CUL-140197-I-P36144

CUL-140197-P 36,144

আমি আর বসিলাম না। "কে মিথ্যা বলিতেছে দেখা যাইবে" বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

কুঞ্জলালের পিতামহীকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি জাল কুঞ্জলাল টাকা লইয়া মকদ্দমা তুলিয়া লইতে স্বীকার করিতে কথা বলিলাম। বৃদ্ধা কহিলেন, "স্ত্রীলোকের ধর্ম্মরক্ষার উপায় এ ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিতে বসিয়াছে, তাহার যে স্ত্রীহত্যা পাতকের ভয় এমন বোধ হয় না। ভগবানের মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে।"

আমি কহিলাম, "যাহাতে এ ব্যক্তির চক্রান্ত প্রকাশ হয়, সে চে ত্রুটি হইবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

জাল কুঞ্জলাল কে, কোথায় নিবাস, তাহার আত্মীয় কে আছে, গোপনে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মকদ্দমা আরম্ভ হইল। জাল কুঞ্জলালের পক্ষে অনেক সাক্ষী। মক এমন সাজান যে, সকলেই বলিতে লাগিল, তাহার ভিত্ হইবে। প্রতিব পক্ষ হইতে আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, কিছু দিন পূর্ব্বে বাদীর অঙ্গুলি ছেদন করিয়াছিলাম। সকল কথা সত্য বলিতে পারিলাম না। বলিত বাদীর অঙ্গুলিতে ঘা হইয়াছিল, সেই জন্য তাহার অঙ্গুলি ছেদন করা জাল কুঞ্জলালের পক্ষে অন্য লোকে পূর্ব্বেই সাক্ষ্য দিয়াছিল যে, আমি সাহেবের লোভে মিথ্যা কথা বলিতে স্বীকৃত হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত মকদ্দমা জাল কুঞ্জলালেরই জিতিবার কথা।

মকদ্দমার শেষ দিন এক জন নূতন সাক্ষী উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া জাল কুঞ্জলালের মুখ শুকাইয়া গেল। সাক্ষী বৃদ্ধা, বিধবা, বাদীকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। কহিল, "ইহার নাম বেণী, আমার একমাত্র সন্তান। তিন বৎসর হইল, গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেই শোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।" বুড়ীর সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী যুবতী ছিল। সে সলজ্জ ভাবে সাক্ষ্য দিল যে, বাদী তাহার স্বামী, তাহাকে কিছু না বলিয়া তিন বৎসর নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

CUL-H01970 P 36,144
1-P 36,144

বলিলাম, "আপনাকে সত্য কথা বলিতেছি। তখন কি করিব, সে ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন?"

ছিলাম। সে সকল কথা অস্বীকার করে, আমার সঙ্গে যে কখন হল, সে কথা পর্য্যন্ত স্বীকার করে না।"

বাদীপক্ষ কহিলেন, "শুধু যদি টাকার কথা হইত, তাহা হইলে কোন ছিল না। না হয় কিছু টাকা দিয়া মিটিয়া যাইত। কিন্তু ঘরে বিপদ আছে। স্ত্রীলোকের বড় ভয়ানক।"

আমি কহিলাম, "তাহার সহিত আর একবার দেখা করিব। টাকার যদি মকদ্দমা মিটাইতে স্বীকৃত হয়, সে চেষ্টা দেখিব।"

মুহুরী কহিলেন, "সেই চেষ্টা দেখিবেন। কি বলে, আমি কেমন করে পাই।"

সেই কথা মত আমি লাল কুঞ্জলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। প্রথমে আমার সহিত দেখা করিতে সম্মত হয় না, অবশেষে বিশেষ অনুরোধে তুষিয়া স্বীকৃত হইল। সে সময় তাহার নিকটে আর কেহ ছিল না। আমাকে দেখিয়া কহিল, "আপনি আবার কেন আসিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "আপনাকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছি। আপনি পাঠাবার লোকেই এ মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন, টাকা লইয়াই বিবাদ কথা। কুঞ্জলালের বিধবা স্ত্রী আছে, তাহাকে কেন বিপদ্‌গ্রস্ত করেন? কিছু টাকা লইয়া নিষ্পত্তি করিয়া কেন নিষ্কৃতি করেন না।"

লাল কুঞ্জলাল কহিল, "আপনাকে স্পষ্ট বলিতে দোষ নাই। বিধবা স্ত্রীর প্রতি আমার বিশেষ লক্ষ্য নাই। স্ত্রীলোকই আমার এজেন্ট উকিল। বিধবার স্বামী পুনঃপ্রাপ্তি হইবে, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের কি কথা আছে?"

ক্রোধে শরীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কহিলাম, "আপনার মনে যদি এমন পাপ সঙ্কল্প থাকে, তাহা হইলে আমাকে আপনার পক্ষত্যাগ করিয়া যাইতে বলিবেন। আমি যাহা জানি, সে বিষয়ে একান্ত সাক্ষ্য দিব।"

মুহুরী কহিল, "আমাদের পক্ষ সংখ্যা এত অধিক যে, একজন বাড়িলে কি কমিলে বিশেষ কিছু বৃদ্ধি হয় না। আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, সাক্ষ্য দিবেন। আমি হুদ্দ সাহেবকে দিয়া বলাইব যে, আপনি প্রতিবাদিদিগের গৃহে যাতায়াত করিয়া থাকেন, এবং বড় পুরস্কারের লোভে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন।"

আমি আর বসিলাম না। "কে মিথ্যা বলিতেছে দেখা যাইবে" বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

কুঞ্জলালের পিতামহীকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলে কুঞ্জলাল টাকা লইয়া মকদ্দমা তুলিয়া লইতে স্বীকার করিবে, এই কথা বলিলাম। বৃদ্ধা কহিলেন, "স্ত্রীলোকের বর্ষবরকার উপায় এ ব্যক্তি যে কর্ম করিতে বসিয়াছে, তাহার যে স্ত্রীহত্যা পাতকের ভয় ইহা এমন বোধ হয় না। ভগবানের মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে।"

আমি কহিলাম, "যাহাতে এ ব্যক্তির চক্রান্ত প্রকাশ হয়, সে চেষ্টা হইবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আমি কুঞ্জলালকে, তোমার নিবাস, তাহার আত্মীয় কে আছে, গোপনে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মকদ্দমা আরম্ভ হইল। আমি কুঞ্জলালের পক্ষে অনেক সাক্ষী। সকলেই এমন সাজান যে, সকলেই বলিতে লাগিল, তাহার ভিক্ষা হইবে। আমি পক্ষ হইতে আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, কিছু দিন পূর্বে বাদীর আত্মীয় ছেদন করিয়াছিলাম। সকল কথা সত্য বলিতে পারিলাম না। বলিব বাদীর অনুপস্থিতি থা হইয়াছিল, সেই জন্য তাহার অনুপস্থিতি হেতু আমি কুঞ্জলালের পক্ষে অন্য লোকে পূর্বেই সাক্ষ্য দিয়াছিল যে, আমি তাহার লোভে মিথ্যা কথা বলিতে স্বীকৃত হইয়াছি। এ পর্যন্ত মকদ্দমা কুঞ্জলালেরই জিতিবার কথা।

মকদ্দমার শেষ দিন এক জন নূতন সাক্ষী উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া আমি কুঞ্জলালের মুখ শুকাইয়া গেল। সাক্ষী বৃদ্ধা, বিধবা, বাদীকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। কহিল, "ইহার নাম বেণী, আমার একমাত্র সন্তান। তিন বৎসর হইল, গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেই শোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।" বৃদ্ধার সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী যুবতী ছিল। সে সলজ্জ ভাবে সাক্ষ্য দিল যে, বাদী তাহার স্বামী, তাহাকে কিছু না বলিয়া তিন বৎসর নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

চারি দিকে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। দুই পক্ষে উকীল অনেক বাদ প্রতিবাদ করিল, অবশেষে জাল কুঞ্জলালের হার হইল। পরদিবস অপরাহ্নে তাহার পুনর্বিচার হইল, এবং দোষী প্রমাণিত হইয়া সাত বৎসর কারাগার দণ্ড হইল।

কুঞ্জলালের বিধবার যেমন প্রায়শ্চিত্ত লইবার ইচ্ছা ছিল, সেইরূপ লওয়া হইল। কুঞ্জলালের পিতামহী পৌত্রবধূকে বিষয় ভার দিয়া কাশীবাসিনী হইলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শিবজীর দরবারে ইংরাজদূত।

ব্রিটিশ রাজ্যের যে অংশ আজকাল শস্যশ্যামলা ফলফুলপূর্ণা রত্নপ্রসূ একচ্ছত্র অধীশ্বরী ভারতের প্রধান প্রধান রাজধানীর প্রাসাদের বিচিত্র চিত্রিত বিজয়কেতন হিমাচল হইতে কুমারিকা আধিপত্য ঘোষণা করিতেছে। এই বিশাল ভারতে ইংরাজের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করি, তখন ইংরাজের সাহিকতা, কৃতিত্ব, আমাদের মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সামান্য বাণিজ্যের গোটাকতক সামান্য স্বত্ব লাভের জন্য, তাহার উপায়ই অবলম্বনীয় রাখেন নাই। আমাদের বর্ণনীয় ঘটনা তা মধ্যে অন্যতম।

শিবজীর দরবারে ইংরাজের দৌত্য, ভারতে ইংরেজাধিকারের ইতিহাসে একটি অপ্রকাশিত পরিচ্ছেদ। কোন ইংরাজ ইতিহাসকারই তাঁহাদের সুবিস্তৃত ভারতেতিহাসে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেন নাই। মিল, গ্রন্থনটন, প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেখকগণ, ফ্রেন্ট যে এই অত্যাবশ্যকীয় তাঁহাদের পুস্তকে অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে না। এমন কি, সুবিখ্যাত গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব, যিনি সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় এক বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়াছেন, তিনিও এই প্রস্তাবোল্লিখিত ঘটনাটির

কোন্ উদ্যম করেন নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে বলিয়াই, আমরা তদ্বিষয়িত ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

জাহাঙ্গীর, সাহজাহান প্রভৃতি, প্রবলপ্রতাপান্বিত একচ্ছত্র ভারতেশ্বর ছিলেন; তাঁহাদের নিকট দূতপ্রেরণে ইংরাজের বিশেষ আবশ্যকতা ছিল; কিন্তু তাঁহারা বাণিজ্যসম্বন্ধীয় কোন স্থায়ী লাভ করিবার জন্য, কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার নিকট কিম্বা রাজধানীতে দূত প্রেরণ করেন নাই। কেননা ইহাতে তাঁহাদের অবমাননার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাহার অনেক আছে। প্রথমতঃ, সেই সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা মোগল সম্রাটের অধীন; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিদেশীয় লোকের ও বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তবে নিবন্ধীর নিকট দূত প্রেরণে ইংরাজের কি স্বার্থ থাকিতে পারে? তাহা পরে বলা যাইতেছে।

নিবন্ধী এক জন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন বটে, কিন্তু সম্রাটের নিকট তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি প্রভৃতি যাহা বলিয়াই বিবরণ করুন, যে সময়ের কথা বলিতেছি, নিবন্ধী তখন সম্পূর্ণ অন্যের বিমুক্ত। ওলন্দাজ, ফরাসি প্রভৃতি সমস্ত বৈদেশিক বণিক্ দেশীয়দের সহিত ও সকল স্থানের কোন [illegible]

অবিকৃত কৃষ্ণাস্ত্রবন্দরের সাহায্যে পাঁচ ছয়টি প্রধান [illegible] ছিল। এখানে বিদেশীয় বণিক্দিগের অধ্যক্ষতাদি [illegible] করিত। এই সমস্ত মোগলের সহিত নিবন্ধীর দোস্তির [illegible] বন্ধ হয়, তখন এক প্রকার অরক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় [illegible] সর্দারখান, কোতোয়াল ও আজী প্রভৃতিরাই প্রকৃতরূপে এই নগরে আধিপত্য করিতেন। তাঁহাদের অত্যাচারে বিদেশীয় বণিক্ সাতিশয় ত্রস্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজেরও বালাসোর বড় কম জ্বালাতন করে নাই। প্রকারে সাহেবদের নিজ মটীর ও অনর্থক কষ্টিগ্রস্ত হওয়ায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মাধ্যক্ষগণ নিবন্ধীর নিকট দূত প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ইংরাজ দূত ডাক্তার ফ্রায়ার সাহেব যখন মহারাষ্ট্রপতির [illegible]

কোনো কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে হইলে বিদ্যা বুদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য যে সকল গুণ তাহা আবশ্যক, তাহা তাঁহার ছিল না। তিনি কবি কবির ন্যায় নয়ন-চক্ষুতে জগৎ দর্শন করিতেন। ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার নিকট যুক্তি ও প্রমাণ নিষ্প্রভ হইয়া যাইত; ব্যবহারশাস্ত্রের কূটতর্ক তাঁহার স্বভাবসুন্দর কবি-প্রকৃতির উপযুক্ত ছিল না। মধুসূদন যে ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে একবারেই অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা নয়। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান ব্যক্তির নিকট হইতে যেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তাঁহার দ্বারা তাহা পূর্ণ হয় নাই বলিয়া, আমরা এই সকল কথা বলিতেছি। প্রথম প্রথম তাঁহার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ আশার চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত এবং সুলেখক বলিয়া তাঁহার নাম পূর্ব্ব হইতেই সকলের পরিচিত ছিল, সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য দেশীয় ব্যারিষ্টারদিগের অপেক্ষা অল্প কালের মধ্যে তাঁহার ব্যবসায়ের সুবিধা হইয়াছিল, এবং এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার আয় মাসিক এক হাজার হইতে দেড় হাজার পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর আর বড় উন্নতি হইল না। শেষাবস্থায় তাঁহার প্রথমার্জ্জিত প্রতিপত্তি বরং ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিল, এবং শেষে উপায়ান্তরের অভাবে তিনি প্রিভিকাউন্সিলের অনুবাদকের কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। "চঞ্চলা ধনদারা" প্রসাদলাভের জন্য তিনি জননী বাগ্দেবীর আরাধনা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সপত্নীর সেবা করিতে দেখিয়া বাগ্দেবী তাঁহার হৃদয়মন্দির হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন, কিন্তু কমলাও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। মধুসূদন রত্নলাভের আশায় রত্নাকরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু রত্ন প্রাপ্ত হইলেন না, তাঁহার মুখই কেবল খারবারিতে পরিপূর্ণ হইল।

মধুসূদন য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর, ছয় বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, এই ছয় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য তিনি নূতন কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। অর্থোপার্জ্জনের প্রলোভনেই তাঁহার দিন গত হইত, বাগ্দেবীর সেবার দিকে আর তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি আজন্ম কবি, সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে একবারে সম্পূর্ণ অবসরগ্রহণ তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না; সেই জন্য মধ্যে মধ্যে সাহিত্যের সেবা না করিয়া তিনি নিরস্ত থাকিতে পারিতেন না। য়ুরোপ প্রবাসকালের ন্যায়, এখনও তিনি দুই একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা

করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সকল অসম্পূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে ভিনাসের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম, নীতি ও কবিতামালা; দ্বিতীয়, হেইরবং; ও তৃতীয় মায়াকানন। নীতিমূলক কবিতাগুলি ইসপস্ ফেবলসের আদর্শে, যাহাতে কথাবিনোদ পেশাদীতে লিখিত হইয়াছিল। শিশুর অর্থাভাবক্লেশ দূর করিবার আশায়, বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ হইবার জন্য মধুসূদন তাহা রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতার অনেকগুলি অতি সুন্দর। বাস্তবিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়া, তাহার মধ্যে কয়েকটি সাধারণের সুপরিচিত হইয়াছে। * তাঁহার মৃত্যুর পর সাধারণী পত্রিকাতেও কয়েকটি প্রকাশিত হইয়াছিল, কয়েকটি এখনও অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। শেষোক্ত কবিতাগুলির মধ্যে একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে; কবিতাটি ইসপস্ ফেবলস্ হইতে গৃহীত;—

অন্ধ ও যুবক।

অন্ধ, বয়স্যায় দেশে
বিহরে একেলা অধিপতি।
চিন্তা নিশা অবশেষে
শিশিরে সরস দূর্ব্বা অতি।

বিধির প্রাতিক চায়,
যা দেখে যাহারে তাঁর,
কতক্ষণে হেরি তবে কহে মনে মনে—

২

বহুই সুখর ভূমি,
অমৃতে নির্ঝরে জল,
তরু, লতা, ফল, ফুল,
মন বীণা অনিবার,
যথাহে আসেন ছায়া,
সরস শীতল কায়া,
পবন ব্যজন করে,
পক্ষ বন্ধ মৃদু স্বরে,
সুরাকরে অনেক অলি।

"হেন রাজ্যে এক প্রভা এ দুখ না সহে।
তোমার প্রসাদ চাই,
তুমি হে দেব-প্রেমাই,
প্রাণদে বিনাশ দেব, পদে দিনু ঠাঁই।'

৩

কিন্তু নিশি অবসান
সুরজ সহসা আসি দিল দরশন।

এক পার্শ্ব কবি অধিকায়
পাইলেন সুরথ বিহায়।
খাইল অনেক ক্লেশ
কে গণিতে পারে লেশ?
অরিন্দম কলাকাল
কহিল পাপ নিবহে,
পরে সুখ ভুঞ্জে তবে

* রসাল ও কর্ণবিহিনী, শেষ-শয়ন, সুর্য্য-ও-মৈনাস, ইত্যাদি।

দিয়া গেল কুসুমদলে,
পূর্ণ পূরবাসী যথা নবী বধূ বলে।

৬

রাজাজীর কোলে অন্ন দিয়াছি এ বালা
তোষ বারি কিবা ধন? নয়ন পুতলি।
উঠিলি কণেক পরে কুসুম দেখিয়া
সুখে ভরে তনু তলে।
বিকল আকুল হয়ে ধরে।
তীব্র সুর আবাহনে বরণী বাজিল।
তীন বেলা তীন দণ্ডে,
অভিলাষি চৌদিকে আসিল।

৭

বিবাহের মুহূরত
উঠিল ঘোষে ঘোষণা।
কে জুই, কত বা বল,
হও সাবধান মন,
না থাকিবি, যুবি হত।
কুসুমের উপরে নয়ন
ভাসিল সরোবে বেলা দুইটি উপর।

৮

হৃদয়ে হৃদয়ে বৈল বল,
ভাবে এ নারাজ-পণ নয়,
পিয়ে মূল শাখাবর
প্রতি-মূল কুসুম-সোহাগ,
বুঝি বা কুসুম তুলা যায়,
কে আমারে দিবে পরিচয়?

৯

মাঝার বিরলে এক রমণী রহিল,
অতি তারে বিশেষ চিনিত।
বহিতে এ অবকাশ
নানা রঙ্গ বিরহের
সুখী পাছিল।
কিন্তু সৌভাগ্যের বলে
কুসুম মাঝা-ছলে
কভু না পড়িল।

কহিল কুসুম পত্র উচ্চপদধারী—
পুরাও রাজ্যে এবে অধিকারী।
না রাখিল অবসর,
কর্মচারী সে অতি;
হও হে পুরার যোর,
মাঝি হই ভবে তরি।

১০

সুখী করিবা প্রভুরে,
কহিল যা এ কি বিড়ম্বনা।
আমি যে প্রভুর আমি,
মনে পত্র কুলে স্বামী,
মার্জনে নিজের মানে
হৃদে বল দিব আনে।
এক মাত্র কেবল উপায়।
কুসুম ও কুসুম পত্র,
পৃষ্ঠে চর্বাসন বহ,
আমি যে আসনে বসি
করে সহযাগ আমি,
তা হলে নির্বিঘ্নে যাব।

১১

হায় ঘোরে অন্ধ অন্ধ কুসুমে ভুলিল,
লাজে পৃষ্ঠে দুই সাথী আসনি চড়িল।
লোহারি কণ্টকে গড়া অন্ধ
যারা পাছুকায়,
তাহার আঘাতে আসি ধরি।
কুসুম শাখিল পত্রি,
ভয়ে হয় কিন্নুমতি,
চলে সাথী যে দিকে তাহার।
কোথা আমি, কোথা ধন
হে কুসুম বিবেচন।
বিবাহে হইল বন্দী অবোধ পামার।
পরের অমিষ্ট হেতু যত যে দুর্মতি,
এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী,
হারা সব জয় যায় কর্মের সংহতি

উদ্ধৃত কবিতাটি হইতে পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন যে, গভীর বিষয়ের ন্যায়, সহজ সরল বিষয়েও মধুসূদনের প্রতিভা কিরূপ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইত। নীতিমূলক কবিতাগুলি মধুসূদন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার হেক্টরবধও এই বৎসর প্রকাশিত হয়। হেক্টরবধ মধুসূদনের গ্রীক-ভাষা ও হোমরের প্রতি আন্তরিক অনুরাগের ফল। ট্রয়-রাজকুমার মহাবীর হেক্টরের মৃত্যু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মধুসূদন ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইলিয়দের ষাদুশ সর্গ পর্য্যন্ত বর্ণিত বিষয় লইয়াই তাঁহার গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। হেক্টরবধ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। গদ্যরচনা মধুসূদনের প্রতিভার উপযোগিনী ছিল না। যে অতিরিক্ত অলঙ্কার-বিন্যাস-প্রিয়তার জন্য তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য-গুলিও স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্য ও কৃত্রিমতাপূর্ণ হইয়াছে, গদ্যে তাহার আধিক্য হইলে, তাহা যে পাঠকের প্রীতিকর হইবে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার ভাষা ব্যাকরণদুষ্ট, গ্রাম্যতাপূর্ণ এবং আদ্যোপান্ত পাশ্চাত্য ভাবানুপ্রাণিত বলিয়া, সাধারণ বাঙ্গালি পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। "পাণ্ডুগণ্ড শশ" "পিঙ্গলপদ, কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত অশ্ব," "কৃষ্ণসারী অলঙ্কলতা" এবং "পাতালকন্দরবসতি দেবগণ" ইত্যাদি পদগুলি পাশ্চাত্যভাবাভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে কোনরূপে অর্থবোধক হইলেও, সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরূহার্থ নহে। "রণিলে" "নিবেদিলে" "প্রবানিবেন" ইত্যাদি ক্রিয়াগুলিও পদ্যে বিশেষ আপত্তিজনক না হইলেও, গদ্যে কখনই প্রয়োগ যোগ্য নয়। তবে হেক্টরবধের ভাষার একটা গুণ আছে, হোমরের ভাষার আদর্শে গঠিত বলিয়া ইহা তেজোময় এবং উৎসাহোদ্দীপক। দোষগুণ শতন্ত্র নহে; ইহার সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, মধুসূদন এই গ্রন্থ প্রকাশিত না করিলেই ভাল করিতেন। নীতিমূলক কবিতাবালার ন্যায় এখানিও বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইলে তাঁহার অর্থাভাব ক্লেশ দূরীভূত হইবে; এই প্রত্যাশাতে তিনি ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার আশা সফল হয় নাই।

মধুসূদনের সাহিত্যানুশীলন ত্যাগ করিয়া, এই বার আমরা তাঁহার শেষ-জীবনের বিষাদময় ইতিহাসরচনায় প্রবৃত্ত হইব। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি ছয় বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে ন্যূনাধিক পাঁচ বৎসর কাল তিনি হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করেন। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তিনি কত দূর

কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই উত্থাপন করিয়াছি। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের দ্বারা তাঁহার যেরূপ আয়ের আশা ছিল, তাহা ঘটে নাই; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ব্যয়ের সঙ্কোচ ছিল না। ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রত্যাশায় এবং সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, তিনি ঋণ করিয়া অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করিতেন। আজীবন এবং মুরোপ প্রবাসকালে অর্থাভাবে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ-ভোগ করিয়াও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। অনেক সময় নিতান্ত হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যের ন্যায় অকারণে অথবা সামান্য কারণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, ইংলণ্ডগমনের ব্যয়ে তাহা নিঃশেষিত হইয়াছিল; এ দিকে ব্যয়ের অনুরূপ আয় ছিল না। সুতরাং মধুসূদনের ঋণ ও সেই সঙ্গে মানসিক অশান্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কেবলই যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বিলাসিতায় তাঁহার অর্থব্যয় হইত, তাহা নয়; অনেক সদনুষ্ঠানেও তিনি মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। অর্থের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও মমতা ছিল না; যত শীঘ্র কিছু সঞ্চয় পাকিত, ধূলিমুষ্টির ন্যায় অকাতরে ব্যয় করিতেন, তাহার পর অর্থাভাব হইলেই ঋণের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেন। নিজের সংসার নির্ব্বাহের জন্য হয় ত তিনি কিছু ঋণ করিয়া আনিয়াছেন, সেই সময় কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় অথবা কোন দারিদ্র্যপীড়িত পরিচিত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে দুঃখ জানাইলেন; নিজের দুরবস্থা সত্ত্বেও মধুসূদন তাঁহাকে একবারে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিতেন না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের জজ হইলে, বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার এবং উকীল সকলেই পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদন কেবল সৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া নিরস্ত হইলেন না, সদ্ব্যবসায়ী এবং বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সুবৃহৎ ভোজের আয়োজন করিলেন, এবং তজ্জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলেন। এইরূপ কারণেও যথেষ্ট অর্থব্যয় হইত। উদারতা ও দানশীলতা অনেক সময় মাত্রাধিক হইয়াও দাঁড়াইত। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একবার মধুসূদনের কোন বাল্যসুহৃদ্ * তাঁহার কোন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া মধুসূদনের নিকট একটি সৌকর্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ জানিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুসূদন পরামর্শ

* স্বর্গীয় মঙ্গলাল বাবুর কনিষ্ঠ, বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দান করিলে তখনোবাই তাঁহাকে তাঁহার নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। অনেকক্ষণ বিবাদ চলিবার পর, মধুসূদন তাঁহার বাল্যসুহৃদকে বলিলেন, "ভাই! তুমি যখন উঁহাকে আমার বলিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, তখন আমি কিছুতেই উঁহার নিকট হইতে পারিশ্রমিক লইতে পারি না। কিন্তু তোমার গৃহে আর একটি উপপত্নিও নাই। যদি তোমার নিজের টাকা সঙ্গে থাকে, তবে আমার স্ত্রীকে পাঁচটি টাকা জলখরচা দিয়া বলিয়া আইস, যেন উপযুক্ত সময়ে আমার আহার্য্য প্রস্তুত হয়।" এক দিকে তাঁহার এইরূপ উদারতা দেখিয়া যেমন আমরা আনন্দিত হই, অপর দিকে প্রতিভা ও পরিশোধের চেষ্টায় তাঁহার উদাসীন্যের বিষয় স্মরণ করিলে, আমাদিগের তেমনি ক্লেশ বোধ হয়। অর্থাভাব হইলেই তিনি ঋণ করিতেন, কিন্তু কোথা হইতে যে সে ঋণ পরিশোধিত হইবে, সে সম্বন্ধে একবারও চিন্তা করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গৃহীত ঋণের টাকার অধিকাংশ অপরিশোধিত ছিল, তাহার উপর আরও নূতন নূতন ঋণ হইতে লাগিল। দেখাবন্দী ঋণজালে তিনি একবারেই জড়িত হইয়া পড়িলেন। গোমাংস ফোরানদার হইতে আরম্ভ করিয়া, হরিণী পর্য্যন্ত শত শত ব্যক্তির নিকট গৃহীত ঋণ, অপরিশোধিত অবস্থাতেই তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। কাহাকেও বঞ্চনা করিব, মধুসূদন কখন স্বপ্নেও সে কথা মনে করিতেন না। কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধিহীন ও অবিমৃষ্যকারী প্রকৃতি প্রবঞ্চক না হইলেও তাঁহার কার্য্য যেমন অনেক সময় প্রবঞ্চকের ন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, মধুসূদনের ব্যবহার সময়ে সময়ে সেইরূপ হইত। তাঁহার অনুরাগী ও কল্পনাপক্ষপাতী ব্যক্তির অভাব ছিল না। তাঁহারাও মধুসূদনকে সাহায্য করিতে কৃপণতা করিতেন না। কিন্তু যিনি নিজের মঙ্গলে নিজে উদাসীন, তাঁহাকে রক্ষা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। সুতরাং ক্রমিক ক্রমশঃ দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইতে লাগিলেন। বাল্যাবধি যে সকল দুঃঅভ্যাসে তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, বয়সের সঙ্গে তাহা সংশোধিত না হইয়া বরং আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার নিষ্ফল পরিণাম তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইল। মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ নিবৃত্ত করিবার জন্য, তিনি হয় কবিতায়, না হয় সুরাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এরূপ অবস্থায় রচিত কবিতা আর যে সেই পূর্ব্ব প্রতিভার স্ফুরণ হইবে,

সে সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না থাকুক, তাঁহার দুই একটি ছত্র হইতে কবির তাৎকালিক মানসিক অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে। ভগবতী বাগ্দেবীর ন্যায় কমলারও অনুগ্রহভাজন হইবেন, এই তাঁহার বড় আশা ছিল; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি নিরাশ হৃদয়ে কমলাকে সম্বোধন করিয়া একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন;—

"ভেবেছিনু মোর ভাগ্যে হে রমা সুন্দরি,
দিবাইবে সে বোধানি, লোকে যাহা বলে
ঢালিতে বর্ষির রূপ তব মনে ফলে।
ভেবেছিনু হায়! দেবি আজি তব বুঝি
ডুবাইছ, দেখিতেছি ভ্রমে এই তরী;
অসার, অতুল সুখসাগরের জলে
ডুবিনু, কি বশ তব হবে বল ফলে!"

সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, সকল অবস্থাতেই যে তিনি বাগ্দেবীর ক্রোড়ে বিশ্রামলাভের প্রত্যাশা করিতেন, তাহা আমরা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক অংশেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। এ সময়ও তাঁহার কবিতানুশীলনের বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার কোন আত্মীয় বলেন যে, এক দিন এই সময় মধুসূদনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখি যে, তাঁহার দ্বন্দ্ব প্রাঙ্গণে ও নিম্নতলে তাঁহার উত্তমর্ণ ও তাহাদিগের অনুচরগণ, কোলাহল ও তাঁহার প্রতি কটূক্তি করিতেছে, উপরিতলে মধুসূদন অব্যাহত চিত্তে দান্তের কবিতার অনুশীলন করিতেছেন। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কিন্তু মধুসূদন এখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে কবিতার অপেক্ষা আরও উত্তেজক সামগ্রীর আবশ্যক হইয়াছিল। কবিতায় তাঁহার হৃদয়ের অবসাদ দূরীভূত হইত। তিনি কবিতায় হৃদয়ের যন্ত্রণা প্রশমিত করিবার চেষ্টা পাইতেন। মানসিক যন্ত্রণা যখন অসহ্য বলিয়া বোধ হইত, তখন অবিশ্রান্ত কবিতা পান করিতেন। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে এরূপ আত্মঘাতী হইতে দেখিতে হৃদয়ে যে কি ক্লেশ হয়, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। মধুসূদন নিজেও জানিতেন যে, তিনি আত্মহত্যা করিতেছেন, কিন্তু আত্মহত্যা ভিন্ন ঋণদায় এবং মানসিক যন্ত্রণা হইতে তাঁহার আর নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই; সুতরাং তিনি স্বেচ্ছাক্রমেই সুরাহ্লাদে বিষপান করিতেন। য়ুরোপ প্রবাসকাল হইতে

বাবু মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত মধুসূদনের বিশেষ সৌহার্দ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি মধুসূদনকে এ অবস্থায় যথাসাধ্য সাহায্য ও সান্ত্বনা দান করিতেন। মনোমোহন বাবু বলেন, একদিন এই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখি যে, বেলা দ্বি-প্রহরের সময় মধুসূদন গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ বন্ধ করিয়া, অতি উগ্র অগ্নিমিশ্র সুরা পান করিতেছেন; আমি নিকটে যাইয়া বলিলাম, "একি, আপনি এ কি করিতেছেন? ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা কি আপনি জানেন না?" মধুসূদন বলিলেন, "মনোমোহন, তোমার কি তবে ইচ্ছা যে, আমি নিজের কণ্ঠে নিজে অস্ত্রাঘাত করি?" মনোমোহন বাবু বলিলেন, "সে কি, আমি তাহা বলিব কেন?" মধুসূদন বলিলেন, "মনোমোহন, এই দ্বি-প্রহরের সময়, এরূপ ভাবে সুরাপানের পরিণাম যে কি, আমি তাহা জানি; কিন্তু আমার আর উপায় নাই। কণ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিলেও যাহা, এরূপে সুরাপানের পরিণামও তাহাই ঘটিবে। তবে অস্ত্রাঘাত অপেক্ষা ইহাতে ক্লেশ অল্প বলিয়াই আমি অস্ত্রের পরিবর্ত্তে সুরা ব্যবহার করিতেছি।"

হতভাগ্য কবির জীবন কি নিদারুণ যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইত, এই একটিমাত্র ঘটনা হইতে, পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। এরূপ অত্যাচার এবং শারীরিক নিয়মলঙ্ঘনের পরিণাম যেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, সেইরূপ ঘটিল। অল্প দিনের মধ্যে নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বিধাতা তাঁহাকে যে অনবদ্য স্বাস্থ্যের অধিকারী করিয়াছিলেন; নিজের অত্যাচারের ফলে, তিনি তাহা এইরূপে বিসর্জ্জন করিলেন। যন্ত্রণার আর পরিসীমা রহিল না। একে অর্থাভাব, তাহার উপর পীড়ার যন্ত্রণা, মধুসূদন ধীরতার সহিত এ সকল সহ্য করিতেন; কিন্তু তাঁহার ঋণদাতাগণ যে সদা সর্ব্বদা তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণের ভীতি প্রদর্শন করিত, তাহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশকর বোধ হইত। অবশেষে কারাগারে মৃত্যুর অপেক্ষা আত্মহত্যা করাই তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন। কবি-জীবন দুঃখময়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু এমন শোচনীয় পরিণাম বুঝি পৃথিবীর অতি অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে আর কোনও উন্নতির আশা নাই দেখিয়া, মধুসূদন এই সময় কিছু দিনের জন্য মানভূমের অন্তর্গত পঞ্চকোটের রাজার কার্য্যোদ্ধারের পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহাতে কথঞ্চিৎ তাঁহার অর্থাভাব দূর হইয়াছিল; কিন্তু মানসিক

চপলতায় বিরক্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে তাহাকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন, কবিতাদেবী যে তাঁহার চিরসঙ্গিনী ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কোন অবস্থাতেই কবিতা-সেবনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। রাজকুমে অবস্থানকালে তিনি যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আমরা নিম্নে দুই তিনটি উদ্ধৃত করিতেছি। মধুসূদনের কবিতায় আর সেই পূর্ব্বের তেজ ছিল না। সে সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল। এখন কেবল তাহার ক্ষীণালোকমাত্র অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু তথাপি মধুসূদনের শেষ জীবনের রচনা বলিয়া আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমটি পক্কোট শৈলদর্শনে, দ্বিতীয়টি পক্কোট রাজলক্ষ্মীকে উল্লেখ করিয়া, এবং তৃতীয়টি রাজার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া কার্য্যপরিত্যাগের সময় লিখিত। শেষ কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে;—

পক্কোট গিরি।

কহিলা মহেন্দ্র-মর্ত্ত্যে স্বর্গ গরবেতে
পর্ব্বত কুলের পাখা; কিন্তু ধীমতি
সে কথা সহ্য হে তুমি নাহি আমি মনে
পক্ক কোট, রয়েছ যে লতায় বেষ্টিত
(কুম্ভকর্ণ, রক্ষ, নর, বাহুবলে বলে
পূর্ণ প্রাণ; পূর্ণ বর্ম, তবু ভীমাকৃতি)
রয়েছ যে পড়ে এথা, অন্ধ সে কারণে।
কোথায় সে রূপলক্ষ্মী যার স্বর্ণ জ্যোতি
উজলিত পূর্ব্ব তব? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেমনি তোমার
গিয়াছে চলিয়া দেবী, তেঁই হে এ স্থলে
মনোদুঃখে মৌনভাব তোমার; কে পারে
বুঝিতে কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে?
মানিয়া কর্ম্ম তুমি রয়েছ আঁধারে।

পক্কোটরাজলক্ষ্মী।

হেরিনু স্বপনে আমি গিরির শিখরে।
বাঁধু বাঁধি হাতি দুই ওঁড়ে ওঁড়ে ধরি—
পদ্মাসন উজলিত সত রত্ন বস্ত্র
দুই দেব বাঁধিবারে শোভিছে অধরে
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে
আলো পুরি দশ দিশ; হেরিনু পরশে
সে কমলাসন মাঝে কুলাঙ্গে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী যেন কৈলাস সদনে।
কহিলা বাগ্দেবী হাসে (ঘুচাবে বেহতি
অবোধ শিশুরে যাঁকা যেন প্রেমাদরে)
বিবিধ আছিল পুণ্য তোর পূর্ব্বভবে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আমি হৈমবতী।
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পক্কোট; পক্কোট—এই গিরিপতি।

পক্কোটগিরি বিদায়-সঙ্গীত।

হেরেছিনু গিরিবর নির্ম্মল দর্পণে
অদ্ভুত দর্শন।
বাঁধু বাঁধি হাতি দুই ওঁড়ে ওঁড়ে ধরে।
কমল-আসন এক হীরক মণ্ডিত
দিব্যি তপন।

যেই রবিকুল খ্যাতি তুমি নিয়াছিলা,
সেই রাজকুললক্ষ্মী বাসে দেখা দিলা ;
শোভে সে আসন।
হে সখে! পাষাণ তুমি তবু তব মনে
ভাব-রূপ উৎস, জানি, ওহে সর্ব্বক্ষণে।

ভেবেছিনু নিশিযোর বরষার প্রপাতে
তাঁর ধরা বলে,
ভাঙ্গা ঘর গড়াইব, জল পূর্ণ করি—
অলক্ষ্য পরিখায়, ধনুর্ব্বাণ ধায়
মারি, পণ
অতি কুতূহলে আবার বসিবে হায়।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

আবাহন।

একদা ক'রেছি যাত্রা—
দূর-দূর-চিন্তা-রাত্রি,
সুখ, দুঃখ, আশা, স্মৃতি,
মহত্ব, সৌন্দর্য্য, ধৃতি ;
—হে শিবাতি, সমৃদ্ধি কর অধিষ্ঠান।
লহ অর্ঘ্য, বাঞ্ছ নব-দান।

আত্মদম-বল-ব্রত,
অধ্যবসা, পরাক্রম,
এত যাগ-যজ্ঞ-কর্ম্ম,
এত শিক্ষা-দীক্ষা-ধর্ম্ম,
এত হত্যা—আত্মহত্যা, এত ভক্তি-জ্ঞান,
নহে মনে তুচ্ছ এই ধ্যান।

হের, এ আকুল-ভাবে
দেবগণ ক্রতি আসে—
ভেদুক আকাশ-পট,
যেন-কেন ঘটপট,
লক্ষ্য দেখাব পথ বিচিত্র আলোকে,
যদি তার মুক্ত হোক।

হের, এ প্রণবে, সতি,
তড়িত ব্রহ্মাণ্ড-গতি,

দূর বিশ্বলোক হতে
আশীর্ব্বাদ আসে স্রোতে,
ঘর ঘর ঘুম-ঘুরি ঘরে শিবোপরি।
কুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় নর।

কিছু তুচ্ছ নাহি তার,
সে যে ঐক্য-অনুভাব—
কল্পনার কুতূহলী,
দর্শনে-বিজ্ঞানে বলী,
অদৃষ্টের বিনাশক, সৃষ্টি-সংস্কারী,
বিশ্ব-প্রভু, ধরা-পরমারী।

এস তবে, এস তবে,
সত্যই কৃতার্থ হবে ;
এ বিকট তমু-ভিম
বিষাভাব ঘোর ঘন,
দেবীহর বৃত্তকণ্ঠ—সর্ব্বভীষণার ;
উপযুক্ত আসন তোমার।

বিনা নবাকিরণী-তীর
কোথা খেলা অমরীর ?
বিনা শিব-মহ-বুক
নাহি মায়া-বিশ্রামসুখ।

কর্ম্ম বিনা কারুর কোথাও আদর ?
ধর্ম্ম বিনা কর্ম্ম বিফল।
অরণ্যান্ত-শশি-সম
ক্ষেত্রীভূত মুখিকম ;
মহাদেব জটাপাকে
ভাগীরথী বাঁধা থাকে ;
প্রকৃতির অভিকৃতি-পুরুষ-হিয়ার ;
কালিকা আশ্রমে বিহার।

২

এসেছে কমলা-মাসী,
এস তুমি, প্রেম-রাশি।
এত কর্ম্ম, এত জন,
তবু নর দুঃখ নর—
তবু ওঠে হাহাকার ভেদি অভ্রভেদ,
ধেয়—ধেয় জীবন বিফল।

সেই উন্মাদনা-স্রোত
আজো প্রাণে ওতপ্রোত ;
আজো তৃপ্তি-অবসরে
সে অতৃপ্তি হাহা করে।
সেই চিত্তে অপ্রসাদ, প্রাণে বিকার।
সর্ব্ব-প্রাণী আর্ত্ত-হাহাকার।

আজো সেই পঙ্ক-মর্ম্মে
অগ্নি-লক্ষ্যহীন কর্ম্মে ;
আজো স্বার্থনার ছলে
বিশ্ব ঘিরি রসাতলে ;
কামে ক্রোধে লোভে মোহে শুধু শত চূর্ণ ;
হায়, নর নিরুপায় অসুর।

বৃথা তার ইতিহাস,
ভবিষ্যৎ কাব্য-ভাষ ;
বৃথা-মুখ-বিবর্ত্তন ;
মিছা কুরুক্ষেত্র রণ ;
সভ্যতায় এত শ্রম বৃথায়—বৃথায়।
বিশ্ব মরে, নর-প্রতিভায়।

উঠ দেবি। রাখ সৃষ্টি,
কর প্রেম-সুধা-বৃষ্টি ;
বিশ্ব ও চরণ-সেবে
এ ভাগ্য হবে না ভোগ,
অচল অটল সেই—দুর্ভেদ্য আঁধার।
প্রকৃতির প্রথম বিকার।

উঠ সত্য-সূর্য্য ভাসে—
নীচতা পলাক্ আসে,
ছাড়ে যাক্ অহঙ্কার,
ঘৃণা-দ্বন্দ্ব-হাহাকার।
হিংসা-দ্বেষ-অত্যাচার, বিশ্ব-কোলাহল ;
মঙ্গলে মঙ্গুক অমঙ্গল।

মরে যথা অনাহারে
মহামারী ঘরে ঘরে,
আসে যথা মহাব্যাধি,
প্রাণ যথা মহাপ্রাণে ;
মঙ্গুক এ অপূর্ণতা পূর্ণতা-ভিতরে।
এস দেবি। এস ঘরে-পরে।

এস, তোমি জগদম্বে,
হে আনন্দ—সুখানন্দ।
উৎপাটিয়া মর্ম্মমূল
সত্য-মন্ত্রে খল খল
এস আজ বিশ্বাধিনি। পার্থ-শীর্ষিতে।
সত্য-শিবে, সৌন্দর্য্য-সহিতে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সহযোগী সাহিত্য।

সহযোগী সাহিত্য বলিতে, আমরা পৃথিবীর সকল দেশীয় সমসাময়িক সাহিত্য বুঝি। স্বদেশীয় সাহিত্যের ন্যায় বিদেশীয় সাহিত্যও এ সময়ের সহযোগী সাহিত্যের অন্তর্গত। স্বদেশীয় সাহিত্য আমাদের সমধিক প্রিয়; কিন্তু বিদেশীয় সাহিত্য সবিশেষ শিক্ষণীয়। শিক্ষণীয় কেন, তাহা সবিস্তারে বলা বাহুল্য; কেন না তাহার কারণ অতীব পরিষ্কার;—এত পরিষ্কার যে, তাহা প্রায় সকলেরই—সমীচীন লোকমাত্রেরই, সহজ প্রত্যক্ষ। সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়া, বা কূট তর্ক করিয়া, তাহা বুঝাইবার দরকার নাই।

জগতের এবং জীবনের সর্ব্ব সামগ্রী অপেক্ষা, স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় সাহিত্য আমাদের অধিকতর আদরণীয়, সাদরণীয় এবং সমালোচনীয়। বঙ্গসাহিত্য আমাদের বুকের জিনিস। সেই বুকের জিনিস বাঙ্গলা সাহিত্যের বিকাশার্থেই বিদেশীয় সাহিত্য আমাদের অবশ্যকরণীয় ও সমালোচনীয়।

বঙ্গ সাহিত্যের সেবার জন্যই এই "সাহিত্য" পত্রের জন্ম।—"সাহিত্য" বঙ্গ সাহিত্য,—আমাদের যথাসাধ্য,—স্বদেশীয় সুলেখক ও শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের বাঙ্গলা সাহিত্য সহায়তায়, সেবিত হইয়া থাকেন। এখন হইতে কিঞ্চিৎ সমালোচিতও হইবেন। সহযোগী বাঙ্গালা সাহিত্যের সারসংগ্রহ ও সমালোচনাত্মক অতিরিক্ত পৃথক প্রবন্ধে প্রকটিত হইবে। এ প্রবন্ধে, আমরা কেবল, সহযোগী, বিদেশীয়, সাহিত্যেরই আলোচনা করিব। প্রতি মাসেই, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সহযোগী-সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইবে, এ বৎসরের ইহা নূতন ব্যবস্থা।

প্রধানতঃ বিলাতি পুস্তক ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পত্রিকা হইতে প্রবন্ধাদির সার সঙ্কলিত হইয়া, সমসাময়িক বিদেশীয় সাহিত্য আলোচিত হইবে। বিদেশীয় সাহিত্য। ইংরেজী সাময়িক পত্রে সমগ্র য়ুরোপের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও বিশিষ্ট সাহিত্য সংবাদ প্রাপ্তব্য; অতএব ইংরেজী সাময়িক পত্রই আমাদের এই সহযোগী-সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন হইবে। ত্রৈমাসিক ও মাসিক "রিবিউ" ও "ম্যাগাজিন" হইতে আমরা এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিব। উপযোগী ও উপযুক্ত যো-

করিলে, সাপ্তাহিক ও প্রাত্যহিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদিও আমরা ব্যবহার করিব। এ ব্যবহার,—সাহিত্যের সাধারণ ভূমিতে দাঁড়াইয়া যতটা করা যাইতে পারে, এবং করা উচিত, আমরা তাহাই করিব; তাহার অতিরিক্ত অগ্রসর অবশ্যই হইব না। বিলাতি সাময়িক পত্রের ন্যায় এদেশ হইতে প্রকাশিত ইংরেজী মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রও এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত হইবে।

বিলাতি সাময়িক সাহিত্য এক সুবিশাল, অতিবিস্তৃত পদার্থ। তাহার অণু পরমাণু স্পর্শ করাও আমাদের অসাধ্য। যাহা সাধ্য, তাহাও আবার সহজ নহে। কার্য্য বড়ই কঠিন। বিশেষতঃ আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে উহা কঠিন হইতেও কঠিনতর। অতএব আশা ও আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও এই গুরু ব্যাপারে,—আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইব,—আদৌ কৃতকার্য্য হইব কি না,—সে কথা আমরা আপাততঃ কিছুই বলিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ, সহযোগী সাহিত্যের এই প্রথম প্রবন্ধ, প্রবাস, এত অল্প সময়ে ও ক্ষিপ্র হস্তে লিখিত হইল যে, নিজের কার্য্য নিজেই অত্যন্ত অপূর্ণ দেখিয়া আমরা অসন্তুষ্ট হইতেছি। তবে এ প্রকৃতির প্রবন্ধে, পাঠকবর্গ যদি প্রীতি বোধ করেন, তাহা হইলে ক্রমশঃ ইহার উন্নতি, অবশ্যই অনতিবিলম্বে নহে; অন্ততঃ আমাদিগের এই রূপ আশা।

বিলাতি সাময়িক পত্রে প্রধানতঃ রাজনৈতিক প্রবন্ধের সবিশেষ বহুলতা; রাজনীতি। } অতএব আবশ্যকানুরোধে রাজনীতির অল্প বিস্তর অনুশীলন কাবেই আমাদিগকে করিতে হইবে। বিলাতি ও দেশীয় পত্রের রাজনৈতিক প্রবন্ধ, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক আমরা পরিবর্জ্জন করিতে পারিব না। তাহা করিলে, সাময়িক সাহিত্যের সারাংশ বাদ পড়িবে, এবং আমাদের উদ্দেশসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে।

রাজনীতি অপেক্ষা সাহিত্যই যে আমাদের সবিশেষ লক্ষ্য হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। তবে রাজনীতি যে সাহিত্যের অন্তর্গত নহে, এ কথাও আর এ কালে, বলা যায় না। রাজনীতি নিজে এক্ষণে একটি সুবিস্তৃত সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। সুকুমার সাহিত্যও এ সময়ে রাজনীতির কল-যন্ত্র হইয়া কার্য্য করে ও রাজনীতির যান, বাহন ও সোপান স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ঐ ব্যবহার যে একেবারেই নূতন, আধুনিক ও অভিনব, তাহাও নহে। মনুষ্য জাতির ইতিহাস ও রাজনীতি

সাহিত্য ও রাজনীতি।

আদি কাল হইতে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সাহিত্যের সহিত সংযুক্ত। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক যেমন সাহিত্য ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে পারেন নাই, সাহিত্যিকরাও তেমনি ইতিহাস ও রাজনীতি হইতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন নাই। তাহা করিলে, সাহিত্যের এতাদৃশ সমুন্নত স্তর নির্ম্মিত হইতে কদাচিৎ পারিত।

সংসারের সকল দ্রব্যের সঙ্গেই সাহিত্যের স্বাভাবিক সম্বন্ধ। রাজনীতির সহিতও তাহা প্রবন্ধ স্বাভাবিক। সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বলা বিড়ম্বনা। মানব প্রকৃতির কতক অংশ বাদ দিয়া না ফেলিতে পারিলে সে কার্য্যের সাধন হয় না। সাহিত্যাধিকারের সর্ব্বোচ্চ স্থান কবির মহাকাব্যেও রাজনীতি কি পরিমাণে কার্য্য করে, কে না জানেন? সাহিত্যাধ্যায়ীর পক্ষে রাজনীতির জ্ঞান ও অনুশীলন অপরিহার্য্য, ইহা কেবল অবোধকেই বুঝাইতে হয়।

অতঃপর প্রকৃত কার্য্যের অনুসরণ করা যাইতেছে।

"কলিকাতা রিবিউ" ত্রৈমাসিক সাময়িক। এপত্র এদেশ হইতে প্রকাশিত একমাত্র সমীচীন-সমালোচন সন্দর্ভ। এ পত্র প্রবীণও বটে; বয়ঃক্রম ইহার বিলক্ষণ হইয়াছে। সুবিদ্বান সাহেব ও বড় বড় সিবিলিয়ানেরা ইহাতে লিখেন; এ দেশীয়দিগের লিখিত সারবান্ প্রবন্ধও ইহাতে প্রকাশিত হয়। মিঃ জেম্‌স্ ডব্লিউ কাম্বেল্ বিগত কিয়ৎকাল হইতে এই পত্রের সম্পাদক হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে ক্যালিফর্ণিয়ার সম্পাদক ছিলেন। মিঃ কাম্বেলের কর্ত্তৃত্বে রিবিউ বেশ তেজে চলিতেছে। কিন্তু সম্পাদকের নিজের হাত সাময়িক অপেক্ষা সংবাদপত্রলিখনের অধিকতর উপযোগী।

কলিকাতা রিবিউ।

বিগত জানুয়ারি সংখ্যা রিবিউর আরম্ভেই ভূতপূর্ব্ব মৃত রাজকবি টেনিসনের স্মৃতি ও সম্মানার্থে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা। তাহার পরে একটি বড় বিচিত্র প্রবন্ধ। সিবিলিয়ান মিষ্টার নোলান ইহার লেখক; প্রবন্ধটির নাম "বুদ্ধের অমূলক উপখ্যান"। লেখকের বিবেচনায় গৌতম বুদ্ধের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব আদৌ নাই। তিনি এ সম্বন্ধে গ্রীক ও হিন্দু ইতিহাসের দোহাই ও আরও কয়েক প্রকার প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহার মতে বুদ্ধাবতার অমূলক; বৌদ্ধধর্ম্ম কপিলবস্তুর যুবরাজের ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা ও বৈরাগ্য হইতে উৎপন্ন নহে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও

বুদ্ধ দেবের অস্তিত্ব।

শ্রমণ সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোকের সমবেত চেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি। লেখক বলেন, যৎকালে গ্রীক দূত ম্যাগাস্থানিস চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটনা নগরে আসিয়াছিলেন, তখন পাটনাই ছিল বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল; এবং ম্যাগাস্থানিস, বৌদ্ধ মত, সন্ন্যাসী শ্রমণদের সৃষ্ট বলিয়াই জানিতেন; অতএব, তাহার বহুকাল পরে, চন্দ্রগুপ্তেরই বংশে বুদ্ধ ভূমিষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে?

কিন্তু হিন্দু ইতিহাসে বুদ্ধের নাম গন্ধ নাই, এ সিদ্ধান্তে লেখক কিরূপে উপনীত হইলেন, বুঝিতে পারিলাম না। হিন্দু পুরাণেতিহাসে দশ অবতারের মধ্যে বুদ্ধ যে একটি অবতার। সে যাহা হউক, বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই প্রবল প্রতিঘাতের সময়ে, যখন চারি দিকে বৌদ্ধ সভা, বৌদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও আলোচনা, দেশে বিদেশে; য়ুরোপ আমেরিকায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনচেষ্টা, যখন শিক্ষিত বাঙ্গালী ও খৃষ্টসৃষ্ট সাহেবেরাও প্রখর বৌদ্ধ মতাবলম্বী, যখন বুদ্ধ গয়ার মন্দির হিন্দু সন্ন্যাধিকারী সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে বহু বহু যুগের পর বৌদ্ধকে দিবার উদ্যোগ হইতেছে, যখন স্বয়ং স্যর এডুইন আর্ণল্ড ও গ্রিয়ার্সন্ সাহেব বৌদ্ধ পক্ষের "ব্রিফ" লইয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই মিঃ নোলান বুদ্ধ দেবের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়া হিন্দুর দশ অবতারকে নয় করিতেছেন, ইহা কম সাহসের কাজ নয়। কিন্তু বৌদ্ধ পক্ষ এ কথায় কি বলিতে চাহেন? এত দিনে তাঁহারা কিছু বলিতেছেন না, ইহাও খুব আশ্চর্য্য বটে।

হজরত্ মহম্মদ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে গবেষণা আছে। শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দে হুগলীর পুরাতন ইতিহাস বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সিংহলভ্রমণ সুখপাঠ্য, সবিশেষ নূতন কথা কিছু নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূমিগ্রহণ-আইনের সংস্কার প্রসঙ্গেই "ইংলণ্ড ও ইতালী রাজ্যের ভূমিগ্রহণপ্রণালী" সম্বন্ধে এ সংখ্যা রিবিউতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় আইনের এবারকার সংস্কার, ভূমিবিক্রেতার পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে, বিবম বিড়ম্বনা,—ইহা বলাই বাহুল্য।

"সাহেবগঞ্জ ও রাজমহল" মিঃ বিদ্যারিজের প্রবন্ধ,—সুপাঠ্য। "মাদ্রাজ কবির ইতিবৃত্ত,—ইহাতে কি শিক্ষা দেয়" কলিকাতা রিবিউর এই প্রবন্ধ, এ দেশীয় সংবাদপত্রসমূহে সবিশেষ আলোচিত হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজী বেয়রতস্ত্রিগের অবস্থার উন্নতি ও দরিদ্রতা প্রশমন সম্বন্ধে, প্রবন্ধলেখক যে

সকল প্রশ্ন উঠাইয়াছেন, যেহার যেরূপ অধিকার তাহা বলিয়াছেন, কিন্তু পার্থক্যতঃ সে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা হওয়া কঠিন; বিশেষতঃ, দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা হ্রাস করা "বড় একটুখানি" কথা নয়। দরিদ্রতার হ্রাস না হইলে দরিদ্র প্রজার সংখ্যা কমিতে পারে না। দরিদ্রতা বৃদ্ধিই হইতেছে, আসল কথা। আর সেই কথাটাই আজকাল পৃথিবীময় তোলাপাড়া হইতেছে।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র ধারাবাহিকপ্রবন্ধে ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের জীবনী লিখিতেছেন। এ সংখ্যায়, বোম্বাই পণ্ডিত রাঘু সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মন্দলিকের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। "দেয়াছেন" দ্বিতীয় প্রবন্ধ এ সংখ্যায় দেখিতেছি; ইহার অধিকাংশ উপকরণ সরকারি কাগজপত্র হইতে সংগৃহীত; ইহাতে জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে। দেয়াছের অবস্থা, আকৃতিক ও আর্থিক, উভয় দিক দিয়াই আলোচিত হইয়াছে। উপসংহারে লেখক সে অঞ্চলের শস্যক্ষেত্র সম্বন্ধে কথা পাড়িয়াছেন। শস্যক্ষেত্রের নানা শত্রু। বানর শূকর, বহুপ্রকার পক্ষিবৃন্দ, বন্যহস্তী। ক্ষেত্রের শস্য প্রায়ই ক্ষেত্রেই ধ্বংস হয়। তথাপি, তথাকার লোক কঠোর অস্ত্র আইনের অতীত নহে। প্রবন্ধ-লেখক কিন্তু এ কথাটির উত্থাপন করেন নাই। তবে গবর্ণমেণ্টের অরণ্য-আইন ও অরণ্য-বহুল যে কৃষিজীবীদিগের অনিষ্ট করিতেছে, তিনি এ কথার আলোচনা করিয়াছেন।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের বিগত বর্ষের শিক্ষা-বিবরণী সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধটি কে লিখিয়াছেন, জানি না; কিন্তু এখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপর ইহার যে সুবিশেষ আক্রোশ আছে, তাহা প্রবন্ধেই প্রকাশ।

"মুসলমান-শাসনে হিন্দু-সভ্যতা" নং ২—এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু। মুসলমানদিগের শাসন-শক্তি প্রভাবে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের আধিপত্য কমে, তন্নিবন্ধন সংস্কৃত সাহিত্য তাহার মৌলিকতা ও মার্জ্জিত প্রভা হারাইয়া, বিকলাঙ্গ ও বিকৃতভাবাপন্ন হয়; সুতরাং এ সম্বন্ধে মুসলমানি শাসনে হিন্দু-সভ্যতা মহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, লেখকের এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায়, মুসলমানি শাসন-কালেই তাঁবা বা "ভার্ণাকিউলার" সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। হিন্দি, বাঙ্গালা, তামিল, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি প্রাকৃতমূলক প্রদেশীয় ভাষা সকল সাহিত্যে বিকাশলাভ করিয়াছিল, মুসলমানদিগেরই আমলে। নানকপন্থী, কবিরপন্থী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও চৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারে,

ঐ সকল সাহিত্যের সংগঠন হয়; বসু মহাশয় বিবেচনা করেন, মুসলমান ধর্ম্মের শক্তি সৌষ্ঠবের কার্য্য করিয়াই হিন্দুধর্ম্ম হইতে ঐ সকল উপধর্ম্ম উৎপাদিত করিয়াছিল। সংক্ষেপতঃ, এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত এই যে, মুসলমান সংসর্গেই সাধারণতঃ হিন্দু-সভ্যতা বিলুপ্ত হয়; তবে এই নষ্টের বা অপরের বীজ হিন্দু-সভ্যতার অভ্যন্তরেই নিহিত ছিল, সে বীজ হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিভেদপদ্ধতি প্রভৃতি। আলবেরুনীর ইতিহাসের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অধিকাংশস্থলে এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আদি ও উন্নতিবিষয়ক একটি প্রবন্ধ কোনও অপ্রকাশিতনাম লেখকের লেখা; কিন্তু সুখপাঠ্য। এই প্রকার প্রবন্ধেই ইতিহাসের সৃষ্টি হয়।

কোনও তীরভ্রমণকারীর ভ্রমপ্রদর্শনে, একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পর্য্যবসিত; তাহার পরের ও সকলের শেষের প্রবন্ধ "লর্ড টেনিসন" শীর্ষক। এই প্রবন্ধে টেনিসনের কাব্য ও কবিত্বের সমালোচনা আছে। প্রবন্ধলেখকের মতে, টেনিসন [টেনিসন্ প্রথম শ্রেণীর কবি নহেন। চসর, স্পেন্সর, শেক্সপীয়র ও মিল্টন, এবং সেলী ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ইহাঁরাই ইংলণ্ডের প্রথম শ্রেণীর কবি; বায়রণ ও কিট্‌স্, এই শ্রেণীভুক্ত হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু সে সংশয়ের ইচ্ছা। পরন্তু, বর্ণস, কোলার, বেন জনসন, মেকিঞ্জার, ড্রাইডন, পোপ, গ্রে, মার্লো, ডন, ক্যাম্বেল ও কোলরিজ, ইহাঁরা সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর,—কিন্তু অতি উপযুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণী। টেনিসনকে, তাঁহার এই সমালোচক, এই শ্রেণীতেই স্থান দিয়াছেন। এই শ্রেণীবিভাগও সেই সমালোচকের।

অতঃপর এই রিবিউর, ত্রৈমাসিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা; এ গুলি বেশ দক্ষতার সহিত লিখিত।

কিছুদিন হইতে ইংলণ্ডে কৃষি বিষয়ে উপদ্রব হইয়াছে। কৃষিসম্প্রদায়ের সংরক্ষার ও উন্নতির জন্য, নানাপ্রকার সদুপায় চলিয়াছে। সংবাদ ও সাময়িকপত্রে এ বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে। জমীদারিত্ব। জমা ও জনমজুর লইয়াই কৃষি। কিন্তু এ দেশে জমীজমার যেরূপ ব্যবস্থা, বিলাতে সেরূপ নহে। সেখানকার প্রণালী স্বতন্ত্র। সেখানে হলবাহী প্রকৃত কৃষকের হস্তে জমীজমার কোনও স্বত্ব নাই। তাহারা "ফারমারের" কৃষিকার্য্য সম্পাদনার্থে জনমজুর মাত্র। "ফারমার" অধিকারী ও

জনমজুরের নম্বরবর্ত্তী বাকি।" তিনি জমিদারের নিকট হইতে "কায়েম" জমা লয়েন, তাহাতে জনমজুরে, তাঁহারই কায়েমাবে কাজ করে। জমিদারের জমিদারীর আবাদি ভূমি কতকগুলি কায়েমে বিভক্ত। এক এক কায়েমে, বহু শত বিঘা করিয়া ভূমি। এই কায়েম্ যিনি জমা লয়েন, তিনিই "কায়েমার"। কায়েমারকে "রাইতিয়ার" বলা যায় না; তাহারা বরং এদেশের এক্‌লো-ইণ্ডিয়ান কুঠিয়ালদের সদৃশ অনুরূপ। এখন বলা বাহুল্য যে, ইংলণ্ডের কৃষিকার্য্য ত্রিশক্তির হস্তে ন্যস্ত। জমিদার, কায়েমার ও জনমজুর। ইহার উপর চতুর্থ শক্তি গবর্ণমেণ্ট; এই সমস্ত শক্তির সামঞ্জস্যে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সম্ভব। জানুয়ারী সংখ্যা এডিনবরা রিবিউতে এ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। বলা বাহুল্য, বিস্তর কথার আলোচনা আছে। সংক্ষেপতঃ সমালোচকের মত এই যে, কৃষি স্বত্বে অর্থাৎ জমীজমায় কৃষকের কিঞ্চিৎ স্থায়ী স্বত্ব থাকা আবশ্যক; নহিলে কোন ক্রমেই কৃষির উন্নতি হইবে না। কৃষক ভূম্যধিকারী হওয়ার আবশ্যক নাই; জমীজমার উপর কৃষকের স্থায়ী স্বত্ব থাকিলেই চলিবে, এবং এ জন্য বৃহৎ বৃহৎ কায়েমের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাঝারি পত্তি হওয়া উচিত। অর্থাৎ, জমীজমার "ছুটো" বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। এডিনবরা রিবিউর ন্যায়, "নিউ রিবিউ" ও অন্যান্য পত্রেও, এ বিষয় এক এক দিক দিয়া অবিশ্রান্ত আলোচিত হইতেছে। ফেব্রুয়ারি সংখ্যা নিউ রিবিউর এ প্রবন্ধ, সবিশেষ দক্ষতার সহিত লিখিত। আমাদের বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের লেখকগণ, এ প্রকার সব ব্যবহারিক কাজের কথার পরেরটা আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ লেখেন না কেন?

এডিনবরা রিবিউর অন্যান্য প্রবন্ধের উল্লেখ মাত্র করিবারও স্থান নাই। এ রিবিউ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ত্রৈমাসিক পত্র। ইহারই অনুকরণে এখনকার কলিকাতা রিবিউ। তবে এডিনবরা হইতে কলিকাতা যত দূর; এই উভয় পত্রের সাহিত্য ও শক্তিগত দূরত্বও তত তফাৎ। প্রথম যুগের এডিনবরা রিবিউ হইতে এখনকার ইংরাজী সাহিত্য, বিশেষতঃ সমালোচন সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কোয়ার্টারলি রিবিউ, আর একখানি ত্রৈমাসিক। ইহাতে টেনিসনের সমালোচনা-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সুন্দর ও সবিশেষ সুন্দর। কোয়ার্টারলী রিবিউর সমালোচক, কলিকাতা

কোয়ার্টারলি রিবিউ।

রিবিউর টেনিসন-সমালোচক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট, জানি না; কিন্তু কলিকাতার কোয়ার্টারলি অপেক্ষা বিলাতের কোয়ার্টারলি যে বিশিষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতা রিবিউর সমালোচকের টেনিসন-সমালোচনা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি; কোয়ার্টারলির সমালোচক টেনিসন সম্বন্ধে কি মতাবলম্বী, দেখা যাউক। ইহাঁর বিবেচনায়, "প্রতিভার পূর্ণ জ্যোতির সম্পূর্ণ অধিকার, টেনিসনের মত, ইংলণ্ডের আর কোন কবিরই ছিল না। যে কোনও কবিই হউন না, সকলেরই একটা-না-একটা অসম্পূর্ণতা, একটা-না-একটা দোষ আছেই আছে। কিন্তু টেনিসনের রচনা পূর্ণতার প্রায় নিকটবর্ত্তী। তাঁহার কাব্যে বায়রণের বিসদৃশ কল্পনা নাই, সেলীর সেথায়ত বাক্য-চিত্রের বাহুল্য নাই, কিটসের কিম্ভূত-কিমাকার রচনা-জাল নাই, পরন্তু টেনিসনের কাব্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পদ্যীকৃত গদ্য নাই। তাঁহার রচনানৈপুণ্য সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত, তাঁহার শিল্পচাতুর্য্য, তদাভ্যন্তরিক সত্য ও সারত্বের একানুবর্ত্তী রূপে উপযুক্ত অনুরূপ। * * * টেনিসন দেব বা অসুর দলভুক্ত, ইহা নির্ণয় করিতে বসা নিরর্থক।" অতঃপর আমরা যে সকল পত্রের আলোচনা করিতেছি, সে সমস্তই মাসিকপত্র।

এমিলি জোলা ফরাসী "নবেলিষ্ট"। ইনি এ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত উপন্যাসলেখক। ইহাঁর উপন্যাসরচনাপ্রণালী নূতন, "রিয়ালিস্টিক"। কনটেম্পোরারী রিবিউ। } রিয়ালিস্টিকের অর্থ, ষোল আনা স্বভাব অনুসরণ; স্বভাবাতিরিক্ত ও সদ্ভাবের কবিকল্পিত উচ্চ আদর্শ-সৃষ্টি, এ প্রণালীর লক্ষ্য নয়; সে লক্ষ্য "আইডিয়ালিষ্টিক" ও "রোমান্টিকের"। রিয়ালিষ্টিক, রোমান্টিকের ঠিক বিপরীত। এমিলি জোলার নবেলে এমিলি জোলা। } রিয়ালিষ্টিকের বিশিষ্ট বিকাশ। মানুষ মানুষী প্রকৃত স্বভাবে যে রূপে জীবন যাপন করে; খায়, দায়, বেড়ায়, তোলে ও তোলায়, পৃথিবী কলুষিত ও পুণ্য প্রকৃতি কলঙ্কিত করে, জোলার নবেলে তাহার আলেখ্য অক্ষরে অক্ষরে গৃহীত। মনুষ্য স্বভাবের অথবা মনুষ্যের পাশব ও পৈশাচিক স্বভাবের সে এক জীবন্ত ও ভয়ঙ্কর ফটোগ্রাফ। জোলার নবেল অশ্লীল, অনিষ্টকর ও অন্ধকারময় বলিয়া এক শ্রেণীর সমালোচক জোলার নবেল। } গণ বিবেচনা করেন। কেন্টেম্পোরারী সংখ্যা কনটেম্পোরারী রিবিউ পত্রে, "জোলার নবেলের নৈতিক

শিক্ষা [illegible] কুমারী বার্ণলি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায়, জোনায় নবেদে যে শিক্ষা সিকিত আছে, তাহা এই ত্রয়ঃ

জোনার নবেদের নৈতিক শিক্ষা। } ধর্ম ও পুণ্য, জ্ঞান ও ভক্তি, সাহস ও সত্যতা, সংসার সংসারের এবং স্বভাবের যাহা কিছু ভাল, সে সকলেরই বুকন, তোমার গ্রন্থে কুথিত হইয়াছে; হওয়ার কারণ, মানুষের সংস্বভাবের শিথিলতা। শিথিলতার কারণ অনেক। অনেক মানুষ মানুষী হইতে জন্মিলই না, জন্মান উচিতই ছিল না; জন্মিয়াছে কেবল জনক জননীর প্রবল ভ্রমে। মানুষ এ সংসারে যেরূপ শিক্ষা পায়, তাহা কুৎসিত স্বার্থেরই নামান্তর; মানুষের সমাজ এবং শিক্ষালয়, স্বার্থ শয়তান এক একটি অট্টালিকা; অতএব, জীবহত্যার প্রথম কারণ জনকজননীর অপরাধ; দ্বিতীয় কারণ, সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রের স্বার্থপরতার অপরাধ। মানুষ যেমন হইয়া জন্মে ও যেমন ভর ভাবে তৈয়ার হয়, তাহাতে সে এই অতি জঘন্য অসত্যেরও কার্য্যোপযোগী হয় না। পৃথিবীর কৃষকসম্প্রদায় ও তাহাদের যত কঠোর শ্রমজীবীরা, কোন প্রকারেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব পাইতে পারে না; ধর্ম, ধর্মমন্দির, রাজনৈতিক অধিকার, এ সব যত কিছু থাকুক না, সব সত্ত্বেই সাংসারিক অভাব ও অনন্ত অনাটন, কঠোর শ্রম ও শ্রমজনিত গ্লানি ও অবসাদে, তাহাদের নিকট সৎকার ও সদাচারশিক্ষা শক্তিহীন হইয়া পড়ে, কাযেই তাহার সফলতা হয় না। তার পর শিল্পীসম্প্রদায়, ইহারাও শারীরিক অভাব ও সাংসারিক অনাটনের এত অতি নিকটে, যে উদরপূরণ ব্যতীত জীবনে আর অতিরিক্ত কোনও উপাদেয় ও বাঞ্ছনীয় বস্তু আছে, ইহা তাহারা বুঝিতেই পারে না। সুতরাং ইহাদের পক্ষেও মনুষ্যত্ব লাভ অসম্ভব। পরন্তু, ধনী ও উচ্চ শ্রেণীর লোক, ইহারা কৃত্রিম অভাবরাশির পূরণ ও পরিতৃপ্তির জন্য উন্মত্ত, ইন্দ্রিয়বিলাসিতায় ও বিলাসিতায় আসমান; লোভ ও অহঙ্কারে আচ্ছন্ন। সুতরাং মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত; মনুষ্যজন্মই ব্যর্থ। ইত্যাদি।

হার্বার্ট স্পেন্সার ও অতিব্যক্তিবাদ। } "আধ্যাত্মিক নির্ব্বাচনের অনুপযোগিতা" নাম দিয়া, মিঃ হার্বার্ট স্পেনসার, ধারাবাহিক প্রবন্ধে, অতিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। এই সংখ্যায় তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে মার্চ সংখ্যা [illegible]

রাষ্ট্রীতে। হার্বার্ট স্পেনসারের মত সংক্ষেপে এই যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বা সুসমর্থের জীবন ধারণ ও অসমর্থের ধ্বংস বলিয়া অভিব্যক্তিবাদের যে বিওরী প্রচলিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নয়; জীবার্জ্জিত স্বরূপ বা স্বভাব, বৈদ্যিক সূত্রেই বংশান্তরে সংযুক্ত হয়। বহুবিধ প্রমাণে পণ্ডিতবর স্পেন্সার এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

—মার্চ সংখ্যা কনটেম্পোরারী রিবিউর প্রথম তিন প্রবন্ধ, "আইরিশ হোম রুল বিল" বিষয়ক। তিন প্রবন্ধই তিন স্বতন্ত্র লেখক কর্ত্তৃক লিখিত। হোমরুল। ইঁহারা সকলেই হোমরুলের পক্ষপাতী; আপনাপন আলোকে বিষয়টির ভিন্ন ভিন্ন অংশের আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধের লেখক পদ্মিটিবিষ্ঠ দলপতি মিঃ গ্লেডষ্টন হারিসন। এই পত্রের চতুর্থ প্রবন্ধ, ইংলণ্ডের দরিদ্র-আইনের সংস্কার সম্বন্ধে; এই আইনের উন্নতির জন্য বিলাতে আজ কাল বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে।

—পঞ্চম প্রবন্ধ সেক্সপীয়রের "জুলিয়স সিজার" সমালোচনা। ষষ্ঠ প্রবন্ধের নাম "শিক্ষকের শিক্ষা।" এই প্রবন্ধটি এ দেশীয় স্কুল কলেজের শিক্ষকের শিক্ষা। শিক্ষক মাত্রেরই সবিশেষ আলোচনীয় হওয়া উচিত। প্রফেসর ও মাষ্টার, উভয়ই এই প্রবন্ধ পাঠে উপকৃত হইবেন, অনেক উপদেশ পাইবেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষেও এ সন্দর্ভটি বিলক্ষণ উপাদেয়। শিক্ষাপদার্থ কি,—শিক্ষকের কি প্রকার এবং কত প্রকার শিক্ষায় সতত শিক্ষিত হওয়া উচিত,—তাঁহার দায়িত্ব এবং কার্য্যের গুরুত্ব কত; পক্ষান্তরে কি প্রণালীতে ছাত্রের কোমল মস্তিষ্কে শিক্ষাবীজ বপন করিতে হয়,—কি উপায়ে ছাত্র ও শিক্ষকে সদ্ভাব,—গুরুশিষ্য-ভাব, সংস্থাপিত ও সুরক্ষিত হইতে পারে,—ইত্যাদি শিক্ষকদিগের অবশ্যজ্ঞাতব্য অনেক উপদেশ ও পাকা পাকা পরামর্শ, এই প্রবন্ধে আছে। ইহার লেখক এক জন বহুদর্শী বিজ্ঞ শিক্ষক,—হাতে কলমে কাজ করিয়া, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা করিয়া, শিক্ষকদিগকে সৎপরামর্শ দিয়াছেন। ইনি বলেন, ভাল ছেলেকে সকলেই মানুষ করিতে পারে, কিন্তু মন্দ ছেলেকে মানুষ করাই শিক্ষকের কাজ। এ কাজ যিনি না পারেন, তিনি শিক্ষা-কার্য্যের উপযুক্তই নন। শিক্ষকের ভ্রমবশতঃ অনেক স্থলে ছাত্রের সর্ব্বনাশ ঘটে; শিক্ষকগণ যদি শীতল মস্তিষ্কে ভাবিয়া দেখেন, সে ভ্রম স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

মনুষ্যের বিবিধ স্বরূপ,—ছাত্রের শরীর, মন ও আত্মা, এ তিনই

শিক্ষকের হাতে; ঐ তিনেরই ইষ্টানিষ্ট হওয়া তাঁহারই উপর নির্ভর করে। অনেকে কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য, অন্য কাজ না পাইয়া, শিক্ষকতা করিতে চান, মাষ্টার হন, স্কুল খুলেন; যদি অর্থাগম হয়, তবে ব্যবসা ছাড়েন না; নহিলে অন্য বৃত্তি করিতে যান;—এরূপ লোক শিক্ষক নহেন,—শত্রু, ছাত্রের শত্রু,—সমাজের শত্রু। অনেকে আবার স্কুলমাষ্টারী করিতে না গিয়াও আজীবন শিক্ষক। আরিষ্টোটল, জেরোম এরাসমস, ফেনিলন, রুবো এই শ্রেণীর।

যে শিক্ষক বালক বশে রাখিতে না পারেন; তাঁহার অন্য বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত। যে শিক্ষয়িত্রী বালিকা বাধ্য না করিতে পারেন, তাঁহার বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বিবাহ করাই শ্রেয়ঃ। বালক বালিকাদিগকে বশ এবং বাধ্য করা, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যের প্রথম ও প্রধান সোপান। রূঢ়ে নহে,—সরস ও সদয় ব্যবহারেই ছাত্র বাধ্য হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে বা সময়বিশেষে, কিঞ্চিৎ শারীরিক শাস্তি খুব আবশ্যক। এ জন্য শিক্ষককে কৌজদারীতে টানা অভিভাবকের আহাম্মকী।

শিক্ষককে শিক্ষক হইতে হয় বলিয়াছি, সর্ব্বদা তাঁহার নিজের শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। সে শিক্ষা ছাত্রকে অর্পণ করিবার জন্য ততটা নয়, শিক্ষকের শিক্ষক হইবার জন্য যতটা। অধ্যাপকের অধ্যাপনা অপেক্ষা অধ্যয়ন অনেক বেশী হওয়া উচিত। এ অধ্যয়ন শিক্ষকের স্বোপার্জ্জিত হইবে।

বর্ণের উন্নতি ও জ্ঞানের বৃদ্ধি, এই দুইটি অষ্ট প্রহর চোখের উপর রাখিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করা আবশ্যক।

অধ্যাপনার অর্থ,—জ্ঞান প্রত্যর্পণ করা; অধ্যয়নের অর্থ,—জ্ঞান আত্মসাৎ করা। অধ্যাপনা অপেক্ষা অধ্যয়ন অধিক হওয়া আবশ্যক এই জন্য যে, শিক্ষক যাহা বলেন বা যাহা করেন, তাঁহার দ্বারা ছাত্রের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত হয় না; শিক্ষক প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা, তাহাতেই ছাত্রের চরিত্র গঠন করে।

শিক্ষার ইতিবৃত্ত শিক্ষক মাত্রেরই অধীত হওয়া উচিত। কিন্তু অনেকেই এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অথচ শিক্ষকতা করেন।

শিক্ষক-সম্প্রদায় অনেক স্থলে, বিদ্যালয়ের বাহিরের অন্য কার্য্যে একেবারে অকর্ম্মণ্য; অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিচিত; বস্তুতই অকর্ম্মণ্য। ইহার কারণ, সংকীর্ণ স্থানে স্বকার্য্য ও শিক্ষকের শিক্ষার সীমা বদ্ধ স্বরূপ।

যথাসাধ্য বিদেশভ্রমণ শিক্ষকের কর্ত্তব্য—ইহা তাঁহার শিক্ষাকার্য্যেরও সম্পূর্ণ উপযোগী। পরন্তু, শিক্ষকের শিক্ষা কেবল শিক্ষিতব্য পুস্তকে আবদ্ধ থাকা উচিত নহে। শিক্ষক পরিমিতরূপ সংবাদপত্র পাঠ করিবেন; উৎকৃষ্ট উপন্যাস গ্রন্থও বিলক্ষণ পড়িবেন। উপন্যাসপাঠের উপকারিতা লেখক সবিশেষ বুঝাইয়াছেন।

ছাত্রদিগকে শিক্ষকদিগের সম্মান করা উচিত। এ সম্মানে ছাত্রহৃদয়ে শ্রদ্ধা জন্মে ও বর্দ্ধিত হয়। ট্রেবনিয়স্ টুপী খুলিয়া ক্লাসে যাইতেন; ডাক্তার ম্যাথু আর্ণোল্ড ছাত্রের কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাদের সম্মান করিতেন।

শিক্ষা একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞান। ইহা "থিওরি" ও "প্র্যাক্টিস," উভয়েই শিক্ষণীয়। শিক্ষকের মন সর্ব্বপ্রকারে শিক্ষার জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত। শিক্ষকের বিশুদ্ধ স্বচ্ছন্দের ন্যায় স্বভাব মিষ্ট মধুর হওয়া চাই; স্বাস্থ্য ভাল থাকা চাই; নহিলে মেজাজ বশে থাকে না। শিক্ষকের পক্ষে পরিমিত নিদ্রার নিতান্ত প্রয়োজন। ক্লাসে বসিয়া "বিমাইলে" সব মাটী।

হইতে পারে, এ সকল কথার অনেক কথাই এ দেশীয় শিক্ষক মহাশয়েরা জানেন; কিন্তু, কথা কার্য্যে পালন করেন খুব কম শিক্ষকে, ইহা শোচনীয়।

টেনিসনের "গালগল্প"—কন্টেম্পোরারীর আর একটি প্রবন্ধ। এটি বড় হৃদয়-স্পর্শী। স্বভাবকবির গ্রাম্য কথোপকথনেও কবিত্ব ফুটিয়া উঠিত।

টেনিসনের গালগল্প। } তাঁহার দুই একটি "গালগল্প" বলি;—টেনিসন বেড়াতে বেরিয়েছেন। সঙ্গে আছেন তাঁহার বন্ধুজন,—এই প্রবন্ধের লেখক। সম্মুখে এক ঘোড়া। ঘোড়া ত ঘোড়া। হেকড়া গাড়ীর বহু দিনের ছাড়া, হাড় বেরুনো, বুড়া ঘোড়া। রাস্তার ধারে চরিতেছে। টেনিসন সেই,—অকর্ম্মণ্য অথর্ব্ব অশ্বরত্ন দেখে, সঙ্গীকে ডেকে চেঁচিয়ে বোলে উঠলেন,—"তা' তোমার চোখে হয় ত এ ঘোড়ায় সুন্দর দেখাচ্ছে না। কিন্তু বস্তুতঃ এই অশ্ব বড়ই সুন্দর। পথের পাশে-মাঠে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে,—লেজটুকু বাচ্চাদের নোড়ছে, আহা এ সুন্দর, সুন্দর। সৌন্দর্য্য যেন বার্দ্ধক্যের সঙ্গেই আসে বলে আমার বোধ হয়। সৌন্দর্য্য বার্দ্ধক্যের সঙ্গে আসে;—শরীরবন্ধনের আরম্ভের সঙ্গেই সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। যেমন দেখ, যখন একটি কটেজ নতুন তৈয়ারি হয়, তখন তা' আর কি?

কিছুই নয়, একটি অতি সামান্য ক্ষুদ্র কুটীর, কিন্তু সেই কুটীরের কতকাংশের চাল উঁচাইয়া দাও, দুই পাঁচটি জানালা ভাঙ্গিয়া ফেল, আর তাহার মধ্যে, তাকড়া-চোকড়া পরাইয়া একটি ছোট ছেলে খাড়া করিয়ে দাও,—দেখিবে, তখন তা' কেমন সুন্দর, কত সুন্দর! তখনই তা' শিল্পীর শিল্পের ধিবর।"

মিঃ গ্রাডষ্টান বৃক্ষ ছেদনে বড়ই অনুরক্ত। কিন্তু লর্ড টেনিসন ছিলেন তাহার বিপরীত। বৃক্ষ ছেদনে তাঁহার কান্না আসিত; বিশেষতঃ, বসন্তকালে বৃক্ষ ছেদন দেখিলে, তাঁহার শোকের অবধি থাকিত না; বিরাটে বুক ফাটিত। একবার একটি "সোঙ্গা দেওয়া" গাছ হেলিয়া পড়িয়াছে;—তাহার পর দিনও তাহার একটি শাখায় কয়েকটি মুকুল ফুটিয়াছে। টেনিসন কাতর নেত্রে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছেন, আর পরে বলিতেছেন, "আহা দেখ দেখ, বাছাটি কেমন বাড়িয়ে দিয়েছে,—পল্লব মুকুলিত হোচ্ছে, মুকুলে কি মধুর সৌন্দর্য্য ফুটেছে; আহা! বৃক্ষ জানে না যে, তাহার ঐ মুকুলে আর ফল হইবে না। এইরূপ কত মানুষ বাহিরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, আর মনে করে যে, তারা বেঁচে আছে। কিন্তু তাহারা অন্তরে অন্তরে মরিয়া গিয়াছে।"

"বেকার মজুর ও ভূমি" নামক সংখ্যার আর একটি প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধটির এ দেশীয় পাঠকের প্রীতিকর না হইতে পারে; কেন না, ইহা বিলাতের রাজনীতির কথা। কিন্তু এ দেশীয় রাজনীতির সহিত ইহা ষোল আনা সম্বন্ধ বর্জ্জিত নহে। ভূমির এ দেশীয় বন্দোবস্তের সহিত বিলাতি ব্যবহার তুলনা করিয়া, পরে আলোচনা করার চেষ্টা করা যাইবে। ফলতঃ, এ সম্বন্ধে সব প্রকার সূক্ষ্ম সংস্কার গবর্ণমেণ্ট এদেশে প্রচলন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, বিলাতে তাহার কিছুমাত্র নাই।

ফেব্রুয়ারী সংখ্যা কণ্টেম্পোরারি রিভিউর অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে, পলিটিশিয়ান দলপতি মি ফ্রেডরিক হ্যারিসনের নরবার্বিকা স্বল্পতা সম্বিলন চিন্তা-ধারা বর্ণন করে। অগষ্ট কোমৎ প্রবর্ত্তিত প্রত্যক্ষবাদ বা পজিটিভিজম্ নিশ্চয়তা-বাদ-তত্ত্ব ক্রমে কিয়ৎপরিমাণে একটি দার্শনিক ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, এবং সে ধর্ম্ম, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক আশ্রয় পাইয়াছে। কোমৎ সম্প্রদায় ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তবুও সম্প্রদায় বটে, আর সুপণ্ডিত লোকেরাই ঐ সম্প্রদায়ের

সমস্ত। কোমৎ সম্প্রদায়ের অধিনায়ক এখন উপরি-উক্ত মিঃ হ্যারিসন্, নব বর্ষের আরম্ভে স্বদলস্থ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রতি বৎসরই এই বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, কোমৎ ধর্ম। প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা থাকে। মোটের উপর মনুষ্যত্ব ধর্ম (মনুষ্যত্ব ধর্ম কোমৎ ধর্ম্মেরই অপর নাম) মনুষ্যজাতির মধ্যে কি পরিমাণে ব্যাপ্ত হইল, এবং হইবার ভবিষ্য সম্ভাবনা কি, দেশ কাল পাত্র ও রাজনীতির গতি অনুসারে, প্রতি বৎসর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা বিবেচিত হয়। এ বৎসরের বক্তৃতায় মনুষ্যত্ব ধর্ম্মপ্রচারক মিঃ হ্যারিসন্ আক্ষেপ করিয়া উত্তপ্ত অশ্রু সহকারে বলিতেছেন,—হায়। সমস্ত শক্তিমনী তাহার পক্ষ বিস্তার করিয়া আজও ইউরোপকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।"

এ উক্তির বাঙ্গালা অর্থ,—য়ুরোপে একটা "কুরুক্ষেত্র" সম্ভাবনা। সে সম্ভাবনা আসন্ন না হইলেও একেবারে বহুদূরস্থিত নহে; কিন্তু কত দূরে, তাহা কেহই জানে না; সুতরাং সন্দেহ ও সংশয়, অতএব শঙ্কা।

ফরাসী ধর্ম্মগুরু অগস্ত কোমতের ইংরেজ শিষ্য হ্যারিসন্, ফরাসী সাধারণতন্ত্রে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি সাধারণতান্ত্রিক সর্ব্বময় শাসনিতার পক্ষপাতী। ইহা হইলেই যেন ফ্রান্স সুখী হইবে,—পৃথিবী শান্ত থাকিবে। কিন্তু তাঁহার এই "রিপব্লিক্যান্ ডিক্টেটর" যেন কেমন এক উদ্ভট অসঙ্গত পদ বলিয়া বোধ হয়।

মার্চ সংখ্যা ফর্টনাইটলি রিবিউর প্রথম দুই প্রবন্ধ (১) বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবসাদ ও (২) বিসূচিকা বীজের টীকা। প্রথম প্রবন্ধে বাণিজ্য ও বণিক। } জেবন্স বর্ত্তমান বিপন্নাবস্থার কারণ নির্দ্দেশক্রমে বড় বড় ব্যবসায়ী লোকের অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭০ সাল হইতে বিলাতী বাণিজ্যের অবসাদ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ নানা লোকে নানারূপ অনুমান করেন। ইহা অর্থবিজ্ঞানের একটি কঠিন সমস্যা। ইহার অন্তস্তলে বহুতর কারণ একত্রে কার্য্য করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু ইহার প্রবল এবং সাধারণ কারণ স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময় বৈষম্য। বিলাতের অনেক ব্যবসায়ী ব্যক্তিই বাণিজ্যবিপত্তির নানাবিধ কারণের মধ্যে এই কারণের সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে বিসূচিকাবীজ। } বসন্তাদির বীজে মনুষ্যদেহে টীকা দিয়া বসন্তাদি সংক্রা-

যক্ষ রোগ নিবারণের তীব্র বিসূচিকাবীজে টীকা দিয়া, বিসূচিকা নিবারণ সম্ভব, এই কথা আলোচিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধের লেখক, ফরাসী ডাক্তার হাফ্‌কিনি। ইনি বিসূচিকাবীজের টীকা প্রদর্শন ও প্রচারার্থে, কিছু দিন হইল, এ দেশে আসিয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে, ডাক্তার হাফ্‌কিনি, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে, সমবেত চিকিৎসকমণ্ডলীর সম্মুখে বিসূচিকাবীজের টীকাপ্রণালী প্রদর্শিত করিয়াছেন।

ফর্টনাইটলির অবশিষ্ট অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে স্বপ্নবিষয়ক সন্দর্ভ এ দেশীয়দিগের চিত্তাকর্ষণ করে।

স্বপ্ন-সত্যতা। } এই প্রবন্ধে, স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষ আছে; স্বপ্নের সত্যতা ও স্বপ্ন-সিদ্ধির দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ আছে। লেখকের বিবেচনায়, স্বপ্ন অনেক স্থলে ভগবদ্বাক্য, সত্য জ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী। স্বপ্নের মধ্যে গতবাচর অসত্যের আবর্জ্জনা ও অলীক অমূলক কল্পনার বিড়ম্বনা থাকুক, কিন্তু, তাহার অন্তর্ভেদ করিলে অতি সুন্দর সত্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। কবি,—কবি স্বপ্নেরই প্রসাদাৎ কবি, ভবিষ্যদ্বক্তা স্বপ্নাদেশ পাইয়াই; প্রতিভা স্বপ্নের অপর নাম। স্বপ্ন পরম রমণীয় পদার্থ, ইহাতে নূতন জ্ঞান জাগন করে; নবীন সৃষ্টিতে মনুষ্যচিত্ত প্রফুল্ল করে; এ স্থলে লেখকের নিজের কয়েকটি কথা আমরা উদ্ধৃত করিব।

It would seem then, after all, that dreams are not the *utter* nonsense they have been said to be by such authorities as Chaucer, Shakespeare, and Milton. The chaotic aggregations of our night fancy have a significance and communicate new knowledge. Like some letter in cipher, the dream inscription when scrutinised closely loses its first look of balderdash and takes on the aspect of a serious, intelligible message, or, to vary the figure slighty, we may say that, like, some palimpsest, the dream discloses, beneath its worthless surface-characters, traces of an old and precious communication.

ফেব্রুয়ারী সংখ্যা নাইন্টিথ সেঞ্চুরী। রাজনৈতিক প্রবন্ধের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সে সকলের সবিশেষ উল্লেখ অধিক সময় ও স্থানাপেক্ষ,

নাইন্টিথ সেঞ্চুরী। } আর তাহা সকল পাঠকের রুচিকর না হইতেও পারে। অতএব, অতি অল্প মাত্রাতেই আমরা সেই এক দ্রব্য পরিবেশন করিতেছি। পত্রের প্রথমেই "মনুষ্য বুদ্ধির ক্রমশ"

'হেডিজে' 'হোম রুল' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ। এক কথায়, এই প্রবন্ধের সারসংগ্রহ এই যে, প্রবন্ধলেখকের বিবেচনায় ১৮৮৬ সালে যে সকল কারণে গ্লাডষ্টোনের হোম রুল বিল পাস হইতে পায় নাই, এবারও সেই সকল কারণে তাহা পাস হইবে না।

আরও কয়েকটির মধ্যে একটি রাজনৈতিক প্রস্তাবের নাম "ভূমি সম্পত্তির রাজকর," অর্থাৎ জমীদারের জমীদারী আয়ের উপর আরও কোনও অতিনব টেক্স বসিতে পারে কি না, তাহার বিচার। ইহা বিলাতের কথা হইলেও, বিষয়টাতে বঙ্গীয় জমিদারদিগের শঙ্কিত হইবার সমূল কারণ আছে। জমীদারী আয়করের জন্য বিলাতে বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে। আন্দোলনে অবশ্য এই করের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় প্রকারেরই লোক আছেন; কলে কোন পক্ষের জয় হইবে, নিশ্চয় কিছু বলা যায় না। কিন্তু এই প্রজাতান্ত্রিক যুগে, এ করের স্বপক্ষ পক্ষেরই এক দিন না এক দিন জয় হইবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে বক্তব্যমাণ প্রবন্ধ, বিপক্ষ পক্ষ হইতে লিখিত। লেখক এ করের কাঠিন্য ও অনুপযোগিতা নানা রকমে দেখাইয়াছেন, ও ইহা যে অসম্ভবেরও অসম্ভব, এবং অন্যায়েরও অন্যায়, তাহা প্রতিপাদনার্থ পররাষ্ট্রসচিব লর্ড রোজবেরির উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। লর্ড রোজবেরি বলেন, "The subject of the taxation of ground-rents is beset withsnares and pitfalls"—ইত্যাদি। কিন্তু মনে করুন, জমীদারীর আয়ের জন্য জমীদারের উপর টেক্স বসিল। কিন্তু এ টেক্স জমিদার প্রজার নিকট হইতে না লইয়া ছাড়িবেন কি? প্রজাই যদি সে টেক্স দিল, তবে জমিদারের নিজস্ব আয়ের বা খাজনার উপর আর টেক্স হইল কৈ? কথাটা ঠিক "আয়" নয় *Rent*, অর্থাৎ "খাজনা"; অতএব জমিদারের দেয় এই টেক্স প্রজার উপর পড়িবার অবসর না আছে, এমন নয়। বিশেষতঃ, এ দেশে হইলে আইনে বিধি বা নিষেধ, যাহাই থাক, জমীদারের জন্য বেহদ্দ দারী।

কোনও লেখক একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছিলেন যে, নরকেও সুখ সম্ভবে। সেই কথা লইয়া মহা বাদপ্রতিবাদ চলিয়াছে। বাদপ্রতিবাদের উত্তরে, লেখক পুনর্ব্বার এ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বাইবেল সম্বন্ধে ও আধুনিক বিজ্ঞান, উভয় দিক হইতে প্রমাণ করিতে

প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু পরিমাণে প্রমাণও করিয়াছেন যে, নরকে সর্ব্বদা সুখ আছে, অবশ্যই সুখ সম্ভবে। নরক যেমন শাস্তির স্থান, তেমনি সংস্কারেরও স্থান। পাপী নরকে বাস করে, তাহার পাপের প্রাপ্তি পাইবার জন্য; পাপের শাস্তির উদ্দেশ্য পাপীর সংস্কার, পাপের প্রক্ষালন। শাস্তি যদি দুঃখ হয়, সংস্কার নিশ্চয়ই সুখ; পাপ যদি পীড়াদায়ক হয়, পাপের প্রক্ষালন, পাপের ধ্বংস, অবশ্যই আরামদায়ক। পাপী নরকে অনন্তযাতনা পায়। কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে সে যাতনা আদৌ অবিশ্রান্ত বলিয়া কিছু নির্দ্দেশ নাই। যদি সে যাতনা অবিশ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে সময়ে সময়ে তাহার বিশ্রামে সুখ; পরন্তু যদি অবিশ্রান্তই হয়, তবে পাপীর যাতনায় অবশ্যই অভ্যাস হইবে, সে অভ্যাসই অনভ্যাসের তুলনায় আরামদায়ক। পক্ষান্তরে সংসারের সর্ব্বত্রই অভিব্যক্তির পরিণামানুসারে কার্য্য হইতেছে। নরকেও সে নিয়ম না থাকিবে কেন? না থাকিলে ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে অমিল হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পাপীর সংস্কারের যে ব্যবস্থা আছে, সে যে ভাবেই বুঝানেই কার্য্য হউক, অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে নিশ্চয়ই হইবে। পাপী পাপ আক্রান্তিত হইয়া পুণ্যের দিকে অগ্রসর সেই নিয়মানুসারেই হয়। নরকেও হয়। পুণ্যের দিকে, পরমেশ্বরের দিকে, অল্প অল্প মাত্রায়ও অগ্রসর হওয়া পরম আনন্দ, তাহার আশাতেও আনন্দ; অতএব নরকে নারকীর নিরানন্দের অত্যন্তরে আনন্দ আছে।

"ক্যাসন মানে কি" সুমারী হিগার কিম্ লিখিয়াছেন। এ প্রবন্ধটি কেবল উপায়ের নয়, এতদ্বারা সংসারের অন্য উপকারেরও স্তম্ভারনা। কিন্তু এ প্রবন্ধ ক্যাসন। } ভেদ সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ করা অসম্ভব। ইহার ভেদ, ইহার তড়িৎ, ইহার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, রস রসিকতা, সসার উক্তি ও অভিমত, কেবল মূল প্রবন্ধে অনুভবনীয়, উপভোগ্যও বটে। সুমারী হিগার ক্যাসনের কর্ম্মকারী সকল দিক দিয়া দেখাইয়াছেন, এবং তাহার সুযোগে যে কি মহা নিষ্ঠিবাহন হইতেছে, অক্ষরে অক্ষরে প্রদর্শন করিয়াছেন। ক্যাসন ফলীবাজ, মুক্তকীবাজ, পক্ষি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, ক্যাসন বিকলাঙ্গ ও ঠিকেল চোর। লেখিকা বলেন, ইহার অতিবিস্তারে য়ুরোপের সর্ব্বনাশ হইতেছে। সুন্দরীদের পরিচ্ছদের নাটিন-পরিবর্ত্তনে পৃথিবী রসাতলগত প্রায়।

প্রেরেসর কেলার একজন বিশিষ্ট বাগ্মীকর। ভারতীয় ভোজবাজী সম্বন্ধে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা নর্থ এমেরিকান রিভিউতে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

মর্থ এমিরিকান রিবিউ। প্রফেসর বলেন, নিজে 'বিখ্যাত বাজীকর হইয়াও সম্পূর্ণ সরলতার সহিত স্বীকার করেন যে, ভারতীয় জোকবাজী এত আশ্চর্য্য, তদ্দ্বারা এমনতর সফল অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শিত হয় যে, বিলাতি "জগলারি" তাহা ব্যাখ্যা করিতে বা তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ নহে। ১৮৭৫—৬ সালে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ যখনকালে এদেশে আসিয়াছিলেন, প্রফেসর কেলার তখন এখানে ছিলেন। কলিকাতার গড়ের মাঠে প্রিন্সের সম্মুখে যে দেশীয় বাজীকরগণ নানা প্রকার বাজী দেখাইয়াছিল। ৫০ হাজার লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। কেলার স্বয়ং সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। বাজী দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। শুদ্ধ পরে বসুমা সেই রহস্যের বিষয় প্রফেসর সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন।

"রিবিউ অব্ রিবিউ" সাময়িক সাহিত্য পত্রের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সাহিত্যের প্রায় সকল শস্যই ইহাতে সংগৃহীত। ইহা আবার একখানি গিন্নিবান্নি। এই পত্রের চিত্রাবলী ছোটখাট এক পিক্‌চার-গ্যালারী। সারসংগ্রহ, সমালোচনার মূল সন্দর্ভ, প্রবন্ধ ও অনুবন্ধের ইহা একটা প্রকাণ্ড হাট। ইহার প্রতি সংখ্যাতেই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির একটি করিয়া জীবন-চরিত থাকে। উপস্থিত ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় জীবন-চরিত কোনও ব্যক্তিবিশেষের নহে,—একটি সংবাদপত্রের "পেলমেল গেজেটের" জীবনবিবরণী এ সংখ্যার অধিকতর আকর্ষণীয় প্রবন্ধ।

এই রিবিউর তিনটি সংস্করণ। তিন সংস্করণ তিন স্থান হইতে যুগপৎ প্রকাশিত হয়। এক সংস্করণ বিলাতে, আর আমেরিকায়, ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় অষ্ট্রেলিয়ায়। সাময়িক পত্রের ইতিহাসে, উহাও এক অভিনব কাণ্ড।

কৌরন্ট আমেরিকান পত্র। ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় মিঃ মেরিয়ন ক্রফোর্ট নবেলের লক্ষণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ক্রফোর্ট নিজে নবেলিষ্ট। (ঔপন্যাসিক।) সংসারে দুইখানি করিয়া নবেল, নিয়মিতরূপে লিখেন।

নবেলের লক্ষণ সম্বন্ধে মিঃ ক্রফোর্ট লিখিয়াছেন যে, নবেলে প্রধানতঃ প্রণয় অঙ্কিত হইবে, এবং নবেল হইবে প্রেমের চিত্র। নবেল প্রেমের চিত্র, নবেলের লক্ষণ। প্রেম নবেলের প্রাণ। কারণ এই যে, প্রেমে মানুষ মানুষীর সচরাচর আর সকল বিষয় ও বৃত্তি অপেক্ষা অধিকতর অনুরাগ। প্রেম

তাহার বর্ত্তমানের প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ ব্যাপারেই হউক, বা অতীতের স্মৃতি-কোমল স্মৃতিতেই হউক, বা ভবিষ্যতের সুমধুর স্বপ্নেই হউক, কোনও না কোনও আকারে, মানুষ মানুষীর প্রাণে আঘাত করে, প্রাণ পূর্ণ ও পুলকিত করে; উদ্বাটন ও উন্মিষিত করে। সর্ব্বাপেক্ষা নবেল পরিষ্কার ও সুমিষ্ট হইবে। পুণ্যাত্মা হইতে পাপী, পরম পবিত্র ও মহাপতিত; সৎ এবং অসৎ, সকলেরই—সমগ্র মনুষ্য সংসারেরই নবেল-লিখিত কাহিনী শ্রবণীয়। তাহা সকলেরই শ্রবণযোগ্য হইবে। নবেলে ঔপন্যাসিক আকর্ষণ থাকিবে, তাহার আদ্যন্ত পাঠ না করিয়া কেহই থাকিতে পারিবে না। উহা "ফক্কা" হইবে না, ফটোগ্রাফ্ প্রহসনের মতও উহার আক্ষরিক অনুকরণ হইবে না। আখ্যানিকর্ত্তা ষোল আনা স্বাভাবিক হইবে, উহার অসমঞ্জসতা সম্পূর্ণ রূপে ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্য হৃদয়েরই হইবে। কিন্তু আদর্শ হইবে উচ্চ হইতেও উচ্চতর; সেই মানুষের মনের মাপে মাপা-জোকা হইলে হইবে না, তাহা মানুষের আত্মার মত অনন্ত-উন্মুখ হইবে। নবেলের ধর্ম্ম এতাদৃশ উদার ও প্রশস্ত হইবে, যাহার অভ্যন্তরে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই বসিতে পারে। নবেলের ভাষা কখনও সরল, কখনও তীক্ষ্ণ, কখনও প্রচণ্ড, কখনও উচ্চ গম্ভীর, কখনও গম্ভীরোচ্চ হইবে। ইত্যাদি।

ম্যাকমিলানস্ ম্যাগাজিন। মার্চ্চ সংখ্যা ম্যাকমিলানস্ ম্যাগাজিনে, একটি প্রবন্ধ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধ, মাননীয় চার্লস্ পিয়ারসন-প্রণীত "জাতীয় জীবন এবং চরিত্র ও তাহাদের পরিণামের পূর্ব্বভাগ," নামক নূতন প্রসিদ্ধ পুস্তকের সমালোচনা-মূলক। প্রবন্ধের লেখক মিঃ হেনরিক গ্রীণউড্। মিঃ গ্রীণউড্ বিলাতের এক জন প্রবীণ ও পাকা সম্পাদক। সুবিখ্যাত প্রাত্যহিক ও সাপ্তাহিক বিলাতি পত্র পেলমেল গেজেট ও রবেট, ইহারই কর্ত্তৃক প্রথমতঃ স্থাপিত হয়, ও বহুকাল যাবৎ পরিচালিত হয়। পেলমেলের সম্পাদকতা পরিত্যাগের পর, ইনিই সেণ্ট জেমস্ গেজেট সংস্থাপন ও সম্পাদন করেন। কিন্তু গ্রীণউডের প্রবন্ধ অপেক্ষা পিয়ার্সনের পুস্তক প্রসঙ্গেই এ স্থলে কথা। পুস্তকে পরিব্যক্ত পিয়ার্সনের মতের অধিকাংশ স্থলে অনুমোদন ও যুক্তিপথ অনুসরণ করিয়া, মিঃ গ্রীণউড্ তাঁহার এই প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন "উন্নতির অবসাদ।"

উন্নতির অবসাদ। তাৎপর্য্য এই যে, য়ুরোপীয় জাতিনিচয়ের অদ্যকার যে এই উন্নতি, ঐশ্বর্য্য, সভ্যতা, স্বাধীনতা, সাম্য, পর

সাম্যবিস্তার, সাম্রাজ্যসৃষ্টি ও উপনিবেশনির্ম্মাণ, এ সকলের পরিণাম আর কিছুই নহে,—য়ুরোপীয় জাতিনিচয়ের নিজের অবশ্যম্ভাবী অধঃপতন; এক দ্বারা, এক দিকে যেমন য়ুরোপীয়েরা আত্মউৎকর্ষ হারাইয়া অবনত হইবে ও অধঃপাতে যাইবে; অপর দিকে তেমনি বিশ্ব সংসারের বিজিত, বন্ধ, অসভ্য ও অপকৃষ্ট জাতি সকল শিক্ষিত, সবর্ব ও সজ্জিত হইয়া, উন্নতিমঞ্চে উত্থিত হইবে; এবং অবশেষে অবনত ও অধঃপতিত য়ুরোপীয়দিগেরই উপর আধিপত্য করিবে। ডাক্তার পিয়ার্সনের বিবেচনায়, য়ুরোপীয়দিগের শ্বেত সভ্যতার এই অতি বিস্তার, সংসার ও সর্ব্বদেশীয় লোকের সহিত শ্বেতাঙ্গদিগের সংমিলন, সাহচর্য্য ও সহবাসে, শ্বেতবর্ণ মনুষ্যদিগেরই সর্ব্বনাশ হইবে,—তাহাদের বল বীর্য্য টুটিবে, মৌলিকতা ঘুচিবে; তাহাদের সামরিক ও সাত্ত্বিক শক্তি একেবারেই থাকিবে না; পক্ষান্তরে, কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ মনুষ্য বীর্য্যবান ও পরাক্রান্ত হইয়া, শ্বেতাঙ্গদিগের উপর আধিপত্য করিবে। অন্য জাতির সহিত য়ুরোপীয়দিগের অতি মিশ্রণ তাহাদিগকে য়ুরোপীয় উন্নতির পথ প্রদর্শনই, ডাক্তার পিয়ার্সন এই ভাবী বিভ্রাটের কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার মতে চীনেরাই এক দিন না এক দিন সম্ভবতঃ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম সামরিক হইয়া দাঁড়াইবে; সর্ব্বজাতীয় লোকের উপর তাহারা আধিপত্য স্থাপন করিবে। চীনদিগের অতিরক্ষণশীলতাই তাহাদের অভিবিক্রমের কারণ হইবে। চীনেরা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র আড্ডা গাড়িয়াছে; কিন্তু নিজের দেশে কাহাকেও দাঁড়াইতেও দেয় না। কোনও য়ুরোপীয় গবর্ণমেণ্টই এখন আর চীনবিজয় করা স্বপ্নেও ভাবেন না; তাহা অসম্ভবেরও অসম্ভব; সে চিন্তা উন্মত্ততার চাঞ্চল্যের সাত্ত্ব।

শ্বেতবর্ণের উপর কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণের আধিপত্য।

ডাক্তার পিয়ার্সনের ভবিষ্যদ্বাণী,—ইউরোপীয়দিগের অধঃপাত আরও কয়েক রকমে হইবে, এবং সে অধঃপাত অনিবার্য্য। যাহা অনিবার্য্য, তাহা অবশ্যই সহনীয়। পণ্ডিত হিন্দুজাতির ন্যায় য়ুরোপীয়গণ আত্মপতন বহন করিবেন।

কিন্তু সে পতন আর কি কি প্রকারে হইবে? ডাক্তার পিয়ার্সন বলেন, য়ুরোপের সাম্যবাদ আরও অধিকতর শক্তিশালী হইবে; তথায় সর্ব্বত্র সাম্যতান্ত্রিক শাসন চলিবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা "সপ্তমে উঠিবে," সাম্যতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টে সংসারের সকল বিষয়েরই

সাম্যতান্ত্রিক শাসন।

রাধারণ ভার গবর্ণমেণ্ট লইবেন। সমাজের ষোল আনা নূতন ধরণে গঠিত হইবে। নরনারীমাত্রেই ঐহিক সুখ ও আত্মসুবিধা বই সংসারের আর কোনও ধারই ধারিবেন না। তাঁহারা কোন প্রকার বন্ধনেই বাধ্য থাকিবেন বিবাহ-বন্ধন। না। গ্রন্থকার বলেন, সুতরাং, এযুগিকার বিবাহের ওরুভার এখনি এতটা অসহ হইয়া উঠিয়াছে যে, সাধারণতঃ সর্বত্রেই বিবাহ-বিচ্ছেদের সুবিধা আইন দ্বারা করিয়া দেওয়া হইতেছে। বৈবাহিক বন্ধন ক্রমে শিথিল হইতে শিথিলতর হইবে; মুহূর্তেকের প্রমত্তায় কেহ আর সারা জীবন বহন করিবে না। বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্পূর্ণ এক্তিয়ার পতিপত্নীর নিজের হাতেই থাকিবে। জনকজননী সন্তানপালন করিবেন না; কারণ তাহা সুখ-সুবিধার অন্তরায়। সন্তানপালনের ভার এবং সন্তানের সম্পূর্ণ অধিকার যাইবে, সাম্য-তান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের হাতে। সুতরাং স্বাধীন মানুষ মানুষীর স্বাধীন হৃদয়ে আর সন্তানস্নেহ থাকিবে না। ধর্মবিশ্বাস, কতকগুলি নৈতিক নিয়ম ও রুচিকর অভ্যাসে পরিণত হইবে, ইত্যাদি।

কথাগুলি হঠাৎ শুনিলে যদি বিরূপ বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ও যুক্তি-তর্ক—প্রমাণের সহিত এই সকল কথা বিবৃত্তিত হইয়াছে। তবে এগুলি ভবিষ্যবাক্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।

প্রবন্ধের উপসংহারে মিঃ গ্রীণউড্ নিজেও বলিতেছেন,—"সংসার শুদ্ধ লোককে সভ্য করা য়ুরোপীয়দিগের বরাতই একটা বিষম রোগে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ রোগ ভারতে ও মিসরে অত্যন্ত প্রবল।"

মিঃ গ্রীণউড্ রক্ষণশীল রাজনৈতিক, ডাক্তার পিয়ার্সনও অবশ্য অত্যুগ্র রক্ষণশীল। সুতরাং সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের সবিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, স্বাতন্ত্র্য ও সংরক্ষণশীলতাই যদি উন্নতির অন্তরায় হয়, তবে হিন্দুজাতির পতন হইল কেন? কিন্তু, ইহাও এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, য়ুরোপীয়দিগের ভুনিবন্ধন বাড়িতে বাড়িতে এত অধিক বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহা রাজনৈতিক বিকারাতিসারের লক্ষণ বলিয়াই বোধ হয়।

এই পত্রিকায় আর অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে "য়ুরেনটাইনদিগের গার্হস্থ্য জীবন" নামক প্রবন্ধ পাঠযোগ্য ও বিশেষ প্রীতিপ্রদ। খৃষ্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর য়ুরেনসনগর ও য়ুরেনবাসীদিগের অবস্থা, ইহাতে অঙ্কিত করা হইয়াছে। সে অবস্থা কিরূপ, একটি কথাতেই পাঠক, বহুক বুঝিতে সমর্থ হইবেন। য়ুরেনবাসিনী কামিনীগণ, তৎকালে কৃষ্টি

বোতাম, কয়গাছি বালা ও কিরূপ বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিবেন, আইন দ্বারা তাহা অবধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যে সুন্দরী আইনের এই ধারা উল্লঙ্ঘন করিতেন, তাঁহার স্বামী প্রচুর অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য হইতেন; 'যেন তেন প্রকারেণ' আইন এড়াইবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিতেন না। ইহাতেই বুঝুন, তৎকালে তথায় বিলাসের বিস্তার ও গবর্ণমেণ্টের অর্থলালসা কি প্রকার বাড়িয়াছিল, এবং মনুষ্যপ্রকৃতি কিরূপ বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

ব্ল্যাকউডের ব্যাগাভিন্ — দেবতাহীনতা।

মার্চ সংখ্যা ব্ল্যাকউডে একটি দীর্ঘ কবিতার নাম "প্রাচীন দেবতা।" কবির বিবেচনায়, এই বৈজ্ঞানিক আমলে মনুষ্য-হৃদয় হইতে দেবদেবী বিলুপ্ত হওয়ায়, এবং মানুষের দৈব বিশ্বাস ও দেবতা-ভক্তি না থাকাতে, মনুষ্যজাতি মৃহা অসুখীই হইয়াছে। মানুষের প্রাণে আর তেমন সৌন্দর্য্যানুভবশক্তি নাই। কবিতা ও কল্পনাও যেন দেবদেবীদিগের সহিত অনেকটা অন্তর্ধান করিয়াছেন। কবি দেবতাদের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন।

হোমরুল বিলের বুদ্বুদ।

"আইরিশ গৃহ শাসনের অন্তর্বুদ" প্রবন্ধের লেখক, মিঃ গ্লাডষ্টোনকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া, অন্তর্বুদ্বুদ জলে মিশাইবে, এমন আশা করিয়াছেন। "আইরিশ গৃহ-শাসন বিল" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে কথায় পদ্যের ন্যায় বিলাতি সাময়িক পত্র সকলও পরিপূর্ণ।

ব্ল্যাকউডের এ সংখ্যায় "ভৈরনদে ভ্রমণ" বিবরণ মন্দ নয়। লেখক অসভ্য আফ্রিকানদের উদ্ধারের আশা আদৌ করেন না। তাহাদের কুসংস্কার-জনিত আফ্রিকান। হত্যা ও হাঙ্করোৎসব বীভৎস। কিন্তু তাহাদের সরলতা এবং সাধুতা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। মানুষ অসভ্যাবস্থায় যদি পরদ্রব্যে লোভ না করে, পুরস্কারের শত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে, তাহার সভ্য না হওয়াই কি সবিশেষ বাঞ্ছনীয় নয়?

দুটি ফুল।

(এই কবিতা কয়টি, প্রতি অমাবস্যার ঘুমের গুরুমণি, প্রতি শিবানন্দ মুদের দুঃখনিবারণ, প্রতি কাঙাল পুরের দারিদ্র্যভঞ্জন, ধর্মচ্যুত পুণ্য, অমরীর মকরন্দ, শিশুমণ্ডলীর উদ্দেশে, তাহাদের চিকিৎসা লেখকের দ্বারায় রচিত হইল।)

খোকাবাবু।

কহিলাম চুপি চুপি, "স্বপন তোমের
সকলি রহস্যময়; শিশু বালকের
ব্যবস্থা; আইন, বিধি, অদ্ভুত সকলি।
কেন আকাশের পানে তাকায়ে কেবলি
কহিস্ দেখালা? কেন গায়ের আঁচুল
চুষিস্ অমন মুখে? হায় রে বাতুল!"
কে যেন উত্তর দিল নীরব ভাষায়—
"স্বর্গ অমৃতের ধাম ভোলা কভু যায়?
এখনও যায় নাই আলোকের রেখা;
এখনও যেয়ে নাই আঁধার মুয়াশা;
এখনও চুমিকাটি আর বুনবুনি
সাধেনি তাদের কাজ—এখনও ধরণি
শিখায়েছে দেবশিশু বাজায় মুখুর,
মায়ের বীণা রাজে মধুর, মধুর।
তাই শুনে গদ-গদ আহ্লাদে ভাসিয়া
কবি গো দেখালা, তাই থাকিয়া থাকিয়া,
মায়ের চুম্বন করি আপন চরণ,
যখনি সে দেবস্মৃতি হয় গো স্মরণ—
উথলি অমৃত-বাটি আনন্দে বর্ষিত।
ইন্দ্রাণী সে সুধাধারি পিয়াইয়া দিত।"

খোকার বিদায়।

(কবি-শ্রীযুক্তা নরেন্দ্রকুমারী ভগিনীর অকালমৃত্যুতে নায়ক ক্ষুদ্র শিশুটি কাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কবিতাটি সেই দেবশিশুর কবরমন্দিরে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইল।)

শিশির কহিল,—"এ যে হকচকি লাগা—
কেন হায় আইনু হেথায়?
নয়ন-প্রাণে ঘুম জাগে, কলহের রাগ লাগে
পাছে মোর পাখা।
আমি যাই—তুই কেন একলা থাকিবি?
তুই কেন স্বর্গলোকে অমর রাখিবি?
আয় খোকা, আয়।
আয় সখা, আয়।
মোরে মিলে, এককালে, আসিয়াছি উষাকালে,
এক যাত্রা, ভিন্ন কভু, ভাগ কি দেখায়?
আয় খোকা; আয়,
আয় সখা, আয়।"

* * * *

খোকা উত্তরিল ধীরে, "হে শিশির ভাই!
চল যাই—যাই।
কি কব মুখের কথা, বিশ্বাসিনী মোরে হেথা,
এখনও চুমিকাটি আর বুনবুনি
সাধেনি তাদের কাজ—এখনও ধরণি
শিখায়েছে দেবশিশু বাজায় মুখুর,
মায়ের বীণা রাজে মধুর, মধুর।
তাই শুনে গদ-গদ আহ্লাদে ভাসিয়া
কবি গো দেখালা, তাই থাকিয়া থাকিয়া,
মায়ের চুম্বন করি আপন চরণ,
যখনি সে দেবস্মৃতি হয় গো স্মরণ—
উথলি অমৃত-বাটি আনন্দে বর্ষিত।
ইন্দ্রাণী সে সুধাধারি পিয়াইয়া দিত।"

খোকার বিদায়।

(কবি-শ্রীযুক্তা নরেন্দ্রকুমারী ভগিনীর অকালমৃত্যুতে নায়ক ক্ষুদ্র শিশুটি কাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কবিতাটি সেই দেবশিশুর কবরমন্দিরে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইল।)

শিশির কহিল,—"এ যে হকচকি লাগা—
কেন হায় আইনু হেথায়?
নয়ন-প্রাণে ঘুম জাগে, কলহের রাগ লাগে
পাছে মোর পাখা।
আমি যাই—তুই কেন একলা থাকিবি?
তুই কেন স্বর্গলোকে অমর রাখিবি?
আয় খোকা, আয়।
আয় সখা, আয়।
মোরে মিলে, এককালে, আসিয়াছি উষাকালে,
এক যাত্রা, ভিন্ন কভু, ভাগ কি দেখায়?
আয় খোকা; আয়,
আয় সখা, আয়।"

* * * *

খোকা উত্তরিল ধীরে, "হে শিশির ভাই!
চল যাই—যাই।
কি কব মুখের কথা, বিশ্বাসিনী মোরে হেথা,
হায় গো নিজেরি বুকে রবে তার বাঁধা।
আপন মর্মের ভাষে, সেকালি ঘষিয়া পড়ে,
হর্ষে হাসে বর্ষে বিষাদ।
নয়নে অমৃত মধি, কোমিনী যায় গো ঘরি,
কেহ নাহি বোঝে তার ব্যথা।
গোলাপ কেতকী গন্ধ, সবাই কাটকণ্টক।
এই বুঝি দেবতার প্রথা?
আয় তোরা—আয় আয়;
অতি ঘন, অতি ঘন, ধরণীর বায়ু
বড় ভীরু, ধরিতেছে মোর—
ইহা নহে আমাদের ঠাঁই।
আয় যতন দেখা সকলি কঠোর।
হে শিশির ভাই।
চল যাই—যাই।'
এত বলি ক্ষুদ্র শিশু, শিশিরের নীরে,
কোমুকে ত্যজিল প্রাণ, জীবনের প্রান্তে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

প্রকৃতির বিচিত্রতা।

প্রথম প্রস্তাব।

চক্ষু সকলের আছে, কিন্তু দেখে কয় জন? সকলেই শুনিতে পায়, কিন্তু সঙ্গীতের মর্ম্ম কয় জন গ্রহণ করিতে পারে? ভাবুক সরলে অটিলতা, অটিলে সরলতা অনুভব করেন। বৈজ্ঞানিক শুষ্ক স্তর সুস্মিত করেন, মরুভূমিতে উৎস দেখান। কবিত্বে বৈজ্ঞানিক কবির নিকট পরাভব স্বীকার করেন না।

একটি পিপীলিকা বা একটি ঊর্ণনাভ লইয়া কি সুখে এক এক জন যুগ-যুগান্তর অতিবাহিত করেন? তাঁহারা কি দেখেন, যাহা আমরা অনুভব করি না? দূরবীক্ষণে চক্ষুঃসংযোজন করিয়া, অনন্তকর্ম্মী জ্যোতির্ব্বিৎ ব্যোম-সাগরে কোন্ চিন্তামণির অনুসরণ করেন যে, আহার নিদ্রা তাঁহার অকিঞ্চিৎ-কর বোধ হয়?

স্যার জন লবক বলেন, আমাদের ন্যায় অন্য প্রাণীর চক্ষু কর্ণ থাকিলেও, তাহারা ভিন্ন প্রকৃতিতে ও ভিন্নভাবে গঠিত। এমন প্রাণীও আছে, যাহাদের পিঠের উপর চক্ষু ও পায়ের ডিম্বাকৃতি কর্ণ আছে, এবং কেহ কেহ মুখ দিয়া গান না করিয়া, দেহের পার্শ্ব দিয়া গান করে। ফিশগিন্ বলেন, মৌমাছির শুঁড়ের অগ্রভাগে যে কয়টি চুল থাকে, উহাই জিহ্বার ন্যায় স্বাদগ্রহণ করে। হলাস বলেন, হাইড্রাকৃতি জীবের ঠোঁটের লোমও এই কার্য্য করে। পতঙ্গ-জাতির মুখের ভিতরে বা পার্শ্বের লোম, তাহাদের স্বাদেন্দ্রিয়। পতঙ্গেরা মুখ দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস করে না, শরীরের ভিন্ন স্থানের ছিদ্র দিয়া, তাহারা এ কার্য্য সমাধা করে। ইহাদের শ্বাসযন্ত্র ও ঘ্রাণযন্ত্র এক নহে। শুঁড়ের অগ্রভাগ দিয়া পতঙ্গেরা শব্দ শ্রবণ ও স্পর্শ করে। অন্ধে দর্শন করে বলিলে লোকে উপহাস করিবে; অথচ, একটি বাদুড়ের দুইটি চক্ষু অন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর নানা রকমে সুতা টাঙ্গাইয়া, তাহার মধ্যে অন্ধ বাদুড় ছাড়িয়া দিয়া দেখা গিয়াছে, সে সারা ঘরে উড়িয়া বেড়ায়, অথচ একটা সুতায় একবার পাখা ঠেকে না। পিপীলিকারা বধির বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। অথচ, ইহাদের পরস্পরে সচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা চলিয়া থাকে। বক, তিত্তিরী প্রভৃতি

খণ্ড হইতে একটি স্বতন্ত্র পূর্ণ জীব উৎপন্ন হইবে। কেহ বা স্বতই দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া দুইটি, সে দুই খণ্ড হইতে চারিটি, এই রূপে সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, সহস্র জীব উৎপাদন করে।

এ জগতে সকলেই সকলের শত্রু। পরস্পরের প্রাণান্ত ঘটাইতে সকলেই ব্যগ্র। জীবনসংগ্রামে যে জয় লাভ করে, সেই বাঁচিয়া যায়। এই অনন্ত কুরুক্ষেত্রসমরে কি করিয়া কোন জীব দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে, চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। জীবনসংগ্রামে জয়লাভের কৌশল অতীব আশ্চর্য্য; তাহার দুই একটি এখানে উল্লেখ করা গেল।

সার জন লবক বলেন, এক প্রকার কীটাণু ফুলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। মধুসঞ্চয়ের জন্য মধুমক্ষী ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিলে, ইহারা তাহার গা জড়াইয়া ধরে। ইহারা আকারে এত ক্ষুদ্র যে, মধুমক্ষী তাহাদের আক্রমণ বুঝিতে পারে না। যত দিন মধুমক্ষী মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, অথবা মধু সঞ্চয় করে, তত দিন ইহারা তাহার দেহ পরিত্যাগ করে না। কিন্তু, সে মৌচাকে ডিম পাড়িলে, কীটাণু মৌমাছির দেহ পরিত্যাগ করিয়া, ডিমের মধ্য লুকাইয়া, ডিম গুলি ভক্ষণ করে, এবং সে গুলি সমাপ্ত হইলে, সঞ্চিত মধু শোষণ করিতে আরম্ভ করে। কয়েক জাতীয় প্রজাপতি শোঁ পোকার গায় ডিম পাড়ে; তাহার দেহে পরিণত হইয়া, শেষে তাহার প্রাণান্ত ঘটাইয়া, ডিম হইতে প্রজাপতি বাহির হয়। জীব জন্তুর ক্ষত স্থানে অনেক কীটাণু ডিম উৎপাদন করে। এজন্য ক্ষত স্থান আচ্ছাদিত করিয়া না রাখিলে শীঘ্র আরোগ্য হয় না। আমেরিকা হইতে শূকরের মাংস বহু পরিমাণে ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। পাঠাইবার পূর্ব্বে উহা অগ্নিদগ্ধ করা হয়। এক প্রকার কীটাণু শূকরের দেহে ডিম উৎপাদন করে। মাংস অগ্নিদগ্ধ হইলেও ডিমের উৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হয় না। মনুষ্য সেই শূকরমাংস ভক্ষণ করিলে, মনুষ্যের উদরে উহা কৃমিরূপ ধারণ করে। মনুষ্যদেহ হইতে পরিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, ভূগর্ভে আশ্রয় লইয়াই উহারা রূপান্তর ধারণ করে। অনেকেই দেখিয়াছেন, এক একটি আম কাটিলে উহার ভিতর হইতে জীবন্ত কীট বাহির হইয়া উড়িয়া পলায়ন করে। কিন্তু দেখিলে আমের কোথাও একটি ছিদ্র কি রূপান্তর দেখা যায় না। কি প্রকারে এই সকল কীট উৎপন্ন হয়, কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বাবু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এইরূপে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আম পাকিবার কতিপয় দিবস পূর্ব্বে, এক প্রকার বিপক্ষবিশিষ্ট মক্ষিকা অপক্ক

আম্রগুলির উপর অণ্ড প্রসব করিয়া যায়। ঐ অণ্ড প্রস্ফুটিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাকারে ফলের মধ্যপ্রবিষ্ট হয় ও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইলে, পক্ক আম্র হইতে বহির্গত হইয়া, সুযোগ পাইলে মাটীর মধ্যে প্রবেশ করে ও সম্বৎসর যাপন করে। পরে বর্ষাকালে পক্ষবিশিষ্ট হইয়া, কীটগুলি মাটীর মধ্য হইতে উঠিয়া, পূর্ব্ববৎ অপক্ক আম্রের উপর অণ্ড প্রসব করে।

ক্রমশঃ।

শ্রীশশীমোহনচন্দ্র রায়।

মাধুরী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেশে বড় হলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। হরিহর বাবু অনেক দিনের পর বাড়ী আসিয়াছেন। এত টাকা কড়ি সোণা দানা ও তৈজস পত্র আনিয়াছেন যে; তাহা বড় বড় জমীদার ওমরাহের ঘরেও মিলে না। সেই রাজ চক্রবর্ত্তী, যে স্বহস্তে পাট কাটিত, চিন্তায় বেড়া বাঁধিত, শাকের ক্ষেত নিড়াইত,—তাহার ছেলে যে এত দিনের পর যথার্থই রাজচক্রবর্ত্তী কুমারের ন্যায় আজ বাড়ী আসিবে, ইহা কেহ স্বপ্নেও কখন ভাবে নাই। আজ কয় দিন মাত্র তিনি দেশে আসিয়াছেন, ইহার মধ্যেই সর্ব্বত্র রাষ্ট্র যে, দশ বিশ লাখ টাকা তিনি অবলীলাক্রমে হাসিতে হাসিতে গণিয়া দিতে পারেন। শুনিয়া কেহ শিহরিয়া উঠে, কেহ অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, কেহ বা বলে—ভগবান্ কাকে কখন্ কি করেন, কিছুই বলা যায় না।

বাড়ীখানি তত বড় নয়, তত্তা ছোটও নয়; মাঝারি ধরণের। অনেক দিন হইল, একবার হরিহর বাবু দেশে আসিয়া এই বাড়ীখানি তৈয়ার করিয়া যান। তখনও তাঁহার এতটা উন্নত অবস্থা হয় নাই। সেই বাড়ী আজ কয় দিন ধরিয়া লোকে পরিপূর্ণ। প্রাচীনেরা দল আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, আর বড় দুঃখের সহিত বলিতেছেন, "আহা, রাজদাদা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন!" সমবয়স্কেরা আসিতেছেন, আর এ কথা সে কথার পর বলিতেছে-

ছেন "ছি, এমন কবিরাই কি আমাদিগকে তুলিয়া থাকিতে হয়?" ব্রাহ্মণেতরদিগের মধ্যে যাঁহারা মুরুব্বি মাতব্বর, তাঁহারা আসিয়া প্রণাম করিয়া বাবুর আরও উন্নতিকামনা করিতেছেন; আর তাঁহার সেই ছেলে-বেলার কথা তুলিয়া কত রঙ্গ করিতেছেন। বাবু সকলকে যথাযোগ্য নানা রকম সদালাপে আপ্যায়িত করিতেছেন। তাঁহার অমায়িকতা দেখিয়া পূর্ব্ব-শত্রুরাও মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

আবশ্যক অনাবশ্যক—কত লোক আসিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। কেহ এক ছিলিম তামাকু খাইয়া, কেহ বা দুটা মিষ্ট কথা কহিয়া, কেহ বা দুটা মিষ্ট কথা শুনিয়া, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছে। কাল যে আসিয়াছিল, সে আজ দুইজন নূতন লোক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, এবং আড়ালে চুপি চুপি তাহাদিগের নিকট বাবুর পদ-গৌরব ও তদ্ভোধিক ধনগৌরবের ব্যাখ্যা করিতেছে; সঙ্গী দুটা এক মনে হাঁ করিয়া তাহাই শুনিতেছে। বাবু নিজে একটা গড়গড়াতে আলাহিদা তামাকু খাইতেছিলেন, অনেকে সেই গড়গড়াটারই: কত তারিপ করিতে লাগিল। কলসিটি রূপার কি কাঁসার, তাহা লইয়াই দুই জনে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। যে বলিতেছিল রূপার, সে তাহার অকাট্য প্রমাণস্বরূপ বলিল যে, পূর্ব্বদিন সে বাবুর দুজন খানসামার মুখে শুনিয়াছিল যে, তাহা যেমন-তেমন রূপার নয়,—খাঁটি চাঁদি রূপার তৈয়ারি। অনেকে এ সব কিছুই তর্কবিতর্ক করিতেছিল না, কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে বাবুকে দেখিতেছিল।

বাবু দেখার সখ কতক মিটিলে, দুই প্রহরের সময় এক পাল ছেলে আসিয়া, দরজার কাছে একখানি চালাঘরে—যেখানে রামলাল সিং ও সুখলাল তেওয়ারি চৌকা দিয়া বসিয়া দুই হাতে চাপড়াইয়া বড় বড় মোটা মোটা রুটীর গোছা গড়িতেছিল—সেইখানে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল। রোদে মাথা জ্বালা করিতেছে, ক্ষুধায় পেট তদধিক জ্বলিতেছে, তবু সেই রুটিগড়া-রূপ অলৌকিক কাণ্ড যতক্ষণ না সাঙ্গ হইল, ততক্ষণ এক প্রাণীও সেখান হইতে নড়িল না।

এইরূপে এক মাস কাটিয়া গেল। ৩২ এক মাসের মধ্যে এক দিনের জন্যও লোকের তেমনি আসা-যাওয়া একটুও কমিল না। না কমিবার কারণও ছিল। হরিহর বাবু ইহার মধ্যে দেশের সমস্ত মিস্ত্রি মজুর ধরিয়া, সেই ক্ষুদ্র বাড়ীখানাকে রাজপ্রাসাদ করিয়া ফেলিলেন। চণ্ডীমণ্ডপ ভাঙ্গিয়া

দালান হইল। বাহিরে সারিবন্দি তিন দিকে টানা বৈঠকখানার চক চলিয়া গেল। বালকে বালকে ঝিলমিলি ঝুলিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। ভিতরে সব ঘরে দোতলা উঠিল। রান্নাবাড়ী স্বতন্ত্র নির্ম্মিত হইল। বাহিরে বড় বড় থাম তুলিয়া গাড়িবারাণ্ডা তৈয়ার হইল। সদরে প্রকাণ্ড ফটক বসিল। ফটকের দুই ধারে দুটা ঘর রামলাল ও সুখলাল দখল করিয়া বসিল। বৈঠকখানার দক্ষিণে বড় আঁকাল রকমের এক ফুলবাগান তৈয়ার হইল। চারিটা মালি একেবারে মাথার গামছা বাঁধিয়া গাছ সকল কেয়ারি করিতে লাগিয়া গেল। দিন কতক রাজমিস্ত্রির ঠক্‌ঠকানি, ছুতারের ঘেঁসঘেঁসানি ও মজুরদিগের কলরবানিতে লোকের কান ঝালাপালা হইয়া গেল। এক মাসের মধ্যে প্রাসাদসদৃশ সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিয়া, দূর দূরান্তরের লোকেরা পর্য্যন্ত অবাক্ হইয়া গেল। কত লোকেই বাড়ী দেখিতে আসিল। কেহ খামের প্রশংসা করিল, কেহ মিস্ত্রি দালানের খিলানে খিলানে যে বিচিত্র লতা পাতা কাটিয়াছিল, তাহার বাহাদুরি দিতে লাগিল, যে কেহ খড়খড়ি কখন দেখে নাই, সেই খড়খড়িগুলা ধরিয়া টানাটানি করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। সকলে ভাবিতে লাগিল—হরিহর বাবু নিশ্চয়ই কোন যক্ষের ধন পাইয়াছে।

এখন, স্ত্রীমের চাঁই মহাশয়দিগের মধ্যে প্রত্যেকেরই চেষ্টা হইল, কিসে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বাবুর অধিক প্রিয়পাত্র হইতে পারেন। কিন্তু উদ্দেশ্য যখন সকলেরই এক, তখন কার্য্যও যে সকলেরই এক হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? কাজেই যিনি যখন আসেন, তিনিই আর এক মতের জন্তু দোলতাড়া দেখিতে পান না। কাজের মধ্যে কি, কেবল বাবুর জন্তে জল গাওয়া, আর খোসগল্প করা। যাঁহারা সভিনা শাকের সন্ধান নাই, তিনিও ঘরিয়া রাজা উজির মারিতেছেন। সকাল বেলায় ঝিমিরাশিহির পর অবশ্যই এক বার বাড়ী যাইতে হয়। খোসগল্পে পেট ত ভরে না। যাহার যে দিন যা জুটে, তিনি সে দিন তাহাই নাকে মুখে গুঁজিয়া আবার ধাবমান হন। এমনই ব্যস্ত যে, দণ্ড বিশ্রামের অবকাশ পর্য্যন্ত নাই। আগে যাঁহার নিত্য কার্য্য ছিল আহারান্তে পুত্রটিকে রক্ষা করা,—তিনি ছেলেটি লইলে তবে গৃহিণী আহার করিতে যাইতে পারিবেন,—তাঁর আজ এক মাস অনবরত গালি খাইয়া খাইয়া পেট ভরিয়া গিয়াছে। যিনি এমন সময়ে নিত্য মাঠের ধারে গিয়া বাছুরটিকে নাড়িয়া বাঁধিয়া আসিতেন, তিনি আজ কাল ছেলের উপর ভার দিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যান, উপযুক্ত পুত্রও সময় বুঝিয়া ডাং-গুলি

বাবু যে সে সময়ে কত সোনার কলস, হীরার মুকুট, কুলের মত বড় বড় মুক্তার হার নিজহস্তে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, তাহার একটা ছোটখাট ইতিহাস বর্ণনা করিলেন, শুনিয়া লোকে আরও অবাক্ হইয়া গেল। ভাবিল, ভগবান যাকে দেন, তাকে এমনি করিয়াই দেন বটে!

কথায় কথায় অনেকটা সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। শুধু সে গল্প বলিয়া যাইতে এত সময় লাগিত না। তবে বাবুর নাকি সকল সময়ে সব কথাগুলা একেবারে যোগাইয়া আসে না। মাঝে মাঝে বিস্তর হিন্দি বাহির হইয়া পড়ে। কাজেই তাহার আবার অর্থ ভাঙ্গিতে অনেক সময় লাগে। হয় ত বলিয়া ফেলিলেন—"আমরা পাঁওরল চলিলাম।" এখন "পাঁওরল" কথাটি কি, তাহা সে সব লোকের মধ্যে কেহই বুঝে না। তবে যাহারা সেয়ানা, তাহারা চুপ করিয়া রহিল; যাহারা বোকা, তাহারা মুখ ফুটিয়া অর্থ জিজ্ঞাসা করিল। যাহারা সবজান্তা ধরণের লোক, তাহারা বলিল—"আরে, ও একটা জায়গার নাম।" কাজেই একটু হাসিয়া, বাবুকে আবার তাহার অর্থ ভাঙ্গিতে হইল। এই রকমে বেলাটা কাটিয়া আসিল।

সন্ধ্যার সময় সবাই উঠিয়া গেলে বাবুও উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দ্রুতপদে এক ব্যক্তি সেই গৃহে প্রবেশ করিল। যে আসিল, তাহাকে দেখিবামাত্র বাবু বলিলেন, "আরে, এস দুর্য্যোধন খুড়া!"

দুর্য্যোধনের পায়ে এক হাঁটু ধুলা, তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তাহা বুঝিয়া বাবু দুষমনকে পা ধুইবার জল দিতে বলিলেন। দুষমন জল দিয়া গেলে, হাত মুখ ধুইয়া খুড়া আসিয়া উপবেশন করিলেন।

বাবু বলিলেন "তবে রাজবাড়ী হইতে ফিরিলে কখন?" দুর্য্যোধন খুড়া বলিলেন, "এই আসিতেছি। (বুঝলে কি না) এখনও বাড়ী যাই নাই। তা, (বুঝলে কি না) যে কাজে গিয়েছি, তা না শেষ করে তো আর (বুঝলে কি না) আসা যায় না।"

দুর্য্যোধন খুড়ার ঐ একটা রোগ, কথায় কথায় "বুঝলে কি না" না বলিয়া থাকিতে পারেন না। লোকে ত্যক্ত বিরক্ত হয়, গৃহিণীর কাছে দুবেলা গালি খাইতে হয়, তবু তাঁহার এ রোগ কিছুতেই গেল না। তাঁহার বিশ্বাস, দশটা, কথা বলিতে যদি অন্ততঃ ৪।৫ টা "বুঝলে কি না" না বলিলাম, তবে সে কথা-টির যাধনই হইল না। তাই কি, কথাটা সহজে শেষ করিবেন। আসল কথা না বলিয়া কেবল আগড়ম বাগড়ম নানা কথা আনিয়া ফেলিবেন। তুমি যাহা

শুনিবার জন্ত মহা উৎসুক হইয়াছ, খুড়া আমার সে কথা না বলিয়া, কোন্ সময়ে কোন্ পথ দিয়া গিয়াছিল, কার সঙ্গে দেখা হইল, কে কি কথা বলিল, ইত্যাদি মহা মহা ইতিহাস আগে বর্ণনা করিতে বসিবেন। বিষম বিরক্তি বোধ হইলেও, হরিহর বাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। জিজ্ঞাসিলেন—তার পর, কি দাঁড়াইল?"

দুর্য্যো। "আরে বাপু (বুঝলে কি না) আমরা হ'লেম পাটোয়ার লোক। আমাদের কাছে (বুঝলে কি না) তাঁরা রাজাই হউন আর মহারাজই হউন (বুঝলে কি না) কথায় যদি না বাগাইতে পারিব, তবে আর—অ্যাঁ—বুঝলে কি না।"

হরিহর বাবুর রাগ হইল; হাসিও আসিল। ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তাতো বটেই।" মনে মনে বলিলেন "আবাগের বেটা ভূত।"

তা, মনে মনে যাহাই বলুন, হরিহর বাবু জানিতেন, ভূত হইলে হয় কি, লোকটা খুব পাকা বটে। যথার্থই একটা মস্ত পাটোয়ার। আইন কানুন তাহার মুখাগ্রে। পরা পরামর্শ দিতে অমন আর দুটি নাই। তাঁহার মুসুবিদা দেখিয়া, বড় বড় উকীল মোক্তারেও বক্ মারিয়া যায়। লোকটা, কন্দিবাজি ও ফেরাবিতে পূর্ণ। হরিহর বাবু যে বার বাড়ী করিতে আসেন, সেই বার দুর্য্যোধন খুড়ার শুপরামর্শ সবিশেষ জানিয়া গিয়াছিলেন। হরিহর বাবুও বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দেশে আসিয়া বাস করিতে হইলে, এরকম লোক বশীভূত রাখা আবশ্যক। তাই, তিনি পশ্চিমে গিয়াও মাঝে মাঝে খুড়াকে পত্রাদি লিখিতেন, বাড়ীটা ঘরটা দেখিবার জন্ত তাঁহার উপর ভার দিতেন, সময়ে সময়ে কিছু কিছু সাহায্যও যে না করিতেন, তাহা নহে। সম্প্রতি, দুর্য্যোধন একটা মোটা দাঁও মারিবার চেষ্টায় ফিরিতেছিলেন। বেলডাঙ্গার রাজা দেবীবর রায়ের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল—সেই একমাত্র মেয়ে তাহার সহিত হরিহর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্বন্ধ করিতে যাইবেন। পশ্চিমে থাকিতেই তিনি হরিহর বাবুকে এ কথা লিখিয়াছিলেন। হরিহর পরিবের ছেলে, পয়সা হইয়াছে, তার রাজার মেয়ে পুত্রবধূ হইবে, শুনিয়া আনন্দে গলিয়া গেলেন। খুড়াকে তাহার জন্ত বিশেষ সচেষ্ট থাকিবার জন্ত পত্র লিখিলেন। খুড়া ঝোপ বুঝিয়া একটি কোপ মারিলেন। লিখিলেন, "সে জন্ত ভাবিও না, কিন্তু ঘটক বেটা অনেক হাঁকিতেছে। পাঁচ শত টাকার কম সে রাজি হয় না।" হরিহর তাহাতেই রাজি হইয়া তাহার

উত্তর লিখিলেন। তার পর, তিনি বাড়ী আসিবার পর, দুর্য্যোধন অনেক বার আদ্যোপান্ত করিয়াছেন। আজ বিষয়টা স্থির হইবার কথা ছিল। হরিহর বাবু ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"শেষ, স্থির করিয়া আসিলে বল।"

দুর্য্যোধন খুড়া বলিলেন, "আরে বাপু, সে অনেক কথা, (বুঝলে কি না) তবে বলি শুন।"

খুড়া তো কথা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু শ্রোতৃপুত্রের প্রাণ যায়। সে আলাত পালাত কথা শুনিতে শুনিতে হরিহর বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তা, সে সব কথা বলিয়া আমি আর তোমাদিগকে বিরক্ত করিব না। শেষ কথাটা দাঁড়াইল এই যে, রামায়া রাজি হইয়াছেন। তাঁহারা শীঘ্রই পাত্র দেখিতে আসিবেন। শুনিয়া আনন্দে হরিহর রোমাঞ্চিত হইলেন। সে আনন্দের কথা ভাবিতে প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন "আহা, আজ যদি অভাগিনী ভুবনের মা বাঁচিয়া থাকিত।" সন্ধ্যার অন্ধকার স্তূপে স্তূপে আসিয়া সে ঘর ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল; সেই অন্ধকারে অজ্ঞের অলক্ষিত এক বিন্দু অশ্রু নয়নের অপাঙ্গ দিয়া গড়াইয়া পড়িল। ক্রমশঃ।

বৈদিক প্রবন্ধ।

ঋগ্বেদের সময়ে গোমাংসভক্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল কি না।

১

বঙ্গভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাদিগকে বলেন যে, ঋগ্বেদের মন্ত্রবচনাকালে ঋষিসমাজে গোমাংসভক্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল। দত্তমহাশয় স্বয়ং কত দূর অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বলা দুষ্কর। তিনি অনেক ইয়ুরোপীয় এবং কোনও কোনও দেশীয় পণ্ডিতের মতের দোহাই দিয়াছেন; সম্ভবতঃ স্বাধীন অনুসন্ধান না করিয়াই

পাশ্চাত্য মতে সায় দিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, স্বীয় বঙ্গানুবাদের সূচীতে, ঋগ্বেদের যেখানে যেখানে গোমাংস, গোবধ, বা গোমাংসভোজনের গন্ধ-মাত্র আছে, তাহার তালিকা দিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহার উল্লিখিত বেদাংশে গোমাংসভক্ষণের কত দূর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

১ম প্রমাণ।

ঘৃতবন্তং পবস্তদক্ষিণং মরুৎ বর্ণেব স্যুতং পরিষ্কাসি বিশ্বতঃ।
অযুক্ষ্মা যো বসতৌ তোদিকৃৎ জীবযাজং যজতে সোপমা দিবঃ। ঋগ্বেদ—১।৩১।১৫

"হে অগ্নি। যে যজমান ঋত্বিকদিগকে দক্ষিণা দান করিয়াছে, তুমি সেই পুরুষকে স্যুত মরুৎ-গণের ন্যায় সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা কর। যে যজমান স্বীয় অন্ন দ্বারা অতিথিদিগকে সুখী করিয়া পশুবলিযুক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, সে সূর্য্যের উপমাস্থল হয়।" (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)

ঋকের টীকাতে দত্ত মহাশয় উইলসন সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা,—"The expression, (জীবযাজং যজতে) however is not in compatible with the practice of killing a cow for the food of a guest" যেরূপ ভাবে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাতে দত্ত মহাশয়েরও যেন এই মত।

মূলের তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বচ্ছ অন্ন পান-উপহার দিয়া মনুষ্যের সেবা করে, সে দেবতার প্রকৃতির অনুকরণ করে। কেন না, মনুষ্যের জন্য খাদ্য অন্ন উৎপাদন করাই দেবতার প্রধান কার্য্য।

মূলে আছে, "জীবযাজং যজতে"। সায়ণাচার্য্য অর্থ করেন—"জীব-যাজং" "জীবযজনসহিতং যজ্ঞং যথা জীবনিষ্পাদ্যং যজতে।" দত্ত মহাশয় সায়ণের উপর টীপ্পনি করিয়াছেন,—"অতএব সায়ণ উভয় অর্থই করিয়াছেন; পশুবলিসহিত যজ্ঞ অথবা জীবনিষ্পাদ্য যজ্ঞ।" দত্ত মহাশয়কে আমরা প্রথমে জিজ্ঞাসা করি, এ দুই প্রকার যজ্ঞের ভেদ কি? ফলতঃ, দত্ত মহাশয় সায়ণকে বুঝিতে পারেন নাই। "জীবযজনসহিতং যজ্ঞং"—ইহার অর্থ,—জীবের অর্থাৎ মনুষ্যের উপাসনাযুক্ত যজ্ঞ; পশুবলিযুক্ত যজ্ঞ নহে। যে যজ্ঞে অন্ন-দানের দ্বারা মনুষ্যের "যজন" বা উপসনা, অর্থাৎ সেবা বা তুষ্টি-সাধন হয়, তাহার নাম "জীবযজনসহিতং যজ্ঞং"। সায়ণ যে "জীবনিষ্পাদ্যং" বলিয়া-ছেন, তাহাতে পশুবলি অর্থ আসে, সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, দত্ত মহা-শয়ের পশুবলিসহিত যজ্ঞ ও জীবনিষ্পাদ্য যজ্ঞ তুল্য। কিন্তু মূলে অথবা

নাবণ-তাণ্ডে, গোমাংসভক্ষণের কথা কোথায়? যজ্ঞে হাগবলি হইত, তাহাকে জীবনিষ্পন্ন যজ্ঞ বলা যায়। দত্ত মহাশয় যে এই ঋকের টীকায় কেন অপ্রাসঙ্গিক গোমাংসভক্ষণের কথায় অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা সুকর নহে। ফলতঃ, বলা বাহুল্য যে, এই ঋকে গোমাংসভক্ষণের গন্ধমাত্র নাই। কেবল উইলসন সাহেব অনুমান করেন যে, যদি "গৌরয়াঃ" শব্দে পশু ধরিয়া অর্থ গ্রহণ করা যায়, তবে গো-হত্যার আভাস এ স্থলে থাকিলেও থাকিতে পারে। ইহা নিরুক্তির অমূলক অনুমান।

দ্বিতীয় প্রমাণ।

অস্মা ইদু প্রতরা প্রযজ্যবঃ ক্রমায় মহে বৃষ্ণে শর্দায় হিন্বিরে।
গোর্ন পর্বণ্বিরসা দিদ্যুদস্ত্যরর্ণাংসি জর্ভুরাণস্তুরণ্যবঃ।—ঋগ্বেদ, ১।৬১।১২

"ইন্দ্র ক্রিপ্রকারী, সকলের ঈশ্বর, এবং অপরিমিতবলশালী। হে ইন্দ্র। তুমি এই বৃত্রকে বজ্র প্রহার কর, পরন্তু তার বৃত্রের শরীরের সন্ধিস্থলি তির্যক্‌-অবস্থিত বস্তু যারা কর্তন করে, যেন বৃষ্টি (বাহির হইতে যাবে) এবং জল (ভূমিতে) বিতরণ করিতে পারে।" (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)

মূলে আছে,—"গোপর্ব বিবরা"। সায়ণাচার্য্য এ স্থলে "গো" শব্দের গরু অর্থ করেন নাই। "পশু" এইরূপ সাধারণ অর্থ গিলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"তত্র দৃষ্টান্তঃ গৌর্ণ। যথা মাংসস্য বিকর্ত্তারো লৌকিকাঃ পুরুষাঃ পশোরবয়বান্ ইতস্ততঃ বিভজন্তে তদ্বৎ"। অতএব, যদি ভাষ্যকারের মতের অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে এস্থলেও গোবধের কোন কথাই নাই। তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, গো-অর্থে পশু হইলেও হইতে পারে। তাহা স্বীকার করিলেও, এই ঋকের ঋষিসমাজে বা ঋষি কর্ত্তৃক গোবধের প্রমাণ কোথায়? ঋগ্বেদের সময়েও সাঁওতাল-বাউরি প্রভৃতি অনার্য্য-জাতীয় লোকের পূর্ব্বপুরুষেরা বিদ্যমান ছিল। তাহারা গোহত্যা করিত সন্দেহ নাই। ঋষিরা অন্ত কর্ত্তৃক গোবধ দেখিয়া কি তাহা উপমাস্বরূপ উল্লেখ করিতে অসমর্থ ছিলেন? গোবধের উপমা দিয়াছেন বলিয়া, ঋষিদিগকে গোহত্যাকারী ও গোমাংসভোজী বলা কিরূপ যুক্তিসঙ্গত, তাহা পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করিবেন।

তৃতীয় প্রমাণ।

ত্বং নৌ অগ্নে অসি আয়তো নশাদ্বিত্ব উপদ্রুতঃ।
অহাপীচীভিব আহুতঃ।—ঋগ্বেদ, ২।৩।৫

"হে অগ্নি। তুমি আমাদিগের। তুমি বন্ধ্যাগোজী, বৃষ ও গর্ভিণী গাভী সকলের দ্বারা স্পৃহণীয় হইয়াছ।"—(রমেশচন্দ্র দত্ত)

টীকার দত্ত মহাশয় পুনর্ব্বার উইলসনের অভিপ্রায় স্বদেশবাসীগণকে উপহার দিয়াছেন। যথা,—"It is remarkable that these animals should be spoken of as burnt offerings"—*Wilson.* মূলে গো বা গাভী আদির কোন উল্লেখ নাই। বন্ধ্য বা বন্ধ্যা পশুর সাধারণ নাম "বশা"। গোজাতীয় তাদৃশ পশুর নাম "গোবশা"। "উক্ষণ" শব্দে বৎসোৎপাদনসমর্থ পুং-পশু বুঝায়। মূলের অষ্টাপদী শব্দটি বড়ই কঠিন। অসম্ভব নহে যে, অষ্টাপদী এক প্রকার কাল্পনিক পশু। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে "শরভ" নামে অষ্টপদবিশিষ্ট পশুর উল্লেখ দেখা যায়, এস্থলে অষ্টাপদী শব্দে তাহাই বুঝায় কি না সন্দেহ করিবার কারণ আছে। অতএব, এই ঋক্‌টিতে যে গাভী ও গো-পশুর কথা বলা হইতেছে, তাহা নিঃসংশয় নহে।

তবে ভাষ্যকার সায়ণ এ স্থলে গো-পশুই বুঝিয়া অর্থ করিয়াছেন। যদি সেই অর্থই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আর একটি বিবেচনার কথা আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পশুযাগের ইতিহাসে বলা হইয়াছে যে, অতি পূর্ব্বকালে যজ্ঞে নরবলিও প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের সময়েও নরবলি ছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন। কিন্তু দত্ত মহাশয় কি তাগ্যে সে মতে সায় দেন নাই। ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, কালক্রমে নরবলি উঠিয়া গিয়া, অশ্ববলির প্রথা প্রচলিত হয়। কালক্রমে তাহাও উঠিয়া গিয়া, গো প্রভৃতি পশুবলির প্রথা আবির্ভূত হয়। গোবলির প্রথা উঠিয়া গিয়া, ছাগ পশুবলিদানের প্রথাই বহুকাল প্রচলিত থাকে। অবশেষে ছাগও "অমেধ্য" বা অবজ্ঞীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। ঋগ্বেদরচনাকালে ছাগবলির প্রথা প্রচলিত ছিল; গো-বলি তৎকালের প্রথা, কি তাহার পূর্ব্বকালের প্রথা, ইহাই বিবেচ্য।

যে ঋকের কথা হইতেছে,—ইহার সায়ণকৃত ব্যাখ্যা সর্ব্বাংশে মনোরম নহে। দত্ত মহাশয় নিজে সায়ণকে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়া, এই ঋক্ ও পরের ঋকের অনুবাদ করেন নাই। ফলতঃ, আমার বিবেচনায় এই ঋক্‌টিকে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঋকের সহিত মিলাইয়া পাঠ না করিলে, ইহার প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইতে পারে না। সমুদায় ঋক্‌গুলি এই;—

শুচিঃ পাবক বন্দ্যোঽগ্নে বৃহদ্ বিবোচসে।
ত্বং ঘৃতেভিরাহুতঃ॥ ৩॥
ত্বং যো অসি ভারত অগ্নে বশাভির্ উক্ষভিঃ।
অষ্টাপদীভির্ আহুতঃ॥ ৫॥

ক্র-অয়ঃ সর্পিষ্ আহুতিঃ প্রত্নো হোতা বরেণ্যঃ।
সহস্পুত্রো অদ্ভুতঃ। ৩।

পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করিবেন, তৃতীয় ঋকের কোনও ক্রিয়াপদ নাই। সায়ণাচার্য্য "এবং মহানুভাবোঽগ্নির্মামনুজানাতু" বলিয়া যে ক্রিয়ার অধ্যাহার করিয়াছেন, ইহা বড়ই কষ্টকল্পনা। দত্ত মহাশয়ও এই অন্বয় গ্রহণ করেন নাই। তবে দত্ত মহাশয়, "অদ্ভুতঃ" এই শব্দের পর, "ভবসি" এই রূপ অর্থের ক্রিয়া আছে মনে করিয়া, অনুবাদ করিয়াছেন।

ফলতঃ, ঋষি নিজে যখন কোন ক্রিয়া ব্যবহার করেন নাই, তখন আমাদের কর্ত্তব্য যে, কোন ক্রিয়া টানিয়া না আনিয়া অর্থ করিতে যত্ন করা। অনুধাবন করিয়া দেখিলে, কোন ক্রিয়ার অধ্যাহারের প্রয়োজনই নাই।

ঋক্ তিনটির অন্বয় এই রূপ করা যায়;—

"হে পাবক অগ্নে। শুচিঃ যস্ত্বং ঘৃতেভিঃ আহুতঃ বৃহদ্বিরোচসে। হে আহুত অগ্নে। (পূষা) বশাভিঃ উক্ষভিঃ অষ্টাপদীভিঃ আহুতঃ (ইষাদীঃ) ক্র অয়ঃ সর্পিষাহুতিঃ প্রত্নো হোতা বরেণ্যঃ সহস্পুত্রো অদ্ভুত যং নঃ (অস্মদীয়ঃ) অসি।

অর্থ—"হে পাপের মলাপহারী অগ্নি। তুমি নিজে নির্ম্মল ও পূজনীয়। ঘৃতসিক্ত হইয়া তুমি প্রভূতরূপে দেদীপ্যমান হইতেছ। হে (তাবক) ঋত্বিক্প্রদত্তহবি অগ্নি। (পূর্ব্বে) তোমাতে বশাগণ, উক্ষগণ ও অষ্টাপদীগণ আহুতিস্বরূপ নিক্ষিপ্ত হইত। ইষাদীঃ কাষ্ঠ তোমার অন্ন—ঘৃত তোমার পানীয়। তুমি আমাদের প্রাচীন হোতা, তুমি বরণীয়, তুমি শক্তিপুত্র, তুমি এক অদ্ভুত পদার্থ। তুমি আমাদের সম্পত্তিস্বরূপ।"

ইহাই আমার বিবেচনায় সঙ্গত অর্থ। ইহাতে ঋগ্বেদী ঋষিসমাজে গোহত্যা প্রচলিত থাকার প্রমাণ নাই।

ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র বটব্যাল।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। চৈত্র, ১২৯৯। "সহবাস-সম্মতি ও সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। লেখক সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, ডাক্তার স্মিথ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র লাল সরকার, ডাক্তার চার্ল্‌স্ প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন যে, বালিকার অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত নহে।

উপসংহারে লিখিয়াছেন, "স্বতঃ ঈষৎ অসভ্য, সর্ব্বত্রোচিত, পাশ্চাত্য প্রথাকে যে অন্তরের সহিত ঘৃণা না করে, তেমন পাশ্চাত্য কুসংস্কার, নয় বর্ষ কখনো মনুষ্যনামের যোগ্য নহে।" আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে প্রায় দুই বৎসর হইল। এখন এরূপ সম্ভ্রান্ত সংবত্ত ভাষায় এই বিষয়ের আলোচনার বিশেষ কোন উপযোগিতা দেখিতেছি না। "জাতীয় একতা" লেখক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় লিখিতেছেন যে, "জাতীয় মহাসমিতির মহত্ত্ব সাধনকালেও যাহা সম্পন্ন হয় নাই, 'সুদূর ইউরোপভূমি হইতে রেলবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, বেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতপ্রণালীর অভিজ্ঞতা লইয়া আসিলে, সেই জাতীয় একতা সিদ্ধ হইবে।' যে টুকু ভাষা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে কেমন ঠেকে। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, "ভাষাবিচার ও অধৈত মীমাংসা" অতি সংক্ষেপে অত্যন্ত বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। কথা সমস্তই পুরাতন, কিন্তু পুরাতন কথা এরূপ সরল ভাবে বুঝাইলে অনেক উপকার হইতে পারে। এই প্রবন্ধের ভাষা ও যুক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। "সাময়িক সাহিত্য" শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের লেখনী-প্রসূত। সম্প্রতি ইনি "অনুসন্ধান" পত্রের সম্পাদকীয় ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'অনুসন্ধান' পত্রে ইনি বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া, কথাটা 'পরিত্যক্ত' লেখা উচিত না 'আক্রান্ত' লেখা উচিত, 'ভাষা' শব্দ ব্যাকরণনিষিদ্ধ অথবা ব্যাকরণবিরুদ্ধ, 'বশঘর' লিখিতে হইবে না 'বশংবদ' লেখা কর্ত্তব্য, ইত্যাদি গভীর প্রহেলিকার মীমাংসা করিয়া বঙ্গভাষার উপকার ও উন্নতি সাধিত করিতেছিলেন। এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় 'অনুসন্ধানের' সমালোচনা হয় না বলিয়া, অতি অযৌক্তিক ভাষায় অভিযোগ করিতেন। সাময়িক সাহিত্য সমালোচনার সাহিত্যের প্রতি কৃপাকটাক্ষের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। স্থানে স্থানে লেখা কিছু মোলায়েম ধরণের হইয়াছে। বঙ্গদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার নামোল্লেখ করিয়া লেখক বলিতেছেন,—"কি বিষয়াংশে কি মুদ্রাকার্য্যে—কোন অংশেই উহাদের সমকক্ষ পত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল বর্ত্তমান সময়ের নব্যভারত, বিষয়াংশে ও যথাসময়ে প্রচার—এই দুই কার্য্যে প্রাচীন পত্রিকা গুলির প্রতিচিত্র রক্ষা করিয়াছেন।" বলা বাহুল্য, নব্যভারতেই এ কথা লিখিত হইয়াছে। "ফসিলিসের ঈশ্বর সম্বন্ধে মত ও তত্ত্ব জ্ঞান" প্রবন্ধে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধনা। চৈত্র, ১২৯৯। "ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা" লেখকের মত যে, ইংরাজি শিক্ষায় বাঙ্গলা ভাষা পরিপুষ্ট হইতেছে, এবং এতদ্দেশীয় অন্যান্য ভাষা উক্ত উপায়ে উন্নতি লাভ করিবে, কারণ ইংরাজি ভাষা ও ভাব শিক্ষা করিয়া যে নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করে, তাহার সেই শিক্ষা অপরকে দিবার ইচ্ছা বলবতী হয় ও স্বদেশীয় ভাষা ব্যতীত সাধারণ্যে কোন শিক্ষা প্রচারিত হইবার অন্য উপায় নাই। স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য বিস্তারিতরূপে প্রচারিত হইলে ইংরাজি শিক্ষার বহুল প্রচারের ব্যাঘাত জন্মিবে। "ডায়ারি" বেশ লেখা হইতেছে; কল্পনা ও চিন্তায় নিমগ্ন সুন্দর হইয়াছে। "শতাভিষেক" কবিতার প্রশংসা করিতে পারিলাম না, বিশেষ রবীন্দ্রনাথ বাবুর ন্যায় সুকবির নিকট আমরা উৎকৃষ্ট কাব্যের আশা করি। "কবি-কথা" কবি বিষয়ে প্রবেশিকাস্বরূপ প্রবন্ধ। এমন বিষয়ে পাঠকবর্গের চিত্ত যত আকৃষ্ট হয়, ততই ভাল। শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় "উন্নতির যুগ" নামক প্রবন্ধে অতি অল্প কথায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে সমগ্র মানব জাতির উন্নতির ইতিহাস বর্ণিত করিয়াছেন। খৃষ্টের আবির্ভাবের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কিরূপে উন্নতিমার্গ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। সমুদয় জগতের ইতিহাস হইতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, যে কোন সময় পৃথিবীর কোন স্থানে কোন মহাপুরুষ স্বজাতিকে উন্নতির পথ দেখাইয়াছেন, সেই সময় পৃথিবীর অন্য কোন না কোন স্থানে আর কোন মহাপুরুষ যুগবিপ্লবের সূত্রপাত করিয়াছেন। কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, সম্রাট, সেনাপতি, বাগ্মী, সকলেই এই যুগোন্নতির প্রবর্ত্তয়িতা। রমেশ বাবুর "স্থির বিশ্বাস যে, যিনি এই যুগ কয়েকটির বিশেষ বিবরণ অবগত আছেন, তিনি মনুষ্যের প্রকৃত ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন; কেবল যুদ্ধবর্ণনা ও সম্রাটদিগের নামাবলী প্রকৃত ইতিহাস নহে।" চারি সহস্র বৎসরের ইতিহাস তিনি সপ্ত যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই যুগসপ্তকের হিন্দু নামকরণও করিয়াছেন। "প্রথম যুগটি বৈদিক যুগ; দ্বিতীয়টি মহাভারতীয় যুগ; তৃতীয়টি গৌতম বুদ্ধের যুগ; চতুর্থটি কণিষ্ক রাজার যুগ; পঞ্চমটি কবি কালিদাসের যুগ; ষষ্ঠ চৈতন্য ও নানকের যুগ; সপ্তম রাজা রামমোহন রায়ের যুগ।" শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাংখ্যকারিকার একটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, "প্রকৃতির অভিব্যক্তি" কথাটা সাংখ্যের কথা। সূক্ষ্ম অথচ সহজবোধ্য যুক্তিকৌশলে দেখাইয়াছেন

বিদ্যালয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে ইংরাজিই প্রধান ভাষা থাকিবে। ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ জাতির উপর নির্ভর করে। আর্য্যের সময় সংস্কৃত, মুসলমানের সময় উর্দ্দু প্রবল ছিল, ইংরাজের রাজ্যে ইংরাজিরই প্রতিপত্তি থাকিবে। সাহিত্য জাতীয় বল, জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় মহত্বের উচ্ছ্বাস মাত্র। যে জাতি স্বাধীন নয়, সে জাতির ভাষা বা সাহিত্যও কখন অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মাতার স্তনদুগ্ধে, ধাত্রীর লালনপালনে বঙ্গভাষা পুষ্ট হইতেছে। আত্ম-শাসনে, আত্মসংযমে কবে সক্ষম হইবে, কে বলিতে পারে।

অনুসন্ধান। ১৫ই ফাল্গুন, ৩০শে ফাল্গুন, ১৫ই চৈত্র, ১২৯৯। অনুসন্ধানসমিতির পাক্ষিক পত্র। শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই তিন সংখ্যা হইতেই শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পত্রিকার আকার, কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে, মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও অপেক্ষাকৃত সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির আমল হইতেই অনুসন্ধানের সংস্কার হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের জন্য বিদ্যানিধি মহাশয় প্রশংসার পাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যেরূপ অনুসন্ধানসমিতির বিবরণ প্রকাশিত হইত, তাহাও হইতেছে। কিন্তু অনুসন্ধানসমিতির বিবরণী আশানুরূপ নয়। এরূপ অনুসন্ধান যেমন ও যত হওয়া উচিত, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এখন-কার অনুসন্ধানে তাহা হয় না। এ অনুসন্ধান যেন নামমাত্র। এই যে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে এত জাল জুয়াচুরি চলিতেছে, অনুসন্ধানের অনু-সন্ধানে তাহার কটা ধরা পড়ে? অনুসন্ধান যাহা করেন, তাহা যৎসামান্য। ইহাই যখন এই পত্রের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন এ বিষয়ে আরও সাহস-সম্পন্ন ও সন্ধানী হওয়া, অনুসন্ধানের উচিত ও আবশ্যক। বিদ্যানিধি মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে সম্পাদকের পদ হইতে সহকারিত্বে অবনত করাতে, তিনি, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া, অনুসন্ধানের সহিত সর্ব্ববিধ সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাগ করিবার কথা বটে। সাহিত্যসংসারে এরূপ অশিষ্টতা নিতান্ত নিন্দনীয়। কোনও কারণে, সম্পাদকীয় বিভাগে পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া থাকিলে, তদানীন্তন সম্পাদকের অভিমত লইয়া করা উচিত ছিল। সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি উপহাস ও আক্রমণ এবং অশ্লীলতাও অনেক সময় অনুসন্ধানের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া থাকে। আশা করি,—অতঃপর অনুসন্ধান সাবধান হইবেন।

৩০শে ফাল্গুনের অনুসন্ধানে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় "বৈদিক-কালের সাম্যভাব" নামে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু গবেষণার পরিচায়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন,—"সাম্যরূপ অতুল্য রত্ন, বৈদিক-কালে এই ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক কিরূপ বিমুক্তকণ্ঠে বিঘোষিত হইত, তৎপক্ষে অথর্ব্ব-সংহিতায় উনবিংশ কাণ্ডের সপ্তমানুবাকের অষ্টম সূক্তের প্রথম মন্ত্রটিই যথেষ্ট নিদর্শন। যথা,—

'প্রিয়ং মাকৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মাকৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্যে।'

"অর্থ।—হে জগদীশ্বর! দেবদলের মধ্যেই প্রিয়-বিধান করিও না, রাজন্যবর্গেই যেন তোমার প্রীতি আবদ্ধ না থাকে; প্রত্যুত সকলের প্রতিই সমভাবে প্রীতি-দৃষ্টি কর,—কি শূদ্রজাতিতে, কি আর্য্যজাতিতে।

এতাদৃশ স্থল-সমূহে, দেবশব্দে তপোবিদ্যাদি-প্রভাবে দীপ্তিশালী ব্রহ্মণ্যযুক্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ জ্ঞানী বুঝায়, রাজ-শব্দে সামান্য ভূস্বামী প্রভৃতি হইতে সম্রাট্ পর্য্যন্ত ধনী বুঝাইয়া থাকে, এবং আর্য্য-শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই ত্রিবিধ মাননীয় জাতি বুঝায়; আর শূদ্র-শব্দে দাস ও দস্যু, এই দ্বিবিধ জাতি বুঝিতে হয়। সেকালে ম্লেচ্ছ ও যবন প্রভৃতি দস্যুরই প্রকার-ভেদ-মাত্র ছিল। আর্য্য মতে, মানবজাতি এই পঞ্চবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়াই, "পঞ্চজন" প্রভৃতি মনুষ্য-শব্দের পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরি-প্রদর্শিত সূক্তটি আলোচিত হইলে, ইহা আর অবিদিত থাকে না যে, প্রাচীনকালের অর্থাৎ বৈদিক-কালের ব্রাহ্মণগণ কদাপি কিছুমাত্র স্বার্থপর ছিলেন না;—এ জগতে, কেবল জ্ঞানীর বা ব্রাহ্মণ-জাতিরই প্রিয়-কার্য্য সংসাধিত হউক, অথবা কেবল ধনী ও ধনী বা ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরই প্রিয় হউক, কিম্বা একমাত্র আর্য্য জাতিরই মঙ্গল হউক,—তাঁহাদের এমন প্রার্থনীয় ছিল না; প্রত্যুত সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত, ব্রাহ্মণগণের এক সময়ে ইহাই প্রার্থনীয় হইয়াছিল যে, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান, কি ধনী কি দুর্ব্বল, কি ধনী কি নির্ধন, কি আর্য্য কি অনার্য্য,—মনুষ্যমাত্রের প্রিয় অর্থাৎ অভীষ্ট সংসিদ্ধ হউক।" প্রবন্ধটি "বাগ্‌প্রতিবাদের পক্ষ নহে;" অতএব আমরা নীরব রহিলাম।

ভারতী। চৈত্র, ১২৯১। ভারতীর ষোড়শ বর্ষ সম্পূর্ণ হইল। যে প্রবন্ধের যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত ভারতী এক্ষণে সম্পাদিত হইতেছে, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। ভারতী লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকা, যাঁহাদিগের রচনা দ্বারা ভারতীর পূর্ব্ব প্রতিপত্তি রক্ষিত হইতে পারে, এখন আর তাঁহারা প্রায় সাহায্য

করেন না; কেন, তাহা বলা যায় না। ঐই কারণে লেখা সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে তাঁহার অবনতি লক্ষিত হইতেছে। "উদোর ঘাড়ে বুদোর বোঝা" একটি গল্প। গল্পটি মন্দ হয় নাই, কিন্তু ভাষা কিছু শিথিল, কিছু অসংযত বোধ হয়। সন্ধি, সমাস, বিরামের এত বিপর্য্যয় ভাষায় বাঞ্ছনীয় নহে। "নূতন ধরণের উপন্যাস" এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। প্রথম পরিচ্ছেদ মহিলার রচনা, শেষ পরিচ্ছেদও মহিলার রচনা। "হৃষীকেশ" একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত—সুখপাঠ্য; ভাষা আর একটু মার্জ্জিত হইলে আরও ভাল হইত। এ সংখ্যায় তাঁহার বিশেষ প্রশংসাযোগ্য কিছুই নাই।

রবীন্দ্র বাবুর পত্র।*

"সাহিত্য সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণেষু"

"পুরী।

"৬ই ফাল্গুন। ১২৯৯

"সবিনয় নিবেদন

চন্দ্রনাথ বাবুর প্রতি আমার বিদ্বেষভাব আপনি যেরূপে প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, তাহা আপনার উপযুক্ত হয় নাই। কারণ, বিষয়টা আপনি কেবল এক দিক হইতে দেখিয়াছেন। আমার পক্ষ হইতে যে দুই একটি কথা বলা যাইতে পারিত তাহা আপনি একটিও বলেন নাই, সুতরাং আমাকেই বলিতে হইল।

---

* গত বর্ষের একাদশ-সংখ্যক সাহিত্যে "তর্কবৈচিত্র্য" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধপ্রসঙ্গে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের এই পত্র। কিন্তু, এই পত্র, সাহিত্যসম্পাদককে কেন লেখা হইল, তাহা কেবল এক রবীন্দ্র বাবু ব্যতীত আর কাহারও বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কথা তিনি কিছুই বুঝা ইয়া বলেন নাই। রবীন্দ্র বাবু কোন বিবেচনায় আমাদিগকে তর্কবৈচিত্র্যের লেখক স্থির করিলেন? ইহা তাঁহার কবিজনোচিত ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু ইহার মূলে কবিত্ব কিছুই নাই। সুতরাং, পূর্বতন বা তাঁহার নিজের, সংবাদিকৃত সত্যও নাই। তর্কবৈচিত্র্য প্রবন্ধ আমরা নিজে লিখি নাই। অতএব, তাহার মতামতের জন্য আমরা দায়ী নহি। সে বিষয়ে রবীন্দ্র বাবুর যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা প্রবন্ধাকারে ও প্রাসঙ্গিক ভাবে লিখিয়া পাঠাইলে রবীন্দ্র বাবু

'বাল্যবিবাহ' লইয়া চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমার প্রথম বাদ প্রতিবাদ হয়। সে আজ বছর দুই তিন পূর্ব্বের কথা। ইতিমধ্যে আমি তাঁহার কোন লেখা সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই।

"আপনার অবিদিত নাই, প্রথম ভাগ সাধনায় মাসিক পত্রের সমালোচনা বাহির হইত। তাহাতে উল্লেখ যোগ্য অথবা প্রতিবাদযোগ্য প্রসঙ্গে সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে ব্যক্ত হইত। সাহিত্যে চন্দ্রনাথ বাবু যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সাধনার সাময়িক সমালোচনায় তাহার দুইটি লেখার প্রতিবাদ বাহির হয়—দুই একটি প্রতিবাদ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রূপেও প্রকাশিত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথ বাবু যখন তাহার পুনঃপ্রতিবাদ করেন তখন তদুত্তরে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আহার এবং লঘুত্ব সম্বন্ধে এইরূপে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি বাদ প্রতিবাদ বাহির হয়। আপনি যদি এমন মনে করিয়া থাকেন যে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমার মতান্তর হওয়াতেই আমি সাধনার সমালোচনার উপলক্ষ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক আমার বিদ্বেষবুদ্ধির চরিতার্থতা সাধন করিতেছিলাম তবে তাহা আপনার ভ্রম—ইহার অধিক আর আমি কিছুই বলিতে চাহি না।

উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া আমাদিগকে অনর্থক আক্রমণ করিয়া এই পত্র লেখেন ও প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করেন। পরের কথা যাহাই হউক, প্রথমেই রবীন্দ্র বাবুর এই বিষম ভ্রম। পত্র প্রকাশিত করিয়া, তাঁহার এই ভ্রম প্রদর্শন করা আমাদের ইচ্ছা ছিল না; আর সেই জন্যই তাঁহার পত্র আমরা প্রকাশিত না করিয়া, পত্রের দ্বারা পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্র বাবু তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। উপস্থিত বিষয়ে যে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশিত না হইলে কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না। কাজেই অগত্যা আমরা, তাঁহার পত্র, প্রকাশের উপযুক্ত না হইলেও, প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিলাম কেবল তাঁহার ও অনুরোধে এবং সাধনার অথবা দোষারোপের জন্য। মহিলে, যাহাদিগের সাময়িকপত্রের লেখক-ও বিষয়-পরিবারে পরিচালক হইয়া রবীন্দ্র বাবু এরূপ বেতালা পত্র লিখিতে কুণ্ঠিত হয়েন না এবং তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, ইহা সাধারণ্যে প্রকাশ করা তাঁহার সম্মানের পরিচায়ক নহে।

রবীন্দ্র বাবু আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা বলিতেছেন, আমাদিগকে সম্বোধন করার জন্যই তাহাদের একটিরও অর্থ নাই। অতএব সে সকল কথার উত্তর দেওয়া আমরা আদৌ আবশ্যক বিবেচনা করি না। "তর্কবৈচিত্র্য" প্রবন্ধের লেখক যদি আবশ্যক বোধ করেন, দিতে পারেন।—সাহিত্য-সম্পাদক।

"কড়াক্রান্তি" প্রবন্ধে এমন দুই একটি মত প্রকাশিত হইয়াছিল যাহার কঠিন প্রতিবাদ করা আমার একটি কর্ত্তব্যস্বরূপে গণ্য করিয়াছিলাম। আপনি যদি সে প্রবন্ধটি সাধারণ সমক্ষে প্রকাশযোগ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে গুরুতর আপত্তিযোগ্য কিছু না পাইয়া থাকেন তবে উক্ত প্রতিবাদটিকে বিদ্বেষভাবের পরিচায়ক মনে করা আপনার পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই।

"হিং টিং ছট্" নামক কবিতায় আমি যে চন্দ্র নাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছি ইহা কাহারও সরল অথবা অসরল কোন প্রকার বুদ্ধিতে কখনো উদয় হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আপনি লিখিয়াছিলেন "অনেকেই বুঝিয়াছে, যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথ বাবু—" এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যাহারা আমার সেই কবিতাটি বুঝিয়াছে তাহারা সেরূপ বুঝে নাই। অবশ্য আপনি অনেককে জানেন, এবং আমিও অনেককে জানি—আপনার অনেকের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি যে অনেককে জানি তাঁহাদের মধ্যে এক-জনও এরূপ মহৎ ভ্রম করেন নাই। এবং আমার আশা আছে চন্দ্রনাথ বাবুও তাঁহাদের মধ্যে একজন।

"চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত মতভেদ হওয়া আমি আমার দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ, আমি তাঁহার উদারতা ও অমায়িকতার অনেক পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অধিকাংশ মত যদি বর্ত্তমান কালের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত না হইত—তাহা হইলে তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বাদ প্রতিবাদে আমার কখনই রুচি হইত না। কিন্তু মানুষ কর্ত্তব্য বুদ্ধি হইতে যে কোন কাজ করিতে পারে এ কথা দেশ-কাল-পাত্র বিশেষের নিকট প্রমাণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে এবং তাহার আবশ্যকও নাই।

"আপনি লিখিয়াছেন "মানিলাম চন্দ্রনাথ বাবুর মতই অগ্রাহ্য, সকল সিদ্ধান্তই অসিদ্ধ এবং সকল কথাই অগ্রাহ্য। কিন্তু এই এক কথা একবার বলিবাই ত রবীন্দ্রনাথ বাবু খালাস পাইতে পারেন। এক কথা বারম্বার বলিবার প্রয়োজন কি? যদি এমন সম্ভাবনা থাকিত যে, চন্দ্রনাথ বাবু নিজের ভ্রান্তমত সমূহ ত্যাগ করিয়া অবশেষে রবীন্দ্রনাথ বাবুর মত গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেও এই জনন্ত তর্ক কতক বুঝা যাইত, কিন্তু সে সম্ভাবনা

---

১ তা বটে। এই অযাচিত উপদেশের জন্য মাননীয় উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ। তাঁহার এ উক্তির দ্বারা চন্দ্রনাথ বাবুর প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকটিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এই অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়া আমাদের "জ[illegible]ছ' একটি ছত্র মনে পড়ে:

বৈদিক প্রবন্ধ।

ঋগ্বেদের সময়ে গোমাংসভক্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল কি না।

২

চতুর্থ প্রমাণ।

ভরদ্বাজ ঋষি বলিতেছেন,—

"আতে অগ্ন ঋচা হবিঃ হৃদা তষ্টং ভরামসি।
তে তে ভবন্তু ঊক্ষণঃ ঋষভাসো বশা উত। ৬।১৬।৪৭

"হে অগ্নি! আমরা তোমাকে হৃদয় দ্বারা সংস্কৃত ঋক্‌রূপ হব্য প্রদান করিতেছি—(এ পর্য্যন্ত এক প্রকার ঠিক)—"বলশালী বৃষভ ও বেহুগণ তোমার নিকট পূর্ব্বোক্ত রূপ হব্য হউক।"

ইহা ঠিক হয় নাই। শেষ ভাগের অনুবাদ এইরূপ করিলে ঠিক হয়—"সেই ঋক্‌রূপ হব্যই তোমার নিকট সেবনসমর্থ বৃষভ ও বশা ঋকরূপ হউক।" ঋষি ভরদ্বাজের অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বকালে অগ্নি গোমাংসের আহুতি ভালবাসিতেন। ভরদ্বাজের সময়ে আর গোমাংস সেব্য ছিল না। সুতরাং, তিনি আপন ঋক্‌মন্ত্রই অগ্নিতে পুরাকালীন গোমাংসের ন্যায় আহুতি প্রদান করিতেছেন; অগ্নি যেন সেই ঋক্‌রূপ আহুতিতেই সন্তুষ্ট হয়েন, আর গো-মাংসের আশা না করেন। সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যাও এই প্রকার অর্থ প্রকাশ করে। দত্ত মহাশয় যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে কোন অর্থই প্রকাশ করে না। বেহুগণ পূর্ব্বোক্তরূপ হব্য হইবে কি প্রকারে? পূর্ব্বোক্তরূপ হব্য অর্থাৎ "হৃদয়ের দ্বারা সংস্কৃত ঋক্‌রূপ হব্য"—বেহুগণ কিরূপে পরিণত হইবে? —ইহাই কি দত্তমহাশয়ের অর্থ? বেহু কিরূপে ঋক্‌রূপ হব্যে পরিণত হইবে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আইসে না।

পঞ্চম প্রমাণ।

ভরদ্বাজ বলিতেছেন,—

ন তা অর্বা রেণুককাটো অশ্নুতে ন সংস্কৃতম্ ত্রিবরূথমংহতিস্ত্বা অগ্নে।
উষ্ট্রা যাতম্ অবনয়ং ন শক্তবে ত্বা যন্তু যাবো মধ্বো বিচেতসি বহন্তু। ৬।২৮।৪

দত্ত মহাশয় অনুবাদ করেন,—

"বেণু সকলের উত্থাপনকারী সামরিক অশ্ব যেন তাহাদিগের (বেণুগণের) নিকট উপস্থিত না হয়। তাহারা যেন যজ্ঞে বিশসনাদি (অর্থাৎ বলিদানাদি) সংস্কার প্রাপ্ত না হয়। যাগানুষ্ঠানকারী মনুষ্যের বেণুগণ যেন নির্ভয় ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।"

"যজ্ঞে বিশসনাদি সংস্কার";—মূলে কিন্তু আদৌ "যজ্ঞে" নাই। কেবল আছে, "ন সংস্কৃতব্রমুপযন্তি"। সায়ণব্যাখ্যা এইরূপ,—"সংস্কৃতব্রং বিশসনাদিসংস্কারং নাভ্যুপযন্তি নাভিগচ্ছন্তু"। বিশসন মানে হত্যা। আদি-শব্দের অর্থ অস্ত্র লোম প্রভৃতি হইতে পৃথক্‌করণ। উদৃশ সংস্কার যে কেবল আহারের জন্য নয়, তাহা কে বলিল? সুতরাং, অনুবাদে "যজ্ঞ" শব্দ জোর করিয়া বসান হইয়াছে।

অবশেষে যদি দত্ত মহাশয়ের অনুবাদই ঠিক্, তর্কানুরোধে ইহা স্বীকার করা যায়, তবে ভরদ্বাজের সময়ে ঋষিগণ কর্তৃক গোবধের প্রমাণ কোথায়?—এই ঋক্ কি তৎকালে গোবধপ্রথা উঠিয়া যাওয়া প্রমাণ করিতেছে না? গাভীগণ যজ্ঞে যেন হত না হয়—বলিলে,যদি তৎকালে ঋষিদের যজ্ঞে গাভীগণ হত হইত, প্রমাণ হয়, তবে আমরা নাচার। যাগানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের বেণুগণ যেন নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, বলিলে কি বুঝিতে হইবে যে, উক্ত বেণুগণকে ঋষিরা প্রত্যহ এক একটি করিয়া বধ করিয়া খাইতেন?

অনার্য্যগণ ভরদ্বাজের সময়েও গোহত্যা করিত। বেণুগণ যেন অনার্য্যদের করকবলিত হইয়া বিনষ্ট না হয়, ঋষি ইহাই বলিতেছেন। (এ বিষয়ে ৭।১৮।৭ দ্রষ্টব্য।)

ষষ্ঠ প্রমাণ।

তৃতীয় ভরদ্বাজের উপর দত্ত মহাশয়ের ঘোরতর আক্রমণ। তিনি, উপরি উপরি তিনটি ঋকের দ্বারা ভরদ্বাজকে গোখাদক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন। আর কোন ঋষিই একবারে তিন ঋকে গোমাংসভক্ষণের কথা বলেন নাই। দত্ত মহাশয়ের মতে গোহত্যা-প্রতিপাদক তৃতীয় তৃতীয় ঋক্ এই,—

> যত্রা নঃ পূর্বেঽবরে যজ্ঞে বিশ্রময়ন্তবো বচসা সপ্তসপ্ত।
> অপা বনস্য সচনা ঘৃতেবো সুষ্ঠু গৃণতে গো অগ্রাঃ ॥৬।৩৭।১

"হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের সেই সোমরস পান কর, ইহা সুকর, বিক্রান্ত, স্বর্গীয় প্রাজ্ঞসম্মত, ফলোপধায়ক, সুপ্রসিদ্ধ ও সেবনীয়। হে দেব! তুমি আমাদিগকে গোপ্রমুখ অন্ন প্রদান কর।"—(রমেশ দত্ত কৃত)।

টীকায় দত্ত মহাশয় উইলসনের মত তুলিতেছেন। যথা,—

"Is this to be understood literally? and were cows in the time of the Vedas a principal article of food? Of course a Brahmin would interpret it metonymically, cows being put for their produce—milk and butter: Sayane is silent but there does not seem to be anything in the Veda that militates against the literal interpretation." Wilson.

দত্ত মহাশয়ের ব্রাহ্মণাপবাদ নাই; অতএব তিনি উইলসনের মত শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে গোবধপ্রথা প্রাচীন কালে ছিল ও তাহা তৎকালে উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া লিখিত আছে, তাহা উইলসন সাহেবের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। ঋগ্বেদরচনাকালে গোহত্যা নিবারিত হওয়ার অন্যান্য যে প্রমাণ আছে, তাহা আমরা পরে উল্লেখ করিব। এ স্থলে ভরদ্বাজের অপরাধ এই যে, তিনি "গোঅগ্রাঃ" অর্থাৎ গোপ্রমুখ "ইষঃ" অর্থাৎ অন্ন, এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। "গো অগ্র", এই শব্দটি ঋগ্বেদে অনেক স্থলে ব্যবহৃত। এটি একটি তৎকালের চলিত সংযুক্ত শব্দ। ধনের মধ্যে "গো" ধনই তৎকালে শ্রেষ্ঠ ধন ছিল। সুতরাং যে স্থলে ধন বা সম্পদের প্রার্থনা, তথায় অগ্রে "গোধনের" প্রার্থনা। "গো অগ্রাং অশ্বশসং রাস্তিং" গৃৎসমদ ঋষির একটি ঋকেতে এইরূপ বাক্যবিন্যাস পুনঃ পুনঃ দেখা যায়। মন্ত্রে ভরদ্বাজ গোধন চাহিয়াছেন মাত্র। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে গো দান কর, এবং তদ্ব্য ভোজ্য অন্যান্য দ্রব্য দান কর, ইহাই সরল অর্থ। পাঠকবৃন্দ ১।১১।৩ ঋক্ হইতে "গো মতঃ রাজন্য" শব্দের সহিত তুলনা করিবেন। নিতান্ত চাপ দিয়া অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা না করিলে আর এই ঋকে গোমাংসভক্ষণের আভাষ দেখা যায় না। যে ভরদ্বাজ দেবতার নিকট একদিন প্রার্থনা করেন যে, তাহার গোসমূহ যেন হত্যাকারীর হস্তে না পড়ে, যেন নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে,—তিনিই আবার স্বয়ং গোমাংসভোজনের জন্য ইন্দ্রকে গো চাহিয়াছিলেন, ইহা কত দূর সঙ্গত, তাহা পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করিবেন।*

* এ স্থলে ইহাও বক্তব্য, গোদুগ্ধ অর্থে "গো" শব্দ, স্পষ্টই ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। মোক্ষমূলর ১।১৯।১ ঋক্ হইতে "গো" শব্দের অর্থ দুগ্ধ লিখিয়াছেন। ৩।৫০।৩ ঋক্ দেখুন। তথায় "গোজিঃ" অর্থে "গো" অর্থাৎ দধি বা দুগ্ধ মিশ্রিত সোম বুঝায়। ৩।৩২।২ ঋকে "গবাশিরং সোমং" শব্দেরও তাদৃশ অর্থ। ৪।২৭।৫ ঋকে যে "গোজিঃ অক্তং" আছে, যথায় "গোজিঃ ঘৃতেন পয়সা" বলিয়া সায়ণ ব্যাখ্যা করেন, তথায় "গো" শব্দের দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কোন অর্থই সম্ভবে না।

সপ্তম ও অষ্টম প্রমাণ।

এই দুই প্রমাণ যুগপৎ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ২৭ ও ২৮ সূক্তে এই দুই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রের পুত্র বসুক্র নামক কোনও এক ব্যক্তিকে এই ঋকের ঋষি বলিয়া গণ্য করা হয়। বসুক্র নামে কোন ব্যক্তি যে কোন কালে বর্ত্তমান ছিল, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। বস্তুতঃ, সূক্তদ্বয়ের রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। পঁচবাচর যেরূপ ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাতে প্রথম সূক্তে ইন্দ্র ও বসুক্র পরস্পর আলাপ করিতেছেন, এবং দ্বিতীয় সূক্তে বসুক্রের পত্নী ও ইন্দ্রের কথোপকথন হইতেছে। বস্তুতঃ, সূক্ত দুইটি বড়ই অস্পষ্ট; উহাদের প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহ করা এক্ষণে বড়ই কঠিন। সায়ণ যথা তথা ভাষ্য করিয়াছেন, দত্ত মহাশয়ও আধুনিক অনুবাদ করিয়াছেন।

কাল্পনিক বসুক্র প্রথমোক্ত ঋকে বলিতেছেন,—

"যে সকল ব্যক্তি দৈবকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, এবং কেবল তাহাদের নিজের উদর পূরণ করিয়া স্ফীত হইয়া উঠে, আমি যখন তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাই, তখন হে ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত পুরোহিতদিগের সহিত একত্র স্থূলকায় বৃষকে পাক করি এবং পঞ্চদশ তিথির প্রত্যেক তিথিতে সোমরস প্রস্তুত করিয়া থাকি।"

বসুক্রের পত্নী, ইন্দ্রের কাল্পনিক যুবা, দ্বিতীয় ঋকে বলিতেছেন;—

"হে ইন্দ্র! যখন অগ্নিকাষ্ঠাতে তোমার উদ্দেশে হোম করা হয়, তখন তাহারা শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তরফলকসহযোগে মাদকতাশক্তিযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করে, তুমি তাহা পান কর। তাহারা বৃষভসমূহ পাক করে, তুমি তাহা ভোজন কর।"

উভয় ঋকেরই দত্ত মহাশয়ের কৃত অনুবাদ দেওয়া হইল। মূলে প্রথম ঋকে আছে, "তুভ্যং বৃষভং পচানি।" দ্বিতীয় ঋকে আছে, "পচংতি তে বৃষভাঁ অবসি তেভ্যঃ।" ঋগ্বেদে বৃষভ-শব্দে সর্ব্বত্রই যে পুংজাতীয় গো-পশু বুঝায়, তাহা নহে। বৃষভশব্দ অনেক স্থানে ইন্দ্রেরই বিশেষণ। ৪।১৮।১০ ঋকে ইন্দ্রকেই "তুভ্যং বৃষভং" বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে বৃষভশব্দের অর্থ,—যে বর্ষণ করে, যা সেচন করে। পুংজাতীয় পশুমাত্রকেই বৃষভ বলা যায়। সুতরাং মূলে যে বৃষভের অর্থ গরু ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা নহে।

বস্তুতঃ, যদিও বৃষভ অর্থে গরু স্বীকার করা যায়, তথাপি উভয় ঋকে বক্তার প্রকৃতি ও সূক্তরচনার ভাবভঙ্গীতে বৃষপাক যে তৎকালের আচার, তাহা কোনমতে স্বীকার করা যায় না। উভয় সূক্তেই নাটকের ন্যায় কথোপকথন।

কে বলিবেন যে, ভবভূতির সময়ে অশ্বমেধসমাজে গোহত্যা প্রচলিত ছিল? তথাপি ভবভূতির নাটকে বসিষ্ঠের গোমাংসভক্ষণের বর্ণনা আছে। যদি তাদৃশ বর্ণনায় ভবভূতির সময়ে গোমাংসভোজনপ্রথা প্রচলিত থাকা প্রমাণ না হয়, তবে বসুক্র ও বসুক্রপত্নীর সহিত ইন্দ্রের কথোপকথনে যে ঋক্‌বেদের সময়ে বৃষপাক হইত, তাহা কিরূপে প্রমাণ হইতে পারে? ফলতঃ, সূক্তের প্রকরণ ও বিষয়সম্বন্ধে আদ্যন্ত পর্য্যালোচনা না করিয়া, কেবল বৃষবধ বা বৃষপাকের উল্লেখমাত্র থাকিলে, ঋগ্বেদী পণ্ডিত যে বৃষবধ ও বৃষপাক করিতেন, ইহা নাব্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

নবম ও দশম প্রমাণ।

এই দুই প্রমাণও যুগপৎ বিবেচনা করা যাইতে পারে। দুইটিই "বৃষকপি" সূক্তে (১০।৮৬) দৃষ্ট হয়। দত্ত মহাশয় নিজেই লেখেন,—"বৃষকপির প্রকরণ একটি দুরূহ অংশ।" কে যে ঐ সূক্ত রচনা করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয় নাই। ইন্দ্রের পুত্র বৃষকপি, ইন্দ্র স্বয়ং এবং ইন্দ্রাণী, সূক্তের ঋষি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী ও বৃষকপির কথোপকথনচ্ছলে সূক্ত রচিত হইয়াছে। তাঁহাদের পরস্পরের বাদানুবাদের তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। ঋষি ব্যঙ্গচ্ছলে রচনা করিয়া গিয়াছেন বা সরল ভাবে উপাখ্যান লিখিয়াছেন, তাহাও বুঝা দুষ্কর। দত্ত মহাশয় অনুমান করেন যে, "বৃষকপি একজাতীয় বানর। ঐ বানর (?) কোন যজমানের যজ্ঞসামগ্রী নষ্ট করিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়াছিল। যজমান এইরূপ কল্পনা করিল যে, ঐ বানর ইন্দ্রের পুত্র, সেই নিমিত্ত ইন্দ্র তাহার ধৃষ্টতা নিবারণ করিলেন না। কবি সেই কল্পনার উপর ইন্দ্রের উক্তি ও ইন্দ্রাণীর কথা ইত্যাদি রচনা করিলেন। এই প্রকার জ্ঞান করিলে বৃষকপি সূক্তের প্রায় সর্ব্বাংশ ব্যাখ্যাত হয়।" দত্ত মহাশয় "প্রায়" শব্দ ব্যবহার করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। ফলতঃ, দত্ত মহাশয়ের কল্পনা-শক্তি প্রখরা। তাঁহার অনুমানে কেমন সুন্দর অর্থ হয়, তাহা পাঠকবৃন্দ নিজে নিজে বিবেচনা করিবেন।

ইন্দ্রাণী কহিতেছেন,—

"হে বৃষকপিবনিতে! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্টপুত্রযুক্তা এবং আমার সুন্দরী পুত্রবধূ। তোমার বৃষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন। তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। আমার জন্য পঞ্চদশ-এমন কি বিংশ বৃষ পাক করিয়া দেয়, আমি খাইয়া শরীরের স্থূলতা

সম্পাদন করি, আমার উদরের দুই পার্শ্ব পূর্ণ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।"—(রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ।)

বানরীর ধন কিম্ভূত, এবং বানরীর বৃষ কিমাকার, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। ফলতঃ, বৃষকপির বনিতা যেই হউন,—এ স্থলে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর যে বৃষপাক ও রসভক্ষণের উল্লেখ আছে, তাহাতে তৎকালীন মানব-যজ্ঞে বৃষপাকের কোন প্রমাণ দেখি না। বসুক্রস্তুক্তের আলোচনাকালে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, তাহা এ স্থলেও বর্ত্তে। ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর উদ্দেশে কোনও এককালে যজ্ঞে বৃষপাক হইত, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতাকালে হইত কি না, ইহাই বিবেচ্য। তাহার প্রমাণ কোথায়?

একাদশ প্রমাণ।

সপ্তি নামক ঋষি বলিতেছেন,—

"হে অগ্নি! তুমি কি দেবতাদের মধ্যে কোন অপরাধ পাইয়া ক্রোধ ধারণ করিয়াছ? আমি জানি না, এই জন্য এই কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যেমন খড়্গ দ্বারা কোন গাভীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করে, তদ্রূপ তুমি ক্রীড়া কর আর না কর, কিন্তু তুমি উজ্জ্বল হইয়া তোমার আহারীয় দ্রব্য তোমনকালে পার্শ্বে পার্শ্বে উহা কর্ত্তন কর।"—(ঋগ্বেদ ১০।৭৯।৬)

মূলে আছে—"বিপর্বশ শকৃত গামিবাসি।" এই প্রমাণও দ্বিতীয় প্রমাণ অপেক্ষা কোন মতে বলবত্তর নহে। তথায় আছে, "গোর্ন পর্ব বিবমা।" উভয় স্থলেই গোহত্যা কেবল একটি উপমাস্থল। উপমা দিয়াছেন বলিয়া যে ঋষি নিজে গোহত্যা করিতেন, ইহা কোন মতে স্বীকার করা যায় না। সায়ণ দ্বিতীয় প্রমাণের "গো"-শব্দের সাধারণ পশু অর্থ করিয়াছেন, এখানেও সেই অর্থ লওয়া যাইতে পারে। মূলের "গো"-শব্দের যে গাভী ভিন্ন আর কোন অর্থ হয় না, তাহা নহে। সুতরাং, এই প্রমাণ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা আবশ্যক করে না।

ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

যে যেখানে থাকে, সে সেইরূপ বর্ণ ধারণ করে। বরফময় উত্তরসাগরের ভল্লুকের বর্ণ শ্বেত, মরুভূমিবাসী জীব বালুকার বর্ণে আচ্ছাদিত। শাকের পোকা সবুজ বর্ণ, লাউ গাছে যে পোকা থাকে, তাহাকে লাউডাঁটা বলিয়া ভ্রম হয়, শুষ্ক পত্রে যে কীট থাকে, তাহাকে পত্রাংশ বলিয়া ভ্রম হয়। যে প্রজাপতি যে ফুলে মধু পান করে, সে সেই ফুলের বর্ণ ধারণ করে, ফুল ভ্রমে পক্ষীরা তাহাদের অনুসরণ করে না। এক প্রকার প্রজাপতি দেখিতে ঠিক পাতার মত। মাছের পিঠের দিক কাল, এজন্য উপর হইতে শত্রু দেখিতে পায় না; নীচের দিকে সাদা, এজন্য নিম্ন হইতে শত্রু লক্ষ্য করিতে পারে না। উপরে সে মেঘের বর্ণ ও নীচে সে জলের বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ব্যাঘ্রের বর্ণ এমন যে, ঘাসের মধ্যে তাহাকে চেনা যায় না। চিতা ও বনবিড়ালের পিঠের দাগ দেখিলে বোধ হয়, যেন পাতার মধ্য দিয়া মাটীর উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়াছে। কচি পাতার যে কীট থাকে, তাহার বর্ণ সবুজ, বয়স বৃদ্ধি হইয়া যখন সে পাকা পাতা খাইতে থাকে, তখন তাহার বর্ণ হরিদ্রার মত হয়। এক প্রকার পোকা আকারে সাপের মত, সাপ বলিয়া ভয়ে পক্ষীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে না, ইহাদের এক জাতি সাপের মত ফোঁস ফোঁস করিতেও শিখিয়াছে। গাছের ছাল, সেয়ালা ও প্রস্তরে যে কীট থাকে, তাহারা তদনুরূপ বর্ণ ধারণ করে। কোন কোন মাকড়সা দেখিতে পিপীলিকার মত, অন্য এক প্রকার ঠিক বোলতা বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন সর্প ও মৎস্য যখন যেরূপ স্থানে থাকে, তখন সেইরূপ বর্ণ ধারণ করিতে পারে। আবার বর্ণে যে সকল জন্তুর বিচিত্রতা আছে, তাহারা খাইতে তিক্ত বা বিষাক্ত। ঋতুভেদে কোন কোন পক্ষীর সময়োপযোগী বর্ণ-ভেদ হয়। টার্মিগান শীতকালে শ্বেতবর্ণ ও গ্রীষ্মকালে ধূসরবর্ণ ধারণ করে। অষ্ট্রেলিয়ার Hoary headed gripe পক্ষীরও এইরূপ বর্ণভেদ হয়। যে বৎসর শীত আগে পড়ে, সেবার তাহার বর্ণও আগেই সাদা হয়। পাখীর ডিমের বর্ণ বাসার অনুরূপ হয়। শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কোন কোন গাছও অন্যজাতীয় বিষাক্ত বা তিক্ত গাছের আকার ধারণ করিতে শিখিয়াছে। অর্কিডেরা মৌমাছি প্রজাপতি বা পক্ষীর আকার ধারণ করে, ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পথিক নরাব মত পড়িয়া থাকিয়া, ভল্লুকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল, এটি কথামালার গল্প বটে; কিন্তু, উকুন, মশা, ছারপোকা, মাকড়শা প্রভৃতি নানা প্রাণী মৃত্যুর ভাণ করিতে শিখিয়াছে। পলায়নের উপায়ান্তর না দেখিলে, ইহারা

মরার মত পড়িয়া থাকে। শেষে শত্রু চলিয়া যাইলে, গাত্রঝাড়া দিয়া উঠিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করে।

অতল-সমুদ্রে, জলরাশির বহু নীচে, ঘোর অন্ধকারে, যে সকল প্রাণী বাস করে, তাহাদের কাহারও এক একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে। কেহ বা শরীরের অংশবিশেষ্ হইতে, সহসা চৌকীদারের লণ্ঠনের মত, জ্যোতিঃ বাহির করিয়া, কোথায় ভক্ষ্য-পদার্থ আছে, দেখিয়া লয়; কিন্তু, শত্রু অনুসরণ করিলে জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত করে। কেহ শত্রুর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, দ্রুতবেগে পলায়নে অক্ষম হইলে, সহসা ধূম উদ্গীরণ করিয়া, অন্ধকারে পলায়ন করে। কেহ বা, তীব্র জ্যোতিঃ বিকশিত করিয়া, শত্রুকে অন্ধ করিয়া দেয়। Bombardier Beetle নামক কীট শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে, পুচ্ছদেশ হইতে এক প্রকার রস নির্গত করে। সে রস বায়ুর সংস্রবে বন্দুকের মত আওয়াজ করে। নবদ্বিলণ্ডের হরা পক্ষী এখন কাঠঠোকরার বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের স্ত্রী, প্রকৃতই জীবনের সহায়। পুরুষ পক্ষীর চঞ্চু, শক্ত ও লম্বা। ইহারা, তাহার দ্বারা গাছে গর্ত্ত করিতে পারে; কিন্তু, পোকা ধরিবার ক্ষমতা নাই। স্ত্রীর চঞ্চু বাঁকা। স্বামী গর্ত্ত করিলে, স্ত্রী চঞ্চু দ্বারা পোকা ধরিয়া স্বামীকে খাইতে দেয় ও আপনিও খায়। তাহার বাঁকা ঠোঁট গাছে গর্ত্ত কাটিবার উপযোগী নহে।

নিম্নজাতীয় জীবের উৎপাদিকা শক্তিই বা কত? এক একটি পুত্তিকা প্রতি দিন ৮৬৪০০ অণ্ড প্রসব করে। এইরূপে একটি চান্দ্র মাসে এক একটি পুত্তিকার ২৪১৯২০০ ডিম্ব হয়। এক বাসায়, এক সঙ্গে, কখন কখন পাঁচ লক্ষ পিপীলিকা বাস করে। অথচ, পরস্পরে কখন বিবাদ করিতে কেহ দেখে নাই। এই সকল জীবের সংখ্যাও যেমন, শত্রুও তেমন। এ জন্য শত্রুমুখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ও তেমনি হইয়াছে। মনুষ্যের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, চারিটি প্রধান ইন্দ্রিয়, এক স্থানে, নিকটে নিকটে, সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু, নিম্নজীবের সমুদয় অঙ্গ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে পূর্ণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিম্নপ্রাণীর ইন্দ্রিয় সংখ্যা যেমন অধিক, এক একটি ইন্দ্রিয়ের শক্তিও তদনুরূপ। বৃহৎ-মক্ষিকার এক একটি চক্ষে কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থ ১৩৫০০ আছে। শ্রমিক মৌমাছির তিনটি প্রধান ও ৩৫০০টি অপ্রধান চক্ষু আছে। এক জাতীয় কীটের (Stag-beetle) দাঁতে এত জোর যে, উহা একটি লোহার সিন্দুকে এক ইঞ্চি ব্যাস একটি গর্ত্ত কাটিয়া বাহির হইয়াছিল। মশা প্রতি সেকেণ্ডে পনর হাজার বার, মাছি ৩০৫ বার, এবং মৌমাছি ৪৪০ বার ডানা নাড়িতে পারে। কোন

which surrounds us may be a totally different place to other animals. To them it may be full of music which we cannot hear of color, which we cannot see, of sensations which we can not conceive."

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

সত্য।

অনেকগুলি বাক্য আছে, যাহাকে আমরা সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি। বিচার করিয়া দেখিলে, সত্য নামটী সর্ব্বত্র উপযুক্ত কি না, অনেক স্থলেই সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাকে আমরা সচরাচর ধ্রুবসত্য বা পূর্ণসত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা বিচারে খণ্ডসত্য, আংশিক সত্যরূপে প্রকাশ পায়। যাহাকে সনাতন ও সার্ব্বভৌমিক সত্যরূপে অকুণ্ঠিতভাবে নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছি, তাহার সত্যতা সংকীর্ণদেশব্যাপী, অথবা সংকীর্ণকালব্যাপী। স্থূল কথায়, সত্য ও মিথ্যা এই দুই শ্রেণীর ভিতরে জগতের ব্যাপারগুলাকে বেঁসিতে পারা যায় কি না, সন্দেহের বিষয়; ব্যাপারমাত্রই কিয়ৎপরিমাণে সত্য ও কিয়ৎপরিমাণে মিথ্যা। কোন্ ব্যাপারটাকে সত্য বলিব, তাহা নিশ্চয় করা বড় সহজ নহে। সত্যের লক্ষণনির্ণয়ের জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কোনটাই বোধ করি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে নাই। শ্রীযুক্ত হর্বট স্পেন্সর, প্রচলিত লক্ষণগুলির সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, কোনটিই বিচারের মুখে স্থিরভাবে দাঁড়ায় না। স্পেন্সর সাহেব নিজেও একটি সত্যের সংজ্ঞা বা লক্ষণ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, আমরা যাহার অন্যথা কল্পনা করিতে পারি না, তাহাই সত্য। যেমন কালের আরম্ভ ও আকাশের সীমা। কালের আরম্ভ আমাদের কল্পনায় আইসে না; আকাশের পরিধি আছে, তাহাও আমাদের কল্পনার অগোচর। সুতরাং, কালের অনাদিত্ব ও আকাশের অসীমতা, এই দুইটা সত্য। আবার জড়ের সৃষ্টি, শক্তির নাশ, এই দুইটাও ঐ হিসাবে সত্য। দর্শনশাস্ত্রে একটা প্রচলিত বাক্য আছে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না, সৎ হইতে অসৎ জন্মে না; দেশ, কাল, জড় ও শক্তি, এই চারিটার অনাদিতা ও অনন্ততা, এই মূল

কথাটারই অন্তর্গত। মোটের উপর 'কিছু না' হইতে ইহাদের উৎপত্তি, এবং 'কিছু না' তে ইহাদের লয়। আমাদের ধারণার আইসে না, সুতরাং কথাটাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

আমাদের কল্পনায় আসে না, আমরা ধারণা করিতে পারি না,—এই বাক্যেই পোষ থাকিল। যাহা আমাদের কল্পনায় আসে না, তাহা অন্যের কল্পনায় আসিতে পারে। আমরা যাহা ধারণা করিতে পারি না, আর কেহও যে তাহা ধারণা করিতে পারিবে না, এরূপ নির্দ্দেশ করিবার কোন অধিকার আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং, যাহা আমাদের পক্ষে সত্য, তাহা অন্যের নিকট অসত্য হইতে পারে, তাহাকে পূর্ণসত্য, অখণ্ড সত্য, অভ্রান্ত সত্য, এরূপে নির্দ্দেশ করিলে আমাদের অধিকারের সীমানা ছাড়িয়া যাইতে হয়। আকাশের সসীমতা আমরা কল্পনা করিতে পারি না, হয় ত এমন জীব আছে, যাহাদের মানসিক বৃত্তি আমাদের অপেক্ষা পূর্ণ, তাহারা আকাশের, অর্থাৎ আমরা যাহাকে আকাশ বলি—তাহার, সসীমতা কল্পনা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; শুধু সমর্থ কেন, হয় ত আমাদের কল্পিত অসীম আকাশ তাহারা স্পষ্টই সীমাবদ্ধ দেখিতে পায়। এরূপ জীবের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, কিন্তু অপূর্ণ মনোবৃত্তি লইয়া আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, এরূপ জীব বর্ত্তমান নাই। জর্ম্মানির হেলম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ ও বিলাতি অধ্যাপক ক্লিফোর্ড, আমাদের এইরূপ অন্যায় অহঙ্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দেখাইয়াছেন যে, ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধগুলিকেও পূর্ণ সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার আমাদের অধিকার নাই।

ফলতঃ, সত্য অর্থে আমাদের পক্ষে সত্য; নিরপেক্ষ নহে,—সাপেক্ষ; পূর্ণ নহে—আংশিক; সার্ব্বভৌম নহে—আপেক্ষিক; সনাতন নহে—তাৎকালিক। স্পেন্সরের দত্ত সত্যের সংজ্ঞাটাও বিচারের ধারে খণ্ডিত হইয়া এইরূপ দাঁড়ায়।

আর একটা কথা বহুদিন হইতে এইরূপে সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। ইহাকে ইংরাজিতে বলে uniformity of Nature; বাঙ্গালায় প্রকৃতির নিয়মবর্ত্তিতা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ, প্রকৃতি চিরদিন এক নিয়মে কাজ করে;—প্রকৃতির খেয়াল নাই। অর্থাৎ, অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা,—যাহাকে ইংরাজিতে miracle বলে,—তাহার প্রকৃতিতে কখন স্থান নাই। অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করিব কি না, ইহা লইয়া ভয়ানক তর্কসংগ্রাম বহুকাল চলিয়াছে; কিন্তু এ সংগ্রাম নিবৃত্ত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। নিরাকৃত শব্দের অর্থটা স্পষ্ট সম্মুখে রাখিলে, বিবাদের পথও পরিষ্কৃত হইয়া আসে।

অসাধারণ ঘটনামাত্রই অতিপ্রাকৃত নহে, মিরাকল্ নহে। তাহা হইলে ক্যারাডে এবং ক্রুক্স্, অথবা ইটালীর যুবক নিকলা টেস্‌লার আবিষ্কৃত ব্যাপারগুলির ন্যায় অবিশ্বাস্য মিরাকল্ আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং, অতিপ্রাকৃত অর্থে অসাধারণ নহে; অতিপ্রাকৃতের অর্থ প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচারী বা বিরুদ্ধচারী; কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কি, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অপূর্ণ, এবং চিরকালই অতি অপূর্ণই রহিবে। জ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত আলোকিত প্রদেশের অপেক্ষা, পরিধির বাহিরের অন্ধকার দেশের প্রসার চিরদিনই অধিক থাকিবে। সুতরাং, এটা প্রাকৃত নিয়মের বহির্ভূত, অথবা এটা প্রাকৃত নিয়মের শিকলের গ্রহীভূত নহে, এরূপ নির্দ্দেশ করিতে কাহারও সাহসে কখন কুলাইবে; বোধ হয় না। সুতরাং এটা প্রাকৃত, ওটা অতিপ্রাকৃত, এরূপ ব্যাখ্যা চলিবে না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, যাহা আপাততঃ অসাধারণ, অলৌকিক, অদ্ভুত, অতিপ্রাকৃত বলিয়া বোধ হয়, অনুসন্ধানে তাহা সাধারণ, সংযত, নিয়মানুযায়ী, প্রাকৃতরূপে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এখন মনে হইতে পারে, প্রকৃতির নিয়ম এইখানে ভাঙিয়াছে; কিন্তু, জ্ঞানের সীমানা প্রসারিত হইলে দেখা যাইবে, প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। নিয়ম এখানে ভাঙিয়াছে, ওখানে ভাঙিয়াছে কি না, তাহা লইয়া তর্ক করিতে ইচ্ছা হয় কর; কিন্তু, তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ক্ষমতা এখন আমাদের বর্ত্তমান নাই। বৈজ্ঞানিকেরা এই পর্য্যন্ত বলেন,—কালে দেখিবে, প্রকৃতির নিয়ম ভাঙে না। অতিপ্রাকৃত কিছুই নাই, মিরাকলের স্থান নাই। প্রকৃতিতে খেয়াল নাই, নিয়ম আছে; ইহার চপলতা নাই; শাস্ত্রের কঠিন নিগড় আছে। ইহা একটা সত্য।

ফলে প্রকৃতির নিয়মবর্ত্তিতা—নেচারে ইউনিফর্মিটি—একটা সত্য। এবং অতিপ্রাকৃতের পক্ষ হইতে ইহার প্রতি সচরাচর যে আক্রমণ হয়, তাহাতে এই সত্যের ভিত্তিমূল নড়াইতে পারে না। অদ্ভুত ঘটনা, যাহাতে মানুষে বিশ্বাস করিতে চায় না, যাহা কখন ঘটিতে দেখা যায় নাই, তাহা যথার্থ বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে প্রাকৃত নিয়মের অতিচারী, তাহার প্রমাণ হয় না। কোন্ নিয়মের অনুযায়ী, তাহা শীঘ্র বাহির না হইতে পারে, কিন্তু কালে বাহির হইবার সম্ভাবনা। ভূয়োদর্শন এইরূপ বলে।

সুতরাং, প্রকৃতির নিয়মবর্ত্তিতা একটা সত্য। কিন্তু কেমন সত্য? প্রকৃতিতে নিয়ম আছে, খেয়াল নাই। কে বলিল? ভূয়োদর্শন বলিয়াছে। নিয়মের

অতিক্রম দেখা যায় নাই। সূর্য্য একই নিয়মে উঠিতেছে, পৃথিবী একই নিয়মে ঘুরিতেছে, নদী একই নিয়মে চলিতেছে; বায়ু একই নিয়মে বহিতেছে। আবার মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি যে নিয়মে চলিতেছে, সেই নিয়মের হিসাবেই প্রাচীন ধূমকেতু উঠিয়াছিল ও নেপচুনের অস্তিত্ব বাহির হইয়াছিল।

ভূয়োদর্শন বলিতেছে, আজ যে নিয়মে জাগতিক কার্য্য চলিতেছে, হাজার বৎসর পূর্ব্বেও সেই নিয়মে চলিয়াছিল। আবার কাল কেমন চলিবে, শত বৎসর পরে কেমন চলিবে, তাহাও আমরা গণিয়া বলি। গণনা ও ঘটনাতে, মিল ভিন্ন অমিল হইতে দেখা যায় নাই।

কিন্তু একটা কথা আছে, ভূয়োদর্শন ভূয়োদর্শন মাত্র। ভূয়ঃ শব্দের অর্থ ভূয়ঃ; চির নহে। ভূয়োদর্শন বহুকাল ব্যাপিয়া ও বহুদেশ ব্যাপিয়া; কিন্তু চিরকাল ব্যাপিয়া বা সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া নহে। এবং চিরের সহিত তুলনায়, সর্ব্বের সহিত তুলনায়, ভূয়ঃ ও বহু, নগণ্যমাত্র। উভয়ের তুলনা হয় না।

মাধ্যাকর্ষণের বর্ত্তমান নিয়ম, কালি ছিল, পরশ্ব ছিল, শত বৎসর বা লক্ষ বৎসর আগে ছিল, মানিলাম। কিন্তু চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ কি? আবার মাধ্যাকর্ষণের যে নিয়ম লোষ্ট্রখণ্ডে আছে, তাহাই চন্দ্রে আছে, পৃথিবীতে আছে, শনৈশ্চরে ও নেপচুনে আছে, হয় ত সিরিয়স ও তাহার সহচরে আছে; হয় ত ছায়াপথমণ্ডলে ও ধূমমণ্ডলে আছে। কিন্তু সর্ব্বত্র আছে, কে বলিল? ভূয়োদর্শনের দৃষ্টি ততদূর বিস্তৃত নহে; সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর নাই।

সূর্য্য আজ যেমন উঠিয়াছে, কাল তেমনি উঠিয়াছিল, পরশ্ব তেমনি উঠিয়াছিল। আমার জীবনের ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তেমনি ভাবে উঠিতেছে, তোমার জীবনের আশী বৎসরেও সেই নিয়মে উঠিয়া আসিতেছে; এবং মানব জীবনের শত দশ পুরুষের হাজার বৎসর ও পৃথিবীর জীবনের শত লক্ষাধিক বৎসরও সেই নিয়মই প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই দেখিয়া সাহস করিয়া বলিতে পারি, কালও এই নিয়মে উঠিবে; দশ, শত কি সহস্র বৎসর পরেও সেই নিয়মে উঠিবে। ইহারই নাম গণনা; গণনাও যখন নিষ্ফল হইতে দেখা যায় নাই, তাই গণনাতে আমাদের বিশ্বাস ও সাহস। এ পর্য্যন্ত শত সহস্র অগ্নিয়াছে, তাহার অধিকাংশই মরিয়াছে। কাল পর্য্যন্ত যারা ছিল, তাদের অনেকেও আজ নাই: তাই গণনা করি, আমি মরিব, তুমি মরিবে, যাহারা এখন আছে, তারা সকলেই মরিবে, যাহারা জন্মিবে, তারাও মরিবে। সাহসের সহিত আমরা গণিয়া বলি, গণনাও সফল হয়; তাই গণনাতে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু সাহসের

কথাটি কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়। সাহস অনেক সময় বিপদের মূল হইয়া দাঁড়ায়। নির্ব্বাপিত আগ্নেয়পর্ব্বতের প্রান্ত মূলে বিশ্বস্ত মানুষে ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে; একদিন অকস্মাৎ অগ্নিগিরি অগ্ন্যুদ্গার করিয়া ধ্বংসকার্য্য সমাপনের পর অভ্রান্ত সাহসের প্রতিফল দেয়। এখানে মানুষ ভূয়োদর্শন কর্ত্তৃক প্রতারিত হয় মাত্র। তেমনি আমাদের ভূয়োদর্শন যে আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে না, কে বলিল? কে বলিল, জগৎযন্ত্র গত শত বৎসর যাবৎ যে নিয়মে চলিয়াছে, কালও সেই নিয়মে চলিতে থাকিবে? সূর্য্য এতকাল যে নিয়মে চলিয়াছে, কালও সেই নিয়মে চলিবে, তাহার নিশ্চয় কি? সকলে মরিয়াছে বলিয়া আমাকেও মরিতে হইবে, কে বলিতে পারে? এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, সূর্য্য সম্ভবতঃ কাল উঠিবে, সম্ভবতঃ আমাকেও মরিতে হইবে। অর্থাৎ ভূয়োদর্শনের উত্তরে নিশ্চয় নাই, সংশয় আছে। নিয়মের শিকল পরমুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; আর যাহা নিয়ম, তাহা অনিয়মে পরিণত হইতে পারে।

বলিতে পার, ইহাতেও নিয়মের অভাব সপ্রমাণ হইল না। ঘড়ীর স্প্রিং ভাঙ্গিতে পারে, ঘড়ীর চাকায় মরিচা ধরিয়া চাকা থামিতে পারে, যে নিয়মে ঘড়ীর কাঁটা চলিতেছিল, তাহা আপাততঃ রহিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে নিয়মের ব্যতিক্রম প্রমাণ হইল না। একটা সঙ্কীর্ণ নিয়মের বন্ধন ছাড়িয়া আর একটা প্রশস্ততর নিয়মের আধিপত্য উপস্থিত হইল মাত্র। জগৎযন্ত্রকে এইরূপ ঘটিকার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জগৎযন্ত্র আপাততঃ বিকল বোধ হইলেও, বস্তুতঃ নিয়মের অধীনতা এড়াইতে পারে না।

আমরাও বলিতেছি তাহাই। আমাদের ভূয়োদর্শন কেবল সঙ্কীর্ণদেশব্যাপক, সঙ্কীর্ণকালব্যাপক নিয়মের বিষয়েই জ্ঞান দেয়। তদপেক্ষা বিস্তৃত নিয়ম, যাহার ক্ষেত্রের পরিসর অধিক, তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না। ভূয়োদর্শন যদি সীমাবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে আমরা সাহসের সহিত নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম, অমুক সময়ে অমুক ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন গণনামাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে অনিশ্চিত না হইয়া পারে না। অতএব দেখা গেল, প্রকৃতিতে যে খেয়াল নাই, প্রকৃতি যে চিরকালই এক নিয়মে চলিবে, এরূপ বলিবার অধিকার আমাদের নাই। তাই বলিয়া কি বৈজ্ঞানিকের অবলম্বিত পদ্ধতি দূষিত? বলা বাহুল্য, এই কথাটাকে সত্য মানিয়া বৈজ্ঞানিক তাঁহার সমুদয় ভবিষ্যৎগণনা সম্পাদন করেন। সত্যটা যদি অমূলক হয়, তবে

বিজ্ঞানের কোন কথাতেই বিশ্বাস স্থাপন চলে না, বিজ্ঞানের অবলম্বিত পদ্ধতিটাই অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে।

আমরা তত দূর বলি না। কালের আদি নাই, আকাশের সীমা নাই, জড়ের বিনাশ নাই, শক্তির সৃষ্টি নাই, এই কথাগুলাও যেমন এক হিসাবে সত্য, প্রাকৃত নিয়মের ব্যত্যয় হয় না, প্রকৃতির খেয়াল নাই, এটাও কতকটা সেইরূপ হিসাবে সত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিরীহ বৈজ্ঞানিক বেচারীর মত দুর্ভাগ্য মনুষ্য কেহ জন্মে নাই।

বৈজ্ঞানিকের আহরিত মিষ্ট মিষ্ট ফলগুলি সাধারণেই উপাদেয়বোধে অকুণ্ঠিত চিত্তে ভোগ করেন; এবং বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরিশ্রম ও ক্ষমতার বিনিময়ে গালির বোঝা মাথায় লইয়া যান। বৈজ্ঞানিক যে কাজ করেন, তাহা আর কেহ পারে না, অন্যের বুদ্ধি তত দূর পৌঁছে না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়; সাধারণের মতে, বৈজ্ঞানিকের মত দুঃশীল, স্থূলদর্শী ও বুদ্ধিহীন মানুষ আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহার বিচারপ্রণালী ভ্রান্ত, তাঁহার বাক্য অর্থহীন, তাঁহার কার্য্য বিধির বাহির। কিন্তু যাঁহারা বৈজ্ঞানিককে গালি দিবার মধুর নিবাকলের পক্ষে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা দেখিলেই ঈশ্বরের হাত হইতে শাসনদণ্ড স্খলিত হইল ভাবিয়া হাহাকার করেন, তাঁহাদের নিজের কার্য্যই তাঁহাদের বাক্যের বিরোধী দেখা যায়। পরন্তু, বিজ্ঞানের অবলম্বিত প্রণালী ও মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী বিশেষ পৃথক্ নহে। শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে, আমরা প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা স্বতঃসিদ্ধরূপে মানিয়া লই, না মানিলে জীবনযাত্রা চলে না। যিনি মানেন, তিনিই জিতেন; যিনি মানেন না, তিনি ঠকিয়া যান। অনাগতবিধাতা ও বক্রবিষ্যের গল্প কাহিনীমাত্র নহে। জীবনসংগ্রামে অনাগতবিধাতার জয়, বক্রবিষ্যের অকালমরণ। মুখে যাহাই বলি, কার্য্যে আমরা প্রকৃতির চপলতায় বিশ্বাস করি না। নিশান্তে যথাকালে ক্ষুধার উদ্রেক নিশ্চয় জানিয়া আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বদিন করিয়া রাখি। হেমন্তে ফসল পাকিবে জানিয়া বর্ষারম্ভে চাষা ধান্য রোপণ করে। চিত্রগুপ্তের তলপ অনিবার্য্য জানিয়া জীবনবীমার টাকা দিয়া থাকি। প্রকৃতিকে চপল জানিলে কোন চিন্তার দরকার হইত না। হয় ত এত দিন মানবজাতিকে কঙ্কালমাত্র রাখিয়া ধরাধাম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইত।

প্রকৃতির শাসন কঠোর শাসন। নিয়মে বিশ্বাস কর, প্রকৃতির আদেশ। বিশ্বাস কর, নতুবা মঙ্গল নাই। পালন কর, তোমার মঙ্গল হইবে। মানব-

জাতি সাধারণতঃ পালন করিতেছে, তাই টিকিয়া আছে। বিজ্ঞানকে দোষ দিও না।

তুমি আমি যাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, বিজ্ঞানও তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া তোমার আমার কাজ করে, ও গালি খায়। সুতরাং, প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা একটা সত্য কথা। এই হিসাবে সত্য। প্রাণভয়ে বা প্রসাদের আশায় জল উঁচু স্বীকার করিতে হয়। একরূপ প্রাণের দায়ে ইহাকেও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। জীবন যদি সত্য হয়, তোমার আমার অস্তিত্ব যদি সত্য হয়, ইহাও তবে সত্য।

জগতে যতগুলা সত্য মানিতে হয়, তার মধ্যে একটা সব চেয়ে সত্য। আর সকলই তার নীচে। আমি আছি, ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর দ্বিতীয় নাই। মনোবিজ্ঞানের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ এই। জীবনযাত্রার আরম্ভ ইহাতেই বিশ্বাসে। এবং এই সত্যটায় বিশ্বাস করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে, আরও কতকগুলা সত্যে বিশ্বাস করিতে হয়। অথবা যাহাতে বিশ্বাস না করিলে জীবনযাত্রা চলে না, বা নিজের অস্তিত্ব টিকে না, তাহারই নাম সত্য।

স্পেন্সরের প্রদত্ত সত্যের সংজ্ঞা অপেক্ষা এই সংজ্ঞাটা একটু বিস্তৃত। তবে উভয়ে কোন বিরোধ নাই। জগৎযন্ত্রে ব্যবস্থা নাই, নিয়ম নাই, এরূপ কল্পনায় আনা আমাদের অসাধ্য। মনে করিতে গেলে, মনের গ্রন্থি ও জীবনের গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যায়।

মানবজীবনের সহিত সুতরাং সত্যের সম্বন্ধ। মানবকে বাঁচিতে হয়, সেই জন্যই এটা সত্য, ওটা মিথ্যা। মানবজীবনের বাহিরে সত্য নাই, মিথ্যা নাই, কি আছে বলা যায় না।

পাঠক যদি বোধ করেন, সত্যের গৌরব লঘুকৃত হইল, তাহা হইলে নাচার।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

তৈমুর লঙ্গের অনুশাসনলিপি।

ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়া কে তৈমুর লঙ্গের নাম না শুনিয়াছেন? এই মহাপরাক্রান্ত তাতার যুবক পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষে যে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

এই ঘটনার পর, ভারতবর্ষের উপর দিয়া, অনেক বার অনেক অত্যাচার চলিয়া গিয়াছে, এবং অনেকের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ভারতের কোমল বক্ষ বিদীর্ণ হইয়াছে; নাদির সাহ ও আহম্মদ শা দুরানী ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্নিদাহ প্রজ্বলিত করিয়া, শস্যশ্যামল প্রদেশসমূহ শ্মশানে পরিণত, এবং শোভা ও সমৃদ্ধিপূর্ণ শত শত সুন্দর নগর ও গ্রাম বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন অত্যাচারীই তৈমুরের ন্যায় ভারতবর্ষে শোণিতস্রোত প্রবাহিত করেন নাই, ভারতের লক্ষ লক্ষ নিরপরাধী নরনারীকে শৃঙ্খলিত করিয়া, কেহই আপনার বীরত্ব-নিশান উড্ডীন করেন নাই। যত দিন ভারতের ইতিহাস থাকিবে, তৈমুরের ভীষণ অত্যাচারের কথা তত দিন ভারতবাসীর মনে জাগরূক থাকিবে। শুধু তাহাই নহে, তৈমুরের বংশের সহিত ভারতের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। তৈমুর আপনাকে ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, ভারতের প্রধান নৃপতিবৃন্দ তাঁহার প্রবল প্রতাপের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহার বংশধর বাবর দিল্লীর সিংহাসন পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন, এবং সৌভাগ্যক্রমে তিনি সেই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ভারতে যে বংশতরু প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রবল ক্ষমতার সহিত ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিল। তাই বলিতেছি, যত দিন ভারতের ইতিহাস থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত ভারত হইতে তৈমুরের নাম বিলুপ্ত হইবে না।

অতএব, তৈমুর লঙ্গ সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। কিন্তু তৈমুর কি প্রকৃতির লোক ছিলেন? ইংরেজের লিখিত প্রায় সমস্ত ইতিহাসেই দেখিতে পাই, তিনি নিষ্ঠুরতার অবতার, তাঁহার প্রকৃতি নিতান্ত পিশাচের ন্যায়, যেন পৃথিবীতে অশান্তি ও রক্তস্রোত প্রবাহিত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; ভারত-আক্রমণ-কালে তিনি দিল্লী ও সীবাট প্রভৃতি স্থানে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে, তাঁহাকে মানবনামের অযোগ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যিনি এসিয়া খণ্ডে অদ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাঁহার সুমহৎ বংশ এই প্রাচ্যভূখণ্ডে সভ্যতার ইতিহাসে নূতন স্রোত আনয়ন করিয়াছিল, যাঁহার বংশে আকবরের ন্যায় মহামহিমান্বিত, প্রাতঃস্মরণীয় সম্রাট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যে বংশের ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের বিস্ময়পূর্ণ কাহিনী সকল গিরি, নদী ও সাগর উপসাগর অতিক্রম করিয়া, সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী সুদূর প্রতীচ্য

ভূখণ্ডের প্রতিভাশালী পরাক্রান্ত সম্রাটবর্গের শ্রবণপথে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই বংশের স্থাপয়িতা তৈমুর লঙ যে এক জন মনুষ্যত্বহীন, হৃদয়শূন্য, লুণ্ঠনকারী দস্যু ছিলেন, এ কথা সহসা বিশ্বাস করা যায় না।

অত্যাচার বা পাশবিক ক্ষমতার পরিচালনে রাজ্য জয় করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেই রাজ্য শাসন ও রক্ষা করিতে হইলে যে সকল গুণের প্রয়োজন, তৈমুরের তাহা না থাকিলে, হয় ত তাঁহার নামের সহিতই তাঁহার বংশগৌরব বিলুপ্ত হইত। তাঁহার অত্যাচার কিম্বা অপকার্য্যের যতই প্রমাণ থাক না কেন, তিনি যে একজন সুযোগ্য সম্রাট ছিলেন, এবং পঞ্চশতাব্দী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহার যে বর্ত্তমান সময়ের অনুরূপ সমদর্শিতা ও রাজনীতিজ্ঞান বিশেষ প্রবল ছিল, তাহা তাঁহার অনুশাসনলিপি পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যে সম্রাট ভবিষ্যৎবংশীয়দিগকে পরিচালিত করিবার জন্য, যেমন সমস্ত সুনিয়ম ও সদভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন, তিনি যে একজন সুযোগ্য এবং সুশিক্ষিত সম্রাট, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করিবার সময় যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইত, এবং তদ্দেশবাসিগণ যে নির্য্যাতন সহ্য করিতেন, তজ্জন্য তাঁহার উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ করা যায় না। অন্ধকূপহত্যাপরাধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রকৃতি আমাদের নিকট যেরূপ জঘন্য ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, অন্ধকূপহত্যাব্যাপার না ঘটিলে হয় ত তাঁহার চরিত্র এরূপ জঘন্যরূপে চিত্রিত দেখিতাম না; কিন্তু সেই অন্ধকূপ-হত্যাব্যাপারে সিরাজউদ্দৌলা নির্দ্দোষী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কে বলিবে, দিল্লী বা মীরাটের হত্যাকাণ্ডে তৈমুরও নির্দ্দোষী ছিলেন না? তৈমুর লঙ যে সকল অনুশাসনবাক্য তাঁহার ভবিষ্যৎবংশীয়দিগকে পরিচালিত করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার যাথাযথিক বিবরণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক দেখিবেন, তৈমুরের অভিপ্রায় কিরূপ মহৎ ছিল, এবং অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ও যথেচ্ছাচারী সম্রাট্ হইয়াও তিনি কিরূপ সংযতভাবে সমদর্শিতার সহিত তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

তিনি বলিতেছেন, "আমার বিশ্বাস আছে, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের কৃপায় আমার পুত্র পৌত্র এবং ভবিষ্যবংশধরগণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, পরম ক্ষমতার সহিত রাজ্যশাসন করিবেন; আমার সেই সকল সৌভাগ্যবান্

বংশধরগণের অতি দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসনবিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য, আমার অনুষ্ঠিত কতকগুলি সুনিয়ম এবং রাজোচিত কার্য্যের দ্বারা বিধিবদ্ধ করিতেছি। আমি ভগবানের আশীর্ব্বাদে ও আমাদের সহস্রবীর ধর্ম্মের গৌরবপ্রভাব, কঠোর পরিশ্রম দ্বারা এবং বারা বিপত্তির সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া, যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ও বিপুল ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছি, যাহার জন্য সহস্র সহস্র নরনারীর রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, এবং যাহার রক্ষার নিমিত্ত ও যাহার উন্নতিকল্পে মহম্মদের ক্ষমতাশালী বংশধর ও বিখ্যাত অনুচরগণ সর্ব্বদা আমার সহায়তা করিয়াছেন, সেই সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, আমার বংশধরগণ মৎপ্রদর্শিত এই সমস্ত নিয়ম সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলিবেন, এই অভিপ্রায়ে তাহা একত্র সঙ্কলন করিতেছি।

"এবং যদি আমার বংশধরগণ সাম্রাজ্য পরিচালনবিষয়ে, এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলেন, তাহা হইলে,তাঁহারা আমার যে সৌভাগ্য ও ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হইবেন, তাহা সর্ব্বদা অবিচলিত এবং অবিকৃত থাকিবে।

"আমি দ্বাদশটি বিশেষ নিয়ম দ্বারা আমার জীবন পরিচালিত করিয়া থাকি, এবং এই সমস্ত সাধু নিয়ম বলেই, আমি এই বিপুল রাজগৌরব লাভ করিয়াছি; করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশ শাসন পূর্ব্বক আমার সিংহাসন সুশোভিত ও অলঙ্কৃত করিয়াছি। অতএব, আমার যে সকল গৌরব ও যশের চিরকীর্ত্তি বংশধরগণ আমার এই সাম্রাজ্য এবং প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন মদনুষ্ঠিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করিয়া চলেন।

"আমার সাম্রাজ্য এবং গৌরব অটুট রাখিবার জন্য, আমি যে সকল নিয়মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার প্রথম নিয়ম এই যে, আমি সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের মহিমা বিস্তারের জন্য ও পবিত্র মহম্মদীয় ধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলনের নিমিত্ত, অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছি, এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সত্য বিশ্বাস স্থাপনের সহায়তা করিয়াছি।

"দ্বিতীয়, আমার বিশ্বস্ত দ্বাদশটি জাতির সাহায্যে আমি বিভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া শাসন করিতেছি, তাহাদেরই সাহায্যে আমার সৌভাগ্যভিত্তি দৃঢ় করিতে সক্ষম হইয়াছি, এবং তাহাদের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া, আমার মন্ত্রিসভা সংগঠিত করিয়াছি।

"তৃতীয়, আমার বিচক্ষণ মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, বিশেষ সতর্কতাবে সকল বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক আমি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হই-

য়াছি, এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বিভিন্ন রাজ্য করতলগত করিয়াছি। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে কখনও মহত্ব দ্বারা, কখনও ধৈর্য্যসহকারে, কখনও বা কূটনীতি পরিচালনা পূর্ব্বক আমি রাজ্যসম্বন্ধীয় বিষয় সুসম্পন্ন করিয়া থাকি, এবং শত্রু মিত্র সকলের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করি।

"চতুর্থ, মৎপ্রচলিত সুনিয়মে ও সুবন্দোবস্তে আমার সাম্রাজ্যের সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়; সেই সমস্ত নিয়ম ও বন্দোবস্ত এরূপ সুকৌশল-সম্পন্ন যে, আমীর, উজীর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিবর্গ হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত, সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে নিজ নিজ পদে অবস্থান করিতেছে; তাহারা কেহই দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইতে পারে না।

"পঞ্চম, আমি আমার আমীর ও সৈন্যগণকে উৎসাহ দান করি, ধনরত্ন উপহার প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখি, তাহাদিগকে রাজকীয় ভোজে নিমন্ত্রিত করি; তাহারাও যুদ্ধক্ষেত্রে আমার জন্য, অম্লানবদনে দেহ-পাত করে। আমার ধনাগারের দ্বার সর্ব্বদা তাহাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে, আমি তাহাদিগকে বিদ্যা এবং যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিই, এবং শ্রমসাধ্য ব্যাপার সম্পাদনে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য আমি তাহাদিগের সহিত পরিশ্রমে যোগ দিই। এই উপায়ে আমি উৎসাহ ও অধ্যবসায়বলে এবং আমার রাজ্যের অধিনায়কবর্গ, সেনাপতি ও যোদ্ধাগণের শাণিত তরবারীর সাহায্যে, দ্বিসপ্ততি জন নরপতির সিংহাসন অধিকার করিয়াছি, এবং ইরাসেন, টুরাউন, রুম, মগরিব, সাম, মিসর, ইরাক্‌, আরব, আজম, মাউজিন, তুরা-য়ুন, কাইলোনট, সর্ত্তোনট্, আজার বুজন, করিস, খোরাসান, জিতেবদস্ত, কিপচকের দস্ত, খারুম, খাটুম, কাবুলিস্থান, হিন্দুস্থান ও বক্করজেমিন প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া, সেই সমস্ত দেশে আমার প্রচণ্ড ক্ষমতা প্রসারিত করিয়াছি।

"এই সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিয়া, আমি শান্তির কোমল শয্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম; দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় হইতে আমি বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, নির্ভীকচিত্তে শত শত বিপদ আলিঙ্গন করি-য়াছি, অভীষ্টসাধনের জন্য শত শত কষ্টকর ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়াছি। আমাকে বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী ও সৈনিক-বর্গের বিদ্রোহানল প্রশমিত করিতে হইয়াছে; তাহাদের উদ্ধত বাক্য শ্রবণ করিয়াও বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে হইয়াছে। যত দিন পর্য্যন্ত আমি বিভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া সাম্রাজ্যস্থাপন ও আমার নামের

গৌরবপ্রচার করিতে সক্ষম না হইয়াছিলাম, তত দিন পর্য্যন্ত মস্তকের উপর অজস্রধারে বিপৎপাত দেখিয়াও আমি মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হই নাই।

"যত্ন, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরতাগুণে, আমি মনুষ্যসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। নির্দ্দোষী প্রজাবর্গই যে আমার স্নেহের পাত্র, তাহা নহে; অপরাধী ব্যক্তিদিগকেও আমি স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি; আমি কাহারও প্রতি লঘু পাপে গুরুদণ্ড বিধান করি না। পরোপকার দ্বারা আমি সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছি, আমি পুরস্কার ও দণ্ডবিধান দ্বারা আমার সৈন্যসামন্ত এবং প্রজাবর্গের হৃদয়ে আশা ও ভয়ের সঞ্চার করি, অতি নিম্নশ্রেণীর প্রজার সহিতও আমার সহানুভূতি আছে, তাহাদের দুঃখকষ্টে আমার হৃদয় বিগলিত হয়।

"আমি অত্যাচারীর হস্ত হইতে পীড়িতকে রক্ষা করি, এবং অত্যাচারের সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া ন্যায়বিচার দ্বারা উভয় পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন করি, আমার শাসনাধীনে একের অপরাধে অপর ব্যক্তি কখনও দণ্ডভোগ করে না।

"যাহারা আমার ক্ষতি করিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, এবং আমার অভিপ্রায় ও যুদ্ধকৌশল ব্যর্থ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, তাহারা আমার অনুগ্রহপ্রার্থী হইলে, আমি তাহাদের প্রতি বিমুখ হই না; আমি তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি, আমার প্রতি তাহাদের অতীত অত্যাচারের কথা ভুলিয়া যাই, এবং তাহাদিগের সহিত এরূপ বিশ্বস্তভাবে নিজের ভাব আচরণ করি যে, আমার অভিপ্রায়ের সাধুতা সম্বন্ধে তাহাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিলে, অবিলম্বেই তাহা বিদূরিত হয়।

"সপ্তম, ইতিপূর্ব্বে যে সকল মহাপুরুষ, ধর্ম্মপ্রচারক, ব্যবস্থাপক, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ মানবজাতির হিতের জন্য যে সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নির্ব্বাচিত নিয়ম আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অনুমোদন করি। বীর্য্যশালী, সাহসী ব্যক্তি ভগবানের প্রীতিভাজন হয়; আমিও বলবান, সাহসী ব্যক্তিদিগকে বিশেষ আদর করিয়া থাকি। আমি জ্ঞানী ও সাধু লোকের সহবাসে সময় অতিবাহিত করি, আমি সর্ব্বদা তাঁহাদের স্নেহ ও সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হই, আমার মঙ্গলের জন্য তাঁহারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহাতে আমার অনেক উপকার সাধিত হয়। আমি ছদ্মবেশ (ফকির) ও দরিদ্রদিগকে সর্ব্বদা আদর করিয়া থাকি, আমার দ্বারা উৎপীড়িত হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময়ই তাহারা আমার

অনুগ্রহভাজন হয়। আমার মন্ত্রিসভায় কোন অসৎপ্রকৃতি পরদ্রোহী লোকের প্রবেশাধিকার নাই, এবং সেরূপ লোকের পরামর্শানুসারেও আমি কোনও কার্য করি না; কাহারও প্রতি আমার বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিবার জন্য তাহারা যে সমস্ত নিন্দাবাদ ঘোষণা করে, আমি তৎপ্রতি কিছুমাত্র কর্ণপাত করি না।

"অধিক, প্রত্যেক কার্যেই আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত লিপ্ত করি, যে কোনও কর্তব্যই হউক না কেন, তাহা সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি সে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই না, কিম্বা বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করি না; আমি কথায় যাহা বলি, কার্যেও সেইরূপই করিয়া থাকি। কাহারও প্রতি অত্যাচরণ করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; প্রত্যেক কার্যেরই কর্মফল আছে, এবং সাধু কার্য করিলে, ভগবানের নিকট হইতে সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া, সদনুষ্ঠিত কার্যসংক্রান্ত কোন লোকের প্রতি আমি উৎপীড়ন করি না।

"আদিপুরুষ আদমের সময় হইতে মুহাম্মদ মহম্মদের সময় পর্যন্ত প্রাচীন রাজন্যবর্গের অনুষ্ঠিত ব্যবস্থা ও বিধানসমূহে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য, আমি পণ্ডিতগণের প্রতি ভার অর্পণ করিয়াছি। আমি সেই সমস্ত ব্যবস্থা ও বিধান অতি মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিয়াছি, এবং তাহা হইতেই আমি অতি উৎকৃষ্ট নিয়মগুলির সঙ্কলনবিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছি। আমি প্রাচীন রাজগণের ক্ষমতাবিলোপের কারণ অনুসন্ধান পূর্বক যে সকল কারণে রাজক্ষমতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা অবগত হইয়া, সেই সমস্ত কারণ দূরে পরিহার করিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি, নির্দয় ব্যবহারে ও উৎপীড়নে শুধু যে রাজগণের ভবিষ্যৎ গৌরবই বিনষ্ট হয়, তাহা নহে; তাহাতে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ এবং প্রজানাশও হইয়া থাকে, অতএব তাহা হইতে বিরত থাকাই বিধেয়।

"নবম, প্রজাসাধারণের অবস্থা আমার নিকট সুপরিজ্ঞাত, যে সকল প্রজা ধনাঢ্য এবং ক্ষমতাপন্ন, তাঁহাদিগকে আমি ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান করি, দরিদ্র প্রজাগণ আমার পুত্রতুল্য। বিভিন্ন দেশের অধিবাসিবর্গের রীতিনীতি ও চরিত্রবিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমি ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান লোকের সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করিয়াছি, এবং তাঁহাদের জন্য যে সকল শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছি, তাঁহারা তদ্দেশপ্রচলিত নিয়ম, রীতিনীতি ও সংস্কার অনুমোদন পূর্বক, বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন।

সেই সমস্ত দেশের অধিবাসিবর্গের বৈষয়িক অবস্থাও আমার অবিদিত নহে। আমার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সকল দেশেই তত্রত্য অধিবাসিবর্গের ও সৈন্য-সামন্তদিগের আচার ব্যবহার, কার্য্যপ্রণালী ও চরিত্রসম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য সংবাদ যথাসময়ে জ্ঞাপন করিবার জন্য, বুদ্ধিমান, সত্যপ্রিয়, কার্য্য-নিপুণ লোক নিযুক্ত করিয়াছি; কেহ মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করিলে আমি তাহাকে দণ্ডিত করি। শাসনবিভাগেই হউক, সৈন্যশ্রেণীতেই হউক, বা প্রজা-সাধারণের ভিতরই হউক, অবিচার কি অত্যাচারের কথা শুনিলেই আমি ন্যায়-সঙ্গত অপক্ষপাত বিচারে প্রবৃত্ত হই।

"দশম, তুর্ক, টাউচিক, আরব, আজম প্রভৃতি যে সকল জাতীয় লোক মৎসন্নিধানে আসিয়াছে, আমি তাহাদিগকেই আদর ও সম্মানের সহিত অভ্য-র্থনা করিয়াছি, তাহাদের অনুচরবর্গকেও পদোচিত সম্মান প্রদর্শনের ত্রুটী হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত সৎলোক, তাঁহাদিগের উপকার করিয়াছি, এবং যাহারা অসৎলোক, তাহারা মন্দপ্রকৃতির ফল পাইয়াছে।

"আমার প্রতি যাঁহারা অনুরক্ত, আমি তাঁহাদিগের অনুরাগের কথা বিস্মৃত হই না, এবং তাঁহাদের প্রতি সদয় ও মহৎ ব্যবহার করিয়া থাকি। যাঁহারা আমার উপকার করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের প্রত্যুপকার করি; যাহারা আমার শত্রুতাসাধন করিয়াও অবশেষে আমার কৃপাপ্রার্থী হইয়াছে, তাহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, দয়া ও সহৃদয়তাগুণে তাহাদিগের হৃদয় বশীভূত করিয়াছি।

"সেয়ার যাহারাম নামক একজন সেনাপতি আমার একজন সহকারী ছিলেন; একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার পক্ষ পরিত্যাগ ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রুসৈন্যের সহিত মিলিত হন, এবং আমারই বিরুদ্ধে অসিচালনা করেন। কিন্তু অবশেষে তিনি আশ্রয়লাভের জন্য আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া নতজানু হইয়া আমার ক্ষমা ভিক্ষা করেন, নানাবিধ দোষ সত্ত্বেও তিনি সদ্বংশ-সম্ভূত বীরপুরুষ এবং বহুদর্শী কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার এই সমস্ত গুণের জন্য, তাঁহার অন্য সকল দোষ ক্ষমা করিয়া, তাঁহাকে গৌরবজনক উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলাম।

"একাদশ, আমি আমার এই সম্পদের দিনে, অর্থ দ্বারা এবং অন্যান্য নানা উপায়ে, আমার সন্তানসন্ততি, আত্মীয়গণ, কর্ম্মচারী ও প্রতিবাসিবর্গের বহু উপকার সাধন করিয়াছি; আমার নিজ পরিবারবর্গের প্রতি আমি সর্ব্বদাই

সদয় ব্যবহার করিয়া থাকি, আমি কখনও আমার পরিবারস্থ কাহারও প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বা কাহাকেও শৃঙ্খলিত করিবার আদেশ প্রদান করি নাই।

"কাহারও সংসর্গে আসিতে হইলে, তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই স্থির করিয়া লই, এবং তদনুসারে কার্য করি। আমার জীবনে অনেক সুখ দুঃখ ঘটিয়াছে, সুতরাং আমি অনেক বিষয়েই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, এবং তদনুসারে সাবধান হইয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আমার শত্রুমিত্রবর্গের সহিত বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হই।

"স্বদেশ, শত্রুই হউন আর মিত্রই হউন, বীরপুরুষমাত্রই আমার শ্রদ্ধার পাত্র; সম্মানলাভের নিমিত্ত তাঁহারা জীবনের সমস্ত সুখশান্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুস্রোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দেন, এবং নির্ভীকচিত্তে প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব বিপদ আলিঙ্গন করেন।

"যাঁহারা আমার শত্রুতাসাধন করেন, আমার বিরুদ্ধে অসিধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রভুর পক্ষ সমর্থন করেন, শত্রু হইলেও তাঁহারা আমার সম্মানের পাত্র; এরূপ কোন বীরপুরুষ আমার সাহায্য গ্রহণ করিলে, তাঁহার সকল অবগত হইয়া তাঁহাকে কোন উপযুক্ত উচ্চপদে নিযুক্ত করি, এবং তাঁহার অনুরাগ ও বিশ্বস্ততা মূল্যবান বলিয়া মনে করি।

"আমার সহিত যখন তক্তমিস খাঁর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময় তক্তমিসের আমীরগণ তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আমার সহিত সন্ধিস্থাপনের অভিপ্রায়ে আমার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন; আমি ঘৃণার সহিত তাঁহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম; কারণ, তাঁহারা স্বামিধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া আমার পক্ষাবলম্বনের অভিপ্রায় করায় আমি বুঝিয়াছিলাম, তাঁহারা আত্মসম্মানজ্ঞান ও কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, যাহারা এক জনের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, সুবিধা পাইলে যে তাহারা অপরের নিকটও তাহা করিবে না, তাহার প্রমাণ কি?

"আমি বহুদর্শিতা দ্বারা বুঝিয়াছি, যে সাম্রাজ্য ধর্ম্ম ও নীতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত নহে, এবং যাহা ব্যবস্থা ও সুনীতি দ্বারা পরিচালিত না হয়, সে সাম্রাজ্য অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রভুত্ব, ক্ষমতা ও গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; সেরূপ সাম্রাজ্য উলঙ্গ মানবদেহের ন্যায়, যে সে দিকে দৃষ্টিপাত করে, লজ্জায় তাহারই চক্ষু নিমীলিত হয়। এরূপ সাম্রাজ্যকে অরক্ষিত নারী-

বিহীন অনাবৃত গৃহের সহিত অনায়াসেই তুলনা করা যাইতে পারে, সকলেই স্বেচ্ছামত সে গৃহে গমনাগমন করিতে পারে।

"এই জন্যই ইংরেজ ধর্ম্ম ও নীতির উপর আমার সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, এবং অতিপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও নিয়মসমূহের প্রতিষ্ঠা দ্বারা আমার শাসননীতির মূল দৃঢ় করিয়াছি। আমার রাজ্যশাসনসম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্যই এই সমস্ত ব্যবস্থা ও নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।"

তৈমুরের এই সমস্ত শাসননীতি পাঠ করিয়া, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে অত্যাচারী, শোণিতলোলুপ, হৃদয়হীন দস্যু বলিয়া মনে করিতে পারেন? এই সাম্য ও স্বাধীনতার যুগে, ইংরোপের কোন্ সুশিক্ষিত সম্রাট ইহা অপেক্ষা উন্নত এবং মঙ্গলকর নিয়মসমূহের দ্বারা আপন সাম্রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন? যথেচ্ছাচারী হইয়াও যে সম্রাট, ধর্ম্ম ও নীতির মস্তকে পদাঘাত না করিয়া, এই সমস্ত সুনিয়মে আপনার শাসনকার্য্য পরিচালন করেন, তিনি কতদূর ভক্তির পাত্র, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সিপাহীযুদ্ধের অবসানে ইংরেজগণ সিপাহীদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাই, কেহ সিপাহী জীবন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কাহারও গলদেশে প্রস্তরখণ্ড বাঁধিয়া তাহাকে নদীজলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, কাহারও বা জীবন্ত অবস্থায় শরীরের চর্ম্ম উন্মোচন করা হইয়াছে। ইহাতে কি প্রতিপন্ন হইবে যে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অতি অত্যাচারী এবং রক্তপিপাসু, তাঁহাদের কিছুমাত্র দয়ামায়া নাই? সেইরূপ, দুই একটি হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পাঠ করিয়া তৈমুরকে নরপিশাচ জ্ঞান করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কোনও রাজার দোষগুণ সমালোচনা করিতে হইলে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মাদি, তাঁহার শাসনকালে প্রজাসাধারণের অবস্থা ও উন্নতি অবনতি এবং রাজ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য; তাহা না করিয়া কেবল সেই রাজার চরিত্রগত কোনও দুর্ব্বলতা বা তাঁহার বিশেষ কোনও অভিপ্রায়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহার শাসননীতি আলোচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাতে কোনও সত্য আবিষ্কার করা দুরূহ হইয়া পড়ে, এবং আমাদের ইতিহাসপাঠের উদ্দেশ্যও বিফল হইয়া যায়।

বহুদর্শী, সুবিজ্ঞ তৈমুর নিজ তাঁহার ভবিষ্যৎবংশীয়দিগকে পরিচালিত করিবার জন্য, এই সমস্ত অনুশাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বংশধরগণও বিশেষ যত্নের সহিত তাহা পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু

চিরদিন সমান যায় না; তৈমুরবংশের যে ঘোর দুর্দ্দিনে বিশ্বাসঘাতক, ধূর্ত্ত আরঙ্গেব রাজ্যলালসায় উন্মত্ত হইয়া, সহোদরগণের হৃদয়শোণিতে ধরণীতল সিক্ত করিলেন, এবং তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন, সেই দিন তৈমুরের এই অনুশাসনলিপির সম্মান বিনষ্ট হইল, সেই দিন তাঁহার বংশধরের হস্ত হইতে এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড বিচ্যুত হইবার কারণ ঘটিল; তাহার পর, উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হইয়াও যখন আরঙ্গেব বিশ্বস্ত বন্ধুবর্গের প্রতি ঘোর অবিচার ও অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, ন্যায়ের পবিত্র নামে রাজ্যে শত শত অন্যায় কর্ম্মের সমর্থন করিতে লাগিলেন, এবং সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ প্রধান প্রধান অমাত্য ও রাজকর্ম্মচারিবর্গের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগকে অপমানিত করিলেন, সেই দিন হইতেই মোগল-সাম্রাজ্য লোপের সূত্রপাত হইল; তাঁহার প্রচণ্ড তেজ, অসীম অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধি এবং গভীর পাণ্ডিত্য, কিছুতেই তাঁহার পতনোন্মুখ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিল না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রধূমিত বিপ্লবাগ্নি প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং তাহাতেই সুন্দর মোগল সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া গেল; তৈমুরের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইল। মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতি, গৌরব এবং বিলাসের পরিচয়স্থল—সেই সমস্ত প্রাচীন প্রাসাদ, দুর্ভেদ্য দুর্গ, পাষাণ স্তূপের ন্যায় ভারতের বিক্ষুব্ধ অঙ্গে এখনও অবিকৃতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু হায়, সেই বিপুল পরাক্রম, রাজ্যের পরিমাণবৃদ্ধির জন্য সেই অবিশ্রাম শোণিতপ্রবাহ, ক্ষণিক মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য মনুষ্যের বিকর্ত্তন দিয়া সেই সমস্ত পৈশাচিক এবং কঠোর অনুষ্ঠান, আজ ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদের ন্যায় কালসাগরের অনন্ত বারিরাশিতে লীন হইয়াছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কবি কৃষ্ণরাম।

বঙ্গদেশের বড় দুর্ভাগ্য। আমরা দেশের লোক চিনি না। আমরা নীল, ষ্টার্ক, ওয়েবষ্টার, বোমণ্ট, ফ্লেচার, ডেবেনাণ্ট কারকুহার, কনগ্রীব, সাডওয়েল, টমসন, অর্ড উইহার, জন চলখিল, জন ফেবলাণ্ড প্রভৃতি পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম-

শ্রেণীর কবির কাব্য পাঠ করিয়া ও তাঁহাদের জীবনচরিত পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করি, অথচ আমাদের নিজের দেশের কবিদের কথা কিছুই জানি না। দেশের মধ্যে কয় জন লোক বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস, নরোত্তম দাস, যদুনন্দন দাস, চূড়ামণি দাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৈষ্ণব কবিগণের নাম অবগত আছেন? দুই চারি জন বরং বৈষ্ণব কবিগণের দুই পাঁচটি নাম জানিতে পারেন; কিন্তু অবৈষ্ণব কবিগণ, এদেশে চিরকালই বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন।

অবৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে, ভারতচন্দ্রের নাম বড় নাম। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজকবি ছিলেন। তাঁহার ভাষা অনুকরণের অতীত, ধীশক্তি প্রখর, এবং প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। বিদ্যাসুন্দর তাঁহার প্রধান কাব্য, তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ ও তাঁহার অমৃতভাণ্ড। কিন্তু, বিদ্যাসুন্দর তাঁহার নিজের নহে, ধার-করা জিনিস। ধারও আবার মূল সংস্কৃত হইতে নহে। মূল সংস্কৃত হইতে যিনিই বিদ্যাসুন্দর ধার-করা হন, তবে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে অন্য লোক তাহা ধার করিয়াছিল, তিনি ধার-করা জিনিস আবার ধার করিয়াছেন। যথেষ্ট সুদসমেত শোধ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু জিনিসটা ধারের ধার। তিনি কাহার নিকট বিদ্যাসুন্দরের গল্পটি গ্রহণ করিয়াছেন? রামপ্রসাদ সেনের নিকট নহে। কারণ, উভয়েই এককালের লোক,—প্রায় এক সময়েই বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, দুই জনেই আর এক জনের নিকট বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশে যে মাননীয় মহাপুরুষের নাম দৃষ্ট হইতেছে, তিনিই বাঙ্গলায় বিদ্যাসুন্দর প্রথম প্রচারিত করেন। কিন্তু তাঁহার নাম জানা যায় না। এখন এক প্রকার লোপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থও পাওয়া যায় না। তিনি কয় খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাও আমরা অভিকষ্টে দুই খানি সংগ্রহ করিয়াছি। তাই বাসনা, বাঙ্গলা সাহিত্যে যাঁহাদের অনুরাগ আছে, তাঁহাদের হস্তে কিছু উপহার দিই।

কৃষ্ণরামের কথা আমরা কেহ কিছু জানি না, অথচ তিনি আমাদের প্রতিবাসী ও বিশেষ আত্মীয়। কলিকাতা হইতে চারি ক্রোশের মধ্যে, বেলঘরিয়া ষ্টেসনের অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্বে, নিমিতায় কৃষ্ণরামের বাড়ী। তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখন কবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কারণ, এখনও নিমিতা গ্রামে দুই এক জন লোক কবি কৃষ্ণরামের নাম করে, এবং তাঁহার ভিটা দেখাইয়া দেয়। সে ভিটায় এক শত বৎসরেরও অধিক কাল কেহ বাস করে না, অথচ

প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন—উহা কৃষ্ণরামের ভিটা। কৃষ্ণরামের বংশ নাই, কিন্তু তিনি নিজে নিঃসন্তান ছিলেন কি না, কেহ বলিতে পারে না।

তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার উপাধি দাস। সুতরাং তিনি কুলীন ছিলেন না। মৌলিক কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভগবতী দাস। তাঁহার প্রণীত রায়মঙ্গল ও কালিকামঙ্গল গ্রন্থে আমরা পাঁচ বার এই কবিতাটি প্রাপ্ত হইয়াছি।

"নিমিতে গ্রামেতে বাস, নাম ভগবতি দাস,
কায়েস্থ কুলেতে উৎপত্তি।
হইয়ে একচিত্ত, রচিয়া রায়ের গীত,
কৃষ্ণরাম তাঁহার সন্ততি।"

কোথাও একটু আধটু পাঠ ভেদ থাকিলেও, পাঁচ জায়গাই ওই এক কথা। কবি মহাশয়ের ভিটা ৺ অক্ষয় কুমার দত্তের জামাতা মিত্রজ মহাশয়ের বাটীর অতি নিকটে অবস্থিত।

কৃষ্ণরাম কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং কোন সময়ে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে লোকের কৌতূহল হইতে পারে। আমরা তাঁহার প্রণীত কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের যে পুঁথি পাইয়াছি, তাহার শেষ ভাগে এই কয়টি কথা আছে,—

"ইতি সমাপ্ত। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ বাবুজির ইহা জানিবা স্বাক্ষর শ্রীআত্মারাম ঘোষ কায়েস্থ সাং কলিকাতা সুতানুটী চড়ক ডাঙ্গার পশ্চিম। ইতি সন ১১৫৯ সাল মাহ শ্রাবণ। ২৭ রোজ শুক্রবার। দিবসে সাঙ্গ হইল। ইহার দক্ষিণা এক জোড়া কাপড় আর দুই তঙ্কা আন্দা চ।"

শেষ তিনটি অক্ষর বড় অড়ানে। আত্মারামের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর। ঠিক মুক্তার মত, সমস্তই কাল কালীতে লেখা। কেবল দাঁড়িগুলি, হেডিংগুলি লাল কালীতে। এখন লেখাইতে গেলে ৪৲।৫৲ টাকা পড়িত, কিন্তু অমন সুন্দর লেখা এখন পাওয়া যায় না। মুদ্রাযন্ত্রের দৌরাত্ম্যে আর হাতের লেখার, বিশেষ নগণ্য বাঙ্গলা ভাষার হাতের লেখার, কিছুমাত্র আদর নাই।

আত্মারাম ঘোষ ১১৫৯ সালে কলিকাতায় বসিয়া গ্রন্থখানি নকল করেন। ১১৫৯ সাল ইংরাজী ১৭৫২।৫৩। তখনও বাঙ্গলা ইংরাজের হস্ত হয় নাই। পলাশীর যুদ্ধ হইতে ৪।৫ বৎসর বিলম্ব আছে। হলওয়েল সাহেব ছয় মাসের জন্য কোম্পানীর জমীদারীর ভার পাইয়া, "ব্ল্যাক জমীদার" গোবিন্দরাম মিত্রের সঙ্গে জমী-

দায়ীর হিনাব লইয়া গোল বাধাইয়াছেন। আর বর্গীরা উড়িষ্যার রাজস্ব ও বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ লইতে স্বীকার করিয়া, বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু তখন ভারতচন্দ্র কোথায়? তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ। প্রত্যহ একটি করিয়া কবিতা লিখিয়া রাজাকে শুনান ও মাসহারা খান। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর লেখা হইয়াছে কি? সকলেই জানেন, ১৬৭৪ শকে, অর্থাৎ ১৬৭৪+৭৮=১৭৫২ খৃষ্টাব্দ অব্দে, ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়, সুতরাং আত্মারাম যখন চড়কডাঙ্গায় বসিয়া কৃষ্ণরামের প্রসিদ্ধ কালিকামঙ্গল নকল করিতেছেন, তখনও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর শেষ হয় নাই।

কিন্তু কোন্ বৎসর যে কালিকামঙ্গল রচিত হয়, তাহার কিছু ঠিকানা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণরাম যখন "শিশু", তখন এক দিন তিনি খাসপুর পরগণার বড়িশা গ্রামে এক গোয়ালার গোয়াল-ঘরে নিদ্রিত আছেন, এমন সময় তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, এক প্রকাণ্ডকায় মহাপুরুষ বাঘের উপর সোয়ার হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"আমি দক্ষিণের রায়। আমার রাজত্ব আঠারভাটী। তুমি আমার মঙ্গলগীত গাও, আমি তোমার ভাল করিব। মাধব আচার্য্য আমার যে মঙ্গল রচনা করিয়াছে, তাহা আমার পছন্দ হয় না।" কবি কহিলেন, "আমি শিশু, আমি আপনার মহিমার কি জানিব?" তাহাতে রায় মহাশয় আপনার মাহাত্ম্যটা কীর্ত্তন করিয়া অন্তর্ধান হইলেন। এই স্থানে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

শুনহ সকল বীর অপূর্ব্ব কথন। আঠারভাটীর মধ্যে হইব প্রচার।
দেবতা হইল এই কবিতারচন। পূর্ব্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
খাসপুর পরগণা নামে মনোহর। সে লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য।
বড়িশা তাহার এক তপ বিখ্যাত (ত)। মসান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
তথায় গেলাম আজমাস সোমবারে। চাসা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোলঘরে। সেই গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন। অন্য গীত করাইয়া গায় আপন।
বাঘাসীন আরোহণ এক মহাজন। কালুটী নালুটী করে আর বহ্নি ভস্মি।
করে ধনুশের চাক সেই মহাকায়। পবন কৌতুকে শুনে মউল্যার লহ্নি।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়। তোমার কবিতা যায় মনে নাহি লাগে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার। সবংশে তাহারে তবে সংহারিবা বাঘে।"

স্বপ্ন দিয়া গীত লেখানটা দেবতাদের সাধারণ রোগ। অনেক পঞ্চম শ্রেণীর কবি স্বপ্নের দোহাই দিয়া হস্ত কণ্ডুয়ন সুখানুভব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রায়-

মহাশয়ের রোগটা কিছু বেশী। যে তোমার কবিতা পছন্দ না করিবে, তাহাকে সবংশে বাঘে খাইবে। আমার যদি কেহ এমন পাকাপাকি একরার দেয়,—নিশ্চয় বলিতেছি,—আমি ২০ ছত্রে কোরাটো কবিতা একদমসে লিখিয়া দিতে পারি। কেহ যদি না শুনে, তাহাকে সবংশে বাঘে খাইবে। সুতরাং, পাঠক ও শ্রোতারও অভাব হইবে না।

এইরূপে কৃষ্ণরামের কবিত্বশক্তির সূত্রপাত হইল। কবি বলিতেছেন, তখন আমি অতিশিশু। কত শিশু, তাহা জানি না। নিমিতে হইতে বড়িস্যা যাইয়া গোয়ালার ঘরে বাসা করিয়া আছেন, নিতান্ত শিশু না হওয়াই সম্ভাবনা। আমরা বছর ২০ বয়স ধরিয়া লইব।

সেটা কোন বৎসর কবি বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণরাম বিরচিল বাঘের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতুচন্দ্র শকের বৎসর।"

"রলয়োরভেদঃ", এই সূত্র অনুসারে এখানে "ল" ও "র" এ মিল হইয়াছে। এখন বসুশূন্য ঋতুচন্দ্র, ৮০৬১; অঙ্কস্য বামা গতিঃ; সুতরাং, ১৬০৮ হইল। ১৬০৮ শকে ১৬০৮+৭৮=১৬৮৬ খৃষ্টীয় অব্দ হইল। রায়মঙ্গলে দুই জায়গায় কবি এই বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং, আরঙ্গজীবের রাজত্বকালে, যে বৎসর ইংরাজেরা হুগলী হইতে তাড়িত হন, তাহার পূর্ব্ব বৎসরে, শিবজীর মৃত্যুর ৫ বৎসর পরে, কবি কৃষ্ণরাম স্বপ্নাদেশ মত রায়মঙ্গল লিখিয়া আপন কবিত্ব-খ্যাতির সূত্রপাত করেন।

তাঁহার কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর ইহার পরে রচিত। কারণ, ও বই খানি নেহাত শিশুর লেখা নহে। আর উহাতে একটি কথা আছে, তাহাতেও কিছু দিন পরে গ্রন্থরচনা হয়, বলিয়া অনুমান হয়। কারণ, বন্দনার শেষভাগে কবি লিখিতেছেন,—

"ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীর অপরূপ বাস।
কলিকাতা বসিনু নির্মিতা জনরাব।"

কলিকাতা অনেক দিনের জায়গা, তাহার সন্দেহ নাই। ১৪৯৫ সালে বিপ্রদাস কবি উহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তখন কলিকাতা বন্দনার যোগ্য নহে। ইংরাজের কুঠী হওয়ার পর হইতেই উহা বন্দনার যোগ্য হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ১৬৯৮ সালে কলিকাতায় ইংরাজ সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। ঐ সালে পুরাতন দুর্গটি নির্ম্মাণ হয় ও কলিকাতা সহর হয়।

১৬৮৬ সালে রায়মঙ্গল লিখিয়া, ১৬৯৮ সালের পর কালিকামঙ্গল লেখা কিছুই বিচিত্র নহে। যেরূপেই হউক, কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের অপেক্ষা, অন্ততঃ ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যত দূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, বিদ্যাসুন্দর গত শতাব্দীতে চারি বার বাঙ্গালা ভাষায়, ও একবার উর্দ্দুতে রচিত হয়। বাঙ্গালার প্রথম লেখা কৃষ্ণরামের, দ্বিতীয় রামপ্রসাদের; তৃতীয়, ভারতচন্দ্রের; চতুর্থ, পূর্ব্ববাঙ্গলার কবি প্রাণরামের। প্রাণরাম তাঁহার গ্রন্থে এই কয়টি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। উহা হইতে বিদ্যাসুন্দরের গ্রন্থকর্ত্তা কে কে, তাহা জানা যায়।

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিলা কৃষ্ণরাম মিমিঠা যাঁর বাস।
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর লেখা নাই।
পশ্চাতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপন্যাস প্রসঙ্গের ছলে।

প্রাণরামের মূল গ্রন্থ আমরা আজিও দেখি নাই। বঙ্গ সাহিত্যের ভাবী ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়, এই কবিতা কয়টি আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোর শাক্ত ও ঘোর চৈতন্যদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার পারিষদ ভারতচন্দ্রও শাক্ত ছিলেন। রামপ্রসাদ শাক্তভক্তিতে সিদ্ধ হইয়া মূর্ত্তিকে ভক্তির দাসী বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কালীমহিমাখ্যাপনের জন্য বিদ্যাসুন্দর লিখিতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণরাম কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন? এবং তিনি কালিকামঙ্গল লিখেন কেন? এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা অত্যন্ত কঠিন।

কালিকামঙ্গলে একটি সুদীর্ঘ বন্দনা আছে। তাহাতে গণেশ, সরস্বতী, কালী, কৃষ্ণরাধা, চৈতন্য নিত্যানন্দ এবং মহাদেবের বর্ণনা আছে। অন্য দেবতার বন্দনা যতই থাকুক, চৈতন্যনিত্যানন্দের বন্দনাটি কিছু গোবরটা করিয়া লিখিত হইয়াছে,—

"নবদ্বীপে চৈতন্য গোসাই অবতার।"
"নিত্যানন্দ ঠাকুর অপার পারিসার।
বন্দিনু পবন ভক্ত সকলের পায়।"
"যথায় কীর্ত্তন হয় চৈতন্য-চরিত্র।
বৈকুণ্ঠ সমান যায় পবন পবিত্র।

তাহে গড়াগড়ি দেব (দেবী) প্রেমে নৃত্য করে।
জীবন সুকৃত তার যত দেহ ধরে।
হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত।
তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত।
শ্রীকৃষ্ণ-স্তব শ্রবণে পুলক যেবা হয়।
তাঁরে জানাম বলি বেদ মিথ্যা নয়।"

উপরি উক্ত কবিতাটি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কৃষ্ণরাম চৈতন্যমতাবলম্বী ছিলেন। তবে তিনি কালিকামঙ্গল লিখেন কেন? যাহারা বিষপত্রকে তেকড়কার পাতা বলে, জবা ফুলকে ওড় পুষ্প বলে, "কাটাকে" "বানান" বলে, যাহারা দুর্গানাম শুনিলে কাণে হাত দেয়, তাহাদের মধ্যে একজন যে কালিকামঙ্গল লিখিবে, ইহা আপাততঃ বড়ই বিচিত্র বোধ হয়।

কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্য পড়িয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। ত্রিবেণীনিবাসী পরাশরের পুত্র মাধবাচার্য্য চৈতন্যমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার প্রধান পুস্তক ভাগবতসার। কিন্তু কীর্ত্তন করা তাঁহার ব্যবসায় ছিল। তিনি সকল দেবতার কীর্ত্তন লিখিতেন। তাঁহার রচিত দুর্গা-মাহাত্ম্য বা চণ্ডীর গান, অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আর এই রায়মঙ্গল পাঠে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, তিনি দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য, ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করেন, আর ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া, কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। অনুমান হয়, কীর্ত্তন ব্যবসায়ীরা সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন। তবে, ব্যবসায়ের খাতিরে তাঁহারা অবৈষ্ণব গ্রন্থও রচনা করিতেন, এবং গানও করিতেন।

একটি নূতন কথা আছে। কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যা আছে, সুন্দর আছে, কালীস্তব আছে, চোরপঞ্চাশতের কবিতা আছে, মশান আছে, কালী আছেন। বীরসিংহ আছেন, গুণসিন্ধু আছেন, নাই কেবল বর্দ্ধমান। বর্দ্ধমানের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরঘটিত কলঙ্কের যোগাযোগ কুটিল, মুখুটীবংশীয় ভারত-চন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত। ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি এই উপাধিতে বিভূষিত আছেন। মুখুর্য্যেরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বড়ই কুটিল। কথাই আছে, "মুখুটী কুটিল বড় বন্দ্যঘাটী সাধা।" এ কবিতা আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। ভারত জাতিতে মুখুর্য্যে, তাহাতে বর্দ্ধমানরাজ

তাহার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত করেন, এবং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। সুতরাং তাহার রাগ বাড়িয়া যায়, তাই বিদ্যাসুন্দরের কেলেঙ্কারী বর্দ্ধমানরাজের ঘাড়ে চাপাইয়া ভারত তাহার অনেকটা প্রতিশোধ লইলেন। বর্দ্ধমানরাজ যে ভারত-চন্দ্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা যে নিশ্চয়ই বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল, এ ধারণা অনেকেরই আছে। এবং এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই পূজ্যপাদ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় মালিনীর বাটী অন্বেষণার্থে বর্দ্ধমান সহরে অনেক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সুযোগ দিয়া এখনও রাজবাটী যাওয়া যায় কি না, দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ভারতচন্দ্রের বর্দ্ধমানরাজের উপর ক্রোধ ছিল না। সুতরাং, তিনি আর বর্দ্ধমান লইয়া তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ-সূচনা এই:—

শ্রীযুত মাতা আসবে হও অধিষ্ঠান।
সুখায় সুন্দর নাম বাজাব মদন।
পূজিলা পবনদেবী কবিল গমন।
যশার শিবার কথা সত্য মনে লয়।
পাইবে রমণীমণি আনন্দ হৃদয়ে।
ভ্রমকেরে না বলিল না জানে জননী।
এবাকী করিল গতি কবি-শিরোমণি।
অবপত্র যুকত বিচিত্র ছত্র ধরি।
দিব্যবস্ত্র ভূষণ ঝিজেরে দান করি।
বসি পণ্ডিতের বেশে প্রতাপের পুত্র।
সাবরা সহায়ে আর বীরসিংহপুর।
ছাড়াইল নিজরাজ্য চলি তিন দিন।
সম্মুখে অবণ্য ঘোর দেখে লাগে ভয়।
বরাহ মহিষ বাঘ তাহাতে সকল।
ভব পাইবা ভাবে কালীচরণ-কমল।
শিবে মণি জলে ফণি বেড়ায় চরিয়া।
পাইলে গণ্ডার চণ্ড শিঙ্গরে ধরিয়া।
যেই দিকে চাহে কবি সেই দিকে বন।
ফিরিয়া না যায় মনে করিয়াছি পণ।
প্রবেশে অবণ্য মাঝে ভাবিয়া সাজন্যা।
শঙ্কটে তারিয়া লও হরের প্রবধূ।
ব্যাঘ্র আদি দেখিয়া ফিরিয়া যাহি চায়।
পশ্চাতে করিল বন তবে পথ পায়।
চলিতে না পারে আর ক্ষুধায় আকুল।
বন্যস্থান দেখিয়া করিল তরুতল।
অকস্মাৎ পাইল দিব্য নানা উপহার।
দেবযোগ্য মনোহর কি বলিব আর।
সকলি দেবীর মায়া জ্ঞান সর্ব্বজন।
কত রঙ্গ করেন বুঝিতে তার মন।
হেনকালে সম্মুখে দেখিল ঘোর নদী।
কূল নাহি তরঙ্গ যেমন নিরবধি।
ফেণে ভাসে ফেণে ডুবে হাঙ্গর কুম্ভীর।
নাহিক কাণ্ডারী তরি বড়ই গভীর।
নাবিব হইতে পার দাঁড়াইল সাধি।
বুঝান না যায় বাতা চরিত্র তোমার।
আপনি কহিলা পথে ঘোরও দুঃখ নবে।
সম্মুখ সমুদ্র ঘোর কি উপায় হবে।
ফিরিয়া সঘনে যাই হেন মনে লয়।
সবে দুঃখ তোমার বচন মিথ্যা হয়।
বলিতে বলিতে কবি জলকূল ঘোর।

মহাযোগী একজন আইল সম্মুখে।
মৃগচর্ম্ম পরিধান ভস্মাবৃত তনু।
যোগবন্ধ-কিবণ তপন যেন ভানু।
সুন্দরেরে বলে তবে রাজার বন্দন।
যদি মনে লয় তব আমার বচন।
কালীমন্ত্র জপ তুমি না করিও আর।
করিতে না পাবেন তিনি সঙ্কটে উদ্ধার।
মহেশের মন্ত্র আসি লহ মোর ঠাঁই।
যাহার সমান আর ত্রিভ লোকে নাই।
যোগবলে যাহা চাহ নিকটে মিলিবে।
এ পাঁচ মাসের পথ এক দণ্ডে যাবে।
শুনিয়া সুন্দর বলে তুমি গুরু জন।
সহনে না যায় মোর তোমার বচন।
হরমৌরী এক অঙ্গ দেবপরমাণ।
ইহাতে কবিলে ভেদ রৌরবে হয় স্থান।
যোগী মহাশয় তুমি জগৎ পূজিত।
শিব শিবা ভেদ কব নহে ত উচিত।
কিবিয়া সুন্দর দেখে যোগী নাহি তথা।
যুচিল মায়ার মতী অপরূপ কথা।

হইল আকাশবাণী শুন কবিবর।
কুতূহলে যাহ বীরসিংহের নগর।
পাইয়া প্রসাদপুষ্প আনন্দ-হৃদয়।
গমন করিল তপস্বিনীর তনয়।
পঞ্চমাসের পথ বীরসিংহের দেশ।
দশম দিবসে গিয়া করিল প্রবেশ।
অমরাবতীর তুল্য মনোহর স্থান।
বর্ণনি বর্ণিতে নাহি যাহার সমান।
নৃত্য-গীত আনন্দিত বত প্রজালোক।
অকাল-মরণ নাহি নাহি দুঃখ শোক।
নৃপতি উত্তম দাতা নাহি অবিচার।
চাঁদেরে মলিন কৈল যশেতে যাহার।
বাহুবলে অধিকার করিল অনেক।
অধিকার ধরাতলে কহিব কতেক।
কমলার দয়া ভাবে কভু নাহি টুটে।
নৃপতি ভকত সদা ভাবে কবপুটে।
কবি কৃষ্ণরাম বলে কালীপদযুগ।
দেখিয়া সুন্দর দেশ সুন্দরের সুখ।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিবিধ। (পূর্ব্ব)

দোলের উপলক্ষে নানা দেশে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের প্রথা আছে। কাশ্মীরে রাজদরবারে হোলির সময় আমোদ কিছু নূতন রকম। দোলের পূর্ব্ব হইতে কয় দিন হোলির দরবার বসে। সকলে পরস্পরের গাত্রে পিচকারি ও কুঙ্কুম দেয়। ফাল্গুন মাসে মহারাজা জম্মুনগরীতে থাকেন। দোলের শেষ দিন পারিষদ ও কর্ম্মচারীগণে পরিবৃত হইয়া, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, মহারাজা রাজমন্দিরে গমন করেন। প্রথম হস্তিপৃষ্ঠে মহারাজা একাকী থাকেন। অপর হস্তিপৃষ্ঠে আর সকলে আরোহণ করে। প্রজাগণ আসাদ-

বৃদ্ধ-বনিতা মিলিয়া, গবাক্ষে ও ছাদে দাঁড়াইয়া, রাজদর্শন করে। মন্দিরে যাইবার পথে কেহ কিছু বলে না। ফিরিয়া আসিবার সময় বড় রঙ্গ হয়। মহারাজের এক জন ভৃত্য মহারাজের মস্তকের উপর এক খণ্ড বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে, প্রজাগণ তাহার উপর কাক্ নিক্ষেপ করে। কর্ম্মচারীগণ উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করে, কিন্তু তাহাদের উপর অত্যাচার কিছু বেশী হয়। কাকের সহিত কর্দ্দম, জুতা ও অন্যান্য সামগ্রী নিক্ষিপ্ত হয়। প্রতিশোধেরও এই এক উত্তম সময়। কোন কারণে কোন কর্ম্মচারীর প্রতি যদি কাহারও রাগ থাকে, তাহা হইলে সে রাগ তুলিবার এই উত্তম অবসর। জুতার ঘা যখন জোরে পড়িল, কিম্বা কর্দ্দমের ভার বেশী হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, রঙ্গের অপেক্ষা রাগের ভাগ বেশী। অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়, কোন ব্যক্তি কোন কর্ম্মচারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার অসাক্ষাতে বলে, "এইবার হোলির সময় ইহার শোধ তুলিব।"

খৃষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থে নোয়ার নৌকা (Noah's Ark) সম্বন্ধে যেমন উপকথা আছে, হিন্দুর পুরাণেও অবিকল সেইরূপ একটি গল্প আছে। মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ে সেই আখ্যায়িকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, বৈবস্বত মনু—পাঠক মনু এবং নোয়া নামের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবেন—চাক্ষুষী নদীতীরে তপস্যা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি মৎস্য আসিয়া তাঁহাকে বলিল, বৃহৎ মৎস্য আমাকে ভক্ষণ করিবে, সেই ভয়ে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। মুনি তৎক্ষণাৎ মৎস্যকে গ্রহণ করিয়া অলিন্দরে নিক্ষেপ করিলেন। কিছু দিনে মৎস্য বর্দ্ধিত হইয়া কহিল, অলিন্দরে আমার স্থান হইতেছে না, আমাকে অন্যত্র স্থান দিন। মুনি তাহাকে লইয়া বৃহৎ বাপীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। কয়েক বৎসর মধ্যে সেখানেও মৎস্যের স্থান পর্য্যাপ্ত হইল না; তখন তাহার কথামত মুনি তাহাকে গঙ্গায় রক্ষা করিলেন। পরিশেষে মৎস্যের আকার অত্যন্ত বৃহৎ হওয়াতে, তাহার অনুরোধানুসারে, তাহাকে সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মৎস্য কহিল, আপনি আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, আমিও আপনার তদনুরূপ প্রত্যুপকার করিব। প্রলয়ের সময় সমাগত হইয়াছে, এই বিশ্ব শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। আপনি দৃঢ় নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া, সপ্তর্ষিগণের সহিত শস্যবীজ সঙ্গে লইয়া, সেই নৌকায় আরোহণ করুন। কিছুকাল পরে আমি শৃঙ্গসম্পন্ন হইয়া, আপ-

বুদ্ধি, সতর্কতা, আত্মরক্ষার চেষ্টা সকল জাতিতে, সকল সময় সমভাবে প্রবল থাকিলে, অপূর্ব্ব শৌর্য্যবীর্য্য, স্বার্থত্যাগ ও মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠার পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যাইত না। কিন্তু এমন হতভাগ্য জাতি জগতে অতি বিরল, যাহাদিগের মধ্যে এরূপ ইতিহাস বা কিম্বদন্তী প্রচলিত নাই, অথবা যাহারা এরূপ ঘটনা গৌরবের বিষয় বিবেচনা করে না। ইয়োরোপে, ভারতবর্ষে প্রধানতঃ এইরূপ ঘটনা লইয়াই ইতিহাস, কাব্য, রচিত হয়। জাপানের ইতিহাস হইতে নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি সংগৃহীত হইল। নামগুলি অতি বিকট ও দীর্ঘ, এজন্য সংক্ষেপে লিখিত হইল। তাইকুনদিগের রাজ্যকালে, আসানো-নামক এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয় পুরুষ ছিলেন। কোট্সুকে নামক আর এক ব্যক্তির রাজদরবারে অত্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল। আসানো এক দিবস কোট্সুকে কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া, অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহার প্রতি স্বীয় কটিস্থিত ছুরিকা নিক্ষেপ করেন। কোট্সুকের অধিক আঘাত লাগিল না, সামান্য ক্ষত হইল। কিন্তু কোট্সুকে তাইকুনের নিকট অভিযোগ করিয়া, আসানোর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করাইল। যে দণ্ড হইল, তাহার নাম হরকিরি। অপরাধীকে স্বহস্তে ছুরিকা লইয়া আত্মহত্যা করিতে হয়। এ দণ্ডে অপমান ছিল না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জন্য এই দণ্ড নির্দ্দিষ্ট ছিল। আসানো হাস্যমুখে সেই আজ্ঞা স্বীকার করিয়া আত্মঘাতী হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার সমুদয় বিষয়সম্পত্তি তাইকুনের কর্ম্মচারীগণ রাজকোষভুক্ত করিল। কুরাণোসুকে আসানোর প্রধান কর্ম্মচারী। প্রভুর মৃত্যুর পর, সে শপথ করিল, আসানোর হত্যার প্রতিশোধ লইবে। কুরাণোসুকে, তাহার পুত্র, এবং আসানোর অপর পঁয়তাল্লিশ জন ভৃত্য, এই শপথ গ্রহণ করিয়া 'রোনীন' হইল। জাপানী ভাষায় রোনীন শব্দের অর্থ তরঙ্গ-মনুষ্য, অর্থাৎ যে সংসারতরঙ্গে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া, অদৃষ্টবাদী হইয়া, তরঙ্গে আহত প্রতিহত হইয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করে। কোট্সুকে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, তয়ে প্রহরীসংখ্যা বর্দ্ধিত করিল, বহুসংখ্যক সশস্ত্র অনুচরবর্গে পরিবৃত না হইয়া গৃহের বাহিরে গমন করিত না। কুরাণোসুকে ও অন্যান্য রোনীনগণ গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইল। অনেক দিন তাহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। অবশেষে কোট্সুকের চরেরা আসিয়া সংবাদ দিল যে, কুরাণোসুকে শপথ বিস্মৃত হইয়া অহোরাত্র সুরাপানে ও অন্যান্য দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। ক্রমে সংবাদ আসিল যে, তাহার অবস্থা দিন দিন আরও মন্দ হইতেছে, প্রায় সর্ব্বদাই অচৈতন্য, আহারের

সংস্থান নাই, পথে লোকে তাহাকে গালি দেয়, অপমান করে। সে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য অপদার্থ হইয়া গিয়াছে, তাহার মৃত্যুরও বোধ হয় অধিক দিন বিলম্ব নাই। এই সকল কথা শুনিয়া, কোট্‌সুকে ক্রমশঃ আশ্বস্ত হইল। পূর্ব্বের মত সর্ব্বদা সশঙ্কিত সতর্ক থাকিত না, প্রহরীর সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া গেল। কুরাণোসুকে ইহাই চায়। অধঃপাতে যাইবার ছলনা কৌশলমাত্র। কোট্‌সুকে বিশ্বস্ত হইয়াছে দেখিয়া, পূর্ব্ব সঙ্কেত মত সাতচল্লিশ জন রোণানী এক রাত্রে কোট্‌সুকের গৃহ আক্রমণ করিল। সেই বহুকাল ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রদিগকে কাহার সাধ্য রোধ করে? প্রহরীগণ সকলে নিহত হইল। ভীত কম্পিত কোট্‌সুকে শয়নমন্দিরে ধৃত হইল। কুরাণোসুকে আত্মপরিচয় দিয়া, কোট্‌সুকের হস্তে শাণিত ছুরিকা দিয়া কহিল, "মহাশয়, আপনি শ্রেষ্ঠবংশসম্ভূত, নীচজাতি চোরের ন্যায় মৃত্যু আপনার শোভা পায় না। আত্মহস্তে হরকিরি গ্রহণ করুন। বীর-পুরুষের ন্যায় মৃত্যুকে আহ্বান করুন।" কোট্‌সুকে ছুরিকা দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তখন কুরাণোসুকে তাহার কেশ গ্রহণ করিয়া, খড়্গাঘাতে তাহার শিরশ্ছেদন করিল। সেই মুণ্ড লইয়া রোণানীগণ চলিয়া গেল। আসানোর সমাধিমন্দির সে স্থান হইতে অধিক দূর নহে। প্রতিদিন প্রভাতে ধর্ম্ম-যাজক সেই মন্দিরে পূজার জন্য আগমন করে। প্রভাতে আসিয়া দেখিল, রোণানীগণ ধূলিধূসরিত শোণিতাক্ত কলেবরে দ্বারের সম্মুখে প্রণত রহিয়াছে। ধর্ম্মযাজককে দেখিয়া, কুরাণোসুকে উঠিয়া তাঁহার হস্তে কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া কহিল, "আমাদের কাছে যাহা ছিল, আপনি গ্রহণ করুন। আর কিছু আমাদের কাছে নাই। আপনি মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করুন, আমরা পুণ্য-শ্লোক আসানোর সমাধি দর্শন করিতে আসিয়াছি।" ধর্ম্মযাজক দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া, এই অত্যাশ্চর্য্য সংবাদ অপর লোকদিগকে জানাইতে গেল। সকলে আসিয়া দেখে, কোট্‌সুকের ছিন্ন মুণ্ড আসানোর সমাধিতলে পড়িয়া রহিয়াছে। রোণানীগণ চারি দিকে পতিত রহিয়াছে। সকলের বক্ষে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ—সকলে আত্মহত্যা করিয়াছে, সকলে হরকিরি গ্রহণ করিয়াছে। সেই স্থলেই সকলের ভিন্ন ভিন্ন সমাধি হইল। ইতিহাসে, কাব্যে, গাথায়, গল্পে, তাহাদিগের অক্ষয় কীর্ত্তি রহিয়াছে। সেই সমাধিস্থল জাপানে সর্ব্ব-লোকপূজ্য শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান।

বাঙ্গালীর কি অভাব ?

বাঙ্গালী লিখিতে দক্ষ, বলিতে পটু, তর্কে তৎপর—বাঙ্গালীর অভাব কি ? বাঙ্গালীর মত কে বক্তৃতা করিতে পারে, বাঙ্গালীর মত শাণিত কলম কাহার, বাঙ্গালীর মত পরীক্ষায় কে উত্তীর্ণ হইতে পারে ? তবে বাঙ্গালীর অভাব কি ? যদি বল বাঙ্গালীর বাহুবলের অভাব, তাহা হইলে বাঙ্গালী প্রমাণ করিয়া দেখাইবে যে, বাহুবলের অপেক্ষা বাক্যবল বড়, কেবল বাহুবলে কিছু হয় না। আধিকালিকার দিনে বাহুবলে কিছুই হয় না, যুদ্ধ হইতে মরদাপেষণ পর্য্যন্ত কলে কৌশলে সম্পন্ন হইতেছে। এমন দেখা যাইতেছে যে, কোন বলবান জাতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতির অধীনে বাস করিতেছে। বুদ্ধি, কৌশল, অধ্যবসায় হইতেই বল উৎপন্ন হয় ; বস্তুতঃ, বাহুবল অতি সামান্য বল। এক মাত্র বাহুবলের প্রাধান্য থাকিলে হস্তী, অশ্ব, বলদ, উষ্ট্র, এমন কি, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত মনুষ্যের দাসত্ব করিত না, ব্যাঘ্রের ভক্ষ্য হইয়া মনুষ্য ব্যাঘ্রকে এত সহজে সংহার করিতে পারিত না। পৌরাণিক কালেও এই কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, দেবতা বাহুবলে সকলেই মনুষ্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সংগ্রামে প্রায়ই মনুষ্যের জয় হইত। পুরাণ অথবা কাব্যলেখক মনুষ্য বলিয়াই যে সর্ব্বদা এরূপ ঘটিয়াছে, এরূপ সন্দেহ করা ক্ষুদ্র মনের পরিচয় মাত্র। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, বাঙ্গালীর বাহুবলের অভাব, ক্ষোভের অথবা নিরাশার কারণ নহে। এবং বলিব যে নিতান্ত অভাব, এ কথাও নিতান্ত প্রমাণিত হয় নাই।

বাক্যবল বলিতে সহজে যে অর্থ বুঝায়, যদি সেই বল, জাতীয় বলের মানদণ্ড হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালীর তুল্য বলবান জাতি পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যাইত না। বক্তৃতা ও তর্কের প্রবাহে আর সকল জাতি এত দিনে ভাসিয়া গিয়া সমুদ্রে পতিত হইত। বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী, বাঙ্গালী সকল তর্কে পারঙ্গম। বাঙ্গালীর অভাব কি ?

বাঙ্গালীর অর্থের অভাব, এ কথা তেমন কাজের নহে। অর্থের অভাব, কালে, অবস্থাবিশেষে মোচন হইতে পারে। বিত্তশালী জাতিমাত্রেরই কোন কালে ধনের অভাব থাকে। মার্কিন জাতি ব্যতীত, বোধ হয়, ইংরাজের অপেক্ষা

ধনী জাতি এ সমস্ত জগতে নাই, কিন্তু ইংরাজও এককালে নির্ধন ছিল। সুতরাং, অর্থাভাব নিত্য অভাবের মধ্যে গণ্য করা যায় না।

বাহুবলের অভাবও নিত্য অভাব নহে। বাঙ্গালী এখন যেমন দুর্ব্বল, চিরকাল এইরূপ দুর্ব্বল ছিল না। অধিক দিনের কথা নহে, যখন দেশে একপ্রকার অরাজকতা ছিল, বর্ত্তমান কালের মত শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই, সর্ব্বদাই চোর ডাকাইতের ভয়, রাজার সাহায্য না পাইয়া লোকে নিজের বিষয়সম্পত্তি নিজে রক্ষা করিত, তখন বাঙ্গালী এত দুর্ব্বল ছিল না। বাঙ্গালী লাঠী খেলিতে জানিত, তরবারি চালনা করিতে জানিত, বাড়ীতে ডাকাইত পড়িলে স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত অস্ত্রধারণ করিত। এখন চোর ডাকাইতের তেমন ভয় নাই, আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলেরও তেমন প্রয়োজন নাই। তাহার উপর রোগের প্রাদুর্ভাব, অপোগণ্ডের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে আমরা আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। আমার রাজার আদেশে আমরা নিরস্ত্র। যে জাতি গৃহে অস্ত্র রাখিলে রাজদণ্ডার্হ হয়, সে জাতি যে পুরুষানুক্রমে দুর্ব্বল ও বাহুবলশূন্য হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি ?

অভাব দুই প্রকারের, এক অবস্থাভেদে, আর এক প্রকৃতিগত। প্রথম প্রকারের অভাব অবস্থার পরিবর্ত্তনে পূর্ণ হইতে পারে, দ্বিতীয়ের মোচন হওয়া কঠিন। আমাদিগের যদি দ্বিতীয় প্রকার কোন অভাব থাকে, তাহা হইলেই চিন্তার কারণ। বাঙ্গালীর চরিত্রে এই দ্বিতীয় প্রকারের একটি গুরুতর অভাব আছে। সে অভাবের উল্লেখও সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্থিরচিত্তে সে বিষয়ে আমরা কয় জন ভাবিয়া থাকি ? অনেকেই বলিয়া থাকে, আমাদের মধ্যে জাতীয় একতার অত্যন্ত অভাব; কিন্তু এই অভাবের ফল কত বিষময়, সেটা সকলে ভাবিয়া দেখে না কেন ? বাঙ্গালীর আর সব আছে, বুদ্ধি আছে, কার্য্যতৎপরতা আছে, আত্মোন্নতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত আছে, কিন্তু কোন একটা কাজ দশ জনে মিলিয়া করিবার বুদ্ধি নাই। এই এক অভাবে বাঙ্গালীর কোন অভাবই পূরিল না।

যেখানে বাঙ্গালী, সেইখানেই এই অভাব। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। তিন জন বাঙ্গালী বিদেশে বাস করেন। এক জন মাসে তিন হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন, আর এক জন পাঁচ শত টাকা, আর এক জন দুই শত টাকা। আরও হয় ত দুই চারি জন বাঙ্গালী আছে, তাহারা যৎসামান্য উপার্জ্জন করে। যে তিন জন প্রধান ব্যক্তি, তাহারা সকলেই বুদ্ধিমান, আপন আপন

কর্ম্মে পটু, লেখাপড়া তিন জনেই এক রকম শিখিয়াছে। তিন জনে দেখা শুনা নাই এমন নয়, কিন্তু প্রায়ই ঘটে না। কখন নিমন্ত্রণ হইল, কখন তাস খেলার আড্ডা বসিল, সেই সূত্রে যাহা দেখা। প্রত্যেক ব্যক্তির মনের ভাব এই রকম যে, নিজের কর্ম্ম করিতেছে, আর কাহারও অন্য বিশেষ ভাবনা কি? এ দিকে মর্য্যাদাজ্ঞান বড় প্রবল। যিনি তিন হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন, তিনি মনে করেন, যে পাঁচ শত টাকা পায়, সে আমার বাড়ী দুই বার আসিয়াছে বলিয়া কি তাহার বাড়ী যাইতে হইবে? আর দুই চারি বার আসুক, তখন দেখা যাইবে। যে পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জন করে, সে মনে করে, আমি উঁহার বাড়ী দুই বার গিয়াছি, উনি আমার বাড়ী একবার না আসিলে আমি যাইব কেন? উনি তিন হাজার টাকা না হয় পান, আমি পাঁচ শত টাকা পাই। যে বেশী টাকা পায় তাহার ঘরে আছে, আমার তাহাতে কি? যে মাসে দুই টাকা পায়, তাহারও মনের ভাব ঐরূপ। তিন জনের মধ্যে এক জনও ভাবে না যে, এমন কোন কর্ম্ম আছে যে তিন জনে মিলিয়া করিতে হইবে, যে তিন হাজার টাকা পায়, সেও একা করিতে পারে না, যে দুই শত টাকা পায়, সেও একা করিতে পারে না; অথচ সেই কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে তিন জনেরই সমান মঙ্গল।

মিলিয়া কেমন করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়, কেহ জানে না, কিন্তু বিবাদ করিয়া কিরূপে কর্ম্ম করিতে হয়, বিলক্ষণ জানে। যাহারা বৎসামান্য উপার্জ্জন করে, বিবাদের বেলা তাহারাও অগ্রসর। এই জন্য যেখানে বাঙ্গালী, সেইখানে দলাদলি। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, দলাদলির উৎসাহ না থাকিলে বাঙ্গালী হাঁপাইয়া মরিয়া যাইত।

মিলিয়া কর্ম্ম করিতে পারে না বলিয়াই বাঙ্গালী স্ব স্ব প্রধান। দলের অপেক্ষা দলপতির সংখ্যা অধিক। কেহ কাহারও কাছে ছোট হইতে চায় না। যে দুই চারি বার বক্তৃতা করিল, যে দুই চারিখানা পুস্তক লিখিল, যে এক খানা সংবাদপত্র লিখিল, অথবা যে কিছুই করিল না, সকলেই এক একটি কৃষ্ণ-বিষ্ণু। এক এক জনের দুই চারিটি পৃষ্ঠপোষক অথবা তৈলজীবী জুটিল, সে পায়ের উপর পা দিয়া বরাখানা সরাখানার মত দেখিতে লাগিল। পার্শ্বচরের মধ্য হইতেও একে একে সরিয়া পড়িয়া আপনার দল করিল। দুই দলে মিলিয়া যে কখন কোন কর্ম্ম করিয়াছে, এমন শুনিতে পাওয়া যায় না। সকলে মিলিয়া, এক জনের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া, তাহার উপদেশ অথবা আদেশ মত কর্ম্ম করিতে স্বীকার করে না।

অবিশ্বাস ইহার মূলীভূত কারণ। প্রথমতঃ, বাঙ্গালীর মধ্যে এমন লোক অত্যন্ত বিরল, যাহার চরিত্র, অধ্যবসায়, নিঃস্বার্থতা নেতার উপযুক্ত, যে স্বার্থের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া পরহিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারে। নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা যত আমাদের দেশে শুনিতে পাওয়া যায়, এত কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, নিষ্কাম কর্ম্মও চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভূমিমানুষের মাথায় খুলি লইয়া ঐন্দ্রজালিক যেমন ভোজবাজী প্রদর্শন করে, প্রাচীন কালের মহতী বাণী লইয়া আমরাও সেইরূপ লোকের চক্ষে ভেল্কি লাগাই, কিন্তু কেবল কথার খেলা, কেবল ইন্দ্রজাল। যে চরিত্র ও চিন্তাবলে সেই সকল আদর্শ কল্পিত হইয়াছিল, সে চরিত্র ও চিন্তাবল নাই।

বাঙ্গালীর চরিত্রে এই মহৎ অভাব যে একেবারে অবস্থামূলক নহে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। যে অবস্থায় পতিত হইলে জাতীয় একতার সূত্রপাত হয়, বাঙ্গালী সে অবস্থায় পতিত হয় নাই। পুত্রকলত্রের প্রতিপালনের অপেক্ষা গুরুতর ভার বাঙ্গালীকে বহন করিতে হয় নাই। যুগব্যাপিনী পরাধীনতার এই সুখ। রাজাকে সকল ভাবনা ভাবিতে হয়। শত্রুভয় রাজাকে নিবারণ করিতে হয়, দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার জন্য অন্নসংগ্রহচেষ্টা রাজাকে করিতে হয়, সংক্রামক পীড়া হইলে রাজাকে উপায় করিতে হয়, শান্তিরক্ষার ভার রাজার উপর। প্রজা শস্য ও সন্তান উৎপাদন করিবে, রাজকর দিবে, এবং নিশ্চিন্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিবে। জাতীয় উন্নতির পথ এইরূপে সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। সকলে মিলিয়া আমরা কি করিব? এমন কোন কঠিন অথবা গুরুকর্ম্ম নাই যে, আমরা সম্পাদন করিতে পারি। যে পথেই যাই, রাজনিয়োগে প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছে, ফিরিয়া যাইবার আদেশ হইতেছে। অস্ত্রধারণ করিবার আদেশ নাই, সৈনিক হইবার আদেশ নাই, রাজ্যরক্ষার ভার আমাদের হস্তে ন্যস্ত নাই, মিলিত হইয়া আমাদিগের দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে?

এ কথার উত্তর নাই। কিন্তু এই একতার অভাব আমাদিগের প্রকৃতিগত, অস্থিমজ্জাগত কেন হইবে, এ কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এ কথার আলোচনার ফলও আছে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, আত্মশ্লাঘা ও আত্মম্ভরিতা, এ সকল আমাদের নিজের দোষ, কপালেরও দোষ নহে, অবস্থারও দোষ নহে। এই নিত্যবিরোধ সকল প্রকার উন্নতির পথে বিষম অন্তরায়।

যে অবস্থায় পতিত হইলে আত্মম্ভরিতা দূর হইয়া আত্মনির্ভর জন্মে, পর-

শবে বিদ্বেষ দূর হইয়া বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, পার্থক্যের পরিবর্ত্তে একতা আইসে, সেই অবস্থা বাঙ্গালীর একান্ত প্রার্থনীয়। এখন যে অবস্থা, এইরূপ থাকিলে যে এই জাতি দ্বারা কখন কোন মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে, এরূপ আশা করা ভ্রম। কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে এরূপ মিলনের সূত্রপাত হইবে, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। তবে ইতিহাসে যেমন দেখা যায়, তাহাতে অনুমান হয় যে, অত্যন্ত দুরবস্থা, অত্যন্ত আশঙ্কা, অত্যন্ত উৎপীড়নে জাতীয় একতা অর্থাৎ বলবত্তার মূল পাওয়া যায়। ইংলণ্ড কত কাল অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছিল, যে আসিত, সেই জয় করিত, সেই শাসন করিত। রোম, ডেন্মার্ক-বাসী, নর্ম্মান, যাহার ইচ্ছা ইংলণ্ড অধিকার করিয়া রাজত্ব করিয়া গেল। ক্রমে পরাধীনতার দিন গিয়া স্বাধীনতার দিন আসিল। বল যেমন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ইংরাজ অমনি বিধিমতে প্রবৃত্ত হইল। আজি ইংরাজের তুল্য রাজ্য কাহার? বিস্তৃত রাজ্য হইলে যে প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ হয়, এ কথা স্বীকার করিতে বলিতেছি না। কিন্তু যে সকল গুণে প্রকৃত মহত্ত্ব হয়, ইংরাজে কি সেই গুণসমূহের অভাব লক্ষিত হয়? ফ্রান্সের নিকট বারম্বার পরাজিত হইয়া জর্ম্মাণি এখন ইয়োরোপে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণিত হইয়াছে। উৎপীড়নে, অত্যাচারে শীখ জাতি প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া পঞ্জাবে আধিপত্য করিয়াছিল। এরূপ কোন প্রকার কল্পনাও আমাদের পক্ষে দুষণীয়, কিন্তু নানাবিধ অভাব ও দুঃখে যে একতার বীজ নিহিত আছে, এরূপ বিশ্বাস অমূলক নহে।

এক বার কেন সকলে মিলিয়া ভাবিয়া দেখি না যে, আমাদিগের মুখ্য কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন হইতেছে না, তাহার একমাত্র কারণ একতার অভাব। যে কর্ম্ম অতি মহৎ কর্ম্ম, যে ব্রত অতি মহৎ ব্রত, যে গৌরবের অপেক্ষা মহত্তর গৌরব নাই, তাহার সাধনায় সমর মান মর্য্যাদার জ্ঞান নাই, ছোট বড়র জ্ঞান নাই, অপমান অভিমানের দিকে দৃক্‌পাতও নাই। সকলেরই এক উদ্দেশ্য, সকলেরই এক সাধনা, সকলেই এক ব্রতধারী। ভাই বাঙ্গালি! "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" এ কথা এ দেশেই শুনিতে পাই। চিরকাল যখন এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, তখন কথাটা ত চলিবেই। কিন্তু এ কলঙ্ক কি আমাদের কখন ঘুচিবে না, কখন কি আমরা একত্রে মিলিয়া কর্ম্ম করিতে পারিব না? যদি জাতীয়ভাব বীজটি উপ্ত না হইল, তাহা হইলে কি বৃথা আস্ফালনে আমার সফল হইবে?

আপনাকে সামলাইয়া লন। পুত্রকে কোলে লইয়া নানা কথায় ভুলাইতে যান, কিন্তু প্রাণের ভিতর যে প্রাণ, তাহা গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। শিশু পুত্রকে লইয়া তিনি আরও অনেক কষ্টে পড়িলেন। তিনি না খাওয়াইলে সে খায় না, তিনি না ঘুম পাড়াইলে সে ঘুমায় না। শেষে তাহাকে লইয়া কাজ কর্ম্ম করা ভার হইয়া উঠিল। বন্ধুবান্ধবেরা তাহা দেখিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু হরিহর তাহা শুনিলেন না।

সেই দিনকার সেই ভয়ানক দৃশ্য এখনও তাঁহার চিত্তপটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। সূর্য্য পশ্চিমে ডুবিয়া গিয়াছে, আকাশ পৃথিবী নীলিমা অল্প অল্প করিয়া সমস্ত ধূসরে ছাইয়া পড়িতেছে, বায়ু বহিতে বহিতে হঠাৎ কি এক ত্রাসে যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, পাখীরা কলরব করিতে করিতে কিসের আশঙ্কায় যেন মুখ বন্ধ করিয়াছে, একটা বিভীষিকাময়ী ছায়ামূর্ত্তি যেন চারি দিক্ হইতে তাঁহাকে ভ্রূকুটী করিতেছে, তিনি ভীতিবর্দ্ধিতপদে কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে আসিতেছিলেন। দ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন, প্রাঙ্গণে তুলসীতলায় তাঁহার সেই চিরহাস্যময়ী আনন্দ-প্রতিমা ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই সাধ্বী বড় কষ্টে ঈষৎ হাস্য করিয়া নিকটে ডাকিলেন। হতবুদ্ধির ন্যায় কাছে আসিলে, তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিলেন, "এখন আমি সুখে মরিতে পারিব। দেখিও, আমার ভুবন রহিল।" হরিহর কুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ভুবনও অমনি চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। মার প্রাণে সন্তানের সেই কাতরকণ্ঠ বাজিল। বড় কষ্টে সেই চিরমুদিতোন্মুখ চক্ষু ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া, মুমূর্ষু, ভুবনের দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া হরিহরকে দেখাইলেন। তার পর আর সে শরীরে জীবিতলক্ষণ কেহ দেখিল না। সেই মর্ম্মভেদী দৃশ্য কি ভুলিবার? বন্ধুবান্ধবেরা যতই বুঝাইতে যান, হরিহরের প্রাণ ততই কাঁদিয়া উঠে। তিনি কিছুতেই তাহাদের কথা শুনিলেন না।

হঠাৎ হরিহরকে এলাহাবাদে বদলি করিল। তখন রেল হয় নাই। পথ বড় দুর্গম। উটের গাড়ী করিয়া যাইতে হয়। সে কষ্টের পরিসীমা নাই। হরিহর বড় ভাবিত হইলেন। ভাবনা নিজের জন্য না হউক, ছেলেটির জন্য বটে। অবসর পাইয়া কোন কোন বন্ধু বলিলেন, "তখন যদি বিবাহ করিতে, তাহা হইলে আর এত ভাবিতে হইত না, ছেলের ত একটা আশ্রয়স্থান হইত বটে।" কথাটা হরিহরের কতক মনে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। অশেষ পথকষ্ট সহিয়া, পুত্র লইয়া এলাহাবাদে পৌঁছিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া এক

নূতন জ্বালা ঘটিল। একে নূতন মনিব, অনেকটা সময় কাজে থাকিতে হয়, তায় এখানকার কাহাকেও ভুবন চেনে না, পুত্র লইয়া তিনি বড় গোলে পড়িলেন। প্রত্যূষে তাঁহাকে সৈন্যদিগের রসদ যোগাইতে যাইতে হয়, যতক্ষণ ফিরিয়া না আসেন, ততক্ষণ ভুবন কিছুই খায় না। মধ্যে একবার ভুবনের জ্বর হইল। এক দিনও কাজ কামাই করিবার যো নাই। হরিহর বড় বিব্রত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, ছেলের জন্য বিবাহ করিলাম না, শেষ বিবাহ না করিয়াই বুঝি ছেলেকে হারাইতে হয়। দুই এক জনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তাহারাও তাহাই বলিল। ক্রমে হরিহরের পুনরায় বিবাহ করিতে মন হইল।

রামলোচন চাটুর্য্যের বহু দিন ধরিয়া এলাহাবাদে বাস। তিনি সেখানে একটি ডাক্তারখানায় চাকুরী করেন। তাঁহার এক অবিবাহিতা কন্যা ছিল। কন্যাটি বড় রূপবতী, নাম তারাসুন্দরী। তাহার বয়স ত্রয়োদশ হইয়াছিল। এখনকার মত তখন সেখানে এত বাঙ্গালী থাকিত না। যে দুটি দশটি থাকিত, তাহারা সকলেই কৃতদার। রামলোচন পাত্রাভাবে বড় ভাবিতেছিলেন। দেশে গিয়া বিবাহ দেওয়াও বড় সহজ নয়। তিনি সংবাদ পাইয়া হরিহরকে আসিয়া ধরিয়া বসিলেন। হরিহর তারাসুন্দরীকে দেখিলেন। সুন্দর গঠন, যেন প্রতিমার ন্যায়। রং আরও সুন্দর, যেন বোয়া খেঁসারির মত। তার বয়স হইয়াছে। দেখিয়া মত হইল। হরিহর ভাবিলেন, যদি বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে এই রকম দেখিয়াই করা উচিত। ভুবনের কষ্টের জন্য বিবাহ করিতেছি, এ রকম ডাগর মেয়ে হইলে অল্প দিনেই বেশ যত্ন আয়ত্তি করিতে শিখিবে। শুভ দিনে বিবাহ হইয়া গেল। তারাসুন্দরী যে দিন প্রথম স্বামিগৃহে আসিলেন, সে দিন কে জানে কেন ভুবনের বড় কান্না আসিল। সে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে গিয়া হরিহরকে ভাঙাভাঙা স্বরে বলিল "ও কে, বাবা?" হরিহর বলিলেন "ও তোমার নূতন মা।" ভুবন বলিল, "মিছে কথা, ও আমার মা নয়। তুমি ওকে ঘরে আনিও না, আমার বড় ভয় করিতেছে।" হরিহর একটু হাসিলেন। ভাবিলেন, সম্পর্কের গুণ এমনই বটে।

তার পর, তারাসুন্দরী বেশ ধীরে ধীরে আপনার ঘরকন্না চিনিয়া লইল। ভুবনের সহিত কি সম্পর্ক, তাহা বুঝিতে তার বেশি বিলম্ব হইল না। সে তাহাকে দেখিলেই কেমন জ্বলিয়া যাইত। তবে, হরিহরের ভয়ে বড় একটা কিছু বলিতে পারিত না। স্বামীর নিকট মুখে ভুবনের প্রতি বড় যত্ন ও ভালবাসা জানাইত; কিন্তু আড়ালে তাহার গলাটা টিপিয়া ধরিতে পারিলে পরম সন্তোষ লাভ

করিত। ভুবন মাঝে মাঝে পিতার নিকট নালিশ করিত। কিন্তু হরিহর যখন তখন দেখিতেন, তারাসুন্দরী ছেলেমানুষ হইয়াও ভুবনকে যেরূপ স্নেহমমতা করে, তেমন বড় বড় মেয়েতেও পারে না। কাজেই তিনি ভুবনকে উল্টিয়া ধমকাইতেন। ভুবন চারি পাঁচ দিন ধমক খাইয়া আর পিতার নিকট কিছু বলিত না। হরিহর ভাবিতেন, ছেলেটা বড় দুষ্ট; যাহা হউক, তাহার এখন স্বভাব যে শোধরাইয়াছে, ইহা জানিয়া মনে মনে তুষ্ট হইতেন। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র শিশু নিত্য নীরবে কত যন্ত্রণা সহ্য করিত, পৃথিবীর কেহই তাহা জানিত না।

তারাসুন্দরীর বয়স হইয়াছিল, বৎসরেক পরেই গর্ভসঞ্চার হইল। যথাকালে সে এক পুত্র প্রসব করিল। হরিহরের তখন বেশ উন্নত অবস্থা। পুত্রের অন্নপ্রাশনে খুব ঘটা করিলেন। তারাসুন্দরী সাধ করিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন অমূল্যকুমার। অমূল্যকুমার দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিলেন। এ দিকে হরিহর ভুবনকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সে বাড়ীর ভিতর বড় একটা যাইতে চাহে না, অনেকটা সময় লেখাপড়া লইয়া বাহিরে কাটাইয়া দেয়।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যকুমারের দুরন্তপনা বড়ই বাড়িতে লাগিল। তাহার জ্বালায় রাস্তা দিয়া লোকজন চলা ভার হইয়া উঠিল। হয় ত কেহ মাথায় মোট লইয়া পথ চলিতেছে, পিছন হইতে তাহার মোটটা ফেলিয়া দিল; কেহ ঘোড়া চড়িয়া যাইতেছে, ওটি ওটি গিয়া ঘোড়ার লেজটা ধরিয়া টান মারিল; রাস্তার এক পাশে একটা ছাগল বাঁধা রহিয়াছে, তাহার খোঁটা উপড়াইয়া পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া ছুটাইয়া দিল। কেহ বলিতে গেল তো তাহার চোখে মুঠা করিয়া ধূলা দিল। সে চোখ লইয়া অস্থির হইল দেখিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড় দিল। হরিহর তাহার জন্য বড় জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন। শাসন করিবেন কি, আগে আসিয়া তারাসুন্দরী তাহাকে আগুলাইয়া বসেন। উল্টিয়া হয় ত তাঁহাকেই ভর্ৎসনা খাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। বড় জ্বালাতন হইয়া হরিহর শেষ একজন মুন্সি রাখিয়া তাহাকে বাড়ীতে পড়াইতে দিলেন। মুন্সির পোর দুই দিন থাকিয়াই দাড়ি বাঁচান ভার হইয়া উঠিল। শেষ 'শোভানাল্লা' বলিয়া পলাইবার পথ পাইল না।

তখন, অমূল্যকে পড়াইবার ভার ভুবনের উপর পড়িল। ভুবন অমূল্যকে শোধরাইবার বিস্তর চেষ্টা করিতেন। কত বুঝাইতেন, কত ভাল কথা বলিতেন—কিন্তু সে কি তেমনি ছেলে? তবে, ভুবনকে অমূল্য ভয় করিত। যতক্ষণ তাহার কাছে থাকিত, ততক্ষণ কিছু করিতে পারিত না। কিন্তু ইহা তাহার

পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। অমূল্য অন্য উপায় না দেখিয়া, এক দিন মাতার নিকট আসিয়া বলিল, "আমি দাদার কাছে পড়িব না।" মা জিজ্ঞাসা-লেন, "কেন?" অমূল্য বলিল, "দাদা যে কট্‌মট্‌ করিয়া চায়, আর আমাকে কেবল মেরে ফেলবে বলে, আমার বড় ভয় করে।" তারাসুন্দরী তাহা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বাট্‌ বাট্‌! না, বাবা, তোমার আর তার কাছে পড়িয়া কাজ নাই।" পাশের ঘরে হরিহর শুইয়াছিলেন, হাঁকাহাঁকি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" বঙ্কার করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "হবে আর কি, আমার ছেলের লেখা পড়ায় কাজ নাই। বেঁচে থাকে ভিক্ষে ক'রে খাবে।" হরিহর শুনিয়া বিশেষ কিছু বলিলেন না। ভুবন কিন্তু প্রাণে বড় ব্যথা পাইল। পর দিন পিছন হইতে ভুবনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া, অমূল্য একটা বোমা লাটাই লইয়া ঘুড়ি উড়াইতে দৌড়িয়া গেল।

ক্রমে, সামান্য খুটিনাটি লইয়া তারাসুন্দরী ভুবনের নামে নিত্য স্বামীর কাছে নানা রকম করিয়া নানা কথা লাগাইতে লাগিল। হরিহর পাকা লোক। তত্ত্বে ভালমন্দ কিছু না বলিয়া, ভুবনকে আপাততঃ স্থানান্তর করা যুক্তিস্থির করিলেন। ভুবনেরও সেখানকার পড়া প্রায় সাঙ্গ হইয়া আসিয়াছিল। হরিহর বাড়ী করিতে যখন দেশে আসিলেন, তখন পড়ার অছিলা করিয়া ভুবনকে সঙ্গে আনিলেন। কাশীপুরে ভুবনের মাতুলালয়। ভুবনের মাতুল গোলোক হালদারকে ডাকিয়া, সেইখানে থাকিয়া কলিকাতায় পড়াশুনা করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। স্বতন্ত্র বাসায় অভিভাবকহীন অবস্থায় না রাখিয়া, সেইখানেই রাখা অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। তবে গোলোক হালদারের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, হরিহর সে জন্য মাসে মাসে কিছু খরচ পাঠাইবারও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তার পর, হঠাৎ মিউটিনীর হাঙ্গামায় কানপুরে বদলি করিয়াছে শুনিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি পশ্চিমে চলিয়া গেলেন। ভুবনকে রাখিয়া যাইতে যে তাঁহার প্রাণ কাঁদে নাই, তাহা আমরা বলিতে পারিব না। সে বিদায়ের দিনে পিতা পুত্রে দুই জনেই চ'খের জলে ভাসিয়াছিলেন। তার পর, হরিহর চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত, ভুবন মাতুলালয়ে থাকিয়া, সেই অবধি কলিকাতায় পাঠাভ্যাস করিত।

বিদেশে থাকিয়া হরিহর শুনিতেন, ভুবন লেখাপড়ায় দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছে, পিতার প্রাণ আনন্দে দ্রবীভূত হইয়া যাইত। বাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই হরিহর ভুবনকে পত্র লিখিয়াছিলেন। ভুবন সংবাদ পাইয়া, সব কর্ম্ম

যাইবা, ছুটিয়া পিতার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছিল। পড়া কামাই হইবে বলিয়া, দুই দিন রাখিয়াই হরিহর আবার তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অত তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দিবার অন্য কারণও ছিল। সেই ভুবন মুখিনীর পুত্র —রাজার জামাতা হইবে, ইহাতে হরিহরের যে যার-পর-নাই আনন্দ হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? সে আনন্দবেগ রাখিতে না পারিয়া, হরিহর তারাসুন্দরীকে সেই সংবাদ দিতে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বুড়া মহাশয়কে বিদায় দিয়া, হরিহর বাবু বাড়ীর ভিতর আসিলেন। দু' চারিটা গলা-খেঁকারি দিয়া বরাবর সিঁড়ি বহিয়া উপরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় তারাসুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না। বার কতক এদিক্ ওদিক্ করিয়া বারাণ্ডায় গিয়া বসিলেন। অর্দ্ধ দণ্ড অতীত হইয়া গেল, তবু তারাসুন্দরী আসিলেন না। সঙ্গে পশ্চিম হইতে চাকরাণী আসিয়াছিল, উচ্চে "মাহারিণ মাহারিণ" বলিয়া হাঁকিলেন। মাহারিণ আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। তারাসুন্দরী আসিলেন না।

তারাসুন্দরী তখন অপর এক গৃহে এক ঝাঁক মেয়ে লইয়া সেজের আলোয় আপনার রূপের ঝক্‌মকানি ও ততোধিক অলঙ্কারের ঝক্‌মকানি দেখাইয়া, তাহাদের মাথাগুলা ঘুরাইয়া দিতেছিলেন। সেই বৈশাখচম্পক-কান্তি দেহের উপর সেই বৈশাখ-চম্পক-কান্তি অলঙ্কারের আভা, আর তার উপর বাতির মধুর আলোক আসিয়া পড়িয়াছে—পাড়াগেঁয়ে মেয়েগুলা ভাবিতেছিল, আজ যথার্থই চক্ষু সার্থক ও জন্ম সার্থক। কিন্তু কি পুণ্য করিলে এমন হওয়া যায়? কি তপস্যার বলে তারাসুন্দরী রাজরাণী হইয়াছে, আর তাহারা সেই তপস্যার অভাবে চির কাঙ্গালিনী রহিয়া গিয়াছে? কাঙ্গালিনী বৈ কি। তারাসুন্দরীর কাছে তারা কাঙ্গালিনী নয় তো আর কি? তাহাদের সে মনোভাব সমস্তটা না হউক, কতক পরিমাণে যে তারাসুন্দরী বুঝিতে না পারিলেন, তাহা নহে। তাহা বুঝিয়াই অন্তরে ঈষৎ হাস্য করিয়া আলোর কাছে সরিয়া আরো ঝাঁকিয়া বসিলেন। সরিতে আপাদলম্বিনী কানের বাড় দুলিয়া উঠিল। বলিহারি কারিগরি! এক একটা পাতে সেই আলোর রেখা প্রতিফলিত হইয়া যেন এক

কাণে শত সূর্য্য চমকিয়া উঠিল। একটি মেয়ে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে সাহারিণ আসিয়া বাবুর সংবাদ দিল।

তারাসুন্দরী কথাটার ততটা মনোযোগ করিলেন না। কি জানি, যদি কেহ লাফা ঠাহরায়। তিনি আপনার গৌরবে আপনি বসিয়া রহিলেন।

সাহারিণ ভাবিল, "মা-জি" বুঝি শুনিতে পান নাই। আবার সেই কথা বলিল।

রুক্ষস্বরে তারাসুন্দরী বলিলেন,—"বস্ বস্। হাম বহিনা নেহি জাব।"

গরীব দাসী ভয় পাইল। তাহার অপরাধ কি বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সেখানে দাঁড়াইতেও আর তাহার সাহস কুলাইল না।

এখন, মেয়েমানুষের মুখে হিন্দি কথা—বিশেষ চড়া সুরে এমন তেরি-মেরি বাৎ শুনিয়া, আর আর সকলে অবাক্ হইয়া গেল। ঘোষেদের গুণপিসি তো অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল, নূতন দিদি হক্‌চকিয়া বোকা বনিয়া গেলেন, অনঙ্গ কিছু কোচ্‌কে মেয়ে, সে মুখে কাপড় দিয়া খুক্ খুক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে যাহার চোখোচোখি হইল, সেই তখন না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। তারাসুন্দরী অনঙ্গর উপর রাগিলেন। সাহারিণের উপর তদপেক্ষা অধিকতর রাগ হইল। শেষে রাগভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরস্পর গা টেপাটেপি করিয়া আর আর সকলে উঠিয়া বাহিরে আসিল। কি জানি কেন, গুণপিসির তখন পর্য্যন্ত বুকের ধড়ফড়ানি থামিল না।

সকলে চলিয়া গেলে, তারাসুন্দরী গর্‌গর্ করিয়া বারাণ্ডায় যেখানে হরিহর বাবু বসিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হরিহর সাজ সজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বড় ভাল লাগিল। তিনি প্রথম হইতেই তারাসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ; সেই অনির্ব্বাচ্যরূপ অলঙ্কার সন্নিবেশে শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তার উপর সম্প্রতি ক্রোধভরে দংশিতাধরে ঈষৎ বঙ্কিম ভাবে দাঁড়াইয়াছেন—কি সুন্দর। হরিহর ভাবিতেছিলেন, "ধন্য আমি, বিধাতা আমার ভাগ্যে এমন স্ত্রীরত্ন লিখিয়াছিলেন।" তিনি যে কথা বলিতে অত তাড়াতাড়ি আসিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গেলেন। অতৃপ্ত নয়নে সেই রূপ দেখিতে লাগিলেন। তারাসুন্দরী রাগিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু হরিহরের রকম দেখিয়া হাসি আসিল। তবে বড় না কি চাপা মেয়ে, তাই সে ভাব চাপিয়া রাখিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "অত তাকাতাকি পড়িয়া গিয়াছিল কেন?"

রূপের ছাঁদ গরীর মতন। কিন্তু তেমন মধুর লাগিল না। হরিহর কি উত্তর

করিবেন, থতমত খাইয়া গেলেন। বলিলেন,—"কৈ, আমি তো ডাকি নাই।"

"তুমি ডাক নাই, তবে সে মাগি গিয়া অমন করিয়া বিরক্ত করিতেছিল কেন?"

তারাসুন্দরী একেবারে সুরটা বড় চড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। হরিহর কিছু ভীত হইলেন। বুঝিলেন, আপনাকে বাঁচাইতে গেলে গরীব চাকরাণীর প্রাণ যায়। কাজেই দোষটা আপনাকেই ঘাড়ে করিয়া লইতে হইল। বলিলেন, "তার দোষ নাই, আমিই তাকে পাঠাইয়াছিলাম বটে।"

তারা। তা, এমন করিলে তো আর বাঁচি না। লোকটা জনটা এলে যে, দু'দণ্ড বসিয়া কথা কহিতে পারিব না, তুমি ধরিয়া আনিতে বলিলে, তোমার চাকর দাসী বাঁধিয়া আনিবে, এও তো বড় জ্বালা। আর, সেই ভাল মানুষের মেয়েরা—তারাই বা মনে করিবে কি?

হরি। তা, আমি তো জানিতাম না যে, তুমি পাঁচ জনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলে।

তারা। তুমি জানিতে না, কিন্তু সে মাগি তো স্বচক্ষে গিয়ে দেখলে।

হরি। ছোট লোক, তার কি অত বোধাবোধ আছে?

তারা। তা ত বটেই। ছোট লোক, তোমার হুকুম না পেলে তার কি অতটা সাহস হয়?

কথায় কথায় তারাসুন্দরীর রাগটা বড়ই চড়িয়া উঠিয়াছিল। তখনও অনঙ্গর সেই মুখে কাপড় পুরিয়া খুক্ খুক্ করিয়া হাসি মনে পড়িতেছিল। সেই কাপড় খানা মুখের ভিতর আরও ঠাসিয়া দিয়া দম আটকাইয়া তাহাকে মারিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু সে পরের মেয়ে, তাহার তো কিছু করিবার যো নাই। তিনি সেই রাগটা স্বামী ও দাসীর উপর বাড়িতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, স্বামী তবে জড়সড় হইয়া চুপ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া থাকিবে; দাসী হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবে, তবে কতকটা কোপের শান্তি হইলেও হইতে পারিবে। তাহা না হইয়া, এত বাদ প্রতিবাদ! তিনি যাহাকে অপরাধী স্থির করিয়াছেন, তাহাকে সেই মুহূর্ত্তে ফাঁসি কাষ্ঠে না লট্‌কাইয়া তাহারি কি না পক্ষসমর্থন। ছি ছি এত অপমান! একটা ক্ষুদ্র দাসীকেও কিছু বলিবার তাঁহার অধিকার নাই। রাগে ফুলিতে ফুলিতে তারাসুন্দরী শেষে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

হরিহর বোকা—ব্যাকুল—হতবুদ্ধি। ভাবিলেন, এ কি এ? বিনা মেঘে

এ বজ্রপাত কেন? ক্ষণপূর্ব্বে তিনি পুত্রের রাজকন্যার সহিত সম্বন্ধ ও তাহার ভাবী সম্পদের কথা ভাবিয়া পুলকিত হইতেছিলেন, সহসা ভয়ে, বিস্ময়ে, উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া পড়িলেন। উৎকণ্ঠা আরও বেশী এই জন্য যে, কি হইতে কি হইল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া নিজহস্তে তারাসুন্দরীর অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। সাদরে সকাতরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" তারাসুন্দরী কোন উত্তর দিলেন না। হরিহর শত বার সেই প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু একটি বারের জন্যও কোন উত্তর পাইলেন না। রাগ গিয়া, তখন পুরামাত্রায় অভিমান আসিয়াছিল। হরিহরের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। তারাসুন্দরীর পায়ে মাথা কুটিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

অনেক সাধ্যসাধনার পর তারাসুন্দরী একটু নরম হইলেন। কিন্তু আসল কথাটা কি, তাহা কিছু বলিলেন না। বলিলেই বা কি, বলিবার বস্তুতঃ বিশেষ কিছুই ছিল না। কাজেই হরিহর তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর পাইলেন না। কিন্তু, তাহা না পান, তারাসুন্দরী যে এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন,—দুটা কথা কহিয়াছেন, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট। বস্তুতঃ কথাটা তেমন কিছুই নহে, তাহাও তিনি কতকটা যে না বুঝিয়াছিলেন, তাহা নহে। তা, সে যাহাই হউক, এ সময়ে আর সে সব কথা না উঠাই ভাল। সাত পাঁচ ভাবিয়া, হরিহর সে সম্বন্ধে আর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন না।

তারাসুন্দরী বলিলেন, "চল, ঘরে চল।" তখন দুই জনে গৃহ মধ্যে শয্যার উপর আসিয়া বসিলেন।

এখন, তারাসুন্দরীর আজ এত সহজে অভিমান ভঙ্গ হইবার একটা কারণ ছিল। প্রথম সেই অপদার্থ পড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোকগুলার নিকট আপনার রূপগর্ব্ব ও ততোধিক ধনগর্ব্ব দেখাইতে মত্ত ছিলেন, তখন অতটা খেয়াল হয় নাই। তার পর, রাগের সময় কোন কিছু জ্ঞানগোচর ছিল না। সেই কোপ যখন কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইল, তখন মনে পড়িয়া গেল, আজ অত ডাকাডাকি করিবার কারণ কি। অবশ্যই তাহার যে একটা বিশেষ কোন কারণ ছিল, তাহা তিনি বেশ অনুভব করিয়াছিলেন। সেই কারণটা যে কি, তাহা জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইল। তারাসুন্দরী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ অত জোর তলব পড়িয়াছিল কেন?"

হরিহরের মন এতক্ষণ অন্য বিষয়ে সাপৃক্ত ছিল। গৃহে আলোক জ্বলিতে-

ছিল, সেই আলোকের উজ্জ্বল কিরণে ভূষণবর্দ্ধিতশ্রী লাবণ্যময়ী তারাসুন্দরীকে মহামহিমাশালিনী অনন্তপ্রতাময়ী হৈমী প্রতিমার ন্যায় দেখাইতেছিল,—হরিহর চক্ষু ভরিয়া একাগ্রচিত্তে তাহাই দর্শন করিতেছিলেন।

কোন উত্তর না পাইয়া তারাসুন্দরী একবার সেই দিকে চাহিলেন। সে অবস্থায়ও একটু হাসি আসিল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"হাঁ করিয়া কি দেখিতেছ, যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দাও।"

হরিহরের চমক ভাঙ্গিল। বলিলেন, "কি বলিতেছিলে?"

তারা। "অত ডাকাডাকি পড়িয়াছিল কেন?"

এতক্ষণের পর আসল কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সেই আনন্দের কথা মনে করিতেও হরিহরের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বড় আগ্রহে বলিলেন, "দেখ, একটা বড় সুখবর আছে, তাহাই বলিয়া তোমাকে আনন্দের ভাগী করিবার জন্য ডাকিতেছিলাম।"

"সুখবর!" তারাসুন্দরী মহোৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসিলেন, "কি সুখবর?"

হরি। দেবীরায়ের নাম শুনিয়াছ?

তারা। রাজা দেবীরায়?

হরি। হাঁ; তার একটি মেয়ে আছে, জান?

তারা। না। সে কথা কেন?

হরি। এক মাত্র মেয়ে, আর সন্তান সন্ততি নাই। সেই ভবিষ্যতে সমস্ত বিজয়ের অধিকারী। মেয়েও তেমনি মেয়ে। যেমন রূপ তেমনি গুণ, যেন নবদুর্গা। কি সুন্দর—

তারাসুন্দরীর কৌতূহল অতিমাত্রায় উদ্রিক্ত হইতেছিল। বামে কথা শুনিতে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। বাধা দিয়া বলিলেন, "কি বলিতেছ, সে মেয়ের কি হইয়াছে?"

হরি। আচ্ছা, সেই মেয়ে যদি তোমার পুত্রবধূ হয়?

পুত্রবধূ! অতুল সম্পদের একমাত্র অধিকারিণী রূপগুণসম্পন্না বালিকা পুত্রবধূ হইবে—তারাসুন্দরী বুঝিতে না পারিয়া, বড় বড় চক্ষু মেলিয়া একবার স্বামীর প্রতি চাহিলেন। হরিহর দেখিলেন, সেই আকর্ণবিশ্রান্ত আয়ত লোচনযুগল পুলকে উদ্ভাসিত হইতেছে। হরিহর বলিলেন, "মিথ্যা নহে; দুর্য্যোধন খুড়া এক রকম সব স্থির করিয়া আসিয়াছেন; শীঘ্রই তাঁহারা পাত্র দেখিতে আসিবেন।"

হঠাৎ কি মনে পড়িয়া গেল। তারাসুন্দরীর সেই হর্ষোৎফুল্ল মুখমণ্ডল ঈষৎ বিমলপ্রভ হইয়া আসিল। বলিলেন, "অসম্ভব।"

হরি। অসম্ভব বলিবাই মনে হয় বটে; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা হইলে কোন কিছুই অসম্ভব থাকে না।

তারা। তা মানি, কিন্তু লোকে কি বলিবে?

হরি। কেন? ইহার মধ্যে কোন্ কাজটা লোকতঃ বিরুদ্ধ হইতেছে?

তারা। শুধু লোকতঃ কেন, শাস্ত্রতঃ বিরুদ্ধও বটে।

হরিহর বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "কি বলিতেছ?"

তারা। আমার গর্ভে না হইলেও ভুবন অমূল্যের জ্যেষ্ঠ। ভুবনের বিবাহ না হইলে অমূল্যের বিবাহ কেমন করিয়া দিবে?

হরিহর—অচতুর লঘুবুদ্ধি বৃদ্ধ হরিহর—এতক্ষণ সব কথাটা তলাইয়া বুঝিতে পারেন নাই। তারাসুন্দরীর কথা শুনিয়া মর্ম্মে ব্যথা পাইলেন। কি উত্তর দিবেন, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না।

তারাসুন্দরী বলিলেন, "চুপ করিয়া রহিলে যে, কি বলিবে, বল না।"

কথাটা বলিতে ইচ্ছা না হইলেও, কেমন অস্পষ্টভাবে আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়িল—"সম্বন্ধ ভুবনের জন্যেই হইতেছে।"

হরিহর মাথা হেঁট করিলেন। পত্নীর দিকে চাহিতে সাহস হইল না। কিন্তু সেই হেঁট হইয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন, তারাসুন্দরীর যে চক্ষু এইমাত্র আনন্দে হাসিতেছিল, আহতা বাঘিনীর ন্যায় তাহা হইতে অনন্ত অনলকণা ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শেষ রাত্রির ম্রিয়মাণ চাঁদ তখনও আকাশের গায় ধীকি ধীকি জ্বলিতেছিল। দূরে ঝোপ ঝাপ ও আনাচ-কানাচ হইতে অন্ধকারের দল পিশাচের ন্যায় মাঝে মাঝে মাথা বাড়াইয়া উঁকি মারিতেছিল। আর যেখানে গাছের সারি শাখায় শাখায় জড়াজড়ি করিয়া ঘনপত্রের চন্দ্রাতপ টাঙাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার তলায় কতকগুলা আঁধার একত্র জড় হইয়া কি একটা ঘটনা পাকাইতেছিল। সন্ধ্যাবিরহক্লিষ্ট কুমুদিনীকান্ত এ সব কিছুই লক্ষ্য করিতেছিলেন না;

আপনার দুঃখে আপনি পাণ্ডু হইতে ক্রমে পাণ্ডুতর হইয়া যাইতেছিলেন। তখনও যে যাহার শয্যায় ঘুমাইয়া, পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত কেহই জাগরিত হয় নাই।

তবে, সবাই যে ঘুমাইয়া—কেহই জাগে নাই—এ কথা বলি না। তারাসুন্দরী শুইয়া আছেন বটে, কিন্তু চক্ষে নিদ্রা নাই। সারারাত্রি যে একটুও নিদ্রা হইয়াছিল, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং, তারাসুন্দরী যখন আসিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন, তখন ঘুম আসিয়া হরিহর বাবুর চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানাটানি করিলেও যে তিনি এক লহমার জন্য চক্ষু বুজাইতে পারিয়াছিলেন, ইহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। দক্ষিণের জানালা খোলা ছিল, হরিহর মড়ার মত আড়ষ্ট হইয়া, সেই দিকে চাহিয়া শুইয়া রহিয়াছেন। আর তারাসুন্দরী কখন শুইতেছেন, কখন বসিতেছেন, কখন পাখা নাড়িতেছেন, আর থাকিয়া থাকিয়া স্বামীকে কত রকম কথাই বলিতেছেন।

রাগ মানের পালা প্রথম রাত্রে শেষ হইয়া গিয়াছে। তার পর, ভর্ৎসনা ও ভয় দেখানর পালা পড়িয়াছিল। দক্ষযজ্ঞগমনে বাধা দিলে সতী মহাদেবকে দশমহাবিদ্যারূপ দেখাইয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। ভৈরব সেই ভৈরবীমূর্ত্তি দেখিয়া ত্রাসে অধীর হইয়া কাতরে স্তব করিতে করিতে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় প্রতিরোধ করিতে আর সাহস পান নাই। ভয় দেখাইয়া ভবানী আপনার কার্য্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। সতী মহাদেবের বুড়া বয়সের স্ত্রী। তারাসুন্দরীও হরিহরের শেষ অবস্থার অবলম্বন। সুতরাং তারাসুন্দরী যদি মনে করিয়া থাকেন যে, ভয় দেখাইলে তিনিও তাঁহার কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিবেন, আমরা তাহাতে ততটা দোষের বিষয় কিছু দেখি না। কিন্তু, হায় তারাসুন্দরী! নানা রকমে ভয় দেখাইয়াও কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। হরিহর নীরব, নিস্পন্দ, নিশ্চল। 'বোবার শত্রু নাই'—তিনি এই মহাজনবাক্যের অনুসরণ করিয়া মুখ আঁটিয়া একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশাইয়া পড়িয়া রহিলেন। রাগে তারাসুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গটা থাকিয়া থাকিয়া রি রি করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। স্বামীর এরূপ অবাধ্যতা তিনি বয়সে আর কখন দেখেন নাই। ভুবনের মাথাটা হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহাকে অমূল্যের পথ হইতে সরাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন, মেয়ে মানুষ, ইচ্ছা করিলে ও ক্ষমতা থাকিলেও, সব কাজগুলা, সব সময়ে ঠিক করিয়া উঠা যায় না। চুপ করিয়া খানিকক্ষণ গম্ হইয়া ভাবিয়া, শেষ সুর বদলাইয়া ধরিলেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন স্তবস্তুতির পালা পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে

একটু কোঁপানি, একটু চোখের জল, একটু ভাঙাভাঙা স্বর চলিতেছে। তারা-সুন্দরী কাঁদিয়া বলিলেন, 'আমি তোমার কি করিয়াছি যে, সারা রাত্রির মধ্যে একটা কথার জবাবও দিলে না।"

হরিহর কথা কহিলেন না।

তারাসুন্দরী আবার বলিলেন, "কথা না কও, একবার ফিরিয়া শোও।"

হরিহর নড়িলেন না।

তারাসুন্দরী বলিলেন, "দেখ, আমার যদি সাধ হইয়া থাকে, আমার ছেলেটিকে রাজার জামাই করিব, তাহাতে তোমার অমত করিবার কারণ কি? ভুবন আর অমূল্য, তোমার পক্ষে তো দু'জনেই সমান।"

হরিহর কথা কহিলেন না। মুখ কহিলেন না, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, অবশ্যই দু'জনেই সমান বটে।

তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "ভুবনের বিবাহের ভাবনা কি? সে আমার রূপবান ও গুণবান্ ছেলে, তার ভগবান তোমার যে ধন ও মান দিয়াছেন, তুমি যদি আজ ভুবনের বিবাহ দিতে উদ্যোগ কর, এখনই হাজার হাজার ভাল ভাল মেয়ে আসিয়া জুটিবে। ভুবনের বিবাহের জন্য আবার ভাবনা?"

হরিহর এতক্ষণে কিছু বলিবেন মনে করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সে অবসর না দিয়া, তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "রাগ করিও না, আমি বলি কি, এই বৈশাখ মাসের মধ্যেই একটি পরীর মত মেয়ে দেখিয়া ভুবনের সঙ্গে বিবাহ দাও। আর অমূল্যর সম্বন্ধ পাকা হইয়া থাক, জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার জ্যেষ্ঠ ছেলের কিছু বিবাহ দিতে নাই, প্রথম আষাঢ়েই যে দিন থাকিবে, সেই দিন বিবাহ দিও। কি বল, কথাটা কি মন্দ বলিয়াছি?"

হরিহর ভাবিতেছিলেন, কথাটা যে নেহাত মন্দ, তাহা নহে। কি করা যায়? জোর করিয়া এ অবস্থায় আপনার মত চালাইলে যে শেষ সুখের হইবে, তাহা বোধ হয় না। লাভে হইতে সংসারটা অশান্তির আগার হইয়া উঠিবে, আর হিংসায়—হরিহর যতই কেন তারাসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হউন না, কিন্তু তাহার স্বভাব তো তাঁহার অগোচর ছিল না—হিংসায় মানুষ কি না করিতে পারে? সে কথা মনে ভাবিতেও হরিহর শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, তাই ভাল, ভুবনের জন্য অন্য একটা সম্বন্ধ দেখি। হরিহর মনে মনে ভাবিলেন বটে, কিন্তু তাহা ভাবিতে বড় কষ্ট হইল। কিছু না বলিয়া একবার জানালার দিকে চাহিলেন। তখন আকাশের চাঁদ ডুবিয়া আসিয়াছিল। সময়

বুঝিয়া নীচের অন্ধকারগুলা উপরে উঠিয়া ঝিলিমিলি করিতেছিল, সেই অন্ধকারশ্রেণী ভেদ করিয়া দূরে—বহুদূরে—আকাশের শেষপ্রান্তে হরিহর দেখিলেন, তাঁহার সেই প্রথমা পত্নীর প্রতিমূর্ত্তি ভ্রূকুটি করিয়া একটি অঙ্গুলি তুলিয়া তাঁহার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। হরিহর সে নয়নে হাসি ও আনন্দ ছাড়া আর কখন কিছু দেখেন নাই, তাহাতে আজ ভ্রূকুটি দেখিয়া তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আবার ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া সেই দিকে চাহিলেন। সেই প্রতিমূর্ত্তি—সেই ভ্রূকুটি—সেই তর্জ্জনীসঙ্কেত! ধড়মড় করিয়া হরিহর বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। তাহার শূন্যদৃষ্টি, বিহ্বলমূর্ত্তি ও অসম্বদ্ধ কার্য্য দেখিয়া, তারাসুন্দরী চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, হরিহর তখনও বসিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন।

"কি, কি হইয়াছে, অমন করিতেছ কেন?" তারাসুন্দরী আগ্রহ ও ব্যাকুলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহাকে শোয়াইবার জন্য তাঁহার দুটা হাত ধরিতে গেলেন। জোরে তারাসুন্দরীর দুটা হাত ছুড়িয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভীতিরুদ্ধকণ্ঠে হরিহর বলিলেন, "না, না, আমি কোন কথা শুনিব না। ভুবনের সহিত দেবীরায়ের মেয়ের বিবাহ দিবই দিব।"

তারাসুন্দরী স্বামীর এই ভাববিপর্য্যয়ের কারণ সব না বুঝিতে পারুন, বুঝিতে পারিলেন বটে, এ সময়ে আর কোন কথা কহা অন্যায়। তিনি অন্য কিছু না বলিয়া, বলিলেন, "ভাল, তাই হবে; এখন শোও, একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর।"

হরিহর নিষেধ করিলেও, তারাসুন্দরী তাঁহাকে ধরিয়া শোওয়াইলেন। আমরা সত্য কথা বলিব, স্বামীকে শোওয়াইয়া তারাসুন্দরী পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। ঝির ঝির করিয়া প্রভাতসমীরও ঘরের ভিতর বহিতেছিল। সারারাত্রি অনিদ্রার পর, হরিহর অচিরাৎ ঘুমাইয়া পড়িলেন।

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বপ্ন। *

১। সুদূর জগতে।

সুদূর নক্ষত্রের উপর একটি জগৎ আছে। সেখানকার কার্য্যপ্রণালী এখান হইতে কিছু স্বতন্ত্র ও বিচিত্র।

সেই নক্ষত্রলোকে দুটি নরনারী একত্রে ভ্রমণ করিত ও বহুদিবস একই কর্ম্মে উভয়ে ব্যাপৃত থাকিত। আমাদের এই বসুন্ধরার ন্যায়, সেই নক্ষত্র-নিকেতনেও এই যুবকযুবতীর মধ্যে ক্রমে সখ্য স্থাপিত হইল।

কিন্তু সেই নক্ষত্রলোকের দু' একটি দ্রব্য আমাদের ধরায় দুর্লভ। এক, ঘনতরুবাজিমণ্ডিত গভীর বনানীর মধ্যে একটি দেবালয়। অবিরল পত্রস্তূপ ভেদ করিয়া দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ সেই বনস্থলীতে পঁহুছিত কি না সন্দেহ। দিবাভাগে চারি দিক নিস্তব্ধ। কিন্তু নীরব নিশীথে যখন চন্দ্রকিরণ আসিয়া তরুশিরের উপর তরঙ্গায়িত হইত, কিম্বা যখন অম্বরপথে একটি এবটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিত,—সেই গভীর সুষুপ্তির মধ্যে কেহ যদি এই মন্দির-বহু প্রস্তরবেদীর সোপানের নিকট নতজানু হইয়া উন্মুক্ত জানুর রক্তে সোপান সিক্ত করিতে পারিত, তাহার সমস্ত কামনা সেই মুহূর্ত্তে পূর্ণ হইত। এই ব্যাপার শুনিয়া বিস্মিত হইবার কোনও কথা নাই, কারণ আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই সুদূর জগতের কার্য্যপ্রণালী কিছু নূতন ও বিচিত্র।

এই প্রকারে প্রণয়িযুগল সেই তারকার উপর যথেচ্ছ ভ্রমণ করিত। যুবতী, যুবকের মঙ্গল কামনা করিত। এক দিন রাত্রে আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, সমুদ্রের তরঙ্গপুঞ্জ বেলাভূমি। রমণী একাকিনী অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল।

চারি দিক তমসাচ্ছন্ন। নিম্নে মৃত পত্ররাশির উপর চন্দ্রকিরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; উপরে তরুশাখাগুলি জড়াজড়ি করিয়া আছে।

---

* Dreams —By Olive Schreiner। এই প্রতিভাশালিনী মহিলা The Story of an African Farm নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াই ইউরোপীয় সাহিত্যসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার "স্বপ্নের" ন্যায় পুস্তক ইংরাজী ভাষায় অদ্যাবধি লিখিত, উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসকবিতা তুর্গেনিফের (Turgeneff) "Prose Poems" ব্যতীত, ইহার সমতুল্য পুস্তক বোধ হয় আর নাই।—অনুবাদক।

আর একটু দূরে, আরও গাঢ় অন্ধকার—সেখানে চন্দ্রকিরণ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। তরুণী দেবনিকেতনের নিকট পৌঁছিয়া, নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিল, কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না। সে তখন বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া একখণ্ড শাণিত প্রস্তরের দ্বারা আঘাত করিল। টস্ টস্ করিয়া শুভ্র সোপানের উপর রক্ত পড়িতে লাগিল। কে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও?"

"আমি এক জনকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসি, তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করি।"

"কি মঙ্গল?"

তরুণী বলিল, "আমি তাহা জানি না—তাহার পক্ষে যাহা অত্যন্ত মঙ্গলজনক, তাহাই যেন সে পায়, এই আমার কামনা।"

"তোমার কামনা পূর্ণ হইল। তাহার মঙ্গল হইবে।"

যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইল। বক্ষের উপর বস্ত্র কঠিন মুষ্টিতে ধরিয়া, বন হইতে বাহির হইবার জন্য সৌড়িতে আরম্ভ করিল। পদতলে মৃত পত্রের মর্ম্মর শব্দ হইতেছিল, বাহিরে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছিল, ও চন্দ্রকিরণ সমুদ্রসৈকতের বালুকারাশি চক্ চক্ করিতেছিল। তরুণী সাগরের তীর দিয়া ছুটিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। সে চোখের উপর হাত আড়াল দিয়া সাগরবক্ষের দিকে চাহিল। তখন অদূরে একখানি নৌকা দ্রুতবেগে বাহির সমুদ্রের দিকে ভাসিয়া যাইতেছিল। এক জন নৌকার উপর দাঁড়াইয়াছিল।—অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে তাহার মুখ ভাল দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু তাহার আকার দেখিয়া রমণী তাহাকে চিনিতে পারিল। নৌকাখানি তীরের ন্যায় ছুটিয়া যাইতেছিল; বোধ হইতেছিল, যেন আপনি যাইতেছে। ঈষৎকম্পিত সাগরতরঙ্গের উপর হইতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকিরণ চোখের উপর আসিয়া পড়ায় ও নৌকাখানি তীর হইতে অনেক দূরে বলিয়া, আরোহীদিগের ছায়ামাত্র প্রতিভাত হইতেছিল। বোধ হইতেছিল, আরও এক জন হালের নিকট বসিয়া আছে। নৌকা সুদূরে ভাসিয়া চলিল। যুবতী তীর দিয়া বরাবর ছুটিতেছিল, কিন্তু নৌকার একটু নিকটেও পঁহুছিতে পারিল না।

হস্তপ্রসারণে বক্ষের বসন শিথিল হইয়া বাতাসে উড়িতেছিল। চন্দ্রকিরণ সুদীর্ঘ উন্মুক্ত কেশকলাপের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

অতি মৃদু স্বরে কে যেন বলিল,—"এ কি?"

রমণী হাসিয়া বলিল, "আমি হৃদয়ের রক্ত দিয়া যাহার মঙ্গল ক্রয় করিয়াছি, সে আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে।"

আরও কোমল স্বরে উত্তর আসিল, "কেন, তোমার ত কামনা পুরিয়াছে, যুবকের পূর্ণ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে।"

"কি রকম মঙ্গল?"

"তোমার নিকট হইতে দূরে থাকাই তরুণের মঙ্গল"। যুবতী নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুদূরে চন্দ্রকিরণ ছাড়াইয়া নৌকাখানি অদৃশ্য হইল। পূর্ব্বের স্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, তুমি ইহাতে সন্তুষ্ট ত?"

কিশোরী একটু অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল, "হাঁ, সন্তুষ্ট।"

তাহার সেই ঈষন্নিমজ্জিত পদমূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চঞ্চল সাগর-ঊর্ম্মি আসিয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

২। চিত্রকর।

একজন চিত্রকর একখানি ছবি আঁকিয়াছিল। অন্যান্য চিত্রকরেরা ইহা অপেক্ষা অনেক সুন্দর ও দুষ্প্রাপ্য রঙ্গে অনেক বিখ্যাত চিত্র আঁকিত। এই আলেখ্যখানি এক বর্ণে চিত্রিত ও ভিতর হইতে কি এক অপূর্ব্ব রক্ত আভা ফুটিয়া বাহির হইত। লোকে বলিত, "চিত্রখানি আমাদের বড় ভাল লাগে, বিশেষতঃ ঐ লাল আভাটুকু।"

অন্যান্য চিত্রকরেরা বলাবলি করিত, "এ রঙ্গ ও কোথা হইতে সংগ্রহ করিল?" এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সে কথা আমি বলিতে পারি না।" তাহার পর মস্তক অবনত করিয়া, সে চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত হইল।

এক জন সুদূর প্রাচ্য দেশে আসিয়া বহুমূল্য চিত্রোপকরণ ক্রয় করিল, এবং ভাল করিয়া রঙ্গ ফলাইয়া একখানি আলেখ্য প্রস্তুত করিল। কিন্তু রঙ্গ টিকিল না, দু' দিনে বিবর্ণ হইয়া গেল। এক জন অনেক প্রাচীন পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া একটি নূতন রঙ্গ প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিল, কিন্তু চিত্রপটে রঙ্গের সমস্ত দীপ্তি নিভিয়া গেল।

কিন্তু, সেই চিত্রকর পূর্ব্বের মত ছবি আঁকিত। চিত্রখানি দিন দিন গাঢ় রক্তাভ হইতেছিল ও সেই সঙ্গে চিত্রকরের বর্ণও পাণ্ডুর হইয়া আসিতেছিল। একদিন চিত্রকরকে আলেখ্যসমীপে মৃত দেখা গেল। সকলে আসিয়া তাহার চিত্রপাত্রসমূহ পাঁতি পাঁতি করিয়া অন্বেষণ করিল, কিন্তু কোনও প্রকার নূতন রঙ্গের চিহ্নমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না।

সমাধিস্থ করিবার সময় তাহার বস্ত্র উন্মোচন করিতে, চিত্রকরের বক্ষের উপর একটি ব্রণচিহ্ন সকলের নয়নপথে পড়িল। বোধ হইল, বে আততায়ী এই কৃত হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছে, এই কারণ ব্রণের চারি ধার কঠিন হইয়া গিয়াছিল। এখন মৃত্যু আসিয়া এই ক্ষতমুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

তাহার সমাধির পরেও লোকে জিজ্ঞাসা করিত, "এই সুন্দর রং সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল?" কালক্রমে চিত্রকরের নাম সকলে ভুলিয়া গেল, কিন্তু তাহার আলেখ্য জীবিত রহিল।

৩। ত্রিদিবে অভিযোগ।

বোধ হইল, যেন আমি স্বর্গে ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। তপস্বীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি দরকার?" আমি বলিলাম, "মানুষের নামে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত আপনার কাছে আসিয়াছি।"

পরমেশ্বর বলিলেন, "সে তোমার কি ক্ষতি করিয়াছে?"

"মানুষ আমার তপস্বিনী স্বরূপ রমণীদিগকে দারুণ আঘাত করিয়া রাজপথে নিক্ষেপ করিয়াছে। অভাগিনীরা সেখানে ধূলিধূসরিতা হইয়া পড়িয়া আছে। নারী-রক্তে মানবের হস্ত রঞ্জিত। সমগ্র সাম্রাজ্য শাসন করিবার সে কোনও মতে উপযুক্ত নয়। এই নিখিল অবনী-রাজ্যের ভার নারীহস্তে সমর্পিত হউক, এই আমার প্রার্থনা। দেখুন, আমার হাত কত শুভ্র।"

আমি তাঁহাকে তুষারধবল হস্তযুগল দেখাইলাম।

দেবতা বলিলেন, "তোমার হাত শুভ্র বটে, তোমার পা দেখি?"

আমি পদমূল হইতে ঈষৎ বস্ত্র উত্তোলন করিলাম, আমার পদযুগল ঘোরবর্ণ—যেন ধূলার ভিতর দিয়া হাঁটিয়া আসিয়াছি।

দেবতা আবার বলিলেন "এ কি?"

আমি বলিলাম "প্রভু, পৃথিবীর পথ সমূহ কর্দ্দমময়। পাছে আমার এই শুভ্র বস্ত্র মলিন হয়, তাই সাবধানে পা রাখিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

"কিসের উপর পা রাখিয়াছ?"

আমি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। পায়ের উপর বসন আসিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে প্রসার দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন করিয়া চলিয়া আসিলাম। ভয়—পাছে দেবদূতেরা আমায় দেখিতে পায়।"

আর এক বার আমি আর এক জনের সহিত ত্রিদিবের তোরণের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমরা পরস্পরকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলাম। অত্যন্ত ক্লান্তির সহিত উভয়ে বৃহৎ তোরণ নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। দেবদূতেরা আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। পরিধের কর্দ্দমলিপ্ত। উভয়ে শুভ্রমর্ম্মরপ্রস্তরময় প্রাঙ্গণ পার হইয়া সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইতেছিলাম। দেবদূতেরা আমাদিগকে পৃথক করিয়া দিল। আমার সহযাত্রীকে সর্ব্বোচ্চ সোপানের উপর উঠিতে আজ্ঞা করিল, আমি নিম্নে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহারা বলিতেছিল, "গত বারে এই রমণী শুভ্রমর্ম্মরপ্রস্তরে লোহিত পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছিল; আমরা অশ্রুধারা দ্বারা সেই চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়াছিলাম। উহাকে সোপানে আরোহণ করিতে দেওয়া হইবে না।"

আমার সঙ্গিনী, আমার দিকে চাহিয়া, হস্ত প্রসারণ করিল; আমি সেই হাত ধরিয়া উপরে উঠিলাম। পবিত্র ও উজ্জ্বলদেহকান্তি দেবদূতেরা আমাদিগের পার্শ্বে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিল। তাহারা নিষ্পাপ বলিয়া কখন কোনও যন্ত্রণা ভোগ করে নাই। দেবদূতেরা এমন সুন্দর ও দীপ্তিমান্ যে, আমার সঙ্গিনী না থাকিলে, আমার অত্যন্ত একলা একলা বোধ হইত।

পরমেশ্বর আমাকে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আমার ভগিনীকে সম্মুখে দাঁড় করাইলাম।

ঈশ্বর বলিলেন, "তোমরা দু'জনে এসেছ কেন?"

আমি বলিলাম, "দেব! এই রমণী পথিমধ্যে পড়িয়াছিল, সকলে ইহাকে ফেলিয়া যাইতেছিল। আমি ইহার পার্শ্বে শয়ন করিলাম, রমণী আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার পর ভূমিশয্যা হইতে উঠিলাম।"

"তোমরা কাহারও নামে নালিস্ করিতে আসিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "আমরা কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি না।"

দেবতা আমাদিগের দিকে নত হইয়া বলিলেন, "বৎসে! তবে তোমরা কি চাও?"

আমার সহচরী আমার হস্ত আকর্ষণ করিল; তাহার ইচ্ছা, আমি দু' জনের হইয়া বলি।

আমি বলিলাম, "আমাদের ভ্রাতৃস্বরূপ মানবদিগকে আপনি বুঝাইয়া বলুন, এবং আমাদের দ্বারা এমন কোন সমাচার প্রেরণ করুন, যেন তাহারা আর—

"আচ্ছা, সমাচার লইয়া যাও!"

আমি বলিলাম, "কি সমাচার পিতঃ?"

দেবতা বলিলেন, "তোমাদের হৃদয়ে যে সমাচার অঙ্কিত আছে, ঐ সন্দেশ মানবের নিকট লইয়া যাও।"

আমরা উভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম; দেবদূতেরা দ্বার পর্য্যন্ত আমাদের অনুগামী হইল। তাহারা আমাদিগের দিকে চাহিয়া ছিল।

এক জন বলিল, "দেখ, কেমন সুন্দর বসন।"

আর এক জন বলিল, "প্রথম প্রবেশের সময় আমি ভাবিয়াছিলাম, ইহাদের পরিধেয় মলিন ও কর্দ্দমময়। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এই ধরণী-রূপের সুঠাম দেহখানি স্বর্ণাংশুকে আবৃত।"

কিন্তু আর এক জন বলিল, "চুপ চুপ, ইহাদের মুখের জ্যোতি কেমন চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।"

আমরা মানবের নিকট নামিয়া আসিলাম।

৪। জীবনের পুরস্কার।

এক রমণী ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিতেছিল, যেন জীবন দুই হস্তে দুটি পুরস্কার লইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার এক হস্তে "স্বাধীনতা" ও অপর হস্তে "ভালবাসা"। সে রমণীকে বলিল, "পছন্দ করিয়া একটি লও।"

রমণী অনেক ক্ষণ পরে বলিল, "স্বাধীনতা।" তখন জীবন বলিল, "তুমি ঠিক্ বাছিয়া লইয়াছ। যদি তুমি বলিতে "ভালবাসা", তাহা হইলে তুমি ভালবাসা পাইতে বটে, কিন্তু আমি আর ফিরিয়া আসিতাম না। এক দিন আমি আবার ফিরিয়া আসিব। সে দিন এক হস্তে দুটি পুরস্কারই লইয়া আসিব।"

সীমন্তিনী ঘুমের ঘোরে হাসিয়া উঠিল।

৫। আমোদ-কানন।

বালিকা উদ্যানে কুসুমাস্তরণের উপর ভ্রমণ করিতেছিল; সেখান হইতে কুসুমের সুমিষ্ট গন্ধ আসিতেছিল। তাহার দুই হস্ত পুষ্পে পরিপূর্ণ। কর্ত্তব্য শুভ্র মুখ-কান্তি লইয়া, বালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বালিকার পুষ্পচয়ন বন্ধ হইল। কিন্তু সে সমিতাধরে কুসুম লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল।

কর্ত্তব্য পুনর্ব্বার তাহার সুগঠিত মুখ লইয়া, বালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহার দিকে অনিমেষে চাহিয়া রহিল। বালিকা মুখ ফিরাইল, কিন্তু অব-

শেষে সেই শ্বেতকণ্ঠীর মুখকান্তি দেখিয়া, তাহার হস্ত হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুলটি খসিয়া পড়িল। বালিকা নীরবে চলিয়া গেল।

সে আবার বালিকার কাছে আসিল। বালিকা চক্ষু নত করিয়া অবরুদ্ধ-কণ্ঠে দ্বারের দিকে যাইতেছিল। যাইবার সময় পশ্চাতে উদ্যানের সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল পুষ্পস্তবকের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। কষ্টে তাহার চক্ষে জল আসিল, বালিকা বাহিরে আসিল, উদ্যানতোরণ যেন চিরক্লদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহার অঞ্চলস্থ অনেকগুলি মুকুলের গন্ধে মরুভূমি আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কর্ত্তব্য, বালিকার পশ্চাতে আসিতেছিল। মৃত্যুর মুখের ন্যায় শুভ্র নির্ব্বাক আনন লইয়া, সে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বালিকা তাহার আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, সযত্নসঞ্চিত সমস্ত পুষ্পগুলি হাত হইতে খসিয়া পড়িল। বালিকা শূন্য হস্তে ও শুষ্ক বেদনাবিধুর নয়নে একাকিনী ফিরিল।

আবার সেই নির্ম্মম দেহহীন মূর্ত্তি বালিকার নয়নপথে উদিত হইল, বালিকা কাতরে শূন্য হাত দুখানি দেখাইল। কিন্তু তাহার কঠিনদৃষ্টি বালিকার উপর স্থাপিত। বালিকা ধীরে ধীরে বক্ষ হইতে একটি লুক্কায়িত পুষ্প বাহির করিয়া বালুকার উপর রাখিল। তাহার আর দিবার কিছুই ছিল না। সে মরুভূমির অভিমুখে চলিল। চতুর্দ্দিকে ধূসর বালুকাস্তূপ উড়িয়া পড়িতেছিল।

নায়িকার প্রতি কবি।

তুমি আমি কত ভিন্ন দেখিলে উপরে।—
তুমি—সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি, কল্পনা-বাহিনী,
ছায়াময়ী, মায়াময়ী, স্বপন-মোহিনী,
স্বরগের প্রতিরূপা কবির অন্তরে।
আমি—নিরাশার মূর্ত্তি, মরণ-নিবাসী,
দুরদৃষ্ট সনে বাঁধা সহস্র বন্ধনে;
অনুদিন অনুক্ষণ আপন ক্রন্দনে
হেরি আপনার সর্ব্বাকাঙ্ক্ষার নিশ্বাসি।

এত ভিন্ন, এত দূরে, তবু দুজনায়
অনন্ত সম্বন্ধে বদ্ধ, কি রহস্য ভবি।
লুটিছে বরষা-লীলা ক্ষুব্ধ ঊর্ম্মি ধরি,
ফুটিছে বসন্ত-রুচি শীত-কুয়াসায়।
অন্ধকারের সৃষ্ট শশি, মরের অমরী,
একি শুভ শক্তি-বাণী রূঢ় অভিশাপে!
নরকে জন্মিল স্বর্গ, পুণ্য পাপে তাপে,
মানবে কলাপ রচ বিধি চিত্রোপরি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সহযোগী সাহিত্য।

আমেরিকায়, য়ুরোপে, ইংলণ্ডে, মনুষ্য জাতির জীবন-স্রোতের সহিত, তাহার সাহিত্য-স্রোত সমবেগে ছুটিয়াছে। অলস নাই, ঔদাস্য নাই; বিরক্তি ও বৈরাগ্য নাই; কার্য্য, কার্য্য, কার্য্য, কেবলমাত্র কার্য্য, অবিরত, অবিশ্রান্ত কার্য্য;—পাশ্চাত্যদিগের বিপুল অস্তিত্ব যেন কার্য্যপরায়ণতার প্রচণ্ড, অতিবেগবান কুলাল-চক্রে অষ্ট প্রহর ঘুরিতেছে। জীবন-গতির এই অতিবেগ, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায়, পাশ্চাত্যদিগের সাহিত্যেও সপ্রকাশ। প্রকাশ কেবল কার্য্যের ব্যাখ্যানে নহে; সাহিত্যের পরিমাণে। পাশ্চাত্য ভাষা প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রসব-বীণা। নিত্য, নিয়মিতপ্রসূত সাহিত্য-শরীরই পর্ব্বতপ্রমাণ! তাহা ব্যতীত নৈমিত্তিক আছে; সাহিত্যের সাময়িক ও অসাময়িক সৃষ্টি ও অভিনব আবির্ভাব আছে।

সাহেবদের সাহিত্যানুরাগ।

পান, ভোজন, নিদ্রাগমনের ন্যায়, অধ্যয়নও পাশ্চাত্যদিগের দৈনিক জীবনের একটি অনিবার্য্য ক্রিয়া, অধ্যয়ন ব্যতীত তাঁহারা এক মুহূর্ত্ত কাল অতিবাহিত করিতে পারেন না বলিলেও বেশী অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা পানকালে অধ্যয়ন করেন, আহার করিতে করিতে অধ্যয়ন করেন; প্রত্যেক অন্ন-গ্রাসের সহিত, পৃথিবীর পাঁচ সাতটা কবিয়া সংবাদ, কোনও না কোনও একটা তথ্য, তাহাদের উদরস্থ হয়। শয়ন, উপবেশন, বিশ্রামে ত অধ্যয়ন আছেই, সাহেবেরা ছুটিতে ছুটিতেও পাঠ করেন। অনবরত কার্য্যপরায়ণ ও চিন্তাশীল লোকের পক্ষে অধ্যয়নই এক প্রকার বিশ্রাম। কাজেই য়ুরোপ আমেরিকার লোক যেমন অতিশয় কার্য্যপ্রবণ, তেমনি অতিপঠনশীল। প্রতি দিন প্রত্যূষে উঠিয়া নূতন সাহিত্য চাই, নূতন নূতন সংবাদ চাই; বিশ্রামকালে অভিনব 'নবেল' চাই। নহিলে পাশ্চাত্য জীবন অচল। কারা-কয়েদীকে পড়িতে না দেওয়াই, তাহার পক্ষে কারাগারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কঠোর শাস্তি। নরকের নিদারুণ যাতনা বরং শ্রেয়, কিন্তু নবকে নবেল নাই, আর সংবাদপত্র নাই, শুনিয়া, আমেরিকায়, একবার গির্জ্জা শুদ্ধ লোক শিহরিয়া উঠিয়াছিল!! একমাত্র ইংলণ্ডেই, প্রতি সপ্তাহে সংবাদপত্র দ্বারা যে বিপুলশরীর সাহিত্যের সৃষ্টি হয়,—আমাদের সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যটা তাহার সমান হইতে পারে কি

না সন্দেহ। প্রিয় "প্রচার" পত্রের সূচনায়, শ্রদ্ধাভাজন বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছিলেন যে,—

"দেব ইংরেজীর এক একখানি সাময়িক পত্র, আমাদের দেশের এক এক খানি পুরাণ বা উপপুরাণের তুল্য আকার,—বৈচিত্র্যে, প্রস্থে, গভীরতা এবং গাম্ভীর্য্যে কলান্তজীবী মার্কণ্ডেয় বা অষ্টাদশপুরাণপ্রণেতা বেদব্যাসেরই আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি মনে করিতে পারিতাম যে, রাবণ 'কুম্ভকর্ণ মেগেজিন পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কণ্টেম্পোরারি বা নাইটিন্থ সেঞ্চুরি পড়িতেন সন্দেহ নাই।"

তা, অবস্থা এই রকমই বটে।

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অঙ্গ ও উপাঙ্গের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবলমাত্র ক্রীড়া, কৌতুক, স্পোর্টিং, ফিসিং, প্রভৃতি মৃগয়া ও শিকার সম্বন্ধে সাহেবদের যে সাহিত্যটা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সমস্ত পুস্তক পত্রিকাগুলি একত্র করিলে, বোধ হয়, ধবলগিরির চূড়াকেও ছাড়াইয়া উঠে। কিন্তু ক্ষান্ত নাই, প্রতি ক্ষণেই উহা কাঁপিয়া উঠিতেছে।

প্রয়োজনের পরিমাণানুসারেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অন্নাধিক উৎপত্তি। পাশ্চাত্যদিগের যে প্রকার প্রবল সাহিত্যতৃষ্ণা, সে তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবারও তেমনি প্রকাণ্ড উপায়;—সাহিত্য-সমুদ্রের ব্যবস্থা। লণ্ডন সহরে প্রতি দিন স্বতন্ত্র প্রকৃতির শতাধিক টন সংবাদ ও সাময়িকপত্র অধ্যয়নের পর আবর্জ্জনারূপে একত্রিত হইয়া, নূতন কাগজে পুনর্ব্বার পরিণত হইবার জন্য কাগজের কলে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহাতেই বিবেচনা করুন—অতি অল্প সময়, একটিমাত্র দিনের ব্যবহারের জন্য, কত বড় একটা বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। শিক্ষা, রুচি, স্বার্থ ও অবস্থানুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোকের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রকম সংবাদ ও সাময়িকপত্র; পুস্তক ও পুস্তিকা। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবক,—সকলেরই আপন আপন আবশ্যক-অনুরূপ নিত্য ও নৈমিত্তিক সাহিত্য। আমরা এদেশে বহুদিন সংবাদ ও সাময়িকপত্রের কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও, অদ্যাপি অনেক বিলাতি কাগজের নাম পর্য্যন্তও জানি না।

পৃথিবীর নানা অংশে ইংরাজি ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত সংবাদপত্রাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবলমাত্র পুস্তকের কথাই ধরুন। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের বিগত দুই মাসের কথা যাউক; ইংলণ্ডের ভিন্ন স্থানের কথাতেও কাজ নাই;—এক লণ্ডনেই প্রতি দিন কত পুস্তক প্রকাশিত হয়? লণ্ডননগরে প্রতি দিন যত নূতন পুস্তক ও পুরাতন পুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহার কেবল প্রধান প্রধান গুলির মাসিক ও সাপ্তাহিক

তালিকা ও সমালোচনামাত্রই আমরা দেখিতে পাই;—কিন্তু তাহাই এক বিরাট ব্যাপার। কেবল সংখ্যামাত্রের সেই বিরাট মূর্ত্তি; তাহাদের আকার ও আভ্যন্তরিক স্বরূপ প্রভৃতির ত কথাই নাই। বিগত দুই মাসে প্রকাশিত প্রধান প্রধান পুস্তকের তালিকা কিরূপ, দেখা যাউক। গত ফেব্রুয়ারি মাসে একমাত্র লণ্ডন হইতে কয়েক জন মাত্র সম্ভ্রান্ত পুস্তকপ্রকাশক কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রধান প্রধান পুস্তকের সংখ্যা ৮৮ খানি; গত মার্চ মাসে ৬৯ খানি। মনে রাখিবেন, ইহা বৃহদাবতন ও বিশিষ্টের মধ্যে বিশিষ্টতর পুস্তকেরই তালিকা। এক এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের পুস্তকতালিকায় আমরা ৪১ খানি প্রধান প্রধান পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিতে পাইতেছি। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নূতন পুস্তক, যেগুলি পুরাতন পুস্তকের নূতন সংস্করণ, তাহাও নূতন ধরণে সম্পাদিত, সম্পাদকদিগের নিজের অনেক নূতন আলোচনা ও গবেষণায় পূর্ণ। এই সকল পুস্তক শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত।

বিবিধ শ্রেণীর বিবিধ গ্রন্থ। } ইহাতে সুকুমার সাহিত্য ও সূক্ষ্মশিল্পসম্বন্ধীয় পুস্তক আছে; জীবনচরিত, ইতিহাস, সন্দর্ভ ও সমালোচনা আছে। মনো-বিজ্ঞান, জড়-বিজ্ঞান ও প্রাণীবৃত্তান্ত আছে; ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ভূগোল, ধর্ম্ম-বিষয়ক ও শিক্ষা-বিষয়ক পুস্তক আছে; স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞান আছে; অভিধান, "এনসাইক্লোপিডিয়া" ও "বেফারেন্স" পুস্তক আছে। রাজ-নীতি, অর্থনীতি, আইন, অঙ্ক ও ইঞ্জিনিয়ারি, এবং অন্যান্য আরও নানা রকমের বই আছে। কাব্য, নাটক, নবেল ত আছেই। নবেলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক।

বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে, ইংরাজি সাহিত্যে অবিশ্রান্ত নূতন সৃষ্টির একটু আভাস, একটা স্থূল দৃষ্টান্ত দিবার জন্য, আমরা উপরি-উক্ত কথাগুলির উল্লেখ করিলাম। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের এই খর, তীব্র স্রোত কোন মুখে যাইতেছে? তাহার

ইংরাজী সাহিত্যের স্রোত-গতি। } গতি ও প্রকৃতি কিরূপ? তদ্দ্বারা আধুনিক ইংরাজি সাহিত্য মোটের উপর কি প্রকার দাঁড়াইতেছে? আমূল আলোচনা করিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা করা আমাদের অসাধ্য। এ সম্বন্ধে কোনও ফরাসী সাময়িক পত্রে (*Revue des Revues*) যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি। বলা আবশ্যক যে, এই অভিমত সাধারণতঃ কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে।

ফরাসী পত্রে, ইংরেজ লেখক কর্ত্তৃকই, ইংরাজি-সাহিত্য সম্বন্ধে অভিমত

ব্যক্ত হইয়াছে! লেখকের বিবেচনায়, কবিবর টেনিসনের মৃত্যুর পর হইতে ইংরেজি সাহিত্যে অপর এক অভিনব যুগের (epoch) গণনা আরম্ভ হওয়া উচিত। এ যুগ, বিগত ২০।৩০ বৎসর হইতে টেনিসনের জীবদ্দশাতেই আরব্ধ হইয়াছে। টেনিসনের মৃত্যুতে যে যুগ সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা লেখকের বিবেচনায়, ইংরেজি সাহিত্যে সবিশেষ আবশ্যকীয় যুগ এবং উৎপাদিকা শক্তিতেও উহা অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে, বিগত কতক কাল হইতে যে নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইংরেজি সাহিত্য বিপুলবিস্তৃত ও বৃহদায়তনবিশিষ্ট হইতেছে বটে; কিন্তু তাহার অন্তঃসারের হ্রাস হইতেছে। লেখকের বিবেচনায়, আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য বিস্তারে বৃহৎ,—কিন্তু অন্তঃসার ও ওজনে হালকা। এখনকার এক এক জন নবেল-লেখক, বিশেষতঃ নবেল-লেখিকা বিবেচনা করেন, (ইঁহাদের মধ্যে অভিমতই এইরূপ) যে, স্বপ্রণীত নবেলের সংখ্যাধিক্যই শ্রেয়ঃ,—দুই চারিখানি উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী নবেল লেখা অপেক্ষা দশ বিশ ডজন চলনসই নবেল রচনা করাই বাহাদুরী। ইহাতে অর্থোপার্জ্জনও অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। কিন্তু সেই আধিক্যের অনুসারে, নবেলে শিল্প-নৈপুণ্যের পরিমাণ ইদানীং নিতান্তই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। এখনকার কাব্য উপন্যাস আর শিল্প-সৌন্দর্য্যে সুশোভিত নহে, এক একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট ভারাক্রান্ত। সাহিত্যের ন্যায় চিত্র-শিল্পেও এই ভাব ঘটিয়াছে। চিত্রকর আর বড় সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করেন না; কেবল উদ্দেশ্য-অঙ্কন করেন, ইত্যাদি।

ইংরেজী সাহিত্যে অভিনব যুগ।

ইংরেজি নবেলের লঘুত্ব।

এ সম্বন্ধে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের নাটক নবেলের অবস্থা কি, আমরা উল্লেখ না করিলেও, বুদ্ধিমান পাঠকের মনে স্বতঃ উদিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব, ইহা ইংরেজি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ হইলেও, এ সম্বন্ধে একটা কথার আলোচনা করা একান্ত অন্যায় হইবে না। বাঙ্গালী নবেল-লেখকদিগের মধ্যে, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ত দূরের কথা, সৌন্দর্য্যবোধই অতি অল্প লোকের আছে। যাঁহারা নবেল লিখিতে কিয়ৎপরিমাণে সক্ষম, এবং যে কেহ কেহ উহাতে কৃতিত্ব লাভও করিয়াছেন; তাঁহারাও ইদানীং এক একটা উদ্দেশ্যের ফেরে বিষম বাঁধা পড়িয়া গিয়াছেন। সে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা সুকঠিন। সুতরাং লিখিবার সময় সাহিত্যও মনে থাকে না; শিল্পও মনে থাকে না; শিল্প সাহিত্যের সৌন্দর্য্যও মনে থাকে না; মনে থাকে কেবল একটা উৎকট

বাঙ্গালা নবেলে বিড়ম্বনা।

উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য, লেখক স্বকৃত চিত্রের আপাদমস্তক বর্ণবিন্যাস করেন; পুস্তকের আগাগোড়া সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই এক-তরফা ওকালতি করেন। এ দৃশ্য বীভৎস, বিবমিষাকর, বিদ্রূপের উদ্দীপক। উপযুক্ত লোকে লিখিলে, লেখার এক প্রকৃতির শিল্প ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্য, সে পথ দিয়াও যায় না; উদ্দেশ্য-সিদ্ধিও অতি অল্প হয়। কিন্তু অনুপযুক্ত লোকের দ্বারা যখন সে কাজটা সম্পন্ন হয়, তখন বাঙ্গলা সাহিত্যকে বাঙ্গালী জাতির সহিত বস্তুতই বদোপসাগরে ডুবাইতে ইচ্ছা করে। বাঙ্গালা নাটক নবেলের বাঁধি উদ্দেশ্য দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, হিন্দু সমাজ-সংস্কার; দ্বিতীয়, হিন্দুয়ানির পুনঃপ্রচার। কিছুকাল পূর্ব্বে সাহিত্যে সমাজসংস্কারের স্রোত অতিশয় খর বহিয়াছিল। সে এমন যে, দুই চারিখানি নবেল ব্যতীত, নাটক নবেল মাত্রেই স্রোত গড়াইয়া চলিয়াছিল। তখন যে পুস্তকে সমাজ-সংস্কারের বুকুনি, হিন্দুসমাজের গ্লানি, স্ত্রী-অবরোধের কাঁদুনি, এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার তাল-ঠুকুনি না থাকিত, সে পুস্তক, পুস্তক বলিয়াই প্রায় গণ্য হইত না; তাদৃশ পুস্তক জন্মিতই না, তাহার আর গণ্য অগণ্য কি? তৎকালে যে দুই চারিখানি উৎকৃষ্ট নবেল অন্য উদ্দেশ্য উপেক্ষা করিয়া, কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও মানবপ্রকৃতির প্রকৃত রহস্যের চিত্রাঙ্কনকল্পে লিখিত হইয়াছিল, তাহা আজও টিঁকিয়া আছে;—সম্ভবতঃ চিরকালই টিঁকিয়া থাকিবে। কিন্তু সেই "সংস্কার"-সংস্পৃষ্ট অসংখ্য নাটক নবেল এখন কোথায়? এখন আবার আর এক রকম অপ্রকৃত প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে; এখন হিন্দুয়ানির হুজুক;—এই হুজুকে হিন্দুসমাজের সর্ব্বগ্রাসী সংস্কারের কোলা-হল কিলিকিলি কৃষ্ণ পাইয়াছে; এখন কসাই-কালীর উপাখ্যানেও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। এখন আর বাঙ্গালী বাবু বীর-রসে নদিয়া, ভারত-উদ্ধারের উদ্ভট গীতি গাইয়া অষ্ট প্রহর গলা সাধেন না; এখন "যমুনা-লহরী" প্রায় জলে নিশিয়াছে; ভারতসঙ্গীত শিকার উপর। এখন সোয়াল-উমাড়-কারীরাও সৌবাদের চিহ্নিত চেলা। তালে বেতালে, কালে অকালে, কেবল "হরিবোল" চলিতেছে। এখন বিরহেও বেদান্তদর্শন; সখীসংবাদেও সাংখ্যপাতঞ্জল। তারকব্রহ্ম নাম, জয়দেবের ছড়া, আর যোগী ঠাকুরদের বীণার ঝঙ্কার নাটক নবেলের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে, প্রায় প্রতি পত্রে বিদ্যমান। নাটক নবেলে ইহা নহিলে, হিন্দুয়ানি যেন ভবিষ্যতের অভাবে অতিসম্পাত করিয়া অতি শীঘ্রই বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে। এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে যত পুস্তক প্রকাশিত

হয়, তাহার প্রায় পনেরো আনা পুস্তকে স্ত্রী-স্বাধীনতার "শতেক খোয়ার"। স্ত্রী-শিক্ষার নাম করিলে, উচ্চশিক্ষাগর্ব্বিত গ্রাজুয়েটও গোঁফ চুমাইয়া গর্জ্জিতে থাকেন। অথচ কথার সহিত কার্য্যের কোথাও কিছুমাত্র ঐক্য নাই। এখনকার গ্রন্থকারমাত্রেই গোলে হরিবোল দিয়া গীতা আওড়ান, ও শাস্ত্রীয় শব্দের অর্থ না জানিয়া পদে পদে তাহার অপব্যবহার করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এ দৃশ্যও বীভৎস, বিরক্তিকর ও বিদ্রূপজনক।

আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের উপরি-উল্লিখিত অবস্থার কারণ, নবেলাদি গ্রন্থের অতিরিক্ত উদ্রেকপ্রবণতা ব্যতীত জনসাধারণের মধ্যে অতিরিক্ত অধ্যয়ন-আকাঙ্ক্ষা, ও তন্নিবন্ধন গভীর ও গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিবার সমর্থ-ভাবও হইতে পারে। সে যাহাই হউক, আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের এই বর্ত্তমান অবস্থার কারণ কি? বলা বাহুল্য, ইহার অব্যবহিত কারণ এবং এক মাত্র কারণ, হুজুগ্। হুজুগ্, আলস্য এবং অনেকানেক পুস্তকপ্রণেতার আত্ম-কার্য্যে অসীম অযোগ্যতা। অন্ততঃ আমাদিগের এই বিবেচনা।

আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে আমরা নূতন প্রকাশিত অভিনব নবেলাদি গ্রন্থের কথাই বলিতেছিলাম। এক্ষণে একটি

পুরাতন পুস্তকের নূতন সংস্করণ।

পুরাতন পুস্তকের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ করিব। এই পুরাতন পুস্তকের নূতন সংস্করণ ও সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে; পরন্তু এই পুস্তক প্রতিভা-প্রসূত; তজ্জন্যই এই প্রসঙ্গ।

উইলিয়ম ব্লেক,—অদ্ভুত কবি।

উইলিয়ম ব্লেক অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি। ব্লেক কবি-শিল্পী ও শিল্পী-কবি। ব্লেক বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি, উভয়েরই চিত্রকর। সৌন্দর্য্যের বর্ণ-কাব্য ও বাক্য-চিত্র, উভয়েরই স্রষ্টা। ব্লেক একাধারে চিত্রকর এবং কবি। তিনি পূর্ণমাত্রায় কল্পনার কবি, পূর্ণ মাত্রায় কল্পনারাজ্যের চিত্রকর। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তাকর্ত্রীটি পর্য্যন্ত,—তাঁহার বিবেচনায় (Imagination) কল্পনা ও কাব্য-রাজ্যের জিনিষ। তাহাতেই জীবের প্রাণ ও পরিত্রাণ। ব্লেক ভবিষ্যদ্বক্তা ও "সিয়ার"—তিনি অদৃষ্ট দেখিতে পান; অজ্ঞের অদৃষ্ট বস্তু বর্ণে অঙ্কিত ও বাক্যে ব্যক্ত করেন। ব্লেক চিত্র নহুষ্য, ইহ সংসারের সাংসারিক বুদ্ধিতে অবোধ্য। তিনি অনন্তঘরা-নিবদ্ধ—নাধাবাদী (Mystic)—ভগবানে বিশ্বাস অটল, ভগবানকে দিব্য চক্ষে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেন, পরলোকস্থিত পদার্থ ও পরলোকগত প্রাণী তিনি ইহলোকেই অবলোকন করেন। কিন্তু তিনি আজন্ম শিল্পী, আজন্ম কবি।

দশ বৎসর বয়স হইতে তিনি সুনিপুণ শিল্পী-চিত্রকর; দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার কবিত্বকুসুম প্রস্ফুট হয়। তাঁহার শিল্প-শক্তি ও কবিপ্রতিভা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং তৎশ্রেণীস্থ কবি ও শিল্পী বিশ্বসংসারে বিরল। তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ, উচ্চতর অনেকে আছেন, কিন্তু তদনুরূপ অতি অল্প অথবা তদনুরূপেরই অভাব। বিশেষতঃ একাধারে শিল্প ও কবিত্বের এ প্রকার সংমিশ্রণ, এক উই-লিয়ম ব্লেক ব্যতীত আর কোথাও নাই। কিন্তু ব্লেক সম্বন্ধে সবিস্তারে কোনও কথা বলিবার স্থান ইহা নয়। তৎপ্রণীত বর্ণ-কাব্য ও বাক্য-চিত্র সম্বন্ধে আমরা কোন কথারই উল্লেখ করিব না। কেবল তাঁহার কাব্য হইতে সাধারণভাবে যে সার সংগৃহীত হয়, তাহাই আমরা তদীয় সম্পাদকের সমালোচনা হইতে, কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতেছি। যে হেতু, পাঠক দেখিবেন যে, অনেক বিষয়েই ব্লেকের বিশ্বাসে ও মতে বিলক্ষণ অভিনবত্ব আছে।

"ব্লেক কবি-কল্পনার আচার্য্য। তাহার মতে কল্পনার দ্বারাই জীবের উদ্ধার হইবে। ব্লেক বলেন—'কল্পনা সঙ্কলন ও সংযোগ করে, বুদ্ধি বিয়োগ ও বিভক্ত করে। কল্পনাই, যথার্থ নাইট। বুদ্ধিই সয়তান। কল্পনা,—অমর্ত্ত পূর্ণ রাজ্য,—তাহার নৈতিক শক্তি ক্ষমা; তাহার বাহ্য-শক্তি 'প্রেম।' মানসিক বস্তুই সত্য এবং নিত্য। যাহা জড়, তাহার প্রকৃত অস্তিত্বেরই অভাব; জড় জগৎ আমার পায়ের ধূলিস্বরূপ, উহা আমার অঙ্গ ও অংশ নহে।"

এ মত য়ুরোপীয় কর্ণে, উদ্ভট বলিয়া অবশ্যই বোধ হয়, কিন্তু ইহার কোনও কোনও কথা হিন্দুর নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। ব্লেক, হয় ত প্রকৃতি-পুরুষ অর্থেই তাঁহার (Imagination) 'কল্পনা' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। হিন্দু "মায়াবাদের" সহিত তাঁহার মতের সামঞ্জস্য না থাকিলেও সাদৃশ্য আছে।

ব্লেকের একটি উক্তি,—

"In Hell all is self righteousness."

আর একটি উক্তি;—

"When any individual regrets error and embraces truth, a last judgement passes upon that individual"

শেষোক্ত উক্তি কতক সহজবোধ্য, কিন্তু প্রথমোক্তটি শক্ত; কিন্তু উভয় উক্তিতেই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান। পুনশ্চ, ব্লেক বলেন;—

'স্বভাব (Nature) আর কিছুই নহে, মানসিক অস্তিত্বের নাম মাত্র। শিল্প, (art) সে অস্তিত্বের অপর নাম, কিন্তু শিল্প স্বভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শিল্প, স্বভাবের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেই, স্বাধীন হইয়া স্বস্থানগমনে সক্ষম হয়।

পৃথিবীর প্রকৃত পরিত্রাণের প্রচারক,—কবি ও শিল্পী। কবি ও শিল্পী, কাব্যে ও শিল্পে পরস্পর ভিন্ন ব্যবহার করিয়া কেবল দেখায় যে, অভাব বা দৃষ্টি, চিদানন্দস্বরূপের বহিঃ-চিহ্নমাত্র। নিয়ত এই ভাব স্মৃতিপথে জাগরিত রাখিয়া চিদানন্দে নিমগ্ন হওয়াই মুক্তি,—অভাবের মৃত্যু বন্ধন-ছেদন।

ব্লেক বলিতেন,—দেবাবেশে তাঁহার কাব্য লিখিত, দৈব-শক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহার চিত্র অঙ্কিত। ব্লেকের ধর্ম্মপত্নী ইহার সত্য সাক্ষাৎ করিতেন। ব্লেকের ভাবাবেশ সর্ব্বদাই যে উপস্থিত হইত, তাহা নহে। সময়ে সময়ে কেবল তাহা আসিত; তখন তাঁহাকে এ পৃথিবীর লোক বলিয়া বোধ হইত না। ব্লেক বলিতেন;—কবিতা ও কাব্যে যাহা দেবাবেশ নহে,—কবি-প্রতিভা নহে,—তাহা কাব্য কবিতা হইতে বাদ দেওয়া উচিত। "All that was not inspiration" should be cast off from poetry.

অতঃপর আমাদের অবলম্বিত প্রথানুসারে সাময়িক পত্রের সার-সংগ্রহ ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা দেওয়া যাইতেছে। বিলাতি পত্রের আলোচনা আগামী বারের জন্য রাখিয়া, এবারে কেবল এ দেশীয় কয়েকখানি ইংরেজি পত্রের কোনও কোনও প্রবন্ধের সার-সংগ্রহ দেওয়া হইল।

মিঃ বিভারিজ কর্ত্তৃক লিখিত মুর্শিদাবাদের ইতিবৃত্তবিষয়ক তৃতীয় প্রবন্ধে, এপ্রিল সংখ্যা কলিকাতা রিবিউর আরম্ভ। এই প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ হইতেই, লেখক সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, মুর্শিদাবাদ জিলার ঐতিহাসিক স্থান সকলের বিস্তৃত আলোচনা করিতেছেন। বর্ত্তমান (তৃতীয়) প্রবন্ধের আরম্ভেই সুলতান সুজার সিংহাসন, মসনদ আলিয়ার কবর ও মুর্শিদাবাদের অবস্থা, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক কানানের উল্লেখ। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে, মুর্শিদাবাদের অতীত গৌরবের এই তিন প্রসিদ্ধ ভগ্নাবশেষ, লেখকের নয়নপথে পতিত হয়। ইহাদের মধ্যে সুলতান সুজার সিংহাসন সম্ভবতঃ (লেখকের বিবেচনায়) মুর্শিদাবাদের উচ্চতম ঐতিহাসিক দৃশ্য। বঙ্গীয় নবাব সুলতান সুজা, সম্রাট সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র; ইহার সময় হইতে মুসলমান বঙ্গেশ্বরেরা সকলেই এই সিংহাসনে উপবেশন করিয়া, রাজ্যশাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। ১০৫২ সালে (খৃঃ ১৬৪১) বোখারার মুসলমান ভাস্কর খোয়াজা নাতোর, সুজার সময়ে এই সিংহাসন নির্ম্মাণ করেন। নির্ম্মাতার নাম ও নির্ম্মাণের

তাবিণ, পাশ্চাত্য ভাষায়, ইহাতে খোদিত আছে। ইহা ১৮ ইঞ্চি উচ্চ ও ছয় ফুট দীর্ঘ,—গোলাকার এক কৃষ্ণ প্রস্তর খোদিয়া এই সিংহাসন গঠিত। মিঃ বিভাবিজ বলেন, উহা যখন সুলতান সুজার প্রথম নবাবী আমলে নির্ম্মিত, তখন নিশ্চয়ই উহা নির্ম্মাণের পর রাজমহলে ছিল; তথা হইতে ঢাকায় যায়, তার পর মুর্শিদাবাদে নীত হয়। কিন্তু, এখন আর তাহার সে আদর—সে গৌরব নাই; এবং বিভাবিজ সাহেব যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে তাহার ঐতিহাসিক সম্মানও যে তাদৃশ কেহ বুঝে, এমন বোধ হয় না। বাঙ্গালার সিংহ-প্রতাপ সুবেদারদিগের সেই মসনদ, মুর্শিদাবাদের নোবাবক মোজিলের এক "বাজালোর" বারান্দায় পড়িয়া রৌদ্র বৃষ্টি খাইতেছে; রেঙ্গ, বাদুড়, চামচিকা এখন তাহার অধিবাসী! কালের এমনি কঠিন হস্ত বটে।

এই সিংহাসনের কৃষ্ণপ্রস্তর সময়ে সময়ে অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হয়। তাহা দেখিয়া মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের লোকের ধারণা যে, সুবেদারি সংহার হওয়ায় সিংহাসন শোকে রোদন করে।

মুর্শিদাবাদ নবাবদিগের পুরাতন অস্ত্রশালায় অদ্যাপি এক কামান পড়িয়া আছে। (কৃষ্ণজী কামান) এই কামানের উপর বাঙ্গালা অক্ষরে, তাহার কারিকর কর্ম্মকার ও খোদ্‌কারের নাম অঙ্কিত আছে। আর নাম অঙ্কিত আছে, কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের। কৃষ্ণচন্দ্রের কামান কি ঘটনায় মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়াছিল, বলা যায় না।

মুর্শিদাবাদের পিরিয়ার প্রশস্ত ময়দান, দুইটি বড় বড় যুদ্ধের ভাগ্য নির্ণয় করিয়াছিল। এই ময়দানে সরফরাজ খাঁ, আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজিত ও হত হন। সে ঘটনা ঘটে ১৭৪০ খৃঃ অব্দে। তাহার পর ১৭৬৩ সালের আগষ্ট মাসে, এই পিরিয়ার মাঠে মেজর এডাম্স পরিচালিত ইংরেজ সৈন্যের সহিত মির কাসিমের যুদ্ধ হয়। সামরু ও আরমানী শকার চালিত মুসলমান সৈন্য বিজিত ও বিতাড়িত হইয়া, সাঁওতাল পরগণার উদয়নালা নামক স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, ইতিহাসপাঠক অবগত আছেন। মিঃ বিভাবিজ পিরিয়ার রণ-প্রাঙ্গণকে পাণিপতের সহিত তুলিত করিয়াছেন।

বাঙ্গালার পাণিপত।

পিরিয়ার রণক্ষেত্রে সেনাপতি গারেস খাঁ সুবেদার সরফরাজ খাঁয়ের পক্ষে (বিপক্ষে নয়,—এ সম্বন্ধে মিঃ বিভাবিজ, ডাক্তার হন্টারের প্রমাদ প্রদর্শন করিয়াছেন।) ঘোরতর সংগ্রাম করেন। গারেস

গারেস খাঁ।

খাঁয়ের বীরত্ব-গীতি মুর্শিদাবাদের অঞ্চলে অদ্যাপি লোকে বিস্মৃত হয় নাই। সে গীত (ডাক্তার হন্টার যেরূপ বলেন) উর্দ্দু ভাষায় নহে, বাঙ্গালা ভাষায়। আলোচ্য প্রবন্ধ হইতে আমরা তাহার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"হায় গো আল্লা বাবিতালা খোদার দিল বেড়ে।
শাবেস খাঁর হবে লড়াই আলিবর্দ্দির সাথে।
হাতি পরে ঝুল দুলিতে ঘোড়া পরে রণে।
আচক মাইর পড়িল এসে শিবিরার মধ্যখানে।
একলা শৌস খাঁ লড়ে আলিবর্দ্দির সনে।"

শাবেস খাঁ বা শৌস খাঁয়ের ভ্রাতা, তাঁহার স্ত্রীও অতিশয় বুদ্ধিমতী ও বীরঙ্গনা রমণী ছিলেন। তিনি অসীম সাহস ও বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শন করিয়া, বর্গির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রী সেনাপতি বালাজীরাও তাঁহার সৎসাহস দেখিয়া বিস্মিত হয়েন ও সৈনিকদিগের হস্ত হইতে তাঁহার সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষা করেন।

আলিবর্দ্দি প্রবঞ্চনা করিয়া, অন্যায় যুদ্ধে সরফরাজকে সংহার করেন। তিনি প্রথমতঃ কোরাণ স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার করেন যে, সরফরাজের সহিত যুদ্ধ করিবেন না। সরফরাজ আলিবর্দ্দির অঙ্গীকারে প্রতারিত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হন ও নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁহার সেই নিশ্চিন্ত অবস্থায় আলিবর্দ্দি সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার শিবির আক্রমণ করেন। সরফরাজ তৎকালে নেমাজ পড়িতেছিলেন। অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া ও আলিবর্দ্দির অঙ্গীকারভঙ্গ দেখিয়া, মহা আশ্চর্য্য হইলেন; কিন্তু উৎপন্নবুদ্ধি হারাইলেন না। তৎক্ষণাৎ এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া, বিদ্যুৎবৎ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন; শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহ-বিক্রমে লড়াই করিতে লাগিলেন। কিন্তু কতক্ষণ এই অসম সংগ্রাম চলিতে পারে? হস্তিচালক সবিনয়ে বলিল, "প্রভু, ভাগিরথীর অপর পারে নিরাপদ স্থানে আপনাকে লইয়া যাই।" সরফরাজ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া মাহুতের গালে চড় মারিয়া উত্তর দিলেন,—"না, কখনই না, এই কুকুরদিগের আমি কখনই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিব না।" কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া, সরফরাজ নিহত হন।

কিন্তু আলিবর্দ্দি প্রকৃত কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন নাই। প্রতিজ্ঞাস্পৃষ্ট পদার্থসম্বন্ধেই মহা প্রবঞ্চনা খেলিয়াছিলেন। কোরাণ বলিয়া

আলিবর্দ্দির কোরাণ। } একখানি ইষ্টক, সুবর্ণবস্ত্রে আবৃত করিয়া, তাহাই স্পর্শ করিয়াছিলেন। অতএব, যে প্রতিজ্ঞার প্রথম অঙ্কুরেই প্রবঞ্চনা, তাহা ভঙ্গ করিতে কত ক্ষণ লাগে? প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবার জন্যই ত তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

মিঃ বিভারিজ বলেন, দিল্লীর সম্রাট বাবর ও আকবরের বংশধরদিগের মত বাঙ্গালার সুবেদারগণ মদিরার উৎসন্ন যান নাই। তাঁহারা বিনষ্ট হইয়াছিলেন,

সুরা, সুন্দরী, ও সুবেদার। } প্রধানতঃ বিলাসে ও বিলাসিনীসহবাসে। বাঙ্গালার বাদসাদিগের জেনানা, বিবি ও উপবিবিতে অন্তরঙ্গ পূর্ণ থাকিত। সরফরাজ খাঁয়ের ১৫ শত উপপত্নী ছিল। কেহ কেহ বলেন ১৫ শত নয়, ১৫ সহস্র। সেরাজ-উদ্দৌলার সম্ভোগার্থেও সহস্র সহস্র সুন্দরী ছিল। বাঙ্গালার সুবেদারদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শক্তিমান ও সমর্থ শাসয়িতা, মুর্শিদকুলি খাঁ ও আলিবর্দ্দি খাঁই কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন না। কিন্তু আলিবর্দ্দির কন্যারা খুব উচ্ছৃঙ্খলস্বভাবা ছিলেন। মুর্শিদকুলির কন্যা এবং সরফরাজের মাতা, জিনাতন নিসা, সতী সাধ্বী, বুদ্ধিমতী ও পবিত্রা রমণী ছিলেন। কিন্তু পতি-প্রেমে সুখিনী হয়েন নাই। তাঁহার স্বামী,—সরফরাজের পিতা,—সুজা-উদ্দৌলা খুব সক্ষম লোক ছিলেন বটে; কিন্তু অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ। মির কাসিমেরও বহু বহু বেগম ছিল। বিপদকালেই তিনি তাহাদের অনেককে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার সুবেদারেরা সকলেই ঘোর আনা মুসলমান। বিশেষতঃ, মদিরাসম্বন্ধে ইহাঁরা প্রকৃত মুসলমানবৎ ছিলেন। সিরাজ-উদ্দৌলা প্রথমতঃ অতিরিক্ত মদ্যপান করিতেন বটে; কিন্তু আলিবর্দ্দির মৃত্যুশয্যায় অঙ্গীকার করার পর, আর কখনও মদ্যপান করেন নাই। দিল্লীর মোগলবংশ কিন্তু মদিরায় বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। মিঃ বিভারিজ বলেন, ইহার একটা প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা পুরোপুরি মুসলমান ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন আধা-হিন্দু, আধা-মুসলমান। সুতরাং সুরাসক্ত ছিলেন। কিন্তু মুসলমানের জন্য হিন্দুর পক্ষেও সুরা সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য। তবে হিন্দু মুসলমানে মিশ্রিত নোয়াকা বলি মদিরার কারণ হয়, সে স্বতন্ত্র কথা।

ইতিহাসজ্ঞ জানেন, মুসলমান সম্রাট ও সুবেদারদিগের বাহিনীতে অল্প বিস্তর য়ুরোপীয় সৈনিকও ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। আরমানী আবসিনিয়ানও সৈন্য-

পাচু কিবিন্দী। } মধ্যে ছিল। হাফ্‌সী কাব্রীরাও অগ্নি-পল্টনে ছিল। পিরিয়ার প্রথম যুদ্ধে এক পাচু কিবিন্দীর নাম পাওয়া যায়। পাচু কিবিন্দী

পর্টুগিজ। এণ্টনী ভাক্তারের পুত্র; সবফরাজ খাঁয়ের কামানাধ্যক্ষ হইয়া, আলিবর্দ্দির সৈন্যের সহিত পাঁচু প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়াছিলেন; যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, পলাইয়া পাঁচুর প্রাণ বাচিয়াছিল।

ইংরেজের কুঠি কাশিমবাজারের পতনবৃত্তান্তে এ প্রবন্ধ শেষ হইয়াছে। মিঃ বিভারিজ, এই বৃত্তান্ত, "বৃটিশ মিউসিয়মে" রক্ষিত, তৎকাললিখিত কাগজপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এ বৃত্তান্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত, সাক্ষাৎ-দর্শী কর্ত্তৃক, দৈনিক রোজনামচার আকারে লিখিত। ফলতঃ, সারার, গ্রন্থ ও তাৎকালিক অন্যান্য অপক্ষপাত বিবরণে যত দূর দেখা যায়, তাহাতে সিরাজ উদ্দৌলার ইংরেজ আক্রমণ ও ইংরেজের প্রতি অত্যাচার, একেবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয় নাই। মেঘ অনেক দিন হইতেই আকাশে উঠিয়াছিল। এবং সে মেঘের সৃষ্টিকল্পে ইংরেজ কোম্পানীর অপরাধ বড় কম ছিল না। মেঘ তাঁহাদেরই দোষে জন্মিয়াছিল; তাঁহাদেরই তাচ্ছীল্যে বাড়িয়াছিল। তাঁহাদের দুরদৃষ্ট নহে, স্বতাদৃষ্টবশতই বোধ করি, মেঘ বর্ষিয়াছিল। নহিলে ভারতে, যবে, মুসলমান রাজত্ব আরও কত কাল থাকিত, কে বলিতে পারে? কাশিমবাজার ও কলিকাতা আক্রমণের পূর্ব্বে, সিরাজ উদ্দৌলার দরবারের সহিত ইংরেজ বণিকদের সম্বন্ধ কি অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা মিঃ বিভারিজ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত নিম্নলিখিত রোজনামচা হইতে বেশ বুঝা যায়।

"The 10th July 1756 * * * Mr. Watts acquainted the Governor and Council that he was told from the Durbar, by order of the Nawab, that he had great reason to be dissatisfied with the late conduct of the English in general. Besides, he had heard, they were building new fortifications near Calcutta without ever applying to him or consulting him about it, which he by no means, approved of, for he looked upon us only, as a sett of merchants, and therefore, if we chose to reside in his dominions under that denomination we were extremely welcome, but as Prince of the country, he forthwith insisted on the demolition of all those new buildings we had made. The Nawab at the same time sent to the President and Council, Fuckeer Tongar with a message much to the same purport which as they did not intend to comply with, looking upon it as a most unprecedented demand, treated the messenger with a great deal of ignoming and turned him out of their bounds without any answer at all; upon which a second messenger was sent to Mr. Drake to this effect, that unless upon receipt of that order, he did not immediately begin and pull down those fortifications, he would come down himself and throw him in the river. This messenger was treated as ridiculously as the other and an answer sent agreeable thereto as likewise by a messenger that was

sent some time before to demand the delivery up of Kissendas seat. In the mean time we received intelligence that Cossimbazar factory was surrounded with a large body of forces and a great quantity of cannon, but the Council were determined not to submit to the terms proposed accordingly directed the chief at Cossimbazar to make the best defence he could and promised him succours as soon as the season would admit of it."

বার বার ইংরাজ বণিক কোম্পানীর কলিকাতা কৌন্সিল নবাবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন, আদেশ অমান্য করিলেন, নবাব-প্রেরিত দূতের অপমান করিলেন; এ সব কথা উপরি-উদ্ধৃত সাক্ষাৎ-দর্শী সাহেব লেখকের ডায়েরী হইতেই প্রকাশ হইতেছে। অতএব এমত অবস্থায় সিরাজ-উদ্দৌলার কোম্পানীর কুঠী ও দুর্গ আক্রমণ করা ব্যতীত আর উপায়ান্তর ছিল না, ইহা অগত্যাই স্বীকার করিতে হয়।

এই অপমানের প্রতিশোধ, সিরাজ-উদ্দৌলা অপমান ও অন্যান্য শাসন দ্বারা প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি রাজনীতির অতি প্রশস্ত নিয়মানুসারেই ইংরেজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে নির্ম্মূল করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন; সকল রাজাই এরূপ অবস্থায়, এরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। যিনি না করেন, তিনি কাপুরুষ; রাজতক্তে বসিবার উপযুক্ত নহেন।

কাশিমবাজার কুঠীর প্রধান কুঠিয়াল ওয়াটস্ সাহেব যেরূপে নবাব দরবারে {ওয়াটসের অপমান।} বন্দী নীত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা উপরি-উক্ত ডায়েরী হইতে কিঞ্চিৎ অনুবাদিত করিয়া, এ প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

"১লা জুন। রাজবল্লভ * চারি জন জমাদার সঙ্গে লইয়া, ওয়াটসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইহারা সকলেই ওয়াটসকে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরামর্শ দিলেন। বলিলেন, নবাবের সহিত যাইয়া সাক্ষাৎ করিলেই সকলেই সব গোল মিটিয়া যাইতে পারে। ওয়াটস্ ইহার উত্তরে বলিলেন যে, নবাব যদি তাঁহাকে (ওয়াটসকে) প্রসাদস্বরূপ পান পাঠাইয়া দিয়া অভয় দান করেন, তাহা হইলে তিনি নবাব-দরবারে যাইতে সম্মত আছেন। রাজবল্লভ চলিয়া গেলেন। মৌল্য পানবাস করিয়া পান প্রসাদ লইয়া আসিলেন। ২রা জুন সায়ংকালে মিঃ ওয়াটস্ ও ছাল্টার্স বর্ষর, হাকিম বেগের পুত্রের সহিত নবাবদরবারে গেলেন। কুঠীর সাহেব সৈনিকেরা সকলেই ওয়াটস্‌কে প্রতি নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুনিলেন না। হাকিম বেগ, রাজবল্লভ ও অন্যান্য ব্যক্তির পরামর্শানুসারে, তিনি (মিঃ ওয়াটস্) পলায়নীকৃতবান ও কৃত-

* ওরফ্ নিমেক— বার দুর্ব্বৃত্ত।" ইনি নবাবের দেওয়ান।

চলি হইয়া, হাতে গলায় কমাল বাঁধিয়া, দীন হীন পোষাক পরীর ন্যায়, বিনীত ও অবনত হইয়া, নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নবাব তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার ও অপমান করিলেন। তাঁহাকে সম্মুখ হইতে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিলেন। হাকিম বেগের পুত্র এই সময়ে ওয়াটসের জন্য নবাবের নিকট সুপারিস করিলেন। বলিলেন, এই ওয়াটস লোকটা মন্দ নয়; হুজুরের কদম চুম্বন করিবার জন্য হাত বাঁধিয়া হুজুরে আসিয়াছে। তখন ওয়াটস্‌কে হাকিম বেগের শিবিরে লইয়া যাইবার হুকুম হইল। ওয়াটস তথায় যাইয়া মুচলকার খাদ্দর করিলেন। মুচলকার সর্ত্ত সংক্ষেপতঃ এইরূপ যে, কোম্পানী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী খড়ের মুরচা তাঙ্গিয়া ফেলিবেন। রাজ্যের কোনও অপরাধীকে আশ্রয় দিয়া রাখিতে পারিবেন না, দস্তকের সমস্ত টাকা ও তাহার খেসারত হিসাব মোতাবেক আদায় করিবেন, এবং আপন জমিদারীতে অত্যাচার করিয়া প্রজা লোকের উৎপীড়ন করিবেন না।'

মিঃ বিভাবিজের এই প্রবন্ধ ব্যতীত, আরও দুইটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ কলিকাতা রিবিউতে চলিতেছে। এক সঙ্গে তিনটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ, রিবিউর সাধারণ পাঠকদিগের কতটা প্রীতিকর হয়, বলা যায় না। আমরা শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দেব লিখিত, হুগলীর অতীত ও বর্ত্তমান ইতিবৃত্ত বিষয়ক ৫ম ও ৬ষ্ঠ প্রবন্ধের অল্পমাত্র আলোচনা করিব।

১৮০৮ সালে হুগলী জিলার ডাকাতের অত্যন্ত উপদ্রব হয়। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় হইতেই বঙ্গদেশে অত্যন্ত দস্যুভীতি উপস্থিত হয়। এই ভীতি বহু কালাবধি সমানে প্রবল ছিল; মধ্যে উহা প্রশমিত হয়; কিন্তু, এত কাল পরে এখন উহা আবার দেখা দিতেছে। আজ কাল প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ডাকাতির সংবাদ, বঙ্গের কোনও না কোনও স্থান হইতে, এমন কি রাজধানীর অতি নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতেও, পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু এখনকার কথা আমরা বলিতেছি না। ১৭৮০ সালে এক কলিকাতাতেই ডাকাত কর্ত্তৃক পনের হাজার গৃহ দগ্ধ ও দুই শত মনুষ্য হত হয়। এই সময়ে সাহেবরাও সতত দস্যুভয়ে ভীত থাকিতেন। ধন-প্রাণ লইয়া কেহই নির্ব্বিঘ্ন ছিলেন না। এই সময়ে শ্যাম মল্লিক নামে এক সর্দ্দার শ্যাম মল্লিক ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিল। এই ব্যক্তি ডাকাতের দলপতি ছিল। ত্রিবেণীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাটীতে, এই ডাকাত-সর্দ্দার দল বলের সহিত একবার ডাকাতি করিতে যায়। কিন্তু পণ্ডিত পঞ্চানন পলায়ন করাতে, তাহারা তাঁহার বাটীতে ডাকাতি না করিয়া, চলিয়া আসে। পণ্ডিতপ্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ন্যায় প্রচুর অর্থও সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত কৃপণ

ছিলেন। অর্থের সদ্ব্যবহারের কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবার জন্যই শ্যাম মল্লিক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ না পাওয়াতে, তাঁহার সঞ্চিত অর্থ স্পর্শ করে নাই। শ্যামের এই সুযশ কাহিনী তাহার উদারতার পরিচায়ক বটে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হুগলী অঞ্চলেই ডাকাতের অত্যাচার উপদ্রব অপেক্ষাকৃত অধিকতর হয়। গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় পুলিস ইহার প্রশমনকল্পে

রাধা ডাকাত। } নানবিধ উপায় ও সতর্কতা অবলম্বন করেন। ডাকাত রাধা ডাকাত ধরা অর্থাৎ গোয়েন্দা-গিরি পদ্ধতি এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। এই সময়ের প্রসিদ্ধ দস্যু "রাধা ডাকাত" ও "বিশ্বনাথ বাবু"। রাধার ভয়ে গঙ্গা পারের লোক প্রাণ হাতে করিয়া বসিয়া থাকিত। কসিবার আরকেও লোকে তত শঙ্কা করে না;—রাধাকে যত ভয় করিত। রজনীযোগে তখন রাধারই রাজত্ব ছিল। রাধার বুদ্ধি-কৌশল, বলবীর্য্য ও বীরত্ব অতি বিখ্যাত। রাধা প্রকৃত প্রস্তাবেই এক জন বীর ছিল। রাধা পঞ্চাশবর্ষে মৃত হয়। হুগলীর মাজিষ্টর-জজ তাহার ফাঁসির হুকুম দেন। ফাঁসি হয়। কিন্তু সাহেবরাও তখন সাধারণ সংস্কারের অতীত ছিলেন না। রাধা ডাকাতের মাতা ডাকিনী বিদ্যায় ব্যুৎপন্না বলিয়া কথিত ছিল। পাছে সে রাধার মৃত দেহ সঞ্জীব করে, এই শঙ্কায় রাধার শব অতিশয় সংগোপনে দগ্ধ করা হইয়াছিল।

গঙ্গার পূর্ব্বে পারে ছিল বিশ্বনাথের রাজত্ব। বিশ্বনাথ জাতিতে বাগ্দী ছিল। কিন্তু বলবীর্য্য, বিক্রম, বুদ্ধিকৌশল ও বীরত্ব তাহার এমনি ছিল, এবং

বিশ্বনাথ। } পক্ষান্তরে, দীন দুঃখীর দুঃখ কষ্ট ঘুচাইতে সে এতই তৎপর ছিল যে, লোকে তাহাকে বিশ্বনাথ বাবু বলিত। বিশ্বনাথ ধনীর ধন লুণ্ঠন করিয়া দুঃখী পরিবারে বিতরণ করিত। স্বভাবে ও সমাজের অসমান গঠনে অনেককে সাম্যবাদী করে। বিশ্বনাথ বাবু বোধ করি, অজ্ঞাতে সাম্যবাদী Socialist ছিল। বৈদ্যনাথ ও পীতাম্বর নামে ডাকাত সম্প্রদায়ের দুই প্রচণ্ড সর্দ্দারও এই সময়ে আবির্ভূত হয়। কিন্তু খ্যাতিতে ইহারা বিশ্বনাথের নিম্নস্থানীয়। ১৮০৮ সালে অনেক নদীয়ার ডাকাত মৃত ও ফাঁসিকাষ্ঠে নিহত হয়। ডাকাত ও ডাকাতি গর্ব্বের বাহিনীর নহে; কিন্তু বঙ্গীয় ডাকাতসম্প্রদায়ের ধ্বংসে, বাঙ্গালীদের মধ্যে আর বীর জন্মিতেছে না। বীরত্ব দেখাইবার উপযুক্ত অবসরই যে নাই; অধিকার ও অবলম্বনই নাই।

উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পিতা, প্রসিদ্ধ ও অবস্থাপন্ন

৺নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এই সময়ে (১৮৩০—৩১) হুগলী কালেক্টরীর

জয়কৃষ্ণ বাবু আমলা। } মোহাফেজ দপ্তর ছিলেন। জয়কৃষ্ণ যোগ্য লোক, ইহা বলাই বাহুল্য। যোগ্যতার জন্যই তিনি মোহাফেজ হইয়াছিলেন; যোগ্যতার জন্যই তিনি দেশের ও দশের মধ্যে একজন গণ্য বলিয়া গণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্যতার জন্যই, হুগলীর কলেক্টর মিষ্টার সেমী মহাকেজের করণীয় সেরেস্তার মামুলী কার্য্য সেওয়ার তাঁহাকে আর একটি গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন। সে কার্য্য, চুঁচড়ার প্রজাদিগকে দিনে-নারি পাট্টার পরিবর্ত্তে ইংরেজী পাট্টা প্রদান। এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের কড়া হুকুম তামিল করিয়া, জয়কৃষ্ণ বাবু প্রজাদিগের আন্তরিক অপ্রীতিভাজন হন। তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে উৎকোচের অভিযোগ করে। কমিসনর ও রেবিনিউ বোর্ডের বিচারে, জয়কৃষ্ণ সরকারী চাকুরী হইতে বরতরফ হন। কিন্তু লক্ষ্মী যাঁহার জীবনসহচরী হইবেন বলিয়া লেখাপড়া, তাঁহার চাকুরী থাকি লেও যাহা, না থাকিলেও তাই। জয়কৃষ্ণ বাবুর চাকরী যাওয়ার পরও সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহাকে কি প্রকার আনুরক্তির সহিত "আঁকড়াইয়া" ছিলেন, তাহা সকলেই জানে। জয়কৃষ্ণের বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক সূক্ষ্মদর্শন এতই ছিল যে, লোকে তাঁহাকে "বঙ্গীয় ফলেট" বলিত। জয়কৃষ্ণের প্রসাদাৎ কাজ প্যারীমোহন রাজা। ইহা প্যারীমোহনেরও প্রীতি ও গৌরবের বিষয়।

এই সময়ে বড় বড় সাহেব জজেরাও উৎকোচগ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেন না। হুগলীর জন মার্টীন এই সময়ে উৎকোচগ্রহণের কতকগুলি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা রিবিউর অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কির ভ্রমণ-পুস্তকের সমালোচনা সবিশেষ চিত্তাকর্ষক। ম্যাডাম, ভারতের অরণ্যে ও ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কি।} পর্ব্বতে পরিভ্রমণকালে, স্বদেশে (রুসিয়ায়) স্বসম্পর্কীয় ভাবার যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাই সংগৃহীত ও ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়া, এই পুস্তক। পুস্তকের নাম "From the caves and jungles of Hindustan" এই পুস্তক ইংরেজী সাহিত্যে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইংরেজ সমালোচক ইহার এক এক স্থানের রচনা-নৈপুণ্য ও কাব্য-প্রবণতা দেখিয়া, ম্যাডামকে, এডগার এলেন পো, বুলওয়ার লিটন,—এমন কি গেটের সহিত তুলিত করিয়াছেন। ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কি বস্তুতই এ যুগের এক বিচিত্র রমণী। ইহার সর্ব্বদিক প্রসারিণী প্রতিভা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সুবিশাল লিপি-শক্তি,

প্রেততত্ত্ববাদের প্রচণ্ডতাব সংমিশ্রিত হইয়া, ইহাকে এক অতি অভূতপূর্ব্ব, অবোধ্য পদার্থে পরিণত করিয়াছিল। ম্যাডাম ব্লাভটস্কি একদিকে বিদুষী, বৈজ্ঞানিক, কবি, দার্শনিক, গ্রন্থকর্ত্রী, সাহিত্যামোদে রতা, সুরসিকা সামাজিক রমণী; অপর দিকে তিনি, ডাকিনী-যোগিনী-প্রেতিনী-মন্ত্র-সিদ্ধা সন্ন্যাসিনী, শিষ্য-সেবক-পরিবৃতা, অভিনবসম্প্রদায়সংগঠন-কারিণী, অনন্ত-স্বপ্ন-নিমগ্না, প্রেততত্ত্ববাদপ্রচারিণী, ত্রিকালজ্ঞা ভৈরবী। এ দেশীয় লোকের প্রতি ম্যাডামের সহানুভূতি, বিশেষতঃ এ দেশীয় পুরাতন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি, আমাদিগের নিকট, তাঁহার অন্যান্য গুণ ও জ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর প্রীতিকর। ম্যাডামের মত ও বিশ্বাস, তাঁহার লিখিত গ্রন্থ ও গঠিত সম্প্রদায়, ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা ভবিষ্যতই বলিতে পারে। তবে, তিনি নিজে যে এই অবিশ্বাসপ্রবণ যুগের এক আশ্চর্য্য পদার্থ; সে বিষয়ে বোধ করি, কাহারও সংশয় হইতে পারে না। আলোচ্য পুস্তকের একটি স্থানমাত্র আমরা কলিকাতা রিবিউ হইতে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। বোম্বাই পিঞ্জরাপোলের বিষয় বিস্তর বর্ণনা করিয়া ম্যাডাম লিখিতেছেন;—

"তার পর আমরা দেখিলাম, এক সন্ন্যাসী আপন শরীরের রক্ত পতঙ্গদিগকে পান করাইতেছেন। তিনি প্রচণ্ড রৌদ্রে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ মক্ষিকা, মশক, পিপীলিকা ও ছারপোকায় পরিপূর্ণ। বন্ধক, পিঞ্জরাপোলের শত শত পশু ও পতঙ্গ আমাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ইহারা সকলেই আমাদের ভ্রাতা; কিন্তু যুরোপীয় আপনারা কোন প্রাণে ইহাদিগকে বধ করেন, কেমন করিয়াই বা গ্রাসে গ্রাসে উদরসাৎ করেন?' ইহার উত্তরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা যদি এই সর্প আপনাকে দংশন করিতে আইসে, এবং তৎক্ষণাৎ যদি আপনি অবসর পান, তাহা হইলে কি আপনি এই সর্পকে সংহার করিবেন না?' 'না, কখনই না, সর্ব্বসংসারের রাজারও জন্যও আমি তাহা করিব না'—বন্ধক জবাব দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, 'আমি সর্পকে সাবধানে ধরিয়া নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিব।' 'কিন্তু যদি আপনাকে দংশন করে'—আমি বলিলাম। বন্ধক কহিলেন, 'আমি মন্ত্র পড়িয়া সর্পবিষ নাশ করিব। যদিই বা সেই বিষে আমার মৃত্যু হয়, তাহাতেই বা কি? আমি তাহা অদৃষ্টের লিখন বলিয়া বুঝিব।' অতঃপর আমি তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে, 'অভাবপ্রদত্ত কোন সামগ্রীই ব্যর্থ নয়। মানুষের দন্তগঠন দেখিয়া ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, মাংসাহার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।' 'এ কথা কখনই সত্য নয়'—পিঞ্জরাপোল-বন্ধক জবাব দিলেন। তিনি ডারুইনের Thoory of Natural Selection and origin of Species গ্রন্থ হইতে মুখে মুখে বড় একটা অধ্যায় উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, মানুষের দাঁতির দাঁত প্রথম অবস্থায় ছিল না, মানুষের মাংসাহার ধারা ক্রমে উহা বিকাশলাভ করিয়াছে।"

বঙ্গদেশে ইদানীং বৌদ্ধসাহিত্যের সবিশেষ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এ আলোচনা উদ্দীপ্ত হইয়াছে,—কয়েকটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তির সমবায়ে ও সংঘর্ষণে। সে শক্তি কয়েকটি কি এবং তাহাদের সমবায় ও সংঘর্ষণ কিরূপ, তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার স্থল ইহা নহে। তবে তাহারা সকলেই যে পাশ্চাত্য শিক্ষা হইতে সমুৎপন্ন, সংক্ষেপে ইহা বলিলে অসত্য বলা হইবে না। বুদ্ধিমানে অবশ্যই বুঝিতেছেন যে, পাশ্চাত্য উত্তেজনা হইতেই উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রাচ্য গবেষণার উদ্যোগ। পাশ্চাত্য শিক্ষার যখন ভাঙ্গিবার শক্তি আছে, তখন ভাঙ্গিয়া গড়িবার শক্তিও যে তাহার নাই, এ কথা কখনই বলা যায় না। প্রথমোক্ত শক্তি, বহু পূর্ব্ব হইতেই, তাহা দেখাইয়া আসিয়াছে; সম্প্রতি শেষোক্ত শক্তি দেখাইবার সময়; দেখাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। যে কারণে বা যে সকল কারণে, আজ শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের অস্বাভাবিক চর্চ্চা, বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্যানুশীলনের উদ্যোগ, তাহারই বা তাহাদেরই অন্যতম অংশ। খৃষ্টধর্ম্ম ও থিওসফী, দুই বিপরীত পাশ্চাত্য শক্তি দুই দিক দিয়া একই ক্রিয়া উৎপাদিত ও অগ্রসর করিতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, তাহার সবলতা ও দুর্ব্বলতার সহিত সেই ক্রিয়ারই পোষকতা করিতেছে। সে ক্রিয়া শিক্ষিতদিগের উপস্থিত আত্মদর্শনস্পৃহা। সে স্পৃহার ফল পুরাতন শাস্ত্র ও সাহিত্যের আলোচনা, গবেষণা। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রথমতঃ আঘাত করিয়াছিল, এখন প্রতিঘাত উপস্থিত করিয়াছে। এ প্রতিঘাতের পরিণাম যাহাই হউক, ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিঘাত বটে। বাঙ্গালীর ইংরেজী শিক্ষার যত দোষই থাকুক ও ইংরেজের যত নিন্দাই কর, ইংরেজী শিক্ষার ও সাহিত্যের উত্তেজনী-শক্তি, এবং ইংরেজ স্বভাবের উত্তেজক ভাব, বাঙ্গালীর মৃতকল্প শরীরে শোণিত সঞ্চালিত করিয়াছে, এই সুস্পষ্ট সত্য স্বীকার না করিলে, অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই।

বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনার উদ্যোগে আমরা প্রীত হইয়াছি। এ আলোচনা অসাম্প্রদায়িক ভাবে হইবে সংবাদ পাইয়া, অধিকতর প্রীত হইলাম। ধর্ম্মান্দোলন অতি উত্তম সামগ্রী। ধর্ম্মমাত্রেই আলোক আছে। কিন্তু তাহাতে অন্ধকারও আছে। অন্ধকার ধর্ম্মান্ধ মনুষ্যকৃত। অন্ধকারকে, মোহবশে বা অতিরিক্ত অনুরাগে আলোক বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্ধই হইতে হয়। ধর্ম্মান্ধ হইলে, প্রশস্ত ভাবে ও প্রকৃতরূপে কোন কার্য্যই সম্পন্ন করা সম্ভবে না।

বিশেষতঃ, সাহিত্যের সেবা আদৌ অসম্ভব। বৌদ্ধ সাহিত্যের বাঙ্গালী সেবক-মণ্ডলী অসাম্প্রদায়িক ও অতি প্রশস্ত ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার সেবা করিবেন,—ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবেই প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা; এইরূপই হওয়া উচিত।

বৌদ্ধ-গ্রন্থ-সমিতি ও বৌদ্ধ সাহিত্য-সম্বন্ধ।

বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনার্থে কলিকাতায় "বৌদ্ধ-গ্রন্থ-অধ্যয়ন ও অনুবাদ সমিতি" সংস্থাপিত হইয়াছে। সমিতির মাসিক পুস্তিকাও প্রকাশিত হইতেছে। তদুপলক্ষেই আমাদের উপস্থিত আলোচনা। বৌদ্ধ-গ্রন্থসমিতি, দেশের গণ্য, মান্য, বিশিষ্ট ও বিদ্বান লোকে গঠিত। সমিতির মুখপত্র, শ্রী শরচ্চন্দ্র দাস, সি-আই-ই কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মাননীয় শরৎ বাবু, কি উপাদানে গঠিত, সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত লোকমাত্রেই তাহা জানেন। অতএব তাঁহার পরিচয় দিতে বসা অনাবশ্যক। সমিতির প্রকাশিত প্রথমসংখ্যক পুস্তিকায় নানা সন্দর্ভ আছে। এ সমস্তই বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে সংকলিত ও অনুবাদিত। অধিকাংশ অনুবাদই সম্পাদক নিজে করিয়াছেন। "তিব্বতে ভারতীয় পণ্ডিত" নামক প্রবন্ধ শরৎবাবুর গভীর গবেষণার ফল। বঙ্গবাসী—বাঙ্গালী পণ্ডিতের তিব্বতগমন এবং তথায় অত্যুচ্চ সম্ভ্রমলাভ, বঙ্গদেশের পূর্ব্বগৌরব প্রকাশ করিতেছে। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী যে একেবারে অকর্ম্মণ্য, অসার, অপদার্থ ছিল না, ইহা বলিয়া দিতেছে। এতথ্য আবিষ্কার করিয়া, শরৎ বাবু স্বদেশের ও স্বজাতির উপকার করিয়াছেন; জননী জন্মভূমির যথার্থই পূজা করিয়াছেন। প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্তসার, স্থানাভাববশতঃ এবারে দিতে পারিলাম না। বারান্তরে দিবার চেষ্টা করা যাইবে। বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ ও আলোচনা সম্বন্ধে, আমাদের কেবল এইমাত্র একটু ইঙ্গিত যে, যদি উহার অনুবাদক ও অনুষ্ঠাতৃগণ, বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদাদি সাধারণের পাঠ্য ও বোধ্য করিতে উৎসুক থাকেন, তাহা হইলে যথাসাধ্য পারিভাষিক পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া, উহা সরল ও প্রাঞ্জল করিতে হইবে। নহিলে, উহা এতকাল যেরূপ অল্পসংখ্যক পণ্ডিতের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এখনও প্রায় সেইরূপই থাকিবে। "মুক্তালতা" নাম্নী কবিতায় ইংরাজী কাব্যানুবাদ পাঠে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। মিঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত, সি-এস, সি-আই-ই, এই অনুবাদ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের কোনও কবি কাব্যাকারে উহার বঙ্গানুবাদ করিলে শ্রম বিফল হইবে না। আমরা রঘুবংশের অনুবাদক, শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দাস মহাশয়কে এই অনুরোধ প্রসঙ্গে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছি।

সম্পাদক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী। জ্যৈষ্ঠ। তত্ত্ববোধিনীর মত পুরাতন কাগজ দ্বিতীয় নাই। ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এখন ১৮১৫ শক চলিতেছে। মানবের স্বভাব মানবকৃত কার্য্যেরও যে অল্প অল্প মৃত্যু আছে, তত্ত্ববোধিনী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তত্ত্ববোধিনীর সে দিন এখন কোথায়? বলিতে দুঃখ উপস্থিত হয়, তত্ত্ববোধিনী এখন পূর্ণ গৌরবে বঞ্চিত হইয়া কথঞ্চিৎ বাঁচিয়া আছে মাত্র।

এ সংখ্যায়, "আকবরের স্বপ্ন" নামক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার লেখক। আমরা ইতিপূর্ব্বে ঠিক এই প্রবন্ধটিই বৈশাখ মাসের "সাধনার সার-সংগ্রহ মাসিক প্রবন্ধে অবিকল মুদ্রিত দেখিয়াছি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়, সাধনার নাম উল্লেখ করিলে ভাল করিতেন। মতুবা, প্রথম দৃষ্টিতে, এই প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীর নিজস্ব বলিয়া বোধ হইতে পারে। "বর্ষাকালে আমেরিকায় প্রবেশবিশেষের দৃশ্য," একটি বালকের রচনা। কিন্তু ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কি বলিয়া স্থান পাইল, তাহা সম্পাদক মহাশয়ই বলিতে পারেন। বালকের রচনা ভাল বোধ হইয়া থাকিলে, উৎসাহ দিবার জন্য তাহাকে এক জোড়া সন্দেশ কি একটা খেলানা কিনিয়া দিলেই চলিত, মধ্য ত সম্পাদকের কাছে পাঠাইয়া দিলেও তিনি যা' হয় করিতে পারিতেন। দর্শন, তত্ত্ববিদ্যা, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতির প্রচার যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যাহার সম্পাদক, সে কাগজে এরূপ ছেলেখেলা শোভা পায় না।

ভারতী। বৈশাখ। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "সূর্য্যসিদ্ধান্ত, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষশাস্ত্রান্তর্গত ভূগোলবিদ্যা" নামক গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই প্রবন্ধে সমালোচনা সমাপ্ত হয় নাই। এই গ্রন্থ যে সময় প্রকাশিত হয়, সংবাদ ও সাময়িক পত্রে অত্যন্ত প্রশংসিত হইয়াছিল। 'সর্ব্বমত্যন্ত-গর্হিতং'—এই প্রবাদবাক্যের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান সমালোচক গ্রন্থের দোষাংশ দেখাইতেছেন। "আপেল আঘ্রাণে" পাবক গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদের অনুবাদ। আরিষ্টট্‌ল মৃত্যুকালে যে উপদেশ দিয়া যান, তাহা 'বুক্ অব দি আপেল' নামে খ্যাত, সেই উপদেশ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রীক দার্শনিকের মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহাকে বিশ্চিন্ত ও আনন্দিত দেখিয়া শিষ্যগণ কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আরিষ্টট্‌ল বুঝাইতে আরম্ভ করিলে, একজন শিষ্য আপত্তি করেন যে, মৃত্যুর সে অবস্থায় বাক্যালাপ করিতে চিকিৎসকের নিষেধ। উত্তরে আরিষ্টট্‌ল একটি আপেল ফল আঘ্রাণ করিতে আরম্ভ করিয়া উপদেশ দান করেন। সেই কারণে এই গ্রন্থের এরূপ নাম হইয়াছে। আত্মা দেহ হইতে পৃথক এবং জ্ঞান আত্মা কর্ত্তৃক অর্জ্জিত হইয়া থাকে, অতএব মৃত্যুতত্ত্ব মিথ্যা এবং দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদ বাঞ্ছনীয়, এই কথা আরিষ্টট্‌ল কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হয়। য়ুরোপে প্রবাসকালে শ্রীযুক্ত যোগিনী-মোহন চট্টোপাধ্যায়, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কোনও আত্মীয়কে পত্র লিখিতে তাহার উল্লেখ করেন। সেই পত্র প্রবন্ধাকারে 'বিলেতে রামমোহন রায়ের পরাভব' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যে সময়ে [illegible]

সকল গল্পের লক্ষ্য, তাঁহার স্মৃতিতে এই প্রবন্ধ গৌরবান্বিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, সেবাজউদ্দৌলার সম্বন্ধে "কলিকাতা আক্রমণের" কিরূপে সূত্রপাত হয়, তাহা সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। "নববর্ষের স্বপ্ন" এক সংখ্যায় সমাপ্ত গল্প। কোনও নব্য বাঙ্গালী-সমাজে নাম "কিরণ কাকা"—বিবাহ করিব না করিব না, অবশেষে কোনও কিশোরীর গান শুনিয়া এবং তাহার রূপ আবছায়া মত দেখিয়া মুগ্ধ হন, কিন্তু ঘটনাচক্রে বিবাহটা ঘটিল না। নব্য বাবু অবিবাহিতই রহিলেন, এবং অবশেষে সেই তন্বী কিশোরীর ছেলেমেয়ের পিতৃব্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। লেখিকার হাত কাঁচা, অনেক স্থলে অন্যান্য লেখকগণের অনুকরণ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পরামর্শ-স্বরূপ একটা কথা বলিলে ক্ষতি নাই যে, লেখক ও লেখিকামাত্রেরই ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতা ও শৈথিল্য সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। ভাষার ভিতর দিয়া চাবি ঘোড়ার গাড়ী হাঁকান যায় না। ভাষাকে যিনি বশীভূত, সংযত, স্পষ্ট করিতে পারেন, তিনিই লেখক।

নব্যভারত। বৈশাখ। সাধারণতঃ এইরূপ নিয়ম আছে যে, মাসিকপত্রের সম্পাদক পত্রিকার সর্ব্বপ্রথমে স্বরচিত কোনও প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিবেন না। নব্যভারত-সম্পাদক এই সংখ্যার প্রথমেই "সান্ত ও অনন্ত" শীর্ষক স্বলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তৎপরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রণীত "হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস" প্রবন্ধ শীর্ষস্থানীয় করিলে সুরুচিসঙ্গত হইত। "সান্ত ও অনন্ত" এই নামেই প্রবন্ধের বিষয় ও লক্ষ্য সূচিত হইতেছে। লেখক অতি প্রাচীন কথা অতি প্রাচীন যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এরূপ গভীর বিষয়ের আলোচনায় সর্ব্বত্রই ভাষাগাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইবার কথা, কিন্তু এই প্রবন্ধ পাঠকরিতে করিতে এক এক স্থলের ভাষা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় "মঙ্গললোক" সম্বন্ধে যাহা সম্প্রতি জানা গিয়াছে, সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রণীত "হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস' অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। বার্ণনিক যুগে সামাজিক অবস্থা ও স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা কিরূপ ছিল, লেখক মহাশয় তৎসম্বন্ধে ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অকারণে স্ত্রী পরিত্যাগ করিলে ও পরস্তর যে প্রায়শ্চিত্তের বিধি করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। "যে ব্যক্তি অকারণে স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে গর্দ্দভের চর্ম্ম উল্টাভাবে পরিয়া সপ্তগৃহে ঐই বলিয়া ভিক্ষা করিতে হইবে যে, 'পরিত্যক্তকলত্র হতভাগ্যকে ভিক্ষা দাও।' এইরূপ ভিক্ষালব্ধ আহারে তাহাকে ছয় মাস জীবন ধারণ করিতে হইবে।" "বায়ুভের মুখে জমীদারের মঙ্গল বা হরগৌরী বিবাহ' প্রবন্ধের প্রথমাংশ সারগর্ভ। লেখকের প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে অনেক মঙ্গল হইতে পারে। গোমস্তাগণ অল্প বেতন পায়, এই জন্য প্রজার উপর অত্যাচার করে এবং উৎকোচ গ্রহণ করে। লেখকের মতে কিছু অধিক বেতন দিয়া শিক্ষিত গোমস্তা নিযুক্ত করিলে জমীদার ও সাধারণ, উভয়েরই মঙ্গল। জমীদারগণ কত প্রকারে প্রতারিত ও বঞ্চিত হন, লেখক তাহার বহুবিধ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদ সালিসী বিচারে নিষ্পত্তি হয়, লেখকের এইরূপ অভিপ্রায়। প্রবন্ধের শেষাংশের সহিত পূর্ব্বাংশের বিশেষ সম্বন্ধ নাই, শেষাংশ স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইলেই ভাল হইত। বৎসর ফুরাইল, নূতন বৎসর আরম্ভ হইল কিন্তু "বার্ষিকের" অর্থাৎ বাঙ্গালীদিগের আভ্যন্তরসাংক্রান্তিবিষয়ক প্রসঙ্গের সমাপ্তি

হইল না। এখনও এই প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এরূপ প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলে অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা।" কার্লাইল ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম ও অসমাপ্ত প্রবন্ধ। ইহাতে উল্লেখযোগ্য কোন কথা নাই। শ্রীযুক্ত বাজকৃষ্ণ বসু, পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর কতকগুলি উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সংখ্যা হইতে উপদেশগুলি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। পরমহংসকৃত সৎসঙ্গ ও সত্যধর্ম্মের ব্যাখ্যা এইবার প্রকাশিত হইয়াছে। সৎসঙ্গের প্রকৃত অর্থ "শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মাকে অন্তরে প্রেম ভক্তির সহিত ধারণ করা।" যে পর্য্যন্ত তাহা না পাওয়া যায়, সৎশাস্ত্রের সঙ্গী হইতে হইবে, অর্থাৎ পাঠ করিতে হইবে। তাহাতেও অসমর্থ হইলে সাধুপুরুষের সহবাস করিতে হইবে। সৎসঙ্গের যে অর্থ, সত্যধর্ম্মেরও মৌলিক সেই অর্থ। এই সৎসঙ্গ প্রসঙ্গে আমাদের একটি গল্প স্মরণ হইতেছে। বৈদান্তিকেরা তাহা অবগত আছেন, কিন্তু যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে তৃপ্তিপ্রদ হইতে পারে, এই বিশ্বাসে এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। মিশরের কোনও বাদশাহ ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া এক সাধুপুরুষকে মুক্তির প্রথম সোপান সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। সাধু 'সৎসঙ্গ' এই একটিমাত্র কথায় উত্তর দেন। বাদশাহ অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সাধু আর কোনও উত্তর দিলেন না। সৎসঙ্গ কি জানিবার জন্য বাদশাহের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। আদেশ করিলেন, কোন সাধু আসিলেই তাঁহার সম্মুখে নীত হইবে। এইরূপে দুই চারি জন সাধু উপস্থিত হইল। বাদশাহ তাহাদিগকে সৎসঙ্গের অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, "কর্, কর্ কর্।" বাদশাহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি যতবার জিজ্ঞাসা করেন, সাধুগণ উত্তরে সেই এক কথাই বারম্বার বলিতে লাগিল। অবশেষে রাজা কুপিত হইয়া সাধুদিগকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। কিছুদিনে সাধুদ্বারাগার পূর্ণ হইল। কয়েক মাস পরে একজন বৃদ্ধ সাধু উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ তাঁহাকে কহিলেন, 'মহাশয়, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আপনাকে প্রাচীন ও জ্ঞানী দেখিতেছি, আপনাকে কারাগারে পাঠাইতে আমার ইচ্ছা নাই। সৎসঙ্গ শব্দের অর্থ আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিন।" সাধু কহিলেন, "কারাগারে যাইতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার উৎসুক্য দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। কিন্তু তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমার কিছু প্রশ্ন আছে?" বাদশাহ কহিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন।" সাধু কহিলেন, "তোমার নিকট যে সকল বহুমূল্য হীরা মুক্তা আছে, পরীক্ষা করিয়া তুমি তাহাদিগের মূল্য বলিতে পার?" বাদশাহ কহিলেন, "আমি রত্নবণিকের কর্ম্ম শিখি নাই, শিখিলে বলিতে পারিতাম।" সাধু কহিলেন, "কতক্ষণে শিখিতে পার?" বাদশাহ বলিলেন, "ইচ্ছা করিলে এখনি শিখিতে পারি।" সাধু কহিলেন, "তাহা হইলে শিখিয়া বল।" সহরের মহরি দিগের তৎক্ষণাৎ তলব হইল। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট জহরি কে?' সকলে একজন বৃদ্ধকে দেখাইয়া দিল। বাদশাহ তাহাকে কহিলেন, "জহরাত কেমন করিয়া চিনিতে হয়, আমায় এখনি শিখাইয়া যাও।" বৃদ্ধ কহিল, "জাঁহাপনা। এ কর্ম্ম কি ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ শিখিতে পারা যায়।" বাদশাহ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাইবে না?" বৃদ্ধ কহিল, "শাহানশাহ। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই কর্ম্ম করিয়া শিখাইয়াছেন। আমি আজন্ম এই কর্ম্ম করিতেছি, কিন্তু এখনও সকল সময় হীরা জহরাত ঠিক পরখ করিতে পারি না। এক দণ্ডে এ কর্ম্ম কেমন করিয়া শিখাইব?" সাধু কহিলেন, "বাদশাহ, এই তুচ্ছ

জীবন ও মৃত্যু।

১

জীবন দিবা, মৃত্যু রাত্রি—চন্দ্রতারকাশূন্য ঘোর অমানিশি; জীবন সুখজনক, মৃত্যু ভীতিবিধায়ক; জীবন সম্মুখে, মৃত্যু দূরে; জীবন দীপশোভিত আবাসস্থান, মৃত্যু অন্ধকার অতল পর্ব্বত-গহ্বর, জীবনের আমি প্রভু, মৃত্যু আমার প্রভু; জীবন আমার দাস, আমি মৃত্যুর দাস; জীবন তরুপল্লবসলিলশোভিত লোকালয়, মৃত্যু বিভীষিকাময়ী মরীচিকা; জীবন আমার সেবা করে, মৃত্যু আমায় গ্রাস করে; জীবন সুন্দর, মৃত্যু ভয়ানক।

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, আশ্চর্য্য কি? মহারাজ যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, প্রাণিগণ প্রতিদিন শমনসদনে গমন করিতেছে দেখিয়াও অবশিষ্ট লোকে যে চির-জীবন ইচ্ছা করে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে!* আমরা যে মরিব, এ কথা আমরা কখন ধারণা করিতে পারি না, ভাবিতে পারি না, বুঝিতে পারি না। অপূর্ব্ব মায়া! কি মন্ত্রেই আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! কেহ যেন না বলে যে আমি মৃত্যুকে চিনিয়াছি, মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। একে ত আমরা মন্ত্রমুগ্ধ, তাহার উপর আরও মূঢ় হই কেন? এমন যে আমাদের ভাগ্যদৃষ্টি, তবু আমরা মৃত্যুর আগমন দেখিতে পাই না। মুখে হাজার বলি, মৃত্যুর ভাবনা আমরা কখনই ভাবি না। তাহার অকাট্য প্রমাণ আমাদের জীবন। মরিব যদি জানিতাম ত আমাদের চিরশত্রু কেহ থাকিত না, কাহাকেও চিরশত্রু থাকিতে দিতাম না। ছোট ছোট সুখ দুঃখ লইয়া এত কোলাহল করিতাম না, যাহা করিতেছি তাহা চিরকালের জন্য করিতেছি, এমন কখন মনে করিতাম না; যে সব তুচ্ছ সামগ্রীকে এত বড় করিতেছি, তাহাদের এত বড় করিতাম না; যে ভাবে জীবন কাটাইতেছি, এ ভাবে জীবন কাটাইতাম না।

মৃত্যুকে আমরা বড় ভয় করি, এত ভয় আর কাহাকেও করি না। সাধে কি বাঙ্গালীর মেয়েরা মৃত্যুর নাম করে না, কাহাকেও করিতে দেয় না, ছেলেপুলে মরণের কথা বলিলে তাহাদের মুখে হাত দেয়, মৃত্যুর নাম শুনিলে আতঙ্কে আকুল হয়? সহজ মানুষের স্বভাবই এই। মৃত্যুর ভয়াল মূর্ত্তি দেখিতে কেমন কেহ জানে না, কেহ দেখিতে চায় না, দেখিলে হৃৎকম্প হয়। জীবিত আছ, জীবিত

---

* বনপর্ব্ব, অজগর পর্ব্বাধ্যায়।

থাক, চিরজীবী হও, সহস্র বৎসর পরমায়ু হউক। সহস্র বৎসর—সেই কি চির-জীবন হইল? শতবর্ষজীবী মনুষ্যের পক্ষে সহস্র বর্ষ প্রায় অনন্ত জীবন।

যে আশীর্ব্বাদ অশিক্ষিত স্ত্রীলোকে করে, সেই আশীর্ব্বাদের আশায় প্রাচীনকালে মুনি ঋষিরা, রাজা প্রজা, কত দীর্ঘ তপস্যা—কত কঠোর সাধনা করিতেন। আরাধ্য দেবতার নিকট শ্রেষ্ঠ বর অমরত্ব। ইহার অধিক আর কিছু দান করিবার ছিল না, ইহার অধিক আর কিছু প্রার্থনীয় ছিল না। অসীমক্ষমতাশালী মহাপুরুষগণ একমাত্র অমরত্বের আশায় দীর্ঘকাল অতি-বাহিত করিতেন, শরীর মনকে পীড়িত করিতেন, অসংখ্য ক্লেশ স্বীকার করিতেন। নিষ্কাম তপস্যা কয় জন করিত? কেহ ইন্দ্রত্বের আশায়, কেহ ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবার আশায়, কেহ শত্রুর বিনাশ জন্য, কেহ অমরত্বের জন্য তপস্যা করিত। অমরত্বই তপস্যার চরম ফল। বহুযুগব্যাপিনী তপস্যা, ষষ্টিসহস্র-বৎসরপরিমিত আরাধনা, সম্ভাবনার অতীত কি না, সে কথা বিচার করিবার আবশ্যক নাই। মূলে সেই একই কারণ দেখিতে পাইতেছি—মৃত্যুভীতি। দীর্ঘ-জীবনের অর্থ আর কিছু নয়, কেবল মৃত্যুকে সাধ্যমত দূরে রাখা।

আত্মা নিত্য, এ কথা প্রাচীন তপস্বীরাও মানিতেন। আত্মা যদি নিত্য, তাহা হইলে যাহা আছে, তাহাই পাইবার জন্য এত যত্ন কেন? এক উত্তর এই যে, আত্মার মুক্তির জন্য তপশ্চরণ কর্ত্তব্য। জীবন অতি দুশ্ছেদ্য মোহবন্ধনে তপস্যা সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায়। শুদ্ধ আত্মা জীবনের অশুদ্ধ কুজ্ঝটিকায় আছন্ন, সেই কুজ্ঝটিকাকে অপসারিত করার নামই তপস্যা। আত্মার বিনাশ নাই সত্য, কিন্তু আত্মার অবনতি আছে। শুদ্ধ আত্মা নহিলে শুদ্ধব্রহ্মে লীন হইবে না। জীবন মৃত্যুর অশেষ দুঃখ ক্রমাগত ভোগ করিতে হইবে, নানা জীবযোনি পরিগ্রহ করিতে হইবে। ব্রহ্মের অংশস্বরূপ অমর আত্মা ব্রহ্ম হইতে দূরপরিভ্রষ্ট হইবে। যাহা তাঁহার অংশ, তাহা তাঁহাকে পুনঃসমর্পণ করা কর্ত্তব্য। আমরা আত্মার রক্ষকমাত্র, যিনি আত্মার প্রভু তাঁহাকে যথাসময়ে তাঁহার সামগ্রী প্রত্যর্পণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। নিষ্কাম তপস্যা এইরূপে আচরিত হইতে পারে। মনুষ্যের প্রধান এবং শেষ গতি তপস্যা। সংসারকলঙ্কিত আত্মাকে বিশুদ্ধ করিবার অন্য উপায় নাই। শ্রেষ্ঠ মানব তপশ্চরণ ব্যতীত আর কিছু করিতে পারে না, এই জন্য সে তপস্যা করিবে।

এ ভাবের তপস্যা অত্যন্ত বিরল। অধিকসংখ্যক তপস্বীরা অমরত্বলাভের জন্যই তপস্যা করিতেন—আত্মার অমরত্ব নহে, এই নশ্বর শরীরের অমরত্ব।

শরীর অর্থে কেবল এক প্রকারের অবয়ব নহে। যাহাকে আমরা আমি বলি, প্রকৃত অর্থে সেই আমার শরীর। তপস্বীরা ইহারই চিরজীবন প্রার্থনা করিতেন। আত্মা অমর হইলেও আমাদের আয়ত্ত নহে। চেতনা আমাদের আয়ত্ত। চির-চেতনাই অমরত্বের বর। বিস্মৃতির বিনাশই এই অর্থে অমরত্ব। আমাকে আমি চিরকাল চিনিব, যখন যেমন ইচ্ছা মাংস অস্থির শরীর পরিগ্রহ করিব, যখন ইচ্ছা ত্যাগ করিব, কিন্তু স্মৃতি আমাকে কখন পরিত্যাগ করিবে না। মৃত্যু নামক যে ভয়ঙ্কর বিস্মৃতি, আমি যেন কখন তাহার অধীন না হই। সরস্বতীর তীরে দাঁড়াইয়া আমি বেদ উচ্চারণ করিয়াছি, সামগান করিয়াছি, সে যেন কালিকার কথা। বিশ্বামিত্র, পরাশর, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের শরীরের পুণ্যজ্যোতি আমি দেখিয়াছি, তাঁহাদের মুখে বেদমন্ত্র প্রথম শ্রবণ করিয়াছি। বাল্মীকি বনে বনে বেড়াইতেন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সীতাদেবীর চরণ দর্শন করিয়াছি, অশোকবনে তাঁহার অশ্রুসিক্ত মলিন মুখ দেখিয়াছি, রামচন্দ্রের কমলনয়নবিভাসিত প্রশান্ত মুখমণ্ডল, হনুমানের বীর্য্য, লক্ষ্মণের ভক্তি, দশাননের বিকট মূর্ত্তি, সব দেখিয়াছি। বেদব্যাসের প্রতিভাপ্রদীপ্ত মুখ হইতে মহাভারতের অপূর্ব্ব কাব্যস্রোত যখন অনন্ত অগ্নিস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইত, তখন সেই কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমার শরীর কণ্টকিত হইত। মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ আসন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে অত্যন্ত গভীরার্থপূর্ণ যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমি সেই সময়েই শ্রবণ করিয়াছিলাম। বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। মহাপুরুষ খৃষ্টের মৃত্যুর সময় আমি সেই স্থলে উপস্থিত ছিলাম। মহম্মদের আবির্ভাবের সময় আমি আরব্য দেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম, চৈতন্যের অশ্রুপূর্ণ মত্ততায় আমার চক্ষে নদী বহিত। মহাকবি হোমর দ্বারে দ্বারে গান করিয়া বেড়াইতেন, আমি কত বার পথে দাঁড়াইয়া তাঁহার গান শুনিতাম। দান্তের দুঃখ দেখিয়া আমি কাতর হইতাম, সেক্ষপীয়র নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত থাকিয়া এমন অপূর্ব্ব নাটকাবলী রচনা করিতেন, আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম। মিল্টন অন্ধ হইলে তাঁহার মুখের শান্তি কত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কালিদাসের দ্রুত রচনায় এবং অসাধারণ কবিত্বশক্তিতে সভাশুদ্ধ লোক মোহিত হইত, আমি রাজসভায় অনেক সময় উপস্থিত থাকিতাম।

আমি সব দেখিয়াছি, সব দেখিব। মানুষ আসিতেছে, যাইতেছে; সেই অবিশ্রাম যাতায়ত দেখিতেছি। দেখি নাই কেবল মৃত্যু। কখনও যে দেখিতে হইবে,

সে ভয়ও নাই। আমি অমর। চক্রাকারে এই পৃথিবী—এই বিশ্বমণ্ডল ঘূর্ণিত হইতেছে, আমি তাহার উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। কালের তরঙ্গ, বিস্মৃতির তরঙ্গ, পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ প্রতিনিয়ত জগতে আসিয়া লাগিতেছে, কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছু তীরে ফেলিয়া যাইতেছে। আমার কেবল স্পর্শ করিতে পারে না। মৃত্যু আমার চারি পার্শ্বে, কিন্তু আমি অমর, বিস্মৃতি আমাকে বেষ্টন করিয়াছে, কিন্তু আমাকে বাঁধিতে পারে নাই। মানুষ যাহাকে অত্যন্ত ভয় করে, অথচ কোনও মতে যাহার হাত এড়াইতে পারে না, আমি তাহাকেই পরাভূত করিয়াছি।

মানুষ মৃত্যুর হাত এড়াইয়া কোনও মতে অমর হইতে পারে, এই বিশ্বাস চিরকালই জগতের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের তপস্বিগণই শ্রেষ্ঠ উপায় অবলম্বন করিতেন। তপস্যা করিলে কেহ অমর না হউক, তাহার জীবন ত পবিত্র হইবেই। দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইবে, সংসারভোগের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে, চিত্তশুদ্ধি জন্মিবে, আত্মা ব্রহ্মে অর্পিত হইবে। দীর্ঘ অথবা অনন্ত জীবনের জন্য বহুবিধ উপায় লোকপরম্পরায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দ্রব্যগুণে জীবন দীর্ঘ হয়, এ বিশ্বাস সাধারণ লোকের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। পক্ক হরীতকীর সন্ধানে এখনও অনেকে ভ্রমণ করে। পৃথিবীর অন্য খণ্ডেও এইরূপ দ্রব্যগুণে অমর হয়, এ বিশ্বাস আপামর সাধারণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও সময় শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও এই বিশ্বাস বলবান হয়। অমৃত, সোমরস পান করিলে তাহাকে মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারে না, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেও এরূপ প্রবাদ ছিল। সম্প্রতি আবার অমর হইবার ইচ্ছায় বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তিব্বতে অমরাশ্রম সিদ্ধান্ত করিয়া, এখন অনেকে তদভিমুখে যাত্রা করিবার নমন করিয়াছেন। এমন চিরকালই হইয়া আসিতেছে; কখন কম, কখন বেশী। কখনও লোক মৃত্যুর কাছে হার মানিয়া জীবনকে লইয়া ব্যস্ত থাকে, কখনও জীবনের আশা তুলিয়া মৃত্যুকে সংহার করিতে অগ্রসর হয়। অমর হইবার আশায় কখনও সোমরস, কখনও অমৃত পান করে, কখনও বনে যায়, কখনও তিব্বতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হয়। কিছু দিন লোকে ক্ষান্ত হয়, আবার, কিছু দিন পরে অমর হইবার চেষ্টায় ফেরে। একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ চেষ্টা শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট উভয়বিধ মনুষ্যের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভাশালী আর্য্য ঋষিগণ অমরত্বের অন্বেষণ করিতেন, অল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও সেই চেষ্টা করে।

আত্মার অমরত্ব আর এ অমরত্বে প্রভেদ আছে, সহজেই বুঝা যাইতেছে। আত্মা অমর, এ কথা সহজেই স্বীকার করিলেও মৃত্যুর ভয় অথবা পরলোকের অনিশ্চিততা হ্রাস হয় না। স্বর্গ, নরক অথবা পরলোকের অন্য কোনও প্রকার কল্পনা গ্রহণ করা না করা স্বেচ্ছাধীন। স্বর্গ নরকের জন্য যে কেহ চিরজীবী হইতে চায়, এমন বোধ হয় না। সে অমরত্ব মনুষ্য-আত্মার প্রকৃতি, তাহার জন্য কামনা করিতে হয় না। এই পৃথিবীর সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ রাখিবার জন্যই স্মৃতিকে চিরজাগরূক রাখিবার জন্যই অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা।

অমর হওয়া কি মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব? এই রক্তমাংসের শরীর, এই অস্থি-মজ্জামেদোনির্ম্মিত, রোগাশ্রিত, ক্ষণিক দেহ কি চিরস্থায়ী হইতে পারে? জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, এই নিয়ম বটে। শরীরধারণ করিলেই শরীরত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু এমন নিয়ম নাই, যাহার ব্যত্যয় ঘটে না। নাই কি? প্রতিদিন প্রাতে সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হইবে, এ নিয়মের কি ব্যতিক্রম সম্ভব? প্রলয়ের সময় ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহাও ত নিয়মবহির্ভূত নহে। সূর্য্যোদয়ের নিয়মে যদি কোনও ব্যত্যয় ঘটে, তাহা হইলে জীবনের পরেই যে মৃত্যু, এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিতে পারে। বিশ্বাসের মূল এইরূপে উৎপন্ন হয়।

মনুষ্যশরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইবেই, এরূপ সহস্র প্রমাণ থাকিলেও তাহার বিরুদ্ধে যে যুক্তি চলে না, এমন নহে। কিন্তু যুক্তির অপেক্ষা বিশ্বাস, বাসনা অধিক প্রবল। মানুষ যে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এ কথা যুক্তিসঙ্গত না হইলেও মানুষ চিরকাল বাঁচিতে ইচ্ছা করে, চিরকাল বাঁচিতে পারা যায়—এরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। এই বিশ্বাস, এই প্রবল আকাঙ্ক্ষাই অমরত্বের মূল। মৃত্যুর বিষয়ে মানুষ কিছু জানিতে পারে না, সেই জন্য সে মৃত্যুকে এত ভয় করে। মানুষ মরিল, তাহার দেহ বিসর্জ্জন দিলাম। কিন্তু যে সেই দেহকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, যে সেই দেহের মধ্যে অবস্থান করিত, সে কোথায় গেল? কোথায় সে গেল, তাহা কোনও মতেই জানা যায় না, কখনও জানা গেল না, কখনও জানা যাইবে না। এই জন্য কেহ মরিতে চায় না। অজানিতকে মানুষে এতই ভয় করে। মৃত্যু কি আমরা যদি জানিতাম, তাহা হইলে হয় ত মৃত্যুকে আমরা ভয় করিতাম না, অমর হইবার জন্য এত আগ্রহ হইত না। আত্মা অমর, এ কথায় মন প্রবোধিত হয় না, যদি এই জগৎ, এই জীবনের সহিত কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না রহিল, ত অমর হইলাম কিসে?

পুনর্জ্জন্ম এই প্রসঙ্গে মনে আসিতেছে। জীব মরিয়া আবার জন্মগ্রহণ করে,

এরূপ বিশ্বাসও অনেক স্থানে, কালভেদে লক্ষিত হয়। ইয়ুরোপের বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ যে আজ বলিতেছেন যে, এক প্রাণী হইতে আর এক প্রাণী উৎপন্ন হয়, ইহাও প্রকারান্তরে পুনর্জ্জন্মবাদ। ডারুইন শরীরতত্ত্বের কথা বলিতেছেন, প্রাচীনেরা আত্মার কথা বলিতেছেন। ডারুইন প্রমাণ করেন, শূকর হইতে ক্রমে ক্রমে উষ্ট্র উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ শূকরের অবয়ব কালক্রমে বহু পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধনের পর উষ্ট্রের আকার ধারণ করিয়াছে। পুনর্জ্জন্মবাদী বলিবেন যে, যে আত্মা মনুষ্যের শরীরে বাস করে, সেই আত্মা মনুষ্যের পাপের ফলস্বরূপ জন্মান্তরে কোনও নীচ প্রাণীর দেহে অধিষ্ঠান করিবে। মনুষ্য পুণ্যাচরণ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। শেষ এমন হইয়াছে যে, লোকে বিশ্বাস করে যে, কাশীধামে মরিলে আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। চিরকাল পাপ করিয়া কাশীতে গিয়া যদি কেহ মরিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার মুক্তি হইল।

জীবন কি এমনি দুর্ব্বহ ভার যে, মানুষে তাহা পুনঃপুনঃ বহন করিতে চায় না? জীবন এবং মৃত্যু বারবার না দেখিতে হয়, এমন কামনা সকলে করে কেন? জন্মমরণের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার জন্য মানুষে এত লালায়িত কেন? মানুষ মরিয়া কোনও নিকৃষ্ট প্রাণীর দেহ ধারণ করিবে, সেই এক ভয়, বারবার মানুষ মনুষ্য-দেহই ধারণ করিবে, তাহাও ভয়ের কথা। এ স্থলে জীবনের ভয় যেমন মরণেরও ভয় তেমনি, কারণ জীবনের পরে মৃত্যু আসিবেই। জীবন এবং মৃত্যুতে সম্বন্ধ নিত্য, একের পর অপর নিশ্চিত আসিবে। পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসের মূল চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। আত্মা অমর মানিতেছি, সে বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতি-নিহিত। আত্মা অমর, কিন্তু শরীর ক্ষণভঙ্গুর, দেখিতে দেখিতে বিনষ্ট হয়। অতএব সেই অমরাত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া আর এক শরীরের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এরূপ বিশ্বাস সহজেই মনে উদিত হয়। বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই তাহার ফল বিচিত্র হইবে। বিশ্বাসের বলে যাহা সাধিত হয়, আর কোনও বলে তাহা সাধিত হয় না। পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস থাকাতে কখন কখন এরূপ বিশ্বাসও হয় যে, এই জন্মে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে এইরূপ বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলে, পূর্ব্বজন্মে আমি রাজা ছিলাম, তৎপূর্ব্বজন্মে অশ্ব ছিলাম, তাহার পূর্ব্বজন্মে আমি বরাহ ছিলাম। এই কথা সে নিজে বিশ্বাস করে, এবং তাহার মুখে শুনিয়া অপর লোকেও বিশ্বাস করে। প্রাচীন কালে অনেক লোকে এইরূপ বিশ্বাস করিত, এখনও অনেক লোকে এইরূপ বিশ্বাস করে। যদি পূর্ব্বজন্ম-

বৃত্তান্ত মানুষে বলিতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতের কথা বলাও অসম্ভব নহে। এ জন্মে যে ভিক্ষা করিতেছে, পরজন্মে সে রাজত্ব করিবে, এ কথা বিশ্বাস করিতেও বড় বিলম্ব হয় না। অতীতের অন্ধকার যে [illegible]বিব, ভবিষ্যতের যবনিকা তুলিব, এ ইচ্ছা আমাদের মনে যেমন বলবৎ কোনও অভিলাষ নহে।

এই দুইটি মৌলিক কথা দৃঢ় করিয়া ধারণা করা চাই—আকাঙ্ক্ষা [illegible]ার বল, এবং মরণের ভয়। মরিলে কি হয় জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছা করে, মরিলে কি হয় কোনও মতে জানিতে পারি না, সেই জন্য মরিতে ভয় করে। জীবন-সম্বন্ধে কিছুই কল্পনা করিতে হয় না, সমুদয় প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। মৃত্যুর সম্বন্ধে নানা রকম কল্পনা করি। মৃত্যুর পরে স্বর্গ নরক; প্রফুল্লচিতপারিজাতবন্দার-শোভিত, অপ্সরোসেবিত, অনন্ত সুখের স্বর্গ; ঘোর আর্ত্তনাদপরিপূরিত অসীম-যন্ত্রণাময় নরক। মহম্মদের স্বর্গে বিলাসের মাত্রা আরও অধিক, যীশুখৃষ্টের স্বর্গ শিশুর হাসিমুখে পূর্ণ। কেহ স্বর্গে তপস্যার আশ্রম দেখে, কেহ মৃগয়ার স্থান কল্পনা করে, কেহ মনে করে স্বর্গবাসিগণ জিতেন্দ্রিয়, কেহ মনে করে বিলাসিতাই স্বর্গসুখ। স্বর্গ ঊর্দ্ধে, নরক পদতলে। কোটীনক্ষত্রধারী, চন্দ্র-সূর্য্যের বিহারভূমি, দিগন্তপ্রসারিত ঐ যে নীল নভোমণ্ডল, উহার পশ্চাতে স্বর্গ ভিন্ন আর কি থাকিবে? আর পদতলে এই যে পৃথিবীর গর্ত্ত অন্ধকার, উত্তপ্ত, ভীষণ, শ্বাসরোধকারী—ইহার তলে নরক ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে? স্বর্গ নরক আর কিছুই নয়, মনুষ্যকল্পনা-কল্পিত পৃথিবীর নামান্তর মাত্র। যাহাকে এখানে সুখ বলে, সেই সুখ স্বর্গে, যাহাকে এখানে দুঃখ বলে, সেই দুঃখ নরকে। বিলাসের সুখ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সুখ, তপস্বীর সুখ, জিতেন্দ্রিয়ের সুখ, অগ্নিদাহের যন্ত্রণা, বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা, তপ্তলৌহের ঘা-ঘাত, সমুদায়ই পৃথিবীতে আছে। যে স্বর্গ নরক আমরা কল্পনা করিয়াছি, তাহা এই পৃথিবীর উপাদানেই নির্ম্মিত। এই পৃথিবীর সুখদুঃখই অধিক পরি-মাণে কল্পনা করিয়া স্বর্গ নরক নির্ম্মিত হয়। মানুষের পক্ষে পূর্ব্বলোক, পর-লোক, গোলোক, ব্রহ্মলোক, প্রেতলোক, সবই এই পৃথিবীর মত, সবই এই জীবনের প্রদীপশিখায় আলোকিত। বিশ্বের বাহিরে যাহা কিছু আজ পর্য্যন্ত কল্পিত হইয়াছে, তাহাতেই বিশ্বের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। প্রকৃত পক্ষে জীবনের বাহিরে কল্পনার গতি নাই।

অমর অর্থে আমরা কি বুঝি? জন্ম হইয়া যে মনুষ্যের মৃত্যু হয় না, সেই

বিশ্বাস হয় না। এই জন্য বলি, যত দিন ইংরাজি ভাষা থাকিবে, তত দিন সেক্ষপীয়রের নাটকাবলী থাকিবে, যত দিন পৃথিবী রহিবে, তত দিন বুদ্ধদেবের, যীশুখৃষ্টের মহাবাক্য সকল লুপ্ত হইবে না।

যত দিন পৃথিবী রহিবে। সে কত দিন! যথার্থ বুঝিতে গেলে যখন চিরজীবী হও বলিয়া আমরা আশীর্ব্বাদ করি, তখন এই কথার যে অর্থ, অমুক গ্রন্থের অথবা অমুক বাক্যের কখন বিনাশ হইবে না, এ কথারও সেই অর্থ। যাবৎ পৃথিবী রহিবে, তাবৎ রামায়ণ মহাভারত রহিবে, এ কথার অর্থ কি? রামায়ণ মহাভারত ত্যাগ করিয়া, বিস্মৃতির সাগরে বিসর্জ্জিত করিয়া, মানুষ কেমন করিয়া রহিবে, পৃথিবী কেমন করিয়া চলিবে, সেটা আমাদের ভাবিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের স্বভাবে এই রকম একটা দুর্ব্বলতা আছে। যত দিন বুদ্ধদেবের, যীশুখৃষ্টের কীর্ত্তি রহিয়াছে, তত দিন কি আর রহিবে? আমরা ভাবি রহিবে না ত কোথায় যাইবে, যদি তাঁহাদের কীর্ত্তিই না রহিবে ত পৃথিবীতে বাকি রহিবে কি, কাহার বলে মানুষ দাঁড়াইয়া আপনার কাজ করিবে, কি ধরিয়া বিস্মৃতির অবিশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গ হইতে রক্ষা পাইবে? মানুষ যে অমর, এই জগৎশুদ্ধ লোকই ত তাহার প্রমাণ; তাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইলে মানুষের আর বল হইবে কিসে? কি ধরিয়া মানুষ এ দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে, কি সাহসে মৃত্যুর বিপক্ষে সদর্পে দাঁড়াইবে? ক্রমশঃ।

ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী।

১। দেশের অবস্থা।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে আলাউদ্দিনের কৌশলে দেবগিরির যাদবগণের শাসিত মহারাষ্ট্রদেশ মুসলমানগণের কবলে পতিত হয়। এই সময় হইতে দাক্ষিণাত্য দিল্লীশ্বরের শাসনের অধীন হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আকবর খাঁর কৌশলে দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণী (বাহমণি) নামক

এক প্রবলপরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপিত হয়। সুলতান মহম্মদ সাহ নামক ব্রাহ্মণী-বংশীয় শেষ নরপতি ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে স্বীয় রাজ্য বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা, বেদর ও বরাড়, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার শাসন জন্য পাঁচ জন সুবেদার (১) নিযুক্ত করেন। ১৪৮৭ খৃঃ অব্দে মহম্মদ সাহ ব্রাহ্মণীর মৃত্যু হইলে, এই সুবেদারগণ সকলেই স্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন। কিছু দিন পরে, বেদর ও বরাড়, যথাক্রমে বিজাপুর ও আহম্মদনগরের অধীন হইল।

এইরূপে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে, দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণীরাজ্যের পরিবর্ত্তে আহম্মদনগর, বিজাপুর (বিজয়পুর) ও গোলকুণ্ডা এই তিনটি প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপিত হইয়া, বহুকাল দিল্লীশ্বরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। দিল্লীশ্বরের সহিত ইহাদের শত্রুতাবশে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ অল্প দিনের মধ্যেই অভ্যুদিত হইলেন। এই সময়ে সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশে বিজাপুর ও আহম্মদনগরের সুলতানগণের আধিপত্য বিস্তারিত হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রদেশের অধিবাসী মরাঠাগণ সাধারণতঃ যুদ্ধপটু, বলিষ্ঠকায়, কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, উগ্রস্বভাব ও কলহপ্রিয়। এই নিমিত্ত ও দাক্ষিণাত্যে মুসলমানগণের সংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত, ব্রাহ্মণীবংশীয় নৃপতিগণের সময় হইতেই, মুসলমান নরপতিগণ পার্ব্বতীয় দুর্গসমূহের শাসন ও রক্ষণভার ইহাদিগের উপর সমর্পণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত, সম্ভ্রান্ত মরাঠাগণ মুসলমান নরপতিগণের অধীনে প্রাদেশিক জমীদার ও সামন্ত নিযুক্ত হইতেন। দিল্লীশ্বরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তাঁহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সৈন্যবৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে, মুসলমান নরপতিগণ এই বলিষ্ঠকায় যুদ্ধপ্রিয় মরাঠাগণকেই অধিকপরিমাণে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিতেন। কর্ম্মদক্ষতাগুণে অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে ইহাদের পদ ও অবস্থার উন্নতি হইল। যাঁহারা বারগীর (২) বা সামান্য সৈনিকমাত্র ছিলেন, তাঁহারা হাবিলদার ও অবশেষে সেনানায়কের পদে উন্নীত হইলেন। এবং রাজা, নায়ক ও রাও প্রভৃতি সম্ভ্রমসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। দাক্ষিণাত্যের অশ্ব ও (৩) মরাঠাগণের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত-

(১) "সুবেদারস্তু দেশাধিকারীতি পরিভাষিতঃ।"—রাজব্যবহারকোষঃ।

(২) "বারগীবরবরঃ।"—রাজব্যবহার কোষঃ।

(৩) প্রবাদ এইরূপ যে, কাঠিয়াবাড় (গুজরাট) প্রদেশীয় ঘোটকীর গর্ভে আরবীয় ঘোটে-

বংশীয় উচ্চপদস্থ মরাঠাগণ কালক্রমে অতিশয় ক্ষমতাশালী, বহুসংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক ও দুর্গাধ্যক্ষ হইয়া উঠিলেন। এইরূপে মুসলমান নৃপতিগণের অধীনে থাকিয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রমে ক্রমে শক্তিসংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

২। পূর্ব্বপুরুষগণের বিবরণ।

আহম্মদ নগরের সুলতানগণের অধীনে থাকিয়া, 'ভোঁস্‌লে' নামক একটি পরিবার এইরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। নানা স্থলের রাজস্ব আদায়ের ভার তাঁহাদের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। ভোঁস্‌লে পরিবারের প্রসিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে 'লুখজী যাদবরাও' নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত আহম্মদনগরে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দশ সহস্র সৈনের অধিনায়ক ও সুবিস্তীর্ণ জাইগীরের অধিস্বামী ছিলেন। দেবগিরির সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া, ইঁহাকে 'যাদবরাও' বলিত। দেবগিরির নৃপতিগণ সুপবিত্র চন্দ্রবংশসম্ভূত।

ভোঁস্‌লে পরিবার রাজপুতানার সুপ্রসিদ্ধ 'শিশোদিয়া' বংশের শাখা-বিশেষ। এই পরিবারের উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ,—

খৃঃ ১৩০৩ অব্দে দুষ্টমতি আলাউদ্দিন চিতোরাধিপতি ভীমসিংহের পত্নী অতুলনীয় রূপলাবণ্যবতী পদ্মিনীর প্রাপ্তি আশায় চিতোরাক্রমণ করিয়া যে সর্ব্বনাশকর ব্যাপারের অভিনয় করেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া কতিপয় রাজপুত পরিবার দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বসতি করেন। দাক্ষিণাত্যে আসিলে পর, অনেকেরই পূর্ব্ব উপাধি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং বসতিস্থানের নামানুসারে (ও অন্যান্য কারণে) তাঁহারা নূতন পারিবারিক আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহারা প্রথমে মুসলমান নৃপতিগণের আশ্রয়ে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া, অবশেষে তাহাদেরই সর্ব্বনাশসাধন করেন। বলা বাহুল্য, এই নবাগত রাজপুতগণের—যাঁহারা দাক্ষিণাত্যে আসিয়া 'পবার' 'ঘাট্‌গে' 'গায়কবাড' (গুইকুমার), "চৌহাণ" "ভোঁস্‌লে", 'ঘোরপড়ে' ও "নিম্বালকর" প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হয়েন—যত্নেই দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত মহারাষ্ট্র-দেশের প্রাচীন অধিবাসীগণ (যাহারা এই নবাগত রাজপুতগণের বহুশতাব্দী

কের উরসে এই আসর উৎপত্তি। ইহারা পর্ব্বতবাসী, ক্রতগামী ও পর্ব্বতবৎ সঙ্কুচ কুটিলতা সম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত।

পূর্ব্ব হইতে মহারাষ্ট্রদেশে বাস করিতেছে) অর্থাৎ সাধারণ মরাঠাগণ ও যোধপুরের রাঠোড়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ যে এক বংশোদ্ভূত—এমন কি প্রাচীন মহারাষ্ট্র জাতি হইতেই যে আধুনিক রাঠোড়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে প্রমাণিত করিব।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে সমস্ত রাজপুত পরিবার ভোঁসাজী শিশোদের(১) সহিত চিতোর হইতে পলায়ন করতঃ দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বসতি করেন, পূর্ব্বকথিত 'ভোঁস্‌লে' নামক পরিবারও তদন্তর্গত। "শিবরাও শিশোদে" এই পরিবারের আদিপুরুষ। তিনি উদয়পুরে বাস করিতেন। মহারাণা সজ্জনসিংহ তাঁহার আত্মীয় ছিলেন। (কেহ কেহ মহারাণা সজ্জনসিংহকে এই পরিবারের আদিপুরুষ বলেন) শিবরাওএর তিনটি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম রামরাও, মধ্যমের নাম উদয়সিংহ ও কনিষ্ঠের নাম ভীমসিংহ। তন্মধ্যে রামরাও ও উদয় সিংহ পূর্ব্বোক্ত চিতোর যুদ্ধে নিহত হইলে, ভীমসিংহ পলায়ন করতঃ চিতোরের নিকটবর্ত্তী 'ভোঁসে' নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভীমসিংহের পুত্র বিজয়তাহু। তৎপুত্র খেলকর্ণ। ইনি "ভোসাব" (ভোঁসে-দুর্গের নিকটস্থ গ্রামবিশেষ; এই গ্রামে ভীমসিংহ ও বিজয়তাহু বাস করিতেন) পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন।

খেলকর্ণের পুত্রের নাম জয়কর্ণ। তৎপুত্র মহাকর্ণ আহাম্মদনগরের সুলতানের অধীনে চাকরী করিতেন। কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি শীঘ্রই দেড় সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন; এবং সেই সকল সৈন্যের ভরণপোষণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে "কাকন্," "পুরন্দর" ও "সুপা" মাহাল জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। যুদ্ধস্থলে মহাকর্ণ নিহত হন। মহাকর্ণের পুত্র "রাজাশিব"। ইনি সাধারণতঃ সাম্ভাজী নামে পরিচিত ছিলেন। আহাম্মদনগরের সুলতান ইঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ভীমানদীতে জলমগ্ন হইয়া ইনি প্রাণত্যাগ করেন। সাম্ভাজীর মৃত্যুর পর, তাঁহার অপোগণ্ড শিশু বাবাজী ভোঁস্‌লেকে (খৃঃ ১৫৩৩ অব্দে জন্ম) সঙ্গে লইয়া তাঁহার বিধবা পত্নী, আহাম্মদনগর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী "বেরুল" নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বাবাজী ভোঁসলে পৈত্রিক জাইগীরের অধিকারী হইতে পারেন নাই। তিনি "দেউল গাঁও", "ধানবটে" ও "জিন্তী" নামক গ্রামত্রয়ের (২)

(১) শিশোদিয়।——মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণ "শিশোদে"।

(২) "বান্ধব"-পত্রের লেখক অনভিজ্ঞতাবশতঃ 'বিঠোজী'কে 'উইজী' করিয়া ফেলিয়াছেন।

পাটিল অর্থাৎ গ্রামাধিকারীর স্বত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন। বাবাজী ভোঁসলে মলজী, বিঠোজী, ত্রিম্বকজী ও উমাজী নামক চারিটি পুত্র রাখিয়া ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তৎপরে ১৫৭৭ খৃঃ পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, মলজী ভোঁসলে পৈত্রিক আবাস পরিত্যাগ করিয়া, আহাম্মদনগরের সুলতানের অধীনে শিলেদারের (শিলাদার) কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার বেতন কেবলমাত্র ৫ পাঁচ হোন্ (প্রায় কুড়ি টাকা) ছিল। কিন্তু সকীয় সুদক্ষতা, রণনৈপুণ্য, বীর্য্যবত্তা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা গুণে মলজী শীঘ্রই প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। আহম্মদনগরের সুলতান তাঁহাকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কতা, "রাজা" উপাধি, এবং পুণা ও সুপা পরগণাদ্বয় জাইগীর-স্বরূপ প্রদান করিলেন। বহুদিবস পর্য্যন্ত পুত্রমুখসন্দর্শনে বঞ্চিত থাকায় মলজী অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। অবশেষে শাহসরীফ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকীরের বরে বর্ষদ্বয়মধ্যে তাঁহার দুইটি পুত্র হয়। মলজী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, অভীষ্টদাতা সিদ্ধপুরুষের নামানুসারে জ্যেষ্ঠের নাম শাহাজী ও কনিষ্ঠের নাম সরিফজী রাখিয়া, তৎপ্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও গভীর ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে শাহাজীর জন্ম হয়।

পিতার মৃত্যুর পর শাহাজী(১) ভোঁসলে পৈতৃক জাইগীরের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে মালিক আম্বেরের সহিত মোগলদিগের যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, শাহাজী তাহাতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৬৩৩ খৃঃ মোগল সম্রাট আহাম্মদনগর রাজ্য ধ্বংস করিলে, শাহাজী উক্ত রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন। তিনি রাজবংশীয় জনৈক বালককে সুলতানপদে অভিষিক্ত করিয়া, স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করতঃ মোগলদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অসীম পরাক্রমে মোগলদিগকে আক্রমণ করিয়া, পুনঃপুনঃ যুদ্ধে পরাজিত করিতে লাগিলেন; এবং তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু এত করিয়াও কোনও ফলোদয় হইল না। নানা কারণে তাঁহাকে আহাম্মদনগরের পুনরুদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। তৎপরে শাহাজী বিজাপুরের সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুলতান বিষয়কর্ম্মে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাহাতে তাঁহার

---

(১) ঐতিহাসিক পণ্ডিত যদুনাথ সরকার মহোদয় শাহাজীকে 'ডাকাইত' স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। শাহাজী দস্যিদলের অধিনায়ক ছিলেন।

জাইগীর ও সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল; এবং তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। শাহাজী রাজা এক জন পরাক্রান্ত বীর ও উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। তৎকালে মহারাষ্ট্রমণ্ডলে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। মহারাষ্ট্ররাজ্যে ছত্রপতি শিবাজী ও পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ ব্যতীত শাহাজী ভোঁসলের ন্যায় তৃতীয় ব্যক্তি আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মুসলমান নরপতি তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা কম্পিত হইতেন। তিনি কোনও কোনও রাজ্যের মন্ত্রি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃত রাজার ন্যায় স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য চালাইতেন। তৎকালের অবস্থাচক্রে পড়িয়া কখনও কখনও তিনি পক্ষ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি কাহারও পক্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, তাহা না করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। এই নিমিত্ত তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিতেন, সেই পক্ষীয়েরা আপনাদিগকে মহাসৌভাগ্যশালী জ্ঞান ও তাঁহাকে বিশেষ প্রকারে সম্মানিত করিতেন। শাহাজীর জীবনীপাঠে জানা যায় যে, তিনি মুসলমানগণের অধীনতাপাশ কাটাইয়া স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের কীর্ত্তির দ্বারায় যেরূপ দশরথের কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া সর্ব্বতোমুখে রাম রাম শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল, সেইরূপ ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর কীর্ত্তির দ্বারায় শাহাজীর কীর্ত্তি লুপ্তপ্রায় হইয়া রহিয়াছে (১)।

৩। শিবাজীর জন্ম ও বাল্যস্বভাব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই সময় দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্রে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। সুতরাং রাজা শাহাজী ভোঁসলে আহাম্মদনগরের সুলতানের পক্ষ হইতে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার সময়, স্বীয় গর্ভবতী স্ত্রী (লুখ্জী যাদব রাও-এর কন্যা) জীজাবাইকে শিউনেরী নামক একটি সুদৃঢ় দুর্গে রাখিয়া যান। শিউনেরী দুর্গ পুণার ৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই শিউনেরী দুর্গে, ১৫৫৯ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬২৭ খৃঃ) বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষীয় ২রা, শুক্রবারে, পবিত্রযাদববংশীয়া জীজাবাইর গর্ভে, যবনমর্দ্দক স্বদেশভক্ত মহাত্মা শিবাজীর জন্ম হয়। যে দেশে, একটি নয়, দুইটি নয়—পাঁচ পাঁচটি পরাক্রান্ত মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে দেশে বহুদিবসাবধি হিন্দুরাজ্য

(১) যে বৎসর মহাত্মা শিবাজীর জন্ম হয়, সেই বৎসর সাহাজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, নিয়তিশক্তির অনন্ত মহিমায় সেই দেশে যবনরাজ্য-বিধ্বংসকারী মহারাষ্ট্র রাজ্যসংস্থাপক এক জন হিন্দু-রাজচক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিলেন। (২)

শাহাজীর দুই পরিবার। ১ম, জীজাবাই, (১৫৯৮ খৃঃ জন্ম; ১৬০৪ খৃঃ বিবাহ; ও ১৬৭৪ খৃঃ মৃত্যু) ২য় তুকা বাই (৩)। জীজাবাইয়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম সাম্ভাজী ও কনিষ্ঠের নাম শিবাজী। শিউনেরী দুর্গে অবস্থানকালে জীজাবাই তত্রত্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "শিবাই" দেবীর নিকট মানস (মানত) করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র জন্মিলে দেবীর নামানুসারে স্বীয় পুত্রের নাম-করণ করিবেন। এই নিমিত্ত, শিবাই দেবীর নামানুসারে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শিবাজী রাখা হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র শাম্ভাজী সর্ব্বদা পিতার নিকটে থাকিতেন। তুকা বাইর পুত্রের নাম "ব্যেঙ্কোজী"। ইনি কর্ণাটক প্রদেশে পিতার তত্রত্য জায়গীর পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

রাজ্যে সর্ব্বত্র সমরানল প্রজ্বলিত হওয়ায়, জীজাবাই ও শিবাজীকে ৭ বৎসর শিউনেরী দুর্গে অতিবাহিত করিতে হয়। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগর রাজ্য ধ্বংস হইলে, দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহানল অনেক পরিমাণে নির্ব্বাপিত হয়। শাহাজী বিজাপুরের সুলতানের অধীনে মনসবদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বহু-দিবসাবধি স্ত্রী-পুত্রের অদর্শনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া, শাহাজী জীজাবাই ও শিবাজীকে বিজাপুরে লইয়া গেলেন। ১৬৩৭ খৃঃ বিজাপুরে নিম্বালকরের দুহিতা সইবাইর সহিত শিবাজীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। সইবাইর গর্ভে ১৬৫৭ খৃঃ সাম্ভাজীর (শম্ভুজী) জন্ম হয়।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কবিত্বশক্তির ন্যায় স্বদেশপ্রীতিও একটি ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক বৃত্তি। শিক্ষা দ্বারা ইহা সম্যক লাভ করিতে পারা যায় না। জগতের ইতিহাসে এমন কতকগুলি মহাত্মার পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁহারা স্বভাবতঃই স্বদেশভক্ত। শিক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশ-

---

(২) যদুনী বাবু 'টুকা বাই' কবিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভুল।

(৩) Vide "A Review of Captain James Grant Duffs' History of the Marathas." By Rao Bahadur Nil Kantha Janardon Kirtane. Late Assistant guardian and tutor to H.H. the Nawab of Jowrah; Guardian and tutor to H. H. of Dewas junior Branch and late Dewan of Manwori Kattawar.

ভক্তি লাভ করিতে হয় নাই। শিবাজী এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বদেশভক্তির অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল।

শিবাজী বাল্যকাল হইতে মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। একদা শাহাজী বিজাপুরের সুলতানের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ করিবার প্রস্তাব করিলে, শিবাজী তাহাতে অসম্মত হন। শাহাজী ও তদীয় অনুরোধে জীজাবাই অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করায় তিনি বলিলেন, "যবনের সহিত সাক্ষাৎ করা ও যবনের অধীনে থাকা নীচতা ও পাপের কার্য্য।" কিন্তু অবশেষে শাহাজীর তাড়নায় তাঁহাকে সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইতে হইল।

অবশেষে এক দিন শিবাজী পিতার সহিত সুলতানের দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি সুলতানকে তৎকালপ্রচলিত প্রথানুসারে হাঁটু পাতিয়া সেলাম অথবা অন্য কোনও রূপ সম্মান প্রদর্শন না করিয়া, নির্ভীক চিত্তে বীরাসনে উপবেশন করিলেন। সুলতান দশবর্ষবয়স্ক বালকের এইরূপ সাহস, তেজস্বিতা ও ঔদ্ধত্য দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। সুলতান নীচপ্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বীরত্বের সম্মান করিতে জানিতেন। এ জন্য শিবাজীকে তাৎকালিক প্রথা অনুসারে একটি পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। শাহাজী গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার ব্যবহারে আমি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু পুনরায় এরূপ করিলে ভাল হইবে না। দেখ, সুলতান এখন আমাদের প্রভু। তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারেন।" এই কথা শুনিয়া তেজস্বী শিবাজী বিনীতভাবে বলিলেন, "তাহারা মুসলমান, আমরা হিন্দু। তাহারা যে আমাদের গোজাতিকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাতে কি তাহাদের পাপ হয় না? কেন তাহারা এরূপ ঘোরতর পাপের অনুষ্ঠান করিতেছে? আমাদের সম্বন্ধে তাহারা আমাদের হিন্দুধর্ম্মের এরূপ অবমাননা করিতেছে, এই জন্য আমি কখনও তাহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিব না। আপনিই আমার প্রভু; আমি তাহাদের ভৃত্য নহি। তাহারা আমাদের দেশ অন্যায়রূপে অধিকার করিয়া বহুদিবসাবধি প্রভুত্ব ও ইচ্ছামত রাজস্ব আদায় করিতেছে। এক্ষণ হইতে আমাদের দেশের শাসনভার আমরা নিজেই লইব, এবং আমাদের হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিব। তাহারা আমাদের দেশ ছাড়িয়া দিয়া স্বদেশে চলিয়া যাউক……"। স্বাধীনতাপ্রিয় তেজস্বী পুত্রের এই বাক্যে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া শাহাজী অত্যন্ত ভীত

কাঠুরিয়া।

(অনুবাদিত।)

১

এককালে সালর্ণো নামক নগরে জরবীন নামে কাঠুরিয়া যুবক বাস করিত। তাহার পিতা মাতা অথবা বন্ধু কেহ ছিল না। সে স্বভাবতঃ একা থাকিতে ভাল বাসিত, তাহাতে আবার অশিক্ষিত বলিয়া কাহারও সহিত বড় একটা মিশিত না। লোকে তাহাকে মূর্খ বিবেচনা করিয়া, তাহার নাম "বর্ব্বর" রাখিয়াছিল। নামটি বেশ মানাইয়াছিল।

প্রাতঃকালে, আর কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই, সে কুঠার স্কন্ধে করিয়া পর্ব্বতের অভিমুখে যাত্রা করিত। সারাদিন বনে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় কাষ্ঠভার লইয়া নগরে ফিরিয়া আসিত। কাষ্ঠভার বিক্রয় করিয়া রাত্রের আহারের সংস্থান করিত।

এক দিবস একটা প্রাচীন বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়া অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ হওয়াতে, জরবীন মনোহর বৃক্ষশ্রেণীপরিবৃত ছায়াস্নিগ্ধ পবনের তীরে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিল। বিস্মিত হইয়া দেখিল, অনতিদূরে তৃণশয্যোপরে, মরালপক্ষ-নির্ম্মিত উৎকৃষ্টবেশপরিহিত অপূর্ব্বসুন্দরী কিশোরী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। মুখে দুর্ভাবনার চিহ্ন, নিদ্রাবস্থায় যেন কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ইতস্ততঃ হস্ত সঞ্চালন করিতেছে।

"স্ত্রীলোক মাত্রেই মূর্খ। দেখ দেখি, দুপুর বেলা এমন জায়গায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে, সূর্য্যের কিরণ মুখে পড়িতেছে।"

এই বলিয়া জরবীন বৃক্ষের কয়েকটা শাখা হেলাইয়া নিদ্রিতা রমণীর মস্তকের উপর ছায়া করিল, এবং সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে না পায়, এই অভিপ্রায়ে, শাখার উপর আপনার উত্তরীয় বস্ত্র রক্ষা করিল।

কিরিয়া দেখে, একটি ক্ষুদ্র বিষাক্ত লোলজিহ্ব সর্প নিদ্রিতা রমণীর দিকে আগমন করিতেছে। "দেখিতে এই টুকু, ইহারই মধ্যে এত দুরভিসন্ধি।" বলিয়াই জরবীন কুঠারের দুই আঘাতে সর্পকে তিন খণ্ড করিয়া ফেলিল।

নিদ্রিতা কিশোরী পত্নী, জলদেবী। কুঠারের আঘাতের শব্দে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া মৃত সর্পকে দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল লোচনে কহিল, "অয়বীন, তুমি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর সামগ্রী রক্ষা করিয়াছ।"

অসত্য অয়বীন উত্তর করিল, "আমি কিছুই করি নাই। তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, ঘাসের উপর শয়ন করিলে সর্পভয় থাকেই। না শয়ন করাই ভাল। এখন তুমি বিদায় হও, আমি একটু নিদ্রা যাইব।" বলিয়া ঘাসের উপর শয়ন করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিল।

পত্নী কহিল, "অয়বীন, আমার নিকট প্রার্থনা করিবার কিছু নাই?"

অয়বীন কহিল, "আমার একাকী নিশ্চিন্ত হইতে দাও এই মাত্র প্রার্থনা, অন্য প্রার্থনা নাই। লোকে যখন কোন সামগ্রীর কামনা করে না, তখন যাহা আবশ্যক প্রাপ্ত হয়। আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে সুখী হয়।" কথা সমাপ্ত হইতেই বর্ব্বরের নাসিকাগর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল।

তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া পত্নী কহিল, "তোমার আত্মা এখনও নিদ্রিত রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যাহাই হও, আমি অকৃতজ্ঞ হইব না। তুমি না থাকিলে আমার পরম শত্রু নিষ্ঠুর দৈত্যের হস্তে পতিত হইতাম। তুমি না থাকিলে আমায় শত বর্ষ সর্প হইয়া বাস করিতে হইত। তোমার জন্য আমার আরও শত বর্ষ রূপ ও যৌবন থাকিবে। অয়বীন, ভবিষ্যতে তোমার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে; কোন দিন তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ করিবে।"

অনন্তর হস্তস্থিত যষ্টি আকাশে তিন বার মণ্ডলাকারে ঘুরাইয়া জলদেবী জলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। চরণস্পর্শ এমন মৃদু যে, পবনের জল কিছুমাত্র চঞ্চল হইল না। রাজ্ঞীর আগমনে বেতসী লতা মস্তক অবনত করিল, পদ্মমুকুল প্রস্ফুটিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। জলদেবীর আনন্দে যেন তরুগণ ও সমীরণ আনন্দিত হইল। শেষ বার যষ্টি সঞ্চালন করিতে উজ্জ্বল জলরাশি রাজ্ঞীর পথমুক্ত করিবার তরে দ্বিধা হইল, কনকরশ্মিরেখার ন্যায় গভীর জলরাশি আলোকিত করিয়া, জলদেবী ধীরে ধীরে জলে প্রবেশ করিল। তখন আবার জলরাশি অস্পষ্ট ছায়াবৃত হইল, চারি দিক আবার নিস্তব্ধ হইল।

দ্বিপ্রহরের সময় কাষ্ঠচ্ছেদকের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সে পূর্ব্বের ন্যায় কাষ্ঠচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল। সবলে কুঠারাঘাত করিতে করিতে তাহার ললাট বহিয়া ঘর্ম্ম পড়িতে লাগিল, কিন্তু তাহার পরিশ্রম নিষ্ফল হইল।

অবশেষে কুঠারের শাণিতাগ্রভাগ বক্র হইয়াছে দেখিয়া, অয়বীন কিছু বিরক্ত

ভাবে কহিল, "এমন যদি কোন অস্ত্র থাকিত, যাহা যারা কাঠ মানুষের মত কাটা যাইত! আমার ইচ্ছা করে, আমি সেই রকম একটা অস্ত্র পাই।"

এই বলিয়া দুই পদ পশ্চাতে সরিয়া কুঠার ঘুরাইয়া এমন জোরে আঘাত করিল যে, স্বয়ং পড়িয়া গেল। বলিয়া উঠিল, "আঃ লক্ষ্যটা বাঁকা হইয়াছে।" বলিতে বলিতে বৃক্ষটা তাহার পার্শ্বে পড়িয়া গেল। অরবীন চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিল।

আহ্লাদে অরবীন কহিল, "কেমন ঘা মারিয়াছি! কাঠ কেমন সুন্দর কাটিয়াছে! আমার সমান কাঠুরিয়া আর কেহ নাই।"

কাষ্ঠখণ্ডসমূহ সংগ্রহ করিয়া, স্বীয় কটিস্থিত রজ্জু দ্বারা কাষ্ঠভার বন্ধন করিল। বন্ধন কঠিন করিবার নিমিত্ত, কাষ্ঠভারের উপর দুই পার্শ্বে দুই পা দিয়া বসিল। আপনা-আপনি কহিতে লাগিল, "কাঠের বোঝার ঘোড়ার মত চারিটা পা নাই, বড়ই দুঃখের কথা! থাকিলে সুন্দর অশ্বারোহীর মত সালর্ণো নগরে প্রবেশ করিতাম। তাহা হইলে কেমন মজা হইত!"

বলিবামাত্র কাষ্ঠভার উঠিয়া অশ্বের ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিল। অরবীন কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া এই অদ্ভুত অশ্বারোহণে চলিল, এবং মনে মনে কাষ্ঠভারের অভাবে যাহাদিগকে পদব্রজে চলিতে হয়, তাহাদিগের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল।

২

সালর্ণো নগরের মধ্যস্থলে বৃহৎ চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডে রাজপ্রাসাদ। সকলেই অবগত আছেন, প্রথিতযশা হনিবী এই সময়ে এই দেশের রাজা ছিলেন।

প্রতি দিন বৈকালে রাজকন্যা আলেলী বিষণ্ণবদনে প্রাসাদের বারান্দায় বসিয়া থাকিতেন। দাসীগণ গান, গল্প ও তোষামোদ দ্বারা তাঁহাকে আমোদিত করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই আপনার চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। তিন বৎসর হইতে রাজা প্রতিবেশী জমিদারপুত্রগণের সহিত রাজকন্যার সম্বন্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু আলেলী বিবাহে সম্মত হইতেন না। এই দিবস আলেলী ব্যগ্রাকুলচিত্তে বারান্দায় বসিয়াছিলেন, এমন সময় বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সম্রাটের ন্যায় গর্ব্বভরে কাষ্ঠভারারোহণে অরবীন প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া রাজকন্যার দুই জন সহচরী উচ্চ হাস্য করিয়া, হস্তস্থিত কমলা লেবু তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিল। দুইটা লেবু অরবীনের মুখে লাগিল।

অর্বীন কহিল, "হাস তোমরা—আমার ইচ্ছা হয় তোমরা কেবল হাসিতেই থাক।"

রাজকন্যার সহচরীদ্বয় ক্রমাগত হাসিতে লাগিল। রাজকন্যা কাষ্ঠচ্ছেদককে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া সহচরীদিগকে হাসিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা কোন মতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না।

রাজকন্যাকে দেখিয়া অর্বীন কহিল, "রাজকন্যা এমন সুন্দরী, তথাপি এত বিষণ্ণ। তোমার মঙ্গল হউক, যে তোমায় প্রথমে হাসাইতে পারিবে, তুমি যেন তাহাকে ভালবাস ও সেই যেন তোমার স্বামী হয়।" বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া রাজকন্যাকে অভিবাদন করিল।

কাষ্ঠভারে আরোহণ করিয়া রাজ্ঞীকেও অভিবাদন না করাই পরামর্শ, কিন্তু অর্বীনের ইহা স্মরণ ছিল না। মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিবার জন্য কাষ্ঠভারের বন্ধনরজ্জু মুক্ত করিয়াছিল। বন্ধনমুক্ত হইবামাত্র কাষ্ঠখণ্ড সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। অর্বীন ঊর্দ্ধপদ নিম্নশির হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল; আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

কেহ পড়িয়া গেলে অন্য লোকে কেন হাসে, এ তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। অর্বীনকে পতিত হইতে দেখিয়া আলেলী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অর্বীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, হৃদয়ে হস্ত রক্ষা করিয়া, অত্যন্ত চঞ্চলচিত্তে প্রাসাদে প্রবেশ করিল।

অর্বীন পুনবার কাষ্ঠভার সংগ্রহ করিয়া, অপর কাষ্ঠচ্ছেদকের ন্যায়, কাষ্ঠভার মস্তকে বহন করিয়া, পদব্রজে গৃহে গমন করিল। সৌভাগ্যে সে বিস্মিত হয় নাই, দুর্ভাগ্যেও তাহার চিত্তে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় নাই।

যে সময় এই সকল ব্যাপার ঘটিতেছিল, সেই সময় চারি ঘটিকা বাজিল। অত্যন্ত গ্রীষ্ম, পথ একেবারে নিস্তব্ধ। রাজা হনিবী শীতল মহলে নিদ্রিত ছিলেন। নিদ্রাবস্থায় প্রজার মঙ্গলের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল—দেখিলেন, আলেলী তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়াছে, তাহার অশ্রু তাঁহার মুখে পড়িতেছে।

অনভ্যস্ত স্নেহাতিশয্য দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "একি? এত অশ্রুপাতের ও আদরের অর্থ কি? তোমার বুঝি কিছু চাই, তোমার জন্য আমায় বোধ হয় কিছু করিতে হইবে?"

আলেলী কহিল, "না পিতঃ, তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। তুমি

যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। এত দিন যে জামাতাকে অন্বেষণ করিতেছিলে, সে পাওয়া গিয়াছে, এবং আমি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছি।"

রাজা কহিলেন, "বটে, এত দিন না না করিয়া শেষে বুঝি এই হইল! লোকটা কে? কাবার রাজপুত্র না কি? না? তবে কি কাশ্মীর জমীদার, না সোরেন্টোর তালুকদার? তাহাদের মধ্যেও কেহ নয়? তবে কে, শুনি।"

আলেলী কহিল, "কে আমি জানি না।"

রাজা কহিলেন, "তুমি তাহাকে জান না সে-কেমন কথা! তুমি তাহাকে নিশ্চয় দেখিয়াছ।"

"হাঁ, তাহাকে দেখিয়াছি—এই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে, রাজপ্রাসাদের সম্মুখে।"

"সে তোমার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল?"

"না। যখন পরস্পরের হৃদয় পরস্পরকে বুঝিয়াছে, তখন: কথা কহিবার আবশ্যক কি?"

রাজা হনিবী মুখভঙ্গী করিলেন। মাথা চুলকাইয়া কন্যার দিকে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন, "যেই হউক, রাজপুত্র বটে ত?"

আলেলী কহিল, "আমি জানি না। রাজপুত্র হউক না হউক, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

"ক্ষতিবৃদ্ধি বিলক্ষণ আছে—তুমি রাজনীতি কিছু বুঝিতে পার না। এই ব্যক্তি কোথায় লুক্কায়িত আছে, জিজ্ঞাসা করি।"

আলেলী কহিল, "আমি জানি না।"

রাজা বাগিয়া কহিলেন, "আমার এত অবকাশ নাই যে, আমি এই সকল নিরর্থ কথা শুনি। বাহিরে কে আছে, রাজকন্যার দাসীদিগকে ডাকিয়া বল, তাহারা অন্তরমহলে রাজকন্যাকে লইয়া যাক্।"

এই কথা শুনিয়া আলেলী কাঁদিয়া পিতার পদতলে পতিত হইল। ক্ষণেক পরে রাজকন্যার সহচরীরা হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এইরূপে অসম্মানিত হইয়া রাজা ক্রোধভরে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "চুপ কর! চুপ কর!" কিন্তু রাজা যত চীৎকার করেন, "চুপ কর!", রাজকন্যার সহচরীরা আরও কায়দা বিস্তৃত হইয়া ততই হাসে।

রাজা ক্রোধে অস্থির হইয়া কহিলেন, "প্রহরিগণ! এই নির্লজ্জ রমণীদিগকে ধৃত করিয়া ইহাদের মস্তক ছেদন কর।"

আলেনী যুক্তকরে কহিল, "মহারাজ! প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আপনার রাজ্য চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, স্মরণ রাখিবেন।"

রাজা কহিলেন, "এ কথা সত্য বটে। আমরা শিক্ষিত জাতি। ইহারা নিষ্কৃতি পাইবে। নির্জ্জন কারাগারে ইহারা রুদ্ধ রহিবে, সেখানে আর কাহারও কথা শুনিতে না পাইয়া, আপনাদের কথা শুনিয়া শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া আপনা-আপনি মরিয়া যাইবে।"

আলেনী কাঁদিতে লাগিল।

সহচরীদ্বয় ভূতলে জানু পাতিয়া কহিল, "মহারাজ! ক্ষমা করুন, আমরা চুপ করিতেছি। যাদুকরের মায়ায় আমাদের এই অবস্থা হইয়াছে, অতএব আমাদিগকে মার্জ্জনা করুন।"

"আমার রাজ্যে যাদুকর! এ কথা কোন মতেই সম্ভব নহে। আমার যখন যাদুকরে বিশ্বাস নাই, তখন এখানে তাহারা কেমন করিয়া থাকিবে?"

সহচরীদ্বয়ের মধ্যে এক জন কহিল, "মহারাজ, এক জন কাঠুরিয়া কাষ্ঠ-ভারের উপর চড়িয়াছে, কাষ্ঠভার ঘোড়ায় নাচের ঘোড়ার মত নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছে, ইহাও কি কখন সম্ভব? এই মাত্র প্রাসাদের সম্মুখে আমরা দেখিয়াছি।"

রাজা কহিলেন, "কাষ্ঠের বোঝা? যাদু বলিয়াই সন্দেহ হইতেছে। প্রহরি-গণ! সেই ব্যক্তিকে তাহার বোঝা সমেত ধৃত করিয়া পুড়াইয়া ফেল। তাহার পর বোধ হয় একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।"

রামকন্যা রোদন করিয়া কহিল, "আমার প্রিয়তমকে পুড়াইবে? মহারাজ, সেই সুন্দর পুরুষ আমার স্বামী হইবেন। তাঁহার একটি কেশ স্পর্শ করিলে আমি মরিব।"

রাজা হনিবী ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "আমার বাড়ীতে সকলেরই ভূতে পাইয়াছে। যদি নিশ্চিন্তই না থাকিতে পারিলাম, তাহা হইলে রাজা হইয়া ফল কি? কিন্তু আমিই বা ভাবিয়া মরি কেন? মিষ্টিগ্রিস্‌কে ডাক। যখন আমার মন্ত্রী রহিয়াছে, সে যদি আর কিছু না পারে, অন্ততঃ আমি কি ভাবি এবং আমি কি ইচ্ছা করি, তাহার বলিতে পারা আবশ্যক।"

মিষ্টিগ্রিস্ শীঘ্রই উপস্থিত হইল। মানুষটি ক্ষুদ্র, স্থূল, গোল; গোলার মত গড়াইয়া যায়, হাঁটিতে বড় পারে না। চক্ষু দুইটি অতি ক্ষুদ্র, কপাল ক্ষুদ্র ও নিম্ন, নাসিকা চক্ষুর ন্যায়, গণ্ডদ্বয় স্থূল এবং চিবুকটি ত্রিতল। রাজা হনিবীর

বিখ্যাত মন্ত্রীর রূপবর্ণনা এই। মন্ত্রী হাসিতে হাসিতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবিক্ষেপে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজা কহিলেন, "এতক্ষণে তোমার আসা হইল। আমার রাজ্যে অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিতেছে, আর আমি তাহার সংবাদ সকলের শেষে পাই। এ কেমন কথা।"

মন্ত্রী কহিল, "কোনরূপ বিভ্রাট কোথাও উপস্থিত হয় নাই। আমার কাছে পুলিশের রিপোর্ট রহিয়াছে। রাজ্যে শান্তি ও স্বচ্ছলতা যেমন থাকে, সেইরূপ রহিয়াছে।" এক খণ্ড বৃহৎ কাগজ বাহির করিয়া মন্ত্রী পড়িতে আরম্ভ করিল—"সালর্গো নগরী—বিত্ত এবং সচ্চরিত্রতা বর্দ্ধিত হইতেছে। দুইটা স্ত্রীলোক অনাহারে মরিয়াছে; দশটি শিশু পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে; তিন জন স্বামী তাহাদের স্ত্রীদিগকে প্রহার করিয়াছে; দশ স্ত্রী স্বামীদিগকে প্রহার করিয়াছে, চুরী ডাকাইতির সংখ্যা ত্রিশ; দুইটা খুন হইয়াছে; তিনটা বিষ দিয়া হত্যা করিয়াছে। নূতন কিছুই নাই।"

রাজা বিরক্ত ভাবে কহিলেন, "এই পর্য্যন্ত বুঝি। আমি রাজকর্ম্মের কিছু না জানি, তোমার অপেক্ষা অনেক সংবাদ রাখি। এক ব্যক্তি কাঠের বোঝার চড়িয়া প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া গিয়াছে। সে মন্ত্র দ্বারা আমার কন্যাকে বশীভূত করিয়াছে। আমার কন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে।"

উত্তরে মন্ত্রী কহিল, "মহারাজ, এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি আমি অবগত ছিলাম—রাজমন্ত্রী সব কথাই জানে; কিন্তু মহারাজকে এই সকল তুচ্ছ কথা বলিয়া বিরক্ত করা কেন? তাহাকে ধরিয়া ফাঁসি দেওয়া যাইবে, গোল চুকিয়া যাইবে।"

"সে যদমায়েশ কোথায় আছে, আমায় বলিতে পার?"

নিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "তাহা আর পারি না? রাজমন্ত্রী সকল দেখে, সকল শুনে, সর্ব্বত্র উপস্থিত থাকে।"

"আচ্ছা, সেই ব্যক্তিকে যদি অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে আমার সম্মুখে আনয়ন না কর, তাহা হইলে তোমার পদ এমন আর এক ব্যক্তিকে দিব, যে শুধু দেখে না, কর্ম্মও করিতে পারে। এখন বিদায় হও।"

নিষ্টিগ্রিস্ স্মিতমুখে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, কিন্তু বাহিরে আসিয়া তাহার মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রথমেই যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহার হস্ত ধারণ করিল। সে ব্যক্তি সরব কোতোয়াল। নিষ্টিগ্রিস্ তাহার গলা চিপিয়া

ধরিয়া কহিল, "এই নগরে কোন দুষ্ট লোক কাঠের বোবায় চড়িয়া বেড়ায়। দশ মিনিটের মধ্যে যদি তাহাকে আমার সম্মুখে আনয়ন না কর, তাহা হইলে তোমার শাস্তি হইবে, মনে রাখিও। এখন যাও।"

কোতোয়ালকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়া মিষ্টিপ্রিন্স্ পূর্ব্ববৎ হাস্যমুখে রাজার নিকটে ফিরিয়া গেল।

৩

যশ উৎকৃষ্ট সামগ্রী হইলেও তাহাতে কতক অসুবিধা আছে। অজ্ঞানিত থাকিবার সুখ আর থাকে না। জবুবীন বেশ্যপে নগরে প্রবেশ করিয়াছিল, বালকগণের মধ্যে তাহা তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্র হইয়া গেল, অতএব তাহাকে অনুসন্ধান করা রাজকর্ম্মচারীদিগের পক্ষে বিশেষ আয়াসসাধ্য হইল না। জবুবীন গৃহের প্রাঙ্গণে হাঁটু পাতিয়া কুঠারে ধার করিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে উঠাইল।

জবুবীন নিশ্চিন্তভাবে রাজকর্ম্মচারীদিগের সমভিব্যাহারে রাজবাটীর অভিমুখে গমন করিল। দ্বারের সম্মুখে অনেকগুলি লোক জরির পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহারা রাজার ভৃত্য, রাজকন্যার পাত্রের প্রত্যুদ্গমনের জন্য দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদের প্রতি আদেশ ছিল যে, জবুবীনকে সম্মান প্রদর্শন করিবে। সেই আদেশ মত তাহারা টুপি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জবুবীনকে দেখিয়া সকলে ঝুঁকিয়া সেলাম করিল। যাহাতে ভদ্রতার অভাব না হয়, এই অভিপ্রায়ে জবুবীনও সেইরূপ সেলাম করিল। ভৃত্যেরা পুনর্ব্বার সেইরূপ সেলাম করিল, জবুবীনও তদ্রূপ। এইরূপ আট দশ বার হইল। জবুবীনের রাজবাটীতে জন্ম হয় নাই, সুতরাং তাহারই প্রথমে শ্রান্তি বোধ হইতে লাগিল।

অবশেষে কহিল, "সেলাম যথেষ্ট হইয়াছে, এখন আমার ইচ্ছা, তোমরা নৃত্য কর, আমি দেখি।" ভৃত্যগণ অমনি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। নৃত্য করিতে করিতে তাহারা রাজবাটীতে প্রবেশ করিল।

রাজোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, রাজা হনিবী নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন। আলেলী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। কেমন করিয়া মুখে রাজনৈতিক ভাব আনিবে, মিষ্টিপ্রিন্স্ সেই চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় বৃহৎ দ্বার মুক্ত হইল, সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, ভৃত্যগণ নৃত্য করিতে করিতে রাজদরবারে প্রবেশ করিতেছে।

তাহাদের পশ্চাৎ জবুবীন আসিল। রাজপ্রাসাদের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া

সে কিছুমাত্র বিস্মিত হয় নাই, যেন জন্মাবধি রাজবাটীতেই বাস করিয়াছে। রাজার সম্মুখে আসিয়া, টুপি খুলিয়া তিন বার তাঁহাকে সেলাম করিল। তৎপরে টুপি পরিয়া, একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে পা দোলাইতে লাগিল।

রাজকন্যা রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "পিতঃ! এই আমার স্বামী। কেমন সুপুরুষ, কেমন উদারপ্রকৃতি! আপনি ইহাকে ভাল বাসিবেন ত?"

রাজা মন্ত্রীকে মৃদুস্বরে কহিলেন, "মিষ্টিপ্রিস্, এই ব্যক্তিকে অতিশয় সাবধানে প্রশ্ন কর। আমার ও আমার কন্যার উভয়েরই সম্ভ্রম যাহাতে বজায় থাকে, এমন করিবে। ভাল বিপদ হইয়াছে! সন্তানাদি না থাকিলে পিতারা কতই সুখী হইত।"

মিষ্টিপ্রিস্ কহিল, "মহারাজ কোন চিন্তা করিবেন না। দয়া প্রদর্শন করা আমার কর্ত্তব্য এবং আমার পক্ষে আহ্লাদের বিষয়।" জরবীনকে লক্ষ্য করিয়া—"বদমায়েশ, যদি প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে ত আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহার উত্তর দে। তুই কি ছদ্মবেশী রাজপুত্র? তুই মায়াবী, কথা কহিতেছিস্ না।"

জরবীন আসন ত্যাগ না করিয়াই কহিল, "বুড়া, তুইও মায়াবী নহিস্, আমিও মায়াবী নহি।"

মন্ত্রী কহিল, "দুর্বৃত্ত, তুই নিরুত্তর রহিয়াছিস্, ইহাতেই তোর অপরাধ প্রমাণিত হইতেছে।"

জরবীন কহিল, "যদি আমি স্বীকার করি, তাহা হইলে আমি নির্দ্দোষী হইব।"

মন্ত্রী কহিল, "মহারাজ, ইহার দণ্ড হউক। পৃথিবী এই পাষণ্ডের ভার বহন করিতে পারিতেছে না। এই পাপিষ্ঠের পক্ষে মৃত্যু অতি লঘুদণ্ড।"

জরবীন কহিল, "বুড়া, বলিয়া যা। দাঁত খিঁচাইলে ক্ষতি নাই। দেখিস্ যেন কামড়াস্ নে।"

রুদ্ধনিশ্বাসে মিষ্টিপ্রিস্ কহিল, "মহারাজ, এই মায়াবী হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। ইহার ফাঁসী হউক, অথবা ইহাকে দগ্ধ করিতে আদেশ হউক। আপনি রাজকন্যার পিতা বটে, কিন্তু আপনি রাজা। পিতার কর্ত্তব্য অপেক্ষা রাজার কর্ত্তব্য শ্রেষ্ঠ।"

রাজা কহিলেন, "মিষ্টিপ্রিস্, তুমি অনর্গল কথা কহিতে পার বটে, কিন্তু

তোমার কথা কহিবার ধরণ অযথা। এত সুর করিয়া বলিতে হইবে না। যাহা বলিবার আছে সমাপ্ত কর।"

মিষ্টিপ্রিস্ হাঁপাইয়া কহিল, "মহারাজ—মৃত্যু—ফাঁসি—অগ্নি!"

যতক্ষণ এই সকল হইতেছিল, ততক্ষণ আলেলী পিতৃপার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া, জবুবীনের পাশে গিয়া উপবেশন করিল। কহিল, "মহারাজ, আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, আদেশ করুন। ইনি আমার স্বামী। ইহার কপালে যাহা আছে আমারও তাহাই আছে।"

এই আচরণে লজ্জিতা হইয়া দরবারের মহিলাগণ মুখ ঢাকিলেন। মিষ্টিপ্রিস্ পর্য্যন্ত লজ্জা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া মুখ লোহিতবর্ণ করিল।

ক্রোধান্ধ রাজা কহিলেন, "হতভাগিনি! আমা অপমান করিয়া তুই আপনার শাস্তিবিধান আপনি করিয়াছিস্। প্রহরিগণ! এই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া এখনি ইহাদিগের বিবাহ দাও। তৎপরে দুই জনকে একখানা নৌকায় আরোহণ করাইয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দাও।"

প্রহরিগণ আলেলী এবং জবুবীনকে ধরিয়া লইয়া চলিল। মিষ্টিপ্রিস্ কহিল, "মহারাজ, আপনার তুল্য প্রতাপশালী সম্রাট জগতে নাই। মহারাজের দয়া, মহারাজের হৃদয়ের কোমলতা, মহারাজের স্নেহ ভবিষ্যতে লোকের আদর্শস্বরূপ হইবে, এবং সকলে শুনিয়া চমৎকৃত হইবে। আমরা এরূপ উদারতা দেখিয়া বাক্যহীন হইয়াছি। মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিয়াছি।"

রাজা কহিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া আমার কন্যার কি দশা হইবে? প্রহরিগণ! মিষ্টিপ্রিস্‌কে ধরিয়া ঐ নৌকায় দাও। এমন চতুর ব্যক্তি আমার প্রিয় আলেলীর নিকট আছে জানিলে আমার মন কতক স্থির হইবে। আর এক জন নূতন মন্ত্রী হওয়াও কিছু আমোদের কথা—আমার মন ভাল থাকিবে। মিষ্টিপ্রিস্, এখন তবে এস।"

মিষ্টিপ্রিস্ অবাক হইয়া হাঁ করিয়া রহিল। অবশেষে রাজা এবং রাজাদিগের কৃতঘ্নতা সম্বন্ধে গালি পাড়িতে আরম্ভ করিতেই, প্রহরিগণ তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল। সে কত বিনয়, কত অশ্রুপাত করিল, কত ভয় দেখাইল, কেহ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তিন জনকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া তরঙ্গরাশির মধ্যে ভাসাইয়া দিল।

রাজা রানী এক বিন্দু অশ্রুমোচন করিয়া, অসুখে অসময়ে তাঁহার বৈকালীন নিদ্রা সমাপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় শয়ন করিলেন।

৪

নিস্তব্ধ বসন্তের রাত্রি; চিরচঞ্চল সমুদ্রের উপর ম্লান জ্যোৎস্নালোক পড়িয়াছে; তীর হইতে বায়ু বহিতেছে। অল্পকালের মধ্যে নৌকা অনেক দূর চলিয়া গেল। অল্পকালের মধ্যে তরঙ্গোত্থিত পুষ্পোদ্যানের ন্যায় কাঞ্চী নগরী দৃষ্ট হইল। জরদীন হাল ধরিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে কাঠুরিয়া ও নাবিকের গীত গাহিতেছিল। তাহার চরণের নিকট আলেলী নীরবে বসিয়া স্বামীর গীত শ্রবণ করিতেছিল। সে অতীত বিস্মৃত হইয়াছিল, ভবিষ্যতের তাহার কোন চিন্তা ছিল না। জরদীনের নিকট রহিয়াছে, ইহাতেই সে সন্তুষ্ট।

মিষ্টিগ্রিসের মনের ভাব অন্যরূপ। পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের ন্যায় সে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। জরদীন অবনতমস্তকে বসিয়া নিশ্চিন্তভাবে মিষ্টিগ্রিসের কথা শুনিতেছিল। দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করা অভ্যাস না থাকাতে, মিষ্টিগ্রিসের বাক্যবিন্যাসে তাহার নিদ্রাগম হইতেছিল।

শেষে বিরক্ত হইয়া মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "হতভাগা বাদুকর, তোর যদি কোন ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষমতা দেখাইবার এই সময়। তুই কোন দেশের রাজা হইয়া আমায় মন্ত্রী করিতে পারিস্ না? আধিপত্য করিবার জন্য আমার ত কিছু চাই। যদি বন্ধুদিগকে ধনী করিতে না পারিলি, তাহা হইলে তোর ক্ষমতা থাকার লাভ কি?"

জরদীন এক চক্ষু উন্মীলন করিয়া কহিল, "আমার ক্ষুধা বোধ হইতেছে।"

আলেলী উঠিয়া চারি দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার কি খাইতে ইচ্ছা হইতেছে?"

জরদীন কহিল, "কিছু ফল খাইতে ইচ্ছা হইতেছে।"

মিষ্টিগ্রিস্ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া এক রাশ ফল ঠেলিয়া উঠিল। মিষ্টিগ্রিস্ উল্টিয়া পড়িয়া গেল।

উঠিয়া মিষ্টিগ্রিস্ মনে মনে কহিল, "হতভাগা, তোমার ক্ষমতার রহস্য বুঝিয়াছি। যাহা তুমি চাও, তাহাই যদি পাও, তাহা হইলে আমার আর ভাবনা কি। এত দিন বৃথা নষ্ট করি নাই। আমার যাহা ইচ্ছা হইবে, তোমারও সেই ইচ্ছা করাইব।"

জরদীন ফল খাইতেছে, এমন সময় মিষ্টিগ্রিস্ হাস্যমুখে সেলাম করিতে করিতে সম্মুখে আসিয়া কহিল, "মহাশয়, আমি আপনার বন্ধু হইবার বাসনা করি। যে সমস্ত মহাশয়ের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তখন

আমার হৃদয়ে আপনার প্রতি কত ভক্তি ছিল, বোধ হয় আপনি বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু আপনাকে সত্য বলিতেছি, আপনার সুখের নিমিত্তই ওরূপ করিয়াছিলাম। আমার উদ্যোগেই আপনার শুভবিবাহ এত শীঘ্র সম্পন্ন হয়।"

জব্‌বীন কহিল, "আমার ক্ষুধা বোধ হইতেছে, কিছু ফল দাও।"

মিষ্টিগ্রিস্ পুরা মোসাহেবের ন্যায় কহিল, "এই গ্রহণ করুন। আপনার যে সকল সামান্য কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আপনার সেবা করিতে পারি, এরূপ অনুমতি দিবেন।"

আত্মগত কহিল, "মহামূর্খ, আমি কি বলিতেছি, বুঝিতে পারিতেছে না। আলেলীকে আমার পক্ষে করিতে হইবে; রমণীগণকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে রাজনীতি সিদ্ধ হয় না।" মৃদু হাস্য করিয়া প্রকাশ্যে পুনর্ব্বার কহিল, "মহাশয়, আপনার সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে, আপনি বোধ হয় বিস্মৃত হইতেছেন। রাজ-পুত্রীকে কিছু উপহার দিতে আপনার ইচ্ছা হইতেছে না?"

জব্‌বীন কহিল, "বৃদ্ধা, তুমি আমার বিরক্ত করিতেছ। উপহার আমি কোথায় পাইব? সমুদ্রতল হইতে বুঝি! তুমি নিজে গিয়া মৎস্যদিগের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আইস।"

সেই মুহূর্ত্তে যেন কোন অদৃশ্য হস্ত মিষ্টিগ্রিস্‌কে ঠেলিয়া নৌকা হইতে জলে ফেলিয়া দিল, সে তরঙ্গতলে ডুবিয়া গেল।

জব্‌বীন যেমন ফল খাইতেছিল, নিশ্চিন্ত ভাবে সেইরূপ খাইতে লাগিল। আলেলী তাহার প্রতি স্নেহ দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎ কাল পরে জব্‌বীন কহিল, "দেখ একটা শুশুক ভাসিয়া উঠিয়াছে।"

শুশুক নহে, মিষ্টিগ্রিস্। ভাসিয়া উঠিয়া সন্তরণের চেষ্টা করিতেছিল। জব্‌বীন তাহার কেশ ধারণ করিয়া টানিয়া নৌকায় তুলিল। মিষ্টিগ্রিস্ দন্ত দ্বারা নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল মাণিক্য ধারণ করিয়াছিল। যখন তাহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল, তখন কহিল, "মৎস্যরাজসুন্দরী রাজকন্যা আলেলীকে এই উপহার দিয়াছেন। মহাশয় এখন দেখিতেছেন যে, আমি আপনার বিশ্বাসী ও আজ্ঞাকারী ভৃত্য। যদি কখন আপনার মন্ত্রীর আবশ্যক হয়—"

জব্‌বীন কহিল, "আমার ক্ষুধা বোধ হইতেছে, আমায় কিছু ফল দাও।"

মিষ্টিগ্রিস্ হতাশ হইয়া অবশেষে একটা কৌশল স্থির করিয়া বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, সম্মুখে একবার চাহিয়া দেখুন। কেমন চমৎকার!'

আলেনী কহিল, "কই, আমি ত কিছু দেখিতে পাইতেছি না।"

অরবীন চক্ষু মুছিয়া কহিল, "আমিও কিছু দেখিতে পাইতেছি না।"

মিষ্টিপ্রিস্ বিস্মিতের ন্যায় কহিল, "বলেন কি? ওই যে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদ সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছে, দেখিতে পাইতেছেন না? সমুদ্রতীর হইতে বৃহৎ সোপানশ্রেণী উঠিয়াছে, সোপানাবলীর সংখ্যা এক শত, দুই পার্শ্বে কমলা লেবুর বৃক্ষশ্রেণী।"

আলেনী কহিল, "রাজপ্রাসাদে স্বর্ণপর মোসাহেব ও ভৃত্যবর্গ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হইবে। আমি সেরূপ প্রাসাদ চাহি না।"

অরবীন কহিল, "আমিও না। তাহার অপেক্ষা কুটীর ভাল, সেখানে শান্তি পাওয়া যায়।"

ভয়ে মিষ্টিপ্রিসের কল্পনাশক্তি উত্তেজিত হইতেছিল। সে কহিল, "এ প্রাসাদ অন্য রাজপ্রাসাদের মত নহে। ইহাতে মোসাহেবও নাই, ভৃত্যও নাই, সকল কর্ম্ম অদৃশ্য হস্ত দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। গৃহস্থিত সামগ্রীসমূহের হস্ত আছে, প্রাচীরের কর্ণ আছে।"

অরবীন জিজ্ঞাসা করিল, "তাহাদের জিহ্বাও আছে?"

মিষ্টিপ্রিস্ কহিল, "আজ্ঞা হাঁ। তাহারা কথা কয়, কিন্তু আদেশ মত চুপ করিয়া থাকে।"

অরবীন কহিল, "তাহা হইলে তাহারা তোমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান। এরূপ প্রাসাদ হইলে আমি পাইতে ইচ্ছা করি। এই অদ্ভুত প্রাসাদ কোথায়? আমি ত দেখিতে পাইতেছি না।"

আলেনী কহিল, "এই যে তোমার সম্মুখে।"

নৌকা তীরের অভিমুখে যাইতেছিল। সেখানে নঙ্গর ফেলিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করা যায়—জল গভীর নহে। তাহাদের সম্মুখে প্রশস্ত সোপানশ্রেণী, তাহার উপর বারান্দা। তাহার পশ্চাতে কল্পনাতীত মনোহর প্রাসাদ।

তিন জনে হৃষ্টচিত্তে সোপান আরোহণ করিল। মিষ্টিপ্রিস্ হাঁপাইতে হাঁপাইতে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া, 'কে আছে' বলিয়া হাঁকিল।

দ্বার স্বয়ং উত্তর করিল, "কি বলিতেছ?"

লৌহদ্বার কথা কহিতেছে শুনিয়া মিষ্টিপ্রিস্ কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

দ্বার কহিল, "অব্‌বীন এই প্রাসাদের স্বামী। তিনি আসিলে আমি স্বয়ং মুক্ত হইব।"

নবদম্পতী উপনীত হইবামাত্র দ্বার আপনা-আপনি মুক্ত হইয়া গেল। মিষ্টিগ্রিস্ পশ্চাতে আসিল।

বারান্দায় উঠিয়া আলেলী চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র তরঙ্গিত হইয়া সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছিল।

আলেলী কহিল, "কি মনোহর স্থান। এখানে পুষ্পিত বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতে কেমন আরাম!"

অব্‌বীন কহিল, "এস, আমরা বসি।"

মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "কিন্তু চেয়ার কোথায়?"

"এই যে আমরা, এই যে আমরা," বলিতে বলিতে চেয়ারগুলা ছুটিয়া আসিল।

মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "এখানে আহার করিতে বেশ।"

অব্‌বীন কহিল, "কিন্তু টেবিল কোথায়?"

"এই যে আমি," বলিয়া একটি সুন্দর মেহগ্‌নী টেবিল প্রৌঢ়া গৃহিণীর ন্যায় তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এইরূপে নানাবিধ আহার্য্য সামগ্রী, বাসন, ফল, আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে আহারের নিমিত্ত উপবেশন করিলে মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "মহাশয়, দেখুন, আপনার জন্য কত করিয়াছি। এ সকল আমার কর্ম্ম।"

কোথা হইতে শব্দ হইল, "মিথ্যাবাদী!"

মিষ্টিগ্রিস্ চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। একটা স্তম্ভ হইতে শব্দ নিঃসৃত হইতেছিল।

মিষ্টিগ্রিস্ অব্‌বীনকে কহিল, "মহারাজ, আমাকে কেহ মিথ্যাবাদী বলিতে পারে না। আমি চিরকাল সত্য কথা বলিয়াছি।"

আবার শব্দ হইল, "মিথ্যাবাদী!"

মিষ্টিগ্রিস্ মনে মনে কহিল, "এই প্রাসাদ বড় ভয়ানক। যদি প্রাচীর সত্য কথা কয়, তাহা হইলে আমি কখন মন্ত্রী হইতে পারিব না। এ বন্দোবস্ত বদলাইতে হইবে।" প্রকাশ্যে কহিল, "মহারাজ, এই জনশূন্য প্রাসাদে বাস করার অপেক্ষা সেনা এবং প্রজাগণে বেষ্টিত হইয়া বাস করা ভাল বিবেচনা করিতেছেন না? প্রজাগণেরা কর দিবে।"

অব্‌বীন কহিল, "রাজা হইব? কেন?"

আলেনী কহিল, "প্রিয়তম! আমরা এইখানেই থাকিব। আমরা দুই জনেই এখানে অত্যন্ত সুখে আছি।"

মিষ্টিব্রিস্ কহিল, "সকলেই। আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। যে সময় আমি আপনাদের নিকট থাকি, তখন আমি আর কিছু চাহি না।"

শব্দ হইল, "মিথ্যাবাদী!"

মিষ্টিব্রিস্ কহিল, "মহারাজ, এ কথা আপনি শুনিবেন না। আমি আপনাকে নিশ্চিত বলিতেছি, আপনাকে ভক্তি ও মান্য করি।"

আবার কঠোর শব্দ হইল, "মিথ্যাবাদী!"

অব্‌বীন কহিল, "যদি তোমার সকল কথাই মিথ্যা, তাহা হইলে তুমি চন্দ্রলোকে চলিয়া যাও। মিথ্যাবাদীদিগের সেই দেশ।"

এই কথা বলিবামাত্র মিষ্টিব্রিস্ তীরের ন্যায় আকাশে উঠিয়া মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হইল।

সে আর কখন ফিরিয়া আসিয়াছে কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ বলেন যে, অশ্ব নাম ধারণ করিয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে যাহাই হউক, যে রাজবাটীতে প্রাচীনেরা পর্য্যন্ত সত্য কথা কয়, সেখানে তাহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই।

৫

তখন তৃতীয় ব্যক্তি কেহ রহিল না। অব্‌বীন সমুদ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল, আলেনী সুখস্বপ্নের কল্পনা করিতেছিল। রম্য নির্জ্জনের মধ্যে প্রিয়তমের সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা মধুরতর স্বপ্ন কি আছে? আলেনী অব্‌বীনের হস্তধারণ করিয়া নূতন গৃহ পরিদর্শন করিতে গমন করিল। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সুন্দর তৃণভূমি, তাহার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বহিতেছে। নানাবিধ বৃক্ষপরিপূর্ণ উপবন, তৃণের উপর দীর্ঘ তরুচ্ছায়া পড়িয়াছে। বৃক্ষের শাখায় বিহঙ্গ গান করিতেছে।

আলেনী পুলকিতচিত্তে অব্‌বীনকে কহিল, "এখানে কি তুমি সুখী নও? তোমার আর কিসের ইচ্ছা হইতে পারে?"

অব্‌বীন কহিল, "আমার কখন কোন ইচ্ছা হয় নাই। কল্য হইতে কুঠার লইয়া আবার কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিব। এখানে অনেক কাঠ আছে। স্বচ্ছন্দে এক শত বোঝা সংগ্রহ করিতে পারিব।"

আলেনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আমায় তুমি ভালবাস না দেখিতেছি।"

অরবীন কহিল, "তোমায় ভাল বাসিব? সে আবার কি? আমি তোমার কোনরূপ দুঃখ দিতে চাহি না—আমার কিছুমাত্র সে ইচ্ছা নাই। এই প্রাসাদ আমাদের—যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহা তোমার হইল। তোমার পিতাকে ডাকাইয়া পাঠাও, আমি খুসী হইব। আমি কাঠুরিয়া হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কাঠুরিয়াই থাকিব। রোদন করিও না। আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাহি না।"

আলেনী কাতরস্বরে কহিল, "অরবীন, তুমি কেন এরূপ করিতেছ? আমি কি এতই কুৎসিত ও অপ্রিয় যে, তুমি আমায় ভালবাসিতে পার না?"

"তোমায় ভালবাসিব? সে কর্ম্ম আমার নয়। রোদন করিও না, কথা শুন। আবার অশ্রুপাত! আচ্ছা, যদি তাহা হইলেই তুমি সন্তুষ্ট হও ত আমি তোমায় ভাল বাসিতে ইচ্ছা করি।"

আলেনী বাষ্পরুদ্ধ চক্ষু তুলিয়া অরবীনের চক্ষে আপনার প্রগাঢ় চিরস্থায়ী প্রেম প্রতিবিম্বিত দেখিল। তখন অশ্রু ভেদ করিয়া তাহার মুখে হাসি ফুটিল।

সেই সময় জলদেবী রাজা হনিবীর হস্ত ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন। রাজা, কন্যা এবং মন্ত্রীর অদর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। কন্যা ও জামাতাকে দেখিয়া, আনন্দিত চিত্তে তাহাদিগকে আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ করিয়া, স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

জলদেবী দম্পতীকে সতত রক্ষা করিতে লাগিলেন। অরবীন ও আলেনী, জগৎকে বিস্মৃত হইয়া ও জগৎ কর্ত্তৃক বিস্মৃত হইয়া, সুখে বাস করিতে লাগিল।

অরবীনের বুদ্ধির অভাব একেবারে দূর হইয়া গেল। না যাইলেও ক্ষতি ছিল না, কারণ দম্পতীর মধ্যে এক জীব বুদ্ধি দুই জনের বুদ্ধির সমান।

লাভেরিয়ে ও বৈশ্বানর।

জগতে যত কাল পদার্থবিজ্ঞান অধীত হইবে, এবং জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি থাকিবে, তত কাল লাভেরিয়ের নাম বিজ্ঞানজগতে দেদীপ্যমান রহিবে।

বিজ্ঞানজগতে ফরাশি জাতি 'Race of Giants' বলিয়া প্রসিদ্ধ। (১) ইনি তাহাদেরই সুযোগ্য বংশধর। কার্য্য দৃষ্টে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ইনি মাধ্যাকর্ষণকে যেরূপ অভ্রান্ত শক্তিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং যেরূপে তাহার সার্ব্বভৌমিকত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, জগতে এ পর্য্যন্ত আর কেহই এরূপ করিতে পারেন নাই। একটি গ্রহের গতিবিচলন দেখিয়া, তাহা কোনও অপরিজ্ঞাত পদার্থখণ্ডের আকর্ষণবশে সংঘটিত হইতেছে, ইহা সিদ্ধান্ত করা; তাহা হইতে ঐ পদার্থখণ্ডের আকৃতি, প্রকৃতি, স্থিতি, গতি প্রভৃতি যাবতীয় সমস্যার গণিতবলে মীমাংসা করা; এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার স্থিতি অভ্রান্তরূপে গণনা করিয়া এক জন সহযোগী জ্যোতির্বীকে ঐ স্থানে উক্ত গ্রহ-রূপী পদার্থখণ্ডের স্বরূপ নেত্রগোচর করিতে আদেশ করা, ও ঐ সহযোগী কর্ত্তৃক তাহা উক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে পর্য্যবেক্ষিত হওয়া; এ সমস্তই যেন বৃদ্ধা পিতামহীর মুখে রাক্ষসীর গল্প শ্রবণ করার মত বোধ হইবে; কিন্তু বাস্তবিক এই সকল ঘটনা বিশ্ববাদ্যে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। অভিনয়ের প্রথমাঙ্কের দৃশ্যস্থান—'পারিনগর'; এবং দ্বিতীয়াঙ্কের দৃশ্যস্থান—'বার্লিন্ মানমন্দির'। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রথমাঙ্ক ও ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর শেষাঙ্ক অভিনীত হইয়াছে। এই অভিনয়ের অধিনায়ক মনীষী 'লাভেরিয়ে'। যাহার প্রেম-কাহিনী হইতে ইহার সৃষ্টি, তাহার নাম 'বরুণগ্রহ'; এবং ঐ প্রেমের প্রকৃতির নাম 'মাধ্যাকর্ষণ'। মানবচরিত্রে প্রেমের স্ফুটন ও প্রেমাস্পদে তাহার অভিব্যক্তি যেরূপভাবে নাটকে বর্ণিত হইয়া থাকে, লাভেরিয়ের গণিতসিদ্ধান্তে, পদার্থদেহে মাধ্যাকর্ষণের স্ফুটন ও পদার্থান্তরের আকর্ষণাধিকারভুক্ত হইলে তৎপ্রতি তাহার অভিব্যক্তি, ঠিক তদ্রূপ অতি আশ্চর্য্য ও তদ্গতভাবে বিবৃত হইয়াছে। তবে নাটকে ও লাভেরিয়ের গণিত-সিদ্ধান্তে একটি অতি বিশেষ পার্থক্য আছে; নাটকে নায়কের চিত্তস্থৈর্য্য বিচলিত হইতে দেখিলে তাহার কারণানুসন্ধান করিয়া ইহা নির্ণীত হইতে পারে যে, কোনও প্রেমাস্পদে চিত্তার্পণ হেতু ঐ বিচলন ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা দ্বারা প্রেমাস্পদের স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় না; লাভেরিয়ের গণিতসিদ্ধান্তে ইন্দ্রগ্রহের স্থৈর্য্যবিচলন দেখিয়া, তাহার চিত্তাকর্ষকের স্বরূপ ও স্থিতিগতি সমস্তই নির্ণীত হইয়াছে, এবং গণিতকুহকে চিত্তচোর ধরা পড়িয়াছে। (যাঁহারা

(১) Sir John Herschel কর্ত্তৃক ফরাশি জাতি ঐ নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

আর একখানি পত্র প্রকাশিত হয়, তাহাতে "লেকার্ব্বো" নামক জনৈক চিকিৎসাব্যবসায়ী ইহা ব্যক্ত করেন যে, ঐ বৎসর ২৬শে মার্চ্চ তিনি দূরবীক্ষণ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, একটি গোলাকার কৃষ্ণকায় পদার্থ সূর্য্যবিম্বের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই দৃশ্য তাঁহার নিকট এত আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল যে, তিনি তাহা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তাহাকে কোনও অনাবিষ্কৃত নূতন গ্রহ স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু জ্যোতিষে অজ্ঞ হইয়া গ্রহাবিষ্কারে আস্পর্দ্ধা করিতেছেন বলিয়া, পাছে লোকে উপহাস করে, সেই ভয়ে তিনি এত কাল তাহা প্রকাশ করেন নাই। (এ স্থলে জানা আবশ্যক যে, লেকার্ব্বো জ্যোতিষের গণনপ্রণালীতে অজ্ঞ থাকিলেও, তদ্বিষয়ে বীতস্পৃহ ছিলেন না; তিনি দূরবীক্ষণ দ্বারা অবসরকালে গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতেন।) এই পত্র প্রকাশিত হইবামাত্র, লাভেরিয়ে তাহার সত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া, কালবিলম্ব না করিয়া, লেকার্ব্বোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

লাভেরিয়ে লেকার্ব্বোর গ্রাম্যবাসে উপনীত হইয়াই, ভদ্রতার রীতি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনাহূত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং অতি উদ্ধতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনিই কি বুধের কক্ষাভ্যন্তরস্থ গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া আস্পর্দ্ধা করিতেছেন? এবং সেই আবিষ্ক্রিয়া ৯ মাস কাল গোপন করিয়া রাখিয়াছেন? আমি তাহার তদন্ত করিতে আসিয়াছি; হয় ত ইহা প্রমাণিত হইবে যে, আপনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহা প্রকৃত গ্রহ নহে, কেবল আপনার দৃষ্টিভ্রম মাত্র; নতুবা আপনি ঐরূপ আবিষ্ক্রিয়া গোপন রাখিয়া দোষী হইয়াছেন। এক্ষণে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা স্বরূপতঃ প্রকাশ করুন।" ডাক্তার মহাশয় আগন্তুকের উদ্ধত স্বভাবে কিছুমাত্র ভীত বা স্তম্ভিত না হইয়া, অথবা প্রত্যুত্তরে তাঁহার পরিচয়াদি কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া, অতি উদারভাবে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দিতে লাগিলেন। তিনি কি কি যন্ত্র ব্যবহার করিতেছিলেন, প্রথমে তাহা বর্ণনা করিলেন। তাহাদের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড জীর্ণ 'জেবঘড়ী' ছিল; লাভেরিয়ে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য হস্তে লইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ঐ ঘড়ীর কেবল মিনিটের কাঁটা মাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, আর সমস্তই কালের মহিমায় লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই ঘড়ী দিয়াই কি আপনি কালনির্দ্দেশ পূর্ব্বক গ্রহগতিনির্ণয় ও তাহা হইতে গ্রহাবিষ্কার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন?"

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তিনি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; কারণ তাঁহার বিশ্বাস হইল, লেকার্ব্বো তাঁহার সহিত পরিহাস করিতেছেন। যাহা হউক, ডাক্তার ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অপ্রস্তুত বা বিচলিত না হইয়া বলিতে লাগিলেন, "কাল-নির্দ্দেশ করিতে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড, এই তিনটি বিভাগই ত জানা প্রয়োজন। আমি যে কোন সময় আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া কয় ঘণ্টা বেলা হইয়াছে, তাহা বলিয়া দিতে পারি; মিনিট সংখ্যা আমার ঘড়ী হইতে অনায়াসে জানা যাইতে পারে, আর সেকেণ্ড জানিবার জন্য আমি একটি "দোলকযন্ত্র" (Pandulum) ব্যবহার করিয়া থাকি।" এই বলিয়া তিনি রেসমীরজ্জুলম্বিত একটি হস্তিদন্তনির্ম্মিত বর্ত্তুল বাহির করিয়া দেখাইলেন; লাভেরিয়ে তাহাকে স্বস্থানে নিবদ্ধ করিয়া দোলাইয়া দিলেন, এবং স্বীয় 'জ্ঞেয়ঘড়ীর' (ইহাতে সেকেণ্ড পর্য্যন্ত বিশুদ্ধরূপে গণনা হইত) সহিত মিলাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ঐ বর্ত্তুল একবার স্থানচ্যুত হইয়া, এক দোলন পূর্ণ করতঃ, পুনরায় স্বস্থানে সমাগত হইতে ঠিক এক সেকেণ্ড সময় লইয়া থাকে। কিন্তু কিরূপে ঐ দোলনসংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে, তাহা তাঁহার নিকট বিষম সমস্যা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি লেকার্ব্বোকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, লেকার্ব্বো অতি গর্ব্বিত ভাবে উত্তর করিলেন, "যাহার 'নাড়ীবিকম্পনের' সংখ্যা গণনা করা অভ্যাস আছে, তাহার নিকট এই দোলনসংখ্যার গণনা করা অতি সামান্য কাজ।" লাভেরিয়ে এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া লেকার্ব্বোর দূরবীক্ষণ পরীক্ষা করিতে চাহিলেন, এবং তাহাতেও কোনরূপ ভ্রান্তি জন্মিবার কারণ দেখিতে পাইলেন না। তাহার পর তিনি পর্য্যবেক্ষণফল ও তৎসংসৃষ্ট গণনাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, লেকার্ব্বো উক্ত দৃষ্ট বস্তুকে চারি ঘণ্টা সময়ে সৌরবিম্ব অতিক্রম করিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন; তিনি তত্তাবৎকাল তাহার স্থিতি ও গতি পর্য্যালোচনা করিয়া যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা একখণ্ড কাষ্ঠের উপর খড়ি দিয়া অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। সমস্ত পরীক্ষা শেষ হইলে, লাভেরিয়ে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক লেকার্ব্বোর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং বিদায়কালে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ ফলাদি আপন সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন। তিনি গৃহে ফিরিয়াই অবিলম্বে ঐ গ্রহের কক্ষাদি গণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং আশ্চর্য্যচিত্তে ইহা প্রকাশ করিলেন যে, সত্য সত্যই বুধকক্ষাভ্যন্তরে একটি নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার কক্ষপ্রমাণাদি, যথা—

সূর্য্য হইতে মধ্যদূরত্ব = ১৩০৮২০০০ মাইল ;
গ্রহের আবর্ত্তনকাল = ১৯ দিন, ১৭ ঘণ্টা ;
„ দৈনিক গতি = ১৮° ১৬′
ক্রান্তিবৃত্ত সমতলের সহিত কক্ষ সমতলের সম্পাত কোণ } = ১২° ১০′
ক্রান্তিবৃত্তপথে ক্রান্তিপাত হইতে কক্ষপাতের দূরত্ব } = ১২° ৫৯′

এতদ্ভিন্ন ইহাও গণনা করিলেন যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যকে যত বড় দেখায়, উক্ত গ্রহ হইতে তাহার অপেক্ষা ২২ গুণ বড় দেখাইবে, অর্থাৎ ২২টি সূর্য্য একত্র সংলগ্ন হইয়া উদিত হইলে ধরাবাসী যেরূপ অনুভব করিবে, উক্ত গ্রহবাসী (যদি কেহ থাকে।) সূর্য্যকে ঠিক সেইরূপ অনুভব করিবে।। (ইহাতে কল্পনার কিছুই নাই, কেবল একটি গণনফলমাত্র।!!) অনন্তর লাভেরিয়ে এই গ্রহের নাম রাখিলেন "বৈশ্বানর" (Vulcan)।

সৌরজগৎ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে এমন কতকগুলি বিধি রহিয়াছে, যাহা সকল গ্রহে সমভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (ইহার একটি দৃষ্টান্ত, যথা—'কোন গ্রহের আবর্ত্তনকালের বর্গকে তাহার মধ্যদূরত্বের ঘনফল দ্বারা ভাগ করিলে ঐ ভাগফল সকল গ্রহের পক্ষে সমান হইয়া থাকে।' ইতি "কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্র"।) এই সকল বিধি "বৈশ্বানরে" প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, লাভেরিয়ের সাধিত গ্রহফল সকলও তদনুসারী বটে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'কি কারণে "বৈশ্বানরের" অস্তিত্ব জ্যোতির্ব্বিদ্‌-সমাজে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতেছে না?' ইহার উত্তর এবং প্রত্যুত্তর প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইবে। শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

চুলের কলপ।

"যে চুলে কলপ দেয়, সে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, জুয়াচোর, অবিশ্বাসী, নরাধম!"

সভার মাঝখানে বসিয়া কথাটা আমি বলিলাম। বরদাকান্ত বাবু কয়েক জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমার যাওয়া আসা সর্ব্বদাই ঘটে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একটি নূতন বাবু। আমার কথা শুনিয়া তিনি কটমট করিয়া

আসার দিকে চাহিলেন। বয়স্য বাবু তাঁহাকে কহিলেন, "তুমিও যেমন, ভোলানাথের কথায় আবার রাগ কোর্‌চ। ওকে এখানে সকলেই জানে, লোকটা চিরকাল রগচটা, যা মনে আসে, তাই বলে।"

নূতন বাবুটি বলিলেন, "তাই বলে কি দশ জনের সম্মুখে ভদ্রলোককে অপমান কোর্‌বে?"

তখন সকলে মিলিয়া অনেক করিয়া বুঝাইয়া বাবুকে ঠাণ্ডা করে।

বাবুটি চুলে কলপ দেন। কেন দেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের কি তৃতীয় পক্ষের সংসার, কিম্বা নূতন বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু কথাটা বলায় যে কোন দোষ হইয়াছে, আমার তাহাও বোধ হয় নাই।

চুলে কলপ দেওয়ার অর্থ কি? পলিতকেশ কৃষ্ণবর্ণ করা, বয়স গোপন করা, যৌবনাতীতের যৌবনের ভান করা। কেন? হয় ত ঘরে বালিকা, কিশোরী অথবা যুবতী স্ত্রী আছে, হয় ত যৌবনের সুখলালসা আছে, হয় ত বর্ষীয়ান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে। যে কারণই থাকুক্, কপটতাই তাহার মূল। কেশ শুভ্র হইয়াছে, কিন্তু লোকের কাছে কৃষ্ণকেশ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে। বয়স পঞ্চাশের উপর, কিন্তু লোকে যাহাতে মনে করে ত্রিশের উর্দ্ধে নয়, সেই চেষ্টা। যৌবনের উদ্যম নাই, বল নাই, উত্তেজনা নাই, তথাপি যৌবন উত্তীর্ণ হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। উপস্থিত অথবা ত্যাগ করিয়া অতীত যৌবনের জন্য লালায়িত।

দাঁত পড়িয়া গেলে দাঁত বাঁধাইবার কতক কারণ আছে। আহারের সুবিধা হয়, কথাবার্ত্তা কহিতে পারা যায়। কিন্তু চুলে কলপ দিবার প্রয়োজন কিছু নাই, প্রবঞ্চনাই একমাত্র উদ্দেশ্য। চুলে কলপ দিলে কি বয় প্রবঞ্চিত হয়, যৌবন কি ফিরিয়া আসে, বয়স কি বসিয়া থাকে? যাহার কেশ শুভ্র হইয়াছে, সে শুভ্র কেশ দেখাইতে লজ্জা পায় কেন? শুভ্র কেশের কি শোভা নাই, সৌন্দর্য্য নাই? যে দেশে প্রাচীন হইলে সকলের পূজ্য হয়, প্রাচীনের কথা সকলে স্বীকার করে, প্রাচীনের সম্মুখে যুবকেরা প্রণত হয়, সে দেশে বার্দ্ধক্যের ভয়ে একজনেরও লজ্জিত হইবার কথা নয়। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে কি কেহ চুলের কলপ জানিত না ব্যবহার করিত?

যযাতিচরিত হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আর্য্যগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, চিরযৌবন চিরসুখের উপায় না। যযাতি বৃদ্ধ বয়সে চুলে কলপ দেন নাই,

কাপড় চোপড়, ঔষধপত্র, মদ গাঁজা প্রকাশ্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, চুলের কলপও সেইরূপ প্রকাশ্যে বিক্রয় হয়। টেকো মাথার জন্য পরচুলা, সাদা চুলের জন্য কলপ, মুখের জন্য রং কোন দোকানে না পাওয়া যায়? সপ্ততিবর্ষীয় বৃদ্ধের জন্য যদি দশ বৎসরের কন্যা পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাদা চুলের জন্য কলপ পাওয়া যাইবে না কেন? অন্য দেশে—যে সকল দেশের দেখাদেখি এ দেশে যৌবনলালসা এত বাড়িয়াছে—সকল প্রকার কুপ্রথাই আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কিছু আছে। বার্দ্ধক্যে কেবল যৌবনের ইন্দ্রিয়প্রবণতা নাই, যৌবনের উৎসাহ, উদ্যম, একাগ্রতা আছে, স্বার্থশূন্য পরিশ্রমের আদর্শ দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের দেশে পাকা চুলে কলপ দিবার প্রথা আছে—আর কি আছে?

সাদা চুল যেমন কালো করিতে পারি, কালো মুখ তেমনি সাদা করিতে পারিলে লাভ হইত। কত সাবান, কত মিল্ক অব রোজ, কত ক্যালিডর মাখিলাম, কিন্তু কালো মুখখানা কখন গোরার মুখের মত হইল না, গোরা বলিয়া কখনো কাহারও মনে ভ্রম জন্মিল না। দেশের গুণে রৌদ্রে পুড়িয়া কেবল কালো হয় নাই, বাস্তবিকই আগুন দিয়া মুখ পোড়াইয়াছি। শত্রুর লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া এ মুখ কালো হয় নাই, আত্মগৃহদাহের কলঙ্ক এই মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। চুলের কলপ মুখে দিলে বরং আমাদের মানায়, কিন্তু তাহার বিশেষ আবশ্যক নাই। যে কলঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা অনেক দিন ভোগ করিতে পারি। আমাদের জাতীয় প্রাচীনতা কি চুলের কলপে দূর হইয়া যাইবে?

প্রাচীন বলিয়াই যদি আমাদের মনে অহঙ্কার থাকিবে, তাহা হইলে আমরা যৌবনের বুলি বলিব কেন? যৌবনের তান করিব কেন? যৌবনের বেশ ধরিব কেন? শুভ্র কেশ লইয়া, বার্দ্ধক্যের বহুদর্শিতা, বিজ্ঞতা লইয়া, শান্ত প্রসন্ন চিত্তে কালযাপন করিতাম, গত যৌবনের অনুশোচনা করিতাম না। যে দিকে চাহিয়া দেখি, যৌবন নাই, যৌবনের প্রাণশূন্য প্রতিমূর্ত্তি আছে; যৌবনের বল নাই, যৌবনের বিভ্রম আছে; যৌবনের দৃঢ়তা নাই, যৌবনের চাঞ্চল্য আছে; যৌবনের উৎসাহ নাই, যৌবনের লালসা আছে। চুলের কলপ চারি দিকে, সব ঝুটা, সব প্রবঞ্চনা, সব মিথ্যাময়।

চলিয়াছে যখন তখন চলুক। কলপ দিয়া সাদা চুল কালো কর, বাঁধান দাঁত বাহির করিয়া যুবকদিগের মধ্যে বসিয়া হাস, বর্ষীয়সী স্ত্রীর বিয়োগান্তে বালিকার পাণিগ্রহণ কর, পৃথিবীর চক্ষে ভেল্কি লাগাও, যমকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা কর। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমি গালি দিব না?

কৃষ্ণের ক্রোধ।

(মহাভারত হইতে গৃহীত।)

তিন দিন গত হুরন্ত আহবে।
তিন দিন রণে ভীষ্ম মহাবীর
নাশিলা অসংখ্য শত্রুসেনাগণে;
পাণ্ডব পক্ষীয় হইল অস্থির।
বৃথা ধনুর্দ্ধর গাণ্ডীব নির্ঘোষে
চাহিলা রোধিতে শান্তনুনন্দনে;
বৃথা কুকোদর করি আস্ফালন
নাশিতে লাগিলা সমরপ্রাঙ্গণে;
পাঞ্চাল, বিরাট, নীলাম্বর, নীল,
কেকয়, চৈকেয়, ইরাবান, কাশী,
বৃথা বীরগণ করি প্রাণপণ
রক্ষিতে সেনায় হইলা প্রয়াসী।
ব্যর্থ শরজাল, বিফল নারাচ,
গাণ্ডীবের লক্ষ্য হইল বিফল,
ভীষ্মের ভীষণ শর প্রহরণে
পাণ্ডব সেনানী বিহ্বল বিকল।
অকালসন্ধাশ ভীষ্ম মহাবলী
সতত করিয়া—ধরি শরাসন—
তীব্র আশীবিষ তুল্য শরজাল
আকাশ ছাইয়া করিলা বর্ষণ।
আকাশে বিস্মিত দেবতা সমাজ,
পুলক-হার্ষিত বত কুরুকুল,
দ্বিধাভিন্ন পাণ্ডবের অনীকিনী,
শোণিতসমুদ্র তরঙ্গসঙ্কুল।
মাধিয়া সহিতে সংগ্রাম ভীষণ
নবপতিগণ পৃষ্ঠ দিলা রণে;
ব্যর্থবীর্য্য হেরি রোষে অভিমানে
ভীম আসত আনলে।

কহিলা কেশব;—সাত্যকিরে ডাকি
কহিলা গম্ভীরে, "শিনিবংশধর।
ভীষ্মতেজে সৈন্য হইয়া ব্যাকুল
চারি দিকে হের পলায়নপর।
নাহি ক্ষতি তায়; আছে যারা হেথা
স্বচ্ছন্দে তাহাও করুক গমন।
আপনি ধরিব আয়ুধ সমরে,
পাণ্ডবের প্রীতি করিব সাধন।
ধরি সুদর্শন চক্র খরধার
সসৈন্য ভীষ্মেরে করিব বিনাশ;
ধর্ম্মরাজে পরে দিয়া রাজ্যভার
পুরাইব আমি পাণ্ডবের আশ।"

এত বলি অধরশ্মি তেয়াগিয়া
ক্রোধে অধীর্ঘন নাশিলা ভূতলে;
শত বজ্রতুল্য চক্র সুধরধার
করি উদ্ভাবণ আকাশমণ্ডলে।
গর্জ্জি ঘোর রবে কুপিত কেশরী
ধায় যথা বেগে মত্তকরী পানে,
ভীষ্মচক্রপাণি দেব বাসুদেব
করিলা গমন ভীষ্মসন্নিধানে।
পদভরে কাঁপি উঠে বসুতল,
ঘোর কোলাহল উঠিল চৌদিকে;
সভয়ে কৌরব গণিল প্রমাদ,
বধী মহাবধী চাহে অনিমিখে।
বাসুদেব করে ভীম বজ্র শোভা
অনাতচক্রের সম সুদর্শন—
বিস্ফুরিত রশ্মিরাশি চারি দিকে,

তরুশাখে সব স্তব্ধসে নয়ন।
বিশ্ববিমোহন কেশব মূরতি,
বিলম্বিত অঙ্গে খণ্ড পীতাম্বর,
চিবলগ্ন যেন সব নীলাকাশে
মোহিয়া নয়ন শোভিল সুন্দর।

অসম্ভ্রান্ত চিত্তে — করে ধনুর্ব্বাণ—
রহিলেন স্থির ভীষ্ম মহামতি,
হেরি বাসুদেবে, প্রসন্ন বদনে
কহিলেন ধীর করিয়া প্রণতি ;—
"ওহে জগন্নাথ। জগত-নিবাস।
ত্রিলোকশরণ। শঙ্খচক্রধারী।
ওহে আদিদেব। ওহে নারায়ণ।
নিত্য নিরঞ্জন। বৈকুণ্ঠবিহারী।
ওহে অপ্রমেয়। মহাযোগেশ্বর।
কমললোচন। আইন ত্বরায়।
হান শীঘ্র হান তীক্ষ্ণ সুদর্শন,
এখনিই দেব বিনাশ' আমায়।
ত্রিলোকবাঞ্ছিত যেই মোক্ষধাম
বসুধাস্পর্শনে নাহি পাব জীবে—
তব হস্তে আজি হইলে নিধন
নিত্য স্থান মোর হইবে ত্রিদিবে।
এখনি হইব জগতের নাথে
নিসর্জ্জিয়া দেহ সম্মুখসংগ্রামে,
ভেটাইব তোমায় আজি,
সহিত আনন্দে সুখশান্তিধামে।"

হেসে বাসুদেব কহিলা উত্তর,
"তোমারি কারণে এই মহাসমর।
কুরুকুল ধ্বংস হবে রণস্থলে,
পুণ্যভূমি আজি হবে রক্তময়।
বর্ত্তমান তুমি কুলপিতামহ,
দুর্ম্মতি কৌরব হেরি দুর্য্যোধনে—
এত দিন কেন নাহি নিবারিলে
দিয়া উপদেশ গাঙ্গেয়ীনন্দনে?"

হেথায় অর্জ্জুন হেরি বাসুদেবে
ভীষ্মের সমীপে করিতে গমন,
দ্রুত পাদচারে আসিলা ধাইয়া,
কেশবের বাহু করিলা ধারণ।
রথে বৃকোদর যথা বেগে
ধায় মহাবায়ু প্রবল গতিতে,
চলিলা সবেগে কৌরবিসূদন
ভীষ্মের সম্মুখে অর্জ্জুন সহিতে।
না পারি বোধিতে কৃষ্ণের গমন
বাহুযুগ ছাড়ি দিলা ধনুঞ্জয়,
হেরম চরণ নিক্ষেপ সত্বরে
ধরি পদযুগ কহিলা বিনয়,—
"ওহে হরি। ওহে পাণ্ডবের গতি।
অনাথ-শরণ। বিপদভঞ্জন।
সম্বর এ ক্রোধ, সম্বর, সম্বর।
আপন প্রতিজ্ঞা করহ স্মরণ।
ধরিবে না অস্ত্র এই মহারণে,
ওহে মহাভুজ, প্রতিজ্ঞা তোমার
করিয়া স্মরণ সেই পূর্ব্ব পণ
এ সমর ক্রোধ কর পরিহার।
চল ফিরি যাই—শুন জনার্দ্দন,
শপথ আমার তোমার সম্মুখে—
তোমার প্রসাদে নাশি কুরুকুল
ধর্ম্মরাজে রাজ্য দিব মনসুখে।"

ঘুচে গেল ক্রোধ স্মরি পূর্ব্ব কথা,
শুনি অর্জ্জুনের কাতর শপথ!
প্রসন্ন বদনে দেব জনার্দ্দন
ফিরিয়া আসিলা অর্জ্জুনের রথে।
অস্ত্রবর্ষি পুনঃ লইলা তুলিয়া,
পূরাইলা দিশি পাঞ্চজন্য-রবে।
তুলিয়া গাণ্ডীব আকর্ণ টঙ্কারি
ধাইলা অর্জ্জুন সুরথ আহবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ

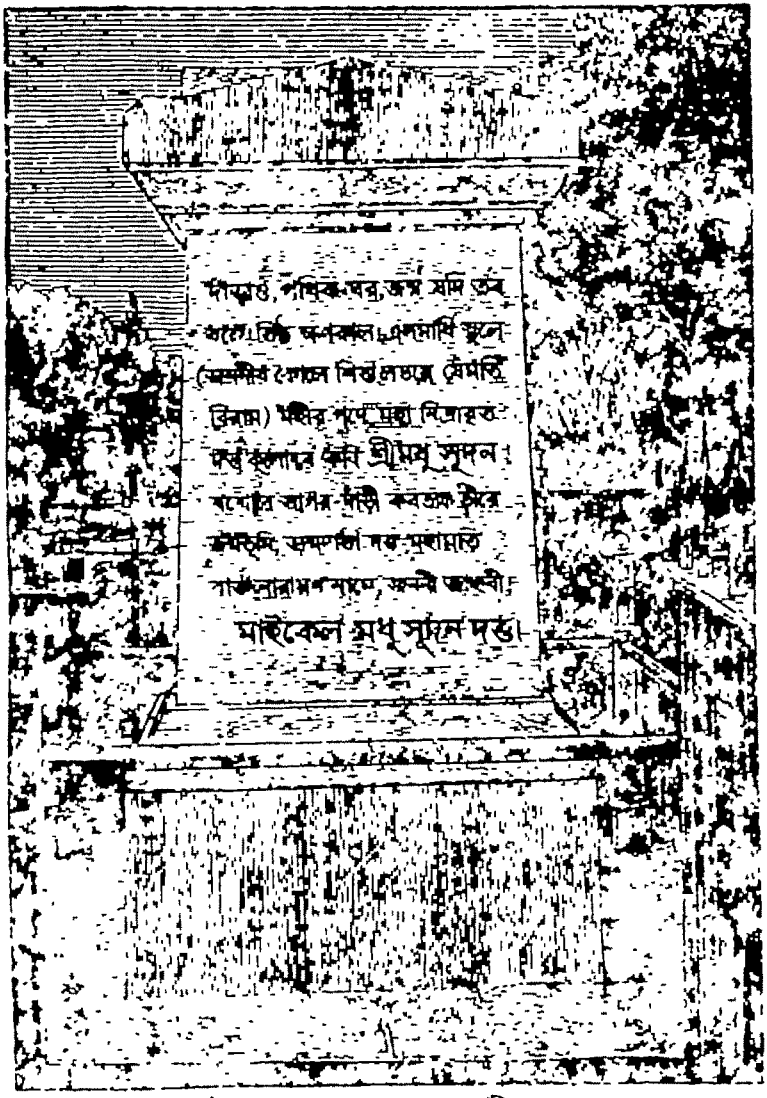

মাইকেল মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষ জীবন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন মানভূম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ পীড়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁহার রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। মধুসূদনের পত্নীর শরীরও পূর্ব্ব হইতে ভগ্ন হইয়াছিল, এই সময় তিনিও কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইলেন। পতি পত্নী উভয়ের এইরূপ অবস্থা, চিকিৎসা ও পথ্যের অভাব, দুইটি অপোগণ্ড শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার এবং তাহার উপর ঋণদাতাগণের নিপীড়ন, সুতরাং মধুসূদনের যন্ত্রণা পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হইল। এতদিন বন্ধুবান্ধবগণের প্রদত্ত সাহায্য ও ঋণের উপর সংসার নির্ব্বাহ হইতেছিল, ক্রমশঃ উভয়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিল। পুনঃপ্রাপ্তির আশা না থাকিলে কয় জন ঋণ দান করিতে পারেন? অন্যের প্রদত্ত সাহায্যের উপরই বা কত দিন নির্ভর করা সম্ভব? গৃহসজ্জার সামগ্রী, পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া, মধুসূদন দিনপাত করিতে বাধ্য হইলেন, ক্রমশঃ তাহাও নিঃশেষিত হইয়া আসিল। তখন সত্য সত্যই অন্নাভাব উপস্থিত হইল। শিশুদিগের কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া, মধুসূদনকে ও তাঁহার পত্নীকে মধ্যে মধ্যে অনাহারে দিনপাত করিতে হইত। সুস্থ থাকিলে যে কোনরূপে হউক, তিনি কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু শয্যা-

শায়ী হইয়া তিনি আর কি করিবেন? সে অবস্থায় যাহা সম্ভব, অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি তাহার ত্রুটী করেন নাই। বঙ্গরঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষগণ, এই সময় তাঁহাকে তাঁহাদিগের রঙ্গশালার জন্য, এক খানি নাটক রচনা করিতে অনুরোধ করিলে, তাঁহাদিগের প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্যের প্রত্যাশায়, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি তাঁহার শেষ গ্রন্থ মায়াকানন রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন এক্ষণে যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে ধীরতার সহিত গ্রন্থ রচনা আর সম্ভবপর ছিল না; নিজের বিষাদময় জীবনের প্রতিবিম্বপাত করিয়াই তিনি রচিত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের যন্ত্রণাময় জীবনের ন্যায়, মায়াকাননও মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ও দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি মায়াকানন সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। খণ্ডিত অংশ সকল সম্পূর্ণ করিয়া ছিলেন, বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ সেই সকল খণ্ডিত অংশ স্বেচ্ছামুরূপ সংযোজিত করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মধুসূদন যে গ্রন্থ স্বয়ং সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাহার দোষগুণ আলোচনা করিয়া, কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করা প্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা সংক্ষেপে কেবল তাহার বর্ণনীয় বিষয় বিবৃত করিয়া নিরস্ত হইব। মায়াকাননের মূল ঘটনা এইরূপ। সিন্ধুদেশে মায়াকানন নামে নিবিড় অরণ্যানী বর্ত্তমান ছিল। সেই অরণ্যের অভ্যন্তরে অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবীর এক পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিল। মায়াকানন সম্বন্ধে সিন্ধুদেশে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত ছিল যে, "যে লগ্নে দিনমনি কন্যা রাশির সুবর্ণ গৃহে প্রবেশ করেন, সেই শুভলগ্নে যদি কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা, ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করেন, তবে তিনি কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে, আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে দেখিতে পান।" এই জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া অনেক বিবাহপ্রার্থী পুরুষ ও রমণী মায়াকাননে উপস্থিত হইতেন। এক দিন সিন্ধু দেশের রাজকুমার অমর এবং গান্ধার দেশের রাজকুমারী ইন্দুমতী, উভয়েই আপন আপন ভবিষ্যৎ পতি ও পত্নী সন্দর্শনের প্রত্যাশায়, পরস্পরের অজ্ঞাতভাবে মায়াকাননে প্রবেশ করিয়া, পরস্পরকে সন্দর্শন করেন। কিন্তু অমর ও ইন্দুমতীর সম্মিলন বিধাতার ইচ্ছা ছিল না। পরস্পরের প্রথম সন্দর্শনের দুই বৎসর পরে উভয়েই নিরাশ হৃদয়ে আত্মহত্যা দ্বারা দেবীর সম্মুখে যন্ত্রণার অবসান করেন; ইহাই সংক্ষেপে মায়াকাননের বর্ণনীয় বিষয়। মধুসূদন

তখন যে অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আত্মহত্যা দ্বারা যন্ত্রণার অবসান করিবার চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে দিবারাত্রি জাগরূক থাকিত। তাঁহার গ্রন্থেও তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কি অবস্থায় এই সময় তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত, এবং কি অবস্থায় তিনি মায়াকানন রচনা করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে, তাঁহার রচিত গ্রন্থের দোষ নির্দ্দেশ করিতে আর আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। রোগের যন্ত্রণায় এক এক বার তিনি মূর্চ্ছিতের ন্যায় পতিত হইতেন; রক্তবমনে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিত, অথচ সেই অবস্থায় অর্থাভাব ক্লেশ কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইবে ভাবিয়া, লেখনী হস্তে যখন যে দুই একটি ভাব হৃদয়ে উদিত হইত, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেন। নিজের যখন লেখনীধারণের সামর্থ্য না থাকিত, তখন বন্ধু বান্ধব বা পরিচিত ব্যক্তি কেহ নিকটে থাকিলে, তাঁহার দ্বারা কোন কোন স্থল লিখাইয়া লইতেন। এরূপ ভাবে রচিত গ্রন্থ নির্দ্দোষ এবং মনোজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে। মায়াকানন মধুসূদনের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বঙ্গসমাজে পরিচিত ও সমাদৃত হয় নাই, কিন্তু যে কেহ কবির এই সময়ের জীবনের ইতিহাস অবগত হইবেন, তিনি ইহা পাঠ করিবার সময় বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার অনেক স্থল কবির হৃদয়ের শোণিত দ্বারা লিখিত। হায়! প্রতিভা এবং সংসারিক জ্ঞান একত্র বর্ত্তমান থাকিলে বুঝি পৃথিবীর অনেক কবির জীবন, তাঁহাদিগের কাব্যের ন্যায় শোকান্ত হইত না।

মায়াকাননের ন্যায়, "বিব না ধনুর্ভঙ্গ" নামক আরও একখানি গ্রন্থ মধুসূদন এই সময় বঙ্গরঙ্গভূমির জন্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অতি সামান্য অংশমাত্রই তিনি রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে যে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অসময়ে যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। কিন্তু সেরূপ সাহায্যের দ্বারা তাঁহার ক্লেশ স্থায়ীভাবে দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বঙ্গদেশে সে সময় মধুসূদনের গুণ-পক্ষপাতী ব্যক্তির অভাব ছিল না। তাঁহার কাব্যসমূহের যশঃসৌরভ তখন সমগ্র বঙ্গদেশেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং বঙ্গের শিক্ষিতমণ্ডলী তখন একবাক্যেই তাঁহার প্রতিভার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সুতরাং মধুসূদনের দুরবস্থা সাধারণের গোচর করিলে, বঙ্গ সমাজ যে তাঁহার দুঃখে উদাসীন হইয়া থাকিতেন, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু কে তাঁহার জন্য সেরূপ চেষ্টা করিবেন? নিজের দুরবস্থা নিজে সাধারণের গোচর করা, মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তির

পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। তিনি বরং সপরিবারে অনশনে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু নিতান্ত আত্মীয় ও সুহৃদ্ ভিন্ন কাহারও নিকট কখনও নিজের দুরবস্থা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ঋণ বা সাহায্য দান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের বিশেষ অপরাধ ছিল না। নিজের দুর্দশার সূত্রপাত হইবার পরে মধুসূদনকে তাঁহার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহ দিতে হইয়াছিল, জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি অনেকেই সে সময় তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। রোগশয্যায় তিনি যাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রথমেই উল্লেখের যোগ্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কোন কার্য্যে প্রশংসার প্রার্থী নহেন, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদিগের বিপদে তিনি নীরবে যে সাহায্যদান ও যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন, আমাদিগের অনেকেই তাহা অবগত আছেন। মধুসূদন এবং তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটা মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ন্যায় ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতিও মধুসূদনকে তাঁহার বিপদের সময় সাহায্য করিতে ত্রুটী করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শেষাবস্থায় রোগের যন্ত্রণার অপেক্ষা ঋণের যন্ত্রণাই মধুসূদনের পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল। ঋণদাতাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য, কিছু দিন কলিকাতা হইতে অন্যত্র বাস করা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। এই সময় উত্তরপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার দুর্দ্দশা অবগত হইয়া, সদ্ভদ্রতার সহিত তাঁহাকে উত্তরপাড়ায় যাইয়া অবস্থিতির জন্য আহ্বান করেন। মধুসূদন তদনুসারে দুই তিন মাস কাল উত্তরপাড়ায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়ায় অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ হইত, এবং জয়কৃষ্ণ বাবু নিজে এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলে মধুসূদনকে যথেষ্ট সম্মান এবং শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়াতে, মধুসূদনের যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বাবুর সুযোগ্য পৌত্র রাসবিহারী বাবু মধুসূদনের নিকট সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া, তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব, তত দূর সান্ত্বনা দান করিতেন। তাঁহার সৎব্যবহারে মধুসূদন পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও

মধুসূদনের স্বভাবসিদ্ধ কবিতানুশীলনের বিশ্রাম ছিল না। যে দিন একটু সুস্থ থাকিতেন, সে দিন তাঁহার প্রিয় কবি মিল্‌টন এবং দান্তে প্রভৃতি হইতে অনর্গল কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন, এবং কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলে নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণন করিয়া, তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন। মধুসূদনের শেষজীবনের সুদীর্ঘ বিবরণ প্রদান করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় না। সে বিবরণ লেখক এবং পাঠক উভয়ের পক্ষেই ক্লেশকর। কিরূপ দুর্দ্দশায় যে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। এক এক দিনের এক একটি ঘটনা অবগত হইলে মনে হয় যে, বঙ্গদেশের সর্ব্বাপেক্ষা দীনতম ভিক্ষুকও বুঝি তাঁহার অপেক্ষা শান্তিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এক দিনের একটি দৃশ্য নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। মধুসূদন যে সময় উত্তরপাড়ায় অবস্থান করেন, গৌরদাস বাবু সেই সময় একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন যে, একটি মলিন শয্যার উপর শয়ন করিয়া, মধুসূদন মুহুর্মুহু রক্ত বমন করিতেছেন। তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটা নিম্নে ভূমিতলে পতিত হইয়া, রোগের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন। গৌরদাস বাবুর গৃহপ্রবেশের সমকালে হেন্‌রিয়েটার মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে তৎকালোচিত সাহায্যদানের জন্য নিকটে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নিজের যন্ত্রণার অপেক্ষা স্বামীর অবস্থাই তখন হেন্‌রিয়েটার পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল। তিনি অতি কাতর স্বরে গৌরদাস বাবুকে বলিলেন; "আমার নিকটে কেন? আমার জন্য কিছু করিতে হইবে না। যদি পারেন আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা করুন।" গৃহের এক দিকে এই;—অপরদিকে একটি পাত্রে কতকগুলি পর্য্যুষিত অন্ন ব্যঞ্জন রহিয়াছিল। মধুসূদনের ক্ষুধাতুর শিশু দুইটি কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সেই পর্য্যুষিত অন্নে উদরপূর্ত্তি করিয়াছিল, এবং ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, অসংখ্য মক্ষিকা বোগীদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। হায়! এই কি মেঘনাদবধের কবির উপযুক্ত অবস্থা! যিনি কল্পনানয়নে লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, বর্ণনাগুণে তাহা পাঠকের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে অবতারিত করিয়াছিলেন, সংসারের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে এই অবস্থাতেই জীবন সমাপন করিতে হইয়াছিল। বিধিবিধাতার নিয়ম অতিক্রম করা কাহার সাধ্য? মধুসূদন স্বহস্তে বিষতরুর বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাকে তাহার উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে হইল।

মৃত্যুর ৭।৮ দিন পূর্ব্বে মধুসূদন উত্তরপাড়া হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। সপরিবারে কলিকাতায় স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারেন, তাঁহার সাংসারিক অবস্থা এখন আর সেরূপ ছিল না। নিদারুণ রোগে তিনি একেবারে উত্থানশক্তিরহিত হইয়াছিলেন; কোনও স্থান হইতে একটি কপর্দ্দকও আয়ের প্রত্যাশা ছিল না; তাঁহার পত্নীও কতক্ষণে পরলোক গমন করিবেন, এইরূপ অবস্থাপন্না হইয়াছিলেন। কে তাঁহাদিগের ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা করিবেন, কে বা তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিবেন? সুতরাং মধুসূদনের বন্ধুগণ, তাঁহার পত্নীকে তাঁহার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার আশ্রয়ে রাখিয়া,তাঁহাকে আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন। অন্য উপায়ও কিছু ছিল না। মধুসূদন অনিচ্ছাসত্ত্বে দাতব্য চিকিৎসালয়ে গমন করিতে স্বীকার করিলেন। এত দিন তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, এইবার তাহা চরম সীমায় উপনীত হইল। নিজের সুখের জন্য, তিনি যে জনকজননীর প্রাণে বেদনা দিয়া, স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা এত দিন পরে তাঁহার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইল। মনুষ্য জীবনে যতই যন্ত্রণাভোগ করুক,মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া, আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিতে পাইলেও তাহার অনেক যন্ত্রণার উপশম হয়। কিন্তু বিধাতা মধুসূদনের ভাগ্যে সে সুখও লিখেন নাই। আত্মীয় বন্ধুগণের মুখ দেখা দূরে থাকুক, তাঁহার হতভাগিনী পত্নী যে মৃত্যুশয্যায় কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার পক্ষে তাহাও অবগত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। মধুসূদনের জীবন আদ্যোপান্ত যন্ত্রণার ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু এরূপ যন্ত্রণা,এরূপ ক্লেশ, জীবনে আর কখনও তিনি ভোগ করেন নাই। নিদারুণ রোগের মধ্যে যখন এক বার চৈতন্য হইত, তখন পীড়িতা পত্নী ও শিশু দুইটির কথা মনে পড়িয়া, তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইত। কখনও কণ্ঠে হৃদয়ের ভাব সংযত করিতেন, কখনও বা বালকের ন্যায় অধীরভাবে ক্রন্দন করিয়া ফেলিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার এবং তাঁহার পত্নীর উভয়েরই পীড়া শেষাবস্থায় উপনীত হইল। পতিপত্নীর মধ্যে কে অগ্রে পরলোক গমন করিবেন, ইহাই তখন তাঁহাদিগের উৎকণ্ঠার বিষয় হইল। মধুসূদন এত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি বুঝি তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, তাই বিধাতা তাঁহার শিক্ষার জন্য শেষ দণ্ড বিধান করিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে, তাঁহার জীবনের সুখ-দুঃখভাগিনী

তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। মধুসূদন তখন দাতব্য চিকিৎসালয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় বাস করিতেছিলেন, তাঁহার এক পূর্ব্বতন ভৃত্য আসিয়া, তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদান করিল। মধুসূদনের অশ্রুর উৎস তখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তিনি কাতরস্বরে বলিলেন, "জগদীশ, আমাদিগের দুই জনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমারও অধিক বিলম্ব নাই, আমি সত্বরই হেন্‌রিয়েটার অনুবর্ত্তী হইব।" তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারও দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। অধিক দিন পত্নী-বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিবা, তাঁহাকে পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না। কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয় এই বিপৎপাতে একেবারে নিষ্পেষিত হইল। পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত সংস্থানও তখন তাঁহার ছিল না। বন্ধুবান্ধবগণের অনুগ্রহে তাহা সম্পন্ন হইল। হতভাগিনী পত্নীর সমাধির উপর শেষ অশ্রুপাত করিয়া, যে তিনি শান্তিলাভ করিবেন, বিধাতা সে সৌভাগ্য হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। বাবু মনোমোহন ঘোষ এবং তাঁহার আরও দুই এক জন সুহৃদ সে কার্য্য সম্পন্ন করিবা, দাতব্য চিকিৎসালয়ে মধুসূদনকে সংবাদ দিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। পাছে অর্থাভাবে পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হইয়া থাকে, সেই আশঙ্কায় মধুসূদনের হৃদয় উদ্বিগ্ন ছিল। তিনি মনোমোহন বাবুকে দেখিয়া বলিলেন; "কেমন মনোমোহন, সকল ত সুসম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ত্রুটি ত হয় নাই?" মনোমোহন বাবু বলিলেন, "না। আমাদিগের এ অবস্থায় যাহা সম্ভব, তাহার কিছুরই ত্রুটি হয় নাই।" মধুসূদন তখন মনোমোহন বাবুকে বলিলেন, "মনোমোহন, তুমি যত্নের সহিত সেক্সপিয়ার পড়িয়াছিলে, ম্যাকবেথের সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়?" মনোমোহন বাবু বলিলেন, "কোন কয়টি পংক্তি"? মধুসূদন বলিলেন, "লেডী ম্যাকবেথের মৃত্যুসংবাদে ম্যাকবেথ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কয়টি পংক্তি। আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কোনও কথা আর আমার স্মরণ হয় না; কিন্তু দেখ দেখি, আমি সেই কাটি পংক্তি আবৃত্তি করিতেছি, আমার কোন ভ্রম হয় কি না।" মধুসূদন এই বলিয়া ম্যাকবেথ হইতে সুস্পষ্টরূপে এই কয়টি পংক্তি আবৃত্তি করিলেন:—

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time
And all our yesterdays have lighted fools.
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player,

That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more ; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.—

আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "কেমন মনোমোহন ঠিক হইয়াছে ত ?" মনোমোহন বাবু বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে, কিন্তু এখন এ সকল কথায় প্রয়োজন কি ? আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।" মধুসূদন শুনিয়া একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ এই যে, আমি যে আর কিরূপ আরোগ্য লাভ করিব, আমার মনই তাহা বুঝিতেছে। পরে মনোমোহন বাবুকে বলিলেন, "দেখ, এই চিকিৎসালয়ের পরিচারিকা এবং ধাত্রীদিগকে পুরস্কার দিতে পারি, আমার এমন সম্বল নাই। ইহারা অর্থপ্রয়াসী, ইহাদিগকে কিছু কিছু পুরস্কার দিলে ইহারা আমার অধিক যত্ন করিত। যদি প্রতিদিন একটি করিয়া টাকা ব্যয় করিতে পারিতাম, তবে এ অবস্থায়ও কিছু শান্তি পাইতাম।"

মনোমোহন বাবু বলিলেন, "প্রতিদিন একটি করিয়া টাকা ? সে জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। যে উপায়েই হউক, তাহা সংগৃহীত হইবে।"

মধুসূদন বলিলেন, "মনোমোহন, তোমায় আর অধিক কি বলিব ? আমার শিশুগুলি যেন অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ না করে, এই দেখিও"। (১) মনোমোহন বাবু বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যদি আমার নিজের সন্তানগণের অন্নাভাব না হয়, তবে আপনার শিশুগুলিরও হইবে না।" মধুসূদনের বিশুষ্ক মুখ ক্ষণ কালের জন্য প্রফুল্লিত হইল। সস্নেহে মনোমোহন বাবুর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "মনোমোহন, জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন্।" মনোমোহন বাবু ইহার পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহে বিদায়ের পর মধুসূদন আর তিন দিবস জীবিত ছিলেন। সেই তিন দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি নিজের অতীত জীবনের কার্য্যাবলীর আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার নিজের অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই যে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, এ চিন্তা মর্ম্মান্তিক শেলের ন্যায় তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিত। কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি তাঁহার নিকট মুক্তকণ্ঠে আপনার দুর্বলতা স্বীকার করিতেন, এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসদাচারের পরিণাম কি, তাহা বুঝাইবার জন্য নিজের অবস্থার উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিতেন।

(১) মনোমোহন বাবু সে সত্য বিস্মৃত হন নাই। পুত্রবৎ স্নেহে তিনি মধুসূদনের পুত্র আলবর্ট নেপোলিয়নকে প্রতিপালন করিয়াছেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে আলবর্ট, অহিফেন-বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে Deputy Opium Agent এর কার্য্য করিতেছেন।

মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবাদ দিয়া আনাইয়া, তিনি অনেকক্ষণ অবধি তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন, এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন যে, "আমি ঈশ্বরের কৃপায় নির্ভর করিয়া মরিতেছি। তিনি যে পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্য খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।" যে দিন তিনি পরলোক গমন করেন, সেই দিন প্রাতে, তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মধুসূদনের শরীর তখন অবসন্ন এবং তাঁহার বাক্‌-নিষ্পত্তির শক্তি লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "ত্রৈলোক্যমোহন, জীবনের কোনও আশা পূর্ণ হয় নাই, অনেক আক্ষেপ লইয়া মরিতেছি, এখন বলিবার শক্তি নাই। তুমি আর এক সময় আসিও, অনেক কথা বলিবার আছে, তোমায় বলিব।" কিন্তু আর বলা হইল না, প্রাণের বেদনা ভাষায় ব্যক্ত করিবার অবসর বিধাতা তাঁহাকে দান করিলেন না। সেই দিন (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবার) বেলা দ্বিপ্রহর দুইটার সময় তাঁহার প্রাণবায়ু বিনিঃসৃত হইল। বাল্যে যাঁহার সেবার জন্য দাসদাসীগণ ব্যগ্র হইয়া থাকিত, পাছে কোনও বিষয়ে তাঁহার পরিচর্য্যার ত্রুটী হয়, এই চিন্তায় তাঁহার পিতা মাতা ব্যাকুলিত হইয়া থাকিতেন, আজ এই শেষ দিনে চিকিৎসালয়ের ভৃত্য ও শুশ্রূষাকারিণী ভিন্ন তাঁহার মুখে জলগণ্ডুষ দিবার জন্যও কোন আত্মীয় নিকটে ছিলেন না। রাজপথের ভিক্ষুক এবং অনাথগণের সহিত একত্রে বঙ্গের বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি এইরূপে পরলোক গমন করিলেন। যে কার্য্যসম্পাদনের জন্য বিধাতা মধুসূদনকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। জননীরূপিণী মাতৃভাষার সেবা করিয়া, এবং আত্মসংযমের অভাবে প্রতিভার পরিণাম কত দূর শোচনীয় হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার অমর আত্মা পাপপ্রলোভনময় পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধলোকে প্রস্থান করিল। সংসারের কুটিল বর্ত্মে ভ্রমণ করিতে করিতে অতিসংবতস্বভাব পুরুষকেও স্খলিতপদ হইতে হয়; মধুসূদনও হইয়াছিলেন। তিনি জীবনে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবী হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণ করিবে, এবং মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধন করিয়া, তিনি তাঁহার স্বদেশীয়গণের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, বিশ্বস্মৃতির ন্যায় তাহা তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, তত দিন তাঁহার স্বদেশীয়গণ সত্যই তাঁহার কাব্য সমূহ হইতে,

"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

বিদায়।

১

আসি তবে, প্রেম-নিশা বুঝি বা পোহায়!
প্রত্যক্ষ আগত-প্রায়,
ভাষা আর না জুয়ায়,
শপথে সন্দেহ হয়, বিদায়—বিদায়।
ভাসিছে কল্পনা-ভ্রান্তি,
আসে বুঝি সুখ-শ্রান্তি,
আসিলে বিরক্তি ঘৃণা রবে না উপায়।
বিদায়—বিদায়।

২

অসমাপ্ত এ চুম্বন, অপূর্ণ পিপাসা।
এ-ই ত প্রেমের বন্ধ—
বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব;
কবিতায় চিরানন্দ সশঙ্ক দুরাশা।
খুলে দাও বাহু-পাক,
অপূর্ণ—অপূর্ণ থাক্,
আজিকে কাঁদিয়া গেলে কাল হেসে আসা।
থাকুক্ পিপাসা।

৩

হাহা, হৃদি বিনির্ম্মিত অস্থি-মজ্জা-মেদে।
পরিমলে কুতূহলী
কুলে শেষে পায়ে দলি;
তৃপ্তির নরকে অলি অতৃপ্তির খেদে।
বুঝি না বাঁশরী-সুরে
সহস্র আহারী ঘুরে;
অসীম মিলন ক্ষুরে সসীম বিচ্ছেদে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সহযোগী সাহিত্য।

চিরকাল কাহারই "কাল দিন" থাকে না। এডিসন ও জনসনের "কাল দিন" কাটিয়া গিয়াছে। এখন আর তাঁহাদের, সে কালের সেই আদর সম্ভ্রম নাই, সে গৌরব-গরিমাও নাই। এখন তাঁরা আলমারির সর্ব্বোচ্চ কক্ষের কেতাব,—সেকেলে বচনায় একটা আদর্শমাত্র। হায়! ইহলোকের আদর এইরূপই বটে।

এডিসন ও জনসন।

জনসন প্রভৃতির এখন আর সে জ্যোতিঃ না থাকুক, তাঁহাদের প্রভা অদ্যাপি ইংরেজী সাহিত্যে প্রচুরপরিমাণে বিদ্যমান। সেকলে বাঙ্গালী জাতিকে যে বিকৃত বর্ণে চিত্র-বিচিত্র করিয়াছিলেন, তিনি জনসনের আলেখ্যও আঁকিয়া গিয়াছেন। প্রায় সেই রঙে অঙ্কিত করেন। কিন্তু তাহাতে কবিরা বাঙ্গালী জাতি বা জনসন, কেহই 'অধম' হন নাই। বিষবিন্দুকের নিন্দা সত্ত্বেও জনসন জীবিত আছেন, সম্ভবতঃ জীবিতই থাকিবেন। পক্ষান্তরে, বাঙ্গালী জাতিও আজও মরে নাই,—তাহাদের মুখে, সেকলে যে অঙ্গার কলঙ্ককালিমা মাখিয়াছিলেন, তাহা বরং এখন সেকলের নিজ মুখই অঙ্কিত করিতেছে। সেকলে লিখিয়া গিয়াছেন,—"জনসন অমানুষ, হৃদয়-হীন, কর্কশ, কঠোর, সহানুভূতিশূন্য রাক্ষস, জনসন গোঁড়ামিতে বদ্ধ, মিথ্যাসন্দে ও লোক-নিন্দার পেচক। তিনি ভাষা-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, কবিকল্পনায় অনধিকারী।" কিন্তু সেকলের এই সকল উন্মাদবৎ উক্তি এখন কে মানে? কোন্ মহামূর্খ উহা বিশ্বাস করে? সেকলে এখন আর মর্ত্ত্যলোকে নাই। কিন্তু সেকলের সেকলে-শক্তি-বিহীন সপ্ত-রই সংস্করণ আজও সাহিত্য-ক্ষেত্রে না জন্মিতেছে, এমন নয়। বিষ-বিন্দুক কেবল ব্যক্তিবিশেষকে নয়,—কেবল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে নয়; গ্রন্থকারের গোষ্ঠী-গোত্র ধরিয়াও টানাটানি করে; সেটা তাহাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সুরুচিরই পরিচয় বটে। বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যেও এমনতর বিষবিন্দুক সেকলের অবতার মূর্ত্তিমান আছে। সেকলের গালি-গালাজ-শ্লাঘিতে জনসনের কীর্ত্তিলোপ হয় নাই, তা জনসন যেমনই হউন। জনসন যে আজও ইংরেজী সাহিত্যে জীবিত আছেন, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি একটি প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে,—গ্রেট বৃটেনের রয়াল ইনিষ্টিটিউসনে, মিঃ ক্লেইকের জনসনসম্বন্ধীয় বক্তৃতায়। হইতে পারে জনসনের প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা ছিল না। কিন্তু তাঁহার যাহা ছিল, রয়াল ইনিষ্টিটিউসনে। তাহা তাঁহার নিজের নিজস্ব। তাহা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল প্রকৃতির প্রতিভাতেও দুষ্প্রাপ্য। রয়াল ইনিষ্টিটিউসন জনসনের জন্য কিরূপ স্থান নির্দ্দেশ করেন, দেখা যাউক। ক্লেইকের কথার সারমর্ম্মই আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

জনসন,—

জনসন-কৃত "বৃটিশ কবিদিগের জীবনী" গ্রন্থে, মিল্টন, ড্রাইডেন ও ওয়েস্লী,—এই তিন

কবির কাব্যসমালোচনা হইতে জনসনের চরিত্র স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। সেকলে যে সকল বিশেষণে জনসনকে বিভূষিত করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া মনে করা মহাভ্রম। সেকলে এডিন্‌বরা রিবিউর কটু পাতর দ্বারাই জনসনকে যাচিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাতে সত্য সপ্রকাশ হয় নাই।

জনসন; তাঁহার প্রকৃতি ও প্রতিভা।

জনসন, চরিত্রে ও মনস্বিতায়, তাঁহার সমবায়ানুরূপ লোকই ছিলেন। তাঁহার বিশাল মানসিক শক্তি, স্বাধীন ও স্বাভাবিক আলোচনা-প্রণালী, সুদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় মিলিত হইয়া যে প্রতিভা প্রসূত করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজের। জনসনের সমালোচনাপ্রণালীর বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি গ্রন্থের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার তন্নতন্ন বিচার করিবার পূর্ব্বে, সমগ্র গ্রন্থের আভ্যন্তরিক সত্তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপের পরিমাপ করিতেন। তখন তিনি গ্রন্থের মূল শরীর হইতে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শাখা, প্রশাখা ও পল্লব পত্রের বিচ্ছেদ করিতেন না। পরন্তু, গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকারকে বিযুক্ত করা তাঁহার নিয়ম ছিল না। তিনি গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্বের সহিত গ্রন্থলিখিত সাহিত্য সংযুক্ত করিয়া,—উভয়েরই সমালোচনা করিতেন।

জনসনের সমালোচনা প্রণালী।

কবি মিল্টনের কাব্য সমালোচনায় তিনি, মনুষ্য মিল্টনের প্রতি তাঁহার যে অপছন্দ ছিল, তাহা গোপন করেন নাই—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু মনুষ্য মিল্টনকে তাঁহার পছন্দ না করার প্রকৃত কারণও ছিল। যে সকল বিপ্লবকার্য্যে মিল্টন নিযুক্ত ছিলেন, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ঘৃণাস্পদ ছিল। সুতরাং, ঐতিহাসিক উদাসীনভাব সহিত, জনসন তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জনসন মিল্টনের "প্যারাডাইস লষ্ট" তদীয় কবিত্বের প্রকৃত নাহাত্ম্য, তাঁহার সার্ব্বকালিক সারবত্তা, তাঁহার অত্যুচ্চ গুণগরিমা, ঔজস্য ও গাম্ভীর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ও তাহা সপ্রকাশ করিয়াছিলেন। মিল্টনে যাহা সাম্প্রদায়িক নয়,—যাহা অসীম, অমর্ত্ত ও মৌলিক,—যাহা চন্দ্রসূর্য্যের সহিত সর্ব্বকালে বিদ্যমান ও দেদীপ্যমান, তাহা জনসন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয় নাই, প্রত্যুত অতি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। জনসন, মিল্টনের মহাকাব্যের যে "সন্নিবিষ্টি" ও সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ও জনসমাজে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা জনসন কর্ত্তৃক মিল্টনের গ্রন্থের সামান্য সামান্য দোষের সমালোচনায়, বস্তুতঃ ক্ষুণ্ণীকৃত হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনসন, মিল্টনকে যে উচ্চাসনে উপবেশিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন,—তাহাতেই তিনি অদ্যাবধি বিরাজ করিতেছেন।

বলা বাহুল্য, জনসনসম্বন্ধে উপরি-উক্ত সমালোচন উচিত এবং সহৎ। বিষনিন্দুকবিদ্বেষের চক্ষে কোনও বস্তুই প্রকৃত বস্তুর প্রতিভাত হয় না। জনসন অন্ততঃ সেকলের মত বিষনিন্দুক ছিলেন না।

বাঙ্গালী সমালোচক,—বাঙ্গালা সাহিত্য বা বিলাতি সাহিত্যেরই হউন,—জাতিগত, বংশগত ও সম্প্রদায়গত সহস্র স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, এবং ব্যক্তিগত বহুবিধ বিদ্বেষ-বুদ্ধির বিড়ম্বনা সত্ত্বেও,—উদারতার উচ্চভূমিতে দাঁড়াইয়া দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিলে, কোনও ক্রমেই যথেষ্টীয়

সাহিত্যের সহায়তা করিতে পারিবেন না,—ইহা, সাহসসহকারে বলিতেছি। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও বন্ধুতার অনুরোধেই দেখিতেছি, ইদানীং বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা শাসিত করে। দৃষ্টান্ত,—অনেক বাঙ্গালীর বিলাতি সাহিত্যে বিদ্বেষ,—ইহা বাঙ্গালী সমালোচক আমাদের বিবেচনায় শুভকরী বিদ্যা। মৌলিকতার যতই মূল্য থাকুক, ও বাঙ্গালা সাহিত্য। বিলাতি সাহিত্যের সহায়তা ব্যতীত, বাঙ্গালা সাহিত্য উপস্থিত অবস্থায় আদৌ উন্নতি হইতে পারিবে না। ইহা সমীচীনতা ও সাধারণদর্শনের স্থিরসিদ্ধান্ত। বাঙ্গালী বিলাতি সাহিত্যের বক্ষ হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন,—(করাই উচিত)—অথচ বিলাতি সাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া বেশ সাজাইতে কুণ্ঠিত হয়েন না, এ স্থলে আন্তরিকতার অভাব। আন্তরিকতা অভাব জলে ডুবাইয়া উচ্চে উঠিবার আকাঙ্ক্ষা, আকাশকুসুমে বাসনা অপেক্ষাও অসম্ভব। পক্ষান্তরে ইংরেজী সাময়িক পত্রিকার ভারতীয়বিদ্বেষী সাহিত্যের সমালোচকগণ সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার এতাদৃশ অন্ধ,—ও সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ও বিলাতি সাহিত্যের প্রণালী পদ্ধতিতে এতাদৃশ অনভিজ্ঞ যে, যাহা বিশাল বিলাতি সাহিত্যেও সম্ভবে না,—বিলাতি সাহিত্যেও যে "পারিভাষিক" পদ্ধতির প্রচলন নাই, ক্ষুদ্র অপ্রাপ্তবিকাশ বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার প্রত্যাশা করেন। তাঁহারা ভাব ও চিন্তামাত্রই বিলাতি সাহিত্যসম্ভূত বলিয়া মনে করেন,—বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার উদ্ভাবন একান্তই অসম্ভব বলিয়া ভাবেন;—বুঝেন না যে, একই ভাব, একই "আইডিয়া", শত শত আকারে সংসারে প্রচারিত হইয়া থাকে;—যিনি যত মৌলিকতারই ভান করুন,—ইদানীং নূতন আমকোরা ভাবের ও মৌলিক চিন্তার আদৌ অভাব। বৈচিত্র্যের চিত্রাঙ্কনবিপুণতাই এখনকার লেখকদিগের মৌলিকতা। সক্রেটিস হইতে হুইট্‌মর্ণ পর্য্যন্ত ও বেদব্যাস হইতে বঙ্কিম বাবু পর্য্যন্ত কে কোন্ ভাবের প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা নির্ণয় করা কঠিন,—পরন্তু উহা সহজ ও অনায়াসসাধ্য স্বীকার করিলেও প্রত্যেক পদে আবিষ্কর্তার নাম নির্দ্দেশ করা অসম্ভব; কেবল অসম্ভব নয়,—হাস্যোদ্দীপক ও পাণ্ডিত্য-পাগলামির পরিচায়ক। কিন্তু সম্প্রদায়িক অন্ধ উন্মাদ সমালোচক ইহা বুঝেন না। যাহা বিলাতি সাহিত্যেও অপ্রচলিত রীতি, বিলাতিবাঙ্গীশত্বের বড়াই সত্ত্বেও,—বাঙ্গালা সাহিত্যের বাঙ্গালী লেখকদিগের নিকট হইতে তাহা আদায় করিতে চান। ইহা ব্যতীত, ব্রাহ্ম সমালোচক হিন্দু লেখকের উপর গালি পাড়েন, হিন্দু, ব্রাহ্ম দেখিলে,—তৈলে-বার্ত্তাকুবৎ চটিয়া উঠেন। খৃষ্টান পাদ্রী শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উপর গুলি-গোলা নিক্ষেপ করেন। হিন্দু উদারতার ভণ্ডামি করেন না, কিন্তু যাঁহারা "উদারতা উদারতা" করিয়া অনবরত উচ্চ চীৎকার ছাড়েন, তাঁহাদের এতটা অনুদারতা, ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব আদৌ অসহনীয়। সাধারণতঃ এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক অসৎ সমালোচনার সমষ্টি,—বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাণ-বায়ুর পক্ষে বিষাক্ত; উহা অতীব অস্বাস্থ্যকর, শোচনীয়,—উহা সর্ব্বথা সাংঘাতিক। বিষ-মিশ্রুকের নিন্দায় অবশ্য বহিয়া যায় না, সাম্প্রদায়িক শিক্ষাভিমানী সহৃদয়ের সহৃদয়তাও অক্ষিঞ্চিৎকর। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য আজও অঙ্কুরের মধ্যে, তাহাতেই এতটা আক্ষেপ।

পুস্তক।

একপ্রকাশিত ইংরেজী পুস্তকরাশির মধ্যে দুই খানি গ্রন্থ, সহিদের চিত্তাকর্ষণ করে। প্রথম,—বঙ্কিমের জীবন-চরিত; দ্বিতীয়,—হার্বার্ট স্পেনসারের "নীতিসূত্র" (Principles of Ethics) গ্রন্থের দ্বিতীয় ও উপসংহারভাগ। বঙ্কিমের জীবনচরিতের সংক্ষিপ্তসার সময়াভাবের জন্য রাখিয়া, অদ্য আমরা হার্বার্ট স্পেনসারের গ্রন্থ সমালোচনা হইতে, তাঁহার রাজনৈতিক মতের অত্যল্প আভাস দিব। সাহিত্যের পাঠকবর্গ সাধারণতঃ শিক্ষিতসম্প্রদায়েরই লোক বলিয়া আমরা অবগত আছি। অতএব শিক্ষিত লোকের নিকট, জন বঙ্কিম কে ও হার্বার্ট স্পেনসার কে, ইহার বিস্তৃত পরিচয় দিতে বসাই বে-আদপি।

বঙ্কিম ও হার্বার্ট স্পেনসার।

হার্বার্ট স্পেনসার ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি।

হার্বার্ট স্পেনসার সাম্প্রদায়িক শাসনপ্রণালী অর্থাৎ Party Government সম্বন্ধে নিম্নানুবাদিত অভিমত ব্যক্ত করেন।

সাম্প্রদায়িক শাসনপ্রণালী, প্রতিনিধিদিগের প্রজাতান্ত্রিক শাসন, পোষণ ও সংশোধন করে না, প্রত্যুত তাহার প্রতিবন্ধকই হয়। সাম্প্রদায়িক শাসন-প্রণালী জাতীয় ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার পরিবর্ত্তে,—জাতীয় ইচ্ছার পরিপূরণপক্ষে বাধাই দেয়; জাতীয় ইচ্ছা অবিশ্রান্ত ভাবে উদ্ভাসই করে। নির্ব্বাচকদিগের নির্ব্বাচনে, মন্ত্রিত্বের মহাশক্তি উত্থিত হইয়া, সম্ভবতঃ জাতীয় ইচ্ছার কোনও একটি প্রধান অঙ্গের পরিপোষণ করে;—কিন্তু সাধারণতঃ সে শক্তি অন্যান্য সর্ব্ববিষয়েই জাতীয় অভিমত অবয়বত পরদলিত করিয়া, আত্ম-ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করে। নির্ব্বাচকগণ, মন্ত্রীদের উমেদারদিগের অজস্র কিন্তু অমূলক অঙ্গীকারে, আত্মবিস্মৃত হইয়া, তাহাদিগকে নির্ব্বাচিত করেন; কিন্তু মন্ত্রীসম্প্রদায় মন্ত্রিত্বে নির্ব্বাচিত হইবার পর,—ঐশী প্রজাশক্তিতে শক্তিবান হইবার পর,—আর পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করেন না,—তাহা সটান জীর্ণ করিয়া,—যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহারা এমন সকল আইনকানুন অবতারিত ও বিধিবদ্ধ করেন, যাহা জাতীয় ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার অনুবর্ত্তী ও অনুগত, অনুচর ও উপচরদিগের সহায়তায়, যথেচ্ছাচারী রাজার মত অত্যাচার আরম্ভ করেন। অঙ্গীকার ও আবেদন সমস্তই ধূইয়া মুছিয়া যায়,—নির্ব্বাচকদিগের নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে সমস্তই তখন শিকায় উঠে,—মন্ত্রীসম্প্রদায় ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতে থাকেন।

সাম্প্রদায়িক শাসনসম্বন্ধে স্পেনসার আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সে সকল উদ্ধৃত করিবার আমাদের অবকাশ নাই। তবে, তাঁহার কথার সারমর্ম্ম,—আমরা আত্ম-শাসনবঞ্চিত চিরপরাধীন জাতি হইলেও, অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে সমর্থ। আমরা রাজ-প্রসাদস্বরূপ,—সহাশয় ইংরেজের আশীর্ব্বাদস্বরূপ, ইদানীং যে নির্ব্বাচনাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি ও আত্মশাসনের অতি নিম্নসোপানে উত্থিত হইয়াছি, তাহারও অপব্যবহার আমরা অবিরত করিয়া থাকি। আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ কি ঠিক আমাদেরই ইচ্ছানুসারে, ও তাঁহাদের অঙ্গীকারানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন? অথবা তাঁহারা স্ব স্ব স্বার্থানুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রতি পদে পরিচালিত হন? আমরা ইহার উত্তর দিতে চাই না। স্বয়ং হার্বার্ট

লেনসাহ ইহার আলোচনা করিয়াছেন। মনুষ্যপ্রকৃতির পক্ষেই এই মহাপাপের কালন, অসম্ভব বলিয়া হইবে। মনুষ্যস্বভাবে সংকীর্ণ স্বার্থই প্রবল, তাহাতে আংশিক আত্মত্যাগের আশাও,—আমাদের বিবেচনায়,—মরুভূমে মরীচিকা।

পত্রিকা।

বিলাতি পত্র পত্রিকায় আইরিশ আত্মশাসন-বিল ব্যপদেশে বিচারবিতর্কবিষয়ক প্রবন্ধ, পূর্ববৎ সব প্রবাহে চলিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রিবিউ ও মেগাজিন এমন প্রায় একখানিও নাই, যাহাতে এই বিষয়ের আলোচনা না হইতেছে।

আইরিশ আত্মশাসন বিল ব্যতীত, প্রধানতঃ আর দুইটি রাজনৈতিক বিষয়ের প্রবল আন্দোলন চলিয়াছে। (১) বৃটিশ পার্লামেণ্টের মেম্বরদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ, আর্থিক বেতন দেওয়া আবশ্যক ও উচিত কি না? এবং (২) মিশরে বৃটিশ রাজনীতি। সাময়িক সংগ্রহ,— পার্লামেণ্টের মেম্বরদিগকে বেতন দেওয়ার পক্ষে অভিমতই অধিক। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে ইহাঁরা বেতন পাইবেন। কেবল ব্যয়বহুলতাই ইহার একমাত্র প্রতিবন্ধক। মিসরে বৃটিশ রাজনীতির প্রতি রোষারোপ, শত্রু মিত্র অনেকেই মন্তব্য করিতেছেন, অন্ততঃ উহার আন্দোলনের বেগ দেখিয়া, ইহা প্রতীত হয়। এ আলোচনা, কেবল আইরিশ আত্মশাসন-আন্দোলনেরই বিরহ। কয়েকখানি বিশিষ্ট রিবিউ হইতে আমরা এ উভয় বিষয়েরই বিস্তৃত বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

পাশ্চাত্য সাহিত্যক্ষেত্রের সর্বপ্রধান নূতন ঘটনা ফরাসী পণ্ডিত যুলেঁা টেইনের মৃত্যু। এপ্রিল সংখ্যা অধিকাংশে ইংরেজী ও ফরাসী পত্রে টেইনের জীবনবৃত্ত ও চরিত্রসমালোচনায় বিবৃত। কণ্টেম্পোরারিতে প্রকাশিত টেইন-বিষয়ক প্রবন্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা সাহিত্য। তাহারই সারসংগ্রহ প্রদান করিলাম।

নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী।

এপ্রিল সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ, আইরিশ আত্মশাসন বিলের বিপক্ষে,—মিঃ গ্লেডষ্টোনের কর্তৃক লিখিত। মিঃ চেম্বারলেন ইউনিয়নিষ্ট উদারনৈতিক দলের অন্যতম কর্ণধারবর। দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রাডক্ট বিলের পক্ষে,—লেখক মিঃ বেডনও। ইনিও বৃটিশ পার্লামেণ্টের মেম্বর।

চেম্বারলেন আয়র্লণ্ডকে আদৌ আত্মশাসন দিতে চাহেন না। কেহই আত্মশাসন দিন, আত্মশাসনের অধিকার অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিস্তৃত করিতে চাহেন। তিনি বলেন, সহজ তর্কবিতর্কে ও তীব্র বাদপ্রতিবাদে বিলের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হইবে না। বরং, সম্পূর্ণরূপে ইহাই হইবে। বিল যত ব্যাখ্যাত হইবে, লোকে উহা যত বুঝিবে, ততই হোমরুল। উহার পক্ষে মঙ্গল। বিল, কমন্স-হাউসে দ্বিতীয় বার পাঠিত হওয়ার কালবিলম্ব হওয়াতে মন্দ হয় নাই, খুব ভালই হইয়াছে। বৃটিশ প্রজা-সাধারণে উহা বুঝুক, পড়ুক, আলোচনা ও আন্দোলন করুক,—তাহাই প্রার্থনীয়। বিলের বিষয় খুব পাকা, নিখুঁত ও খাঁটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও প্রবল প্রতিবাদে উহার বিরুদ্ধ

মাত্র আশঙ্কা নাই। বিল কিছুতেই ব্যর্থ হইবে না। তবে কোনও কোনও স্থলে উহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, আইরিশদিগের আত্মশাসনাধিকার আপাততঃ আরও কিছু অধিক হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে মিঃ চেম্বার্লেন বিবেচনা করেন, হোমরুল বিল বড়ই বিষম; উহা কখনই পাশ হইবে না, কেন না, তদ্দ্বারা বৃটিশ রাজ্য রসাতলে যাইবে। নানারূপ রাজনৈতিক যুক্তি তর্ক দ্বারা তিনি এ কথা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

মিঃ চেম্বার্লেন চতুর রাজনৈতিক। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি। ১৮৮৬ সালের উদারতান্ত্রিক মন্ত্রিত্বে, প্রথমতঃ আইরিশ আত্মশাসন বিল অবতারিত হওয়ার পূর্ব্বে, ইনি গ্লাডষ্টোন সম্প্রদায়ের অতীব অনুরক্ত সভ্য ছিলেন। মন্ত্রণাকক্ষে মিঃ গ্লাডষ্টোনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। আইরিশ আত্মশাসন বিলই ইঁহাদের আত্মবিচ্ছেদ ঘটায়। উদারনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া 'ইউনিয়নিষ্ট'-মণ্ডলের একটি অভিনব রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে,—আধুনিক রাজনীতিক্ষেত্রের ইতিহাসের এই সকল মূল তথ্য অনেকেরই স্মরণ আছে।

মিঃ চেম্বার্লেন।

১৮৮৬ সালের আইরিস আত্মশাসন বিল ব্যর্থ হয়, উদারনৈতিক মন্ত্রিত্বের পতন হয়। রক্ষণশীল সম্প্রদায় মন্ত্রী হয়েন। রক্ষণশীলদিগের সময়ে, বলা বাহুল্য, আইরিশ আত্মশাসন বিলের আর কোনও উচ্চবাচ্য ছিল না। এখন পুনর্ব্বার উদারনৈতিক শাসন, লর্ড সালিসবারীর পর পুনর্ব্বার মিঃ গ্লাডষ্টোন প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। কাযেই আইরিস আত্মশাসনসমস্যা আবার উপস্থিত। আয়র্লণ্ডকে অন্ততঃ আংশিক স্বাধীনতা দেওয়াও মিঃ গ্লাডষ্টোনের বলবতী বাসনা। আইরিস আত্ম-শাসন তাঁহার জীবন-ব্রত। এবার সুতন ও সংস্কৃত আকারে তিনি তাহার এক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপি, অদ্যাপি কমন্স-হাউস উত্তীর্ণ হইয়া হাউস-অব্-লর্ডসে উত্থিত হয় নাই। বিগত কয়েক মাস হইতে ইহা লইয়া স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দলে মুখরক্ষ লেখনীযুদ্ধ ও রসনাসংগ্রাম চলিয়াছে। আজ কাল ইংলণ্ডে, আইরিশ-আত্মশাসনকথাই প্রবল, ইহার আলোচন ও আন্দোলনে রাজনৈতিক আকাশ আচ্ছন্ন; বিলাতি সাহিত্য ইহারই সেবায় অধুনা সর্ব্বাধিক নিযুক্ত। আইরিস আত্মশাসনসমস্যায়, মুখ্য ও গৌণ ফলে, মনুষ্যজাতির অনেক মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। বৃটিশ-সিংহশাসিত অনেক রাজ্যেরই ভাবী আশা ও আশঙ্কা উহার মধ্যে নিহিত। অতএব, এদেশীয়দিগেরও উহা একবারে উপেক্ষণীয় নহে।

আইরিস আত্মশাসন বিলের স্বপক্ষে ও সানুকূল যুক্তি বিস্তর, ইহা বলাই বাহুল্য। উহার আসল ও মূল কথা, মনুষ্যজাতির স্বাধীনতা,—আপন ধনে আত্মাধিকার। এক কথায়, উহার প্রকৃষ্ট যুক্তি, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, জাতির জাতীয়তা। রাজ-নৈতিক সত্যাসত্য।

স্বার্থপরতা বলিয়ুরে, এ কথা কোন কাযেরই নয়,—ইহা প্রাকৃত,—ইহা "Platitude"। কিন্তু রাজনৈতিক নিঃস্বার্থপরতা, শাসনবৈতিক উদারতার এ কথা বটে। মিঃ গ্লাডষ্টোনের হোমরুল বিল যে সম্পূর্ণরূপে, রাজনৈতিক নিঃস্বার্থপরতাপ্রণোদিত, তাহা নহে। ইংলণ্ডের স্বার্থ অটুট রাখিয়া, আয়র্লণ্ডবাসীকে যতটা আত্ম-

শাসনাধিকার দেওয়া যাইতে পারে,—[illegible]ওয়াই এ বিলের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহাতেও প্রতিপক্ষী দল সন্তুষ্ট নহেন,—তাহারা [illegible]ধিকন্তু তুমুল তর্ক তুলিয়াছেন।

মিঃ চেম্বার্লেনের বক্তব্যাদি প্রবন্ধে [illegible] বিপক্ষদলের অভিমত মূলতঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে; আয়র্লণ্ড আত্মশাসনাধিকার প্রাপ্ত হইলে কি প্রকারে ইংলণ্ড হীনবল হইবেন, অর্থাৎ হওয়ার সম্ভাবনা, চেম্বার্লেন তাহা ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে যথেষ্ট রাজনীতিজ্ঞতার সূক্ষ্মদর্শিতা ও দূরদর্শিতা বিলক্ষণ বিদ্যমান; ইহাও স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। আইরিশ আত্মশাসন বিলের প্রতিবাদ উপলক্ষে, তিনি ইয়ুরোপীয় রাজনীতির উপস্থিত অবস্থা সম্বন্ধেও আভাস দিয়াছেন,—অতএব তাঁহার প্রবন্ধের কিঞ্চিদধিক আলোচনা আবশ্যক করিব। মিঃ চেম্বার্লেন আইরিশ আত্মশাসন বিলের নাম দিয়াছেন,—"ইংলণ্ডের কলঙ্করণ বিল"। তিনি বলিতেছেন;—"আয়র্লণ্ড যদি আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থিত কোনও স্থান হইত, তাহা হইলেও বরং তাহাকে ইংলণ্ড হইতে পৃথক করিলেও করা যাইতে পারিত; কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন, মুক্ত রাজ্য হইতে আয়র্লণ্ডকে কোন প্রকারেই মুক্ত করা যাইতে পারে না। আয়র্লণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থিতিই তাহার অন্তরায়।" মিঃ চেম্বার্লেনের এই উক্তি উপলক্ষে, স্বতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, "তাহার ও বিলের ভৌগোলিক অবস্থান ত আয়র্লণ্ডের মত নহে, তবে তাহারা আত্মশাসন পায় না কেন?" এ প্রশ্ন কেবল প্রাসঙ্গিক মাত্র, অতএব অধিক বিস্তারের আবশ্যক নাই। জানত, হয় ত, আত্মশাসনে অযোগ্য, কিন্তু বিপরও কি? তা, যাউক এ কথা—মিঃ চেম্বার্লেন বলিতেছেন;—"আয়র্লণ্ডের কোনও কালেই স্বতন্ত্র জাতীয়তা ছিল না। স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌স যে হিসাবে জাতীয়তার দাবী করিতে পারে, সে হিসাবে আয়র্লণ্ড জাতীয়তার দাবী করিতে পারেন না। ইহা ঐতিহাসিক কথা, এ কথা গ্লাডষ্টোন-সম্প্রদায়ও স্বীকার করিতে বাধ্য; স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব কোন ন্যায়ানুসারে এখন আয়র্লণ্ডকে পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব দেওয়া যাইতে পারে? আয়র্লণ্ডের সে আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য করিবার অধিকার ইংলণ্ডের আছে।"

কিন্তু মিঃ গ্লাডষ্টোন ও তদীয় সম্প্রদায় কোনও ক্রমেই স্বীকার করেন না যে, তাঁহারা আয়র্লণ্ডকে ইংলণ্ড হইতে পৃথক করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তা স্বীকার নাই করুন, প্রকৃত প্রস্তাবে আয়র্লণ্ডকে পৃথকই করা হইতেছে। বহিলে ইংলণ্ডের বল অক্ষত রাখিয়া আয়র্লণ্ডকে উচিতমাত্রায় আত্মশাসনাধিকার দেওয়া, উদারনৈতিকদিগের ন্যায়, ইয়ুনিয়নিষ্টদিগেরও অনভিমত নহে।

ইংলণ্ডের বল অটুট রাখিয়া আয়র্লণ্ডকে আত্মশাসনাধিকার দেওয়াই যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে,—হোমরুল বিলে অন্ততঃ নিম্নলিখিত দুইটি "ধারা" থাকিত; যথা—

(১) যুদ্ধকালে সমগ্র যুক্তরাজ্যের সৈনিকবল, ও অর্থবলের উপর ইম্পিরিয়াল যুটিশ পার্লামেণ্টের, এখনকার মত, সম্পূর্ণ শাসনাধিকার থাকিবে।

(২) সাম্রাজ্যের ন্যায্য ব্যয়ের ন্যায্য অংশ আয়র্লণ্ড চিরকাল দিবে।

কিন্তু এই দুইটি অত্যাবশ্যকীয় বন্ধের এ[illegible] হইবে না। আত্মশাসনী সম্প্রদায় উহার আবশ্যকতাই আদৌ অনুভব [illegible] ই[illegible] আয়র্লণ্ড ও বঙ্গের যে প্রকৃতির স্বদেশ-হিতৈষিতা, তদনুসারে এত দিন কা[illegible] হইল, [illegible] ইতিহাসই উল্টাইয়া যাইত; তাহার অনেক পৃষ্ঠা অলিখিত থাকিত, [illegible] গৌরবধ্বনি এতাদৃশ বিস্তার লাভ করিত না, তৎকর্তৃক সভ্যতার সুদীর্ঘ বিস্তার হইত [illegible] ইংলণ্ড সমগ্র জগতের মধ্যে এরূপ সর্বোচ্চ রাজনৈতিক শক্তিতে উন্নীত হইতে পারিত না।

কেহই অবশ্য একথা বলিতে পারেন না যে, ইংলণ্ড এখনও আধিপত্য-প্রতাপ পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত করিয়াছে। ইংলণ্ড এখনও উচ্চ হইতে আরও উচ্চে, উচ্চতরে উন্নীত হইবে। অপিচ, ইংলণ্ডের এই যোপার্জ্জিত-প্রাপ্ত প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে, তাহাকে প্রবল প্রয়াস পাইতে হইবে না, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? যুদ্ধ-পদ্ধতি,—বিশেষতঃ জলযুদ্ধের প্রকরণ-প্রণালী অধুনা এরূপ পরিবর্ত্তিত ও অভিনব হইয়াছে যে, ইংলণ্ডকে বহু প্রয়াসেই, সাগর-পারাবারের উপর তাহার পূর্ব্ব আধিপত্য বজায় রাখিতে হইবে।

সমগ্র ইয়ুরোপ এ মুহূর্ত্তে আপাদমস্তক সশস্ত্র, সমরার্থে সজ্জিত, কখন কি ঘটে, স্থির নাই। যুদ্ধের কারণ বিশিষ্ট বিদ্যমান,—অতি নিকট,—নিকটতর,—প্রায় সমুখের উপর। অথচ, ইংলণ্ডের স্বার্থ, ইংলণ্ডের সমর পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। সর্ব্বত্রই হৃদৃঢ়-হস্তে ইংলণ্ডকে আত্মস্বার্থ ও আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিতে হইবে। দুর্ব্বলকেই লোকে সর্ব্বাগ্রে আক্রমণ করে; অতএব উপস্থিত অবস্থায় ইংলণ্ডের সর্ব্বথা সবল, সজ্জিত-শক্তি ও সজাগ থাকা উচিত। কিন্তু, এখন প্রশ্ন এই যে, আয়র্লণ্ডকে পৃথক্‌কৃত করিলে, ইংলণ্ডের এখন যেরূপ শক্তি আছে, তখনও কি সেইরূপ থাকিবে?

সিঃ চেম্বার্লেনের বিবেচনায়, আয়র্লণ্ডবাসী আত্মশাসন প্রাপ্ত হইলে এবং আয়র্লণ্ডে স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইংলণ্ড নিশ্চয়ই হীনবল হইবেন। কিন্তু কি কি কারণে? প্রবন্ধ-লেখক যে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

আয়র্লণ্ডে পৃথক্ পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে, আয়র্লণ্ড কখনই যুদ্ধকালে ইংলণ্ডের সহায়তা করিবেন না। যুদ্ধকালে অনুকূলভাব পরিবর্ত্তে প্রবল প্রতিকূলতাই করিবেন। আয়র্লণ্ডের জাতীয় সম্প্রদায় (Nationalists) ইংলণ্ডের ঘোর বিদ্বেষী,—চিরবিদ্বেষী। এঙ্গলো-স্যাক্সন জাতিকে তাঁহারা ঘৃণার চক্ষে দেখেন। অতএব এঙ্গলো-স্যাক্সনের অবোগতিতে তাঁহারা অবশ্যই প্রীত, প্রফুল্ল হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কেবল তাহাই নহে। আবশ্যক স্থলে এবং বিপৎকালে আনুকূল্য চাহিলে, আয়র্লণ্ড সুবিধা পাইলে ইংলণ্ডকে চাপিয়া ধরিবেন। আত্মশাসনের অধিকতর অধিকার আদায় করিতে একান্ত তৎপর হইবেন,—ক্রমে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য শিকায়িত করিয়া লইবেন। পরন্তু ইহা ব্যতীত আরও কথা আছে। ইংলণ্ডবিদ্বেষী আইরিশ জাতি, যুদ্ধকালে ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? তাঁহারা গ্রেট বৃটেনের অপক্ষ না হইয়া বিপক্ষ দলে যোগ দেওয়ারই ত বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পৃথিবীর কিম্বদেশের ত্রিশক্তির কোনও বা কোনটি, গ্রেটবৃটেনের শত্রুতা করিতে, তাহাকে আক্রমণ করিতে, তাহার রাজনৈতিক শক্তি ও অস্তিত্ব লুপ্ত করিতে অগ্রসর

হইতে পারে। ফ্রান্স, আমেরিকা ও রুষিয়া;—এই তিন মহাশক্তি হইতেই ইংলণ্ডের শঙ্কা। ফ্রান্স বা আমেরিকার সহিত যুদ্ধকালে, আয়র্লণ্ড অগ্রেই যাইয়া ফ্রান্স বা আমেরিকার সহিত সংমিলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, প্রথমতঃ ফ্রান্স ও আয়র্লণ্ড এক ধর্ম্মাবলম্বী; বিশেষতঃ, পূর্ব্ব উপকারের জন্য আয়র্লণ্ড ফ্রান্সের নিকট বাধ্য। এক দিকে কৃতজ্ঞতা আর অপর দিকে চিরপোষিত শত্রুতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ। অতএব আইরিশ ইংরেজকে ছাড়িয়া ফরাসীর দিকে যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহাই ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে আমেরিকার সহিত যদি ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে, আয়র্লণ্ড আমেরিকার দিকে ত যাইবাই আছে। কারণ আয়র্লণ্ডের অর্দ্ধেকেরও অধিক এখন আমেরিকার উপনিবিষ্ট, আয়র্লণ্ডে আমেরিকার "গলাগলি" প্রসঙ্গ। তৃতীয়তঃ রুষিয়ার সহিত ইংলণ্ডের সংগ্রাম-বহ্নি প্রজ্বলিত হইলে, আয়র্লণ্ড রুষিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে কেন? মুখ্য ও সবিশেষ কারণ অবশ্য কিছু নাই; কিন্তু গৌণ ও সাধারণ কারণ বিলক্ষণ আছে। তাহা এই যে, রুষিয়ার সহিত যুঝিতে হইলে, ইংলণ্ড ইতালীর সহায়তাপ্রার্থী হইবে, সহায়তা পাইবে। ইংলণ্ড ও ইতালী মিলিত হইবে। ক্যাথলিক গোষ্ঠী-প্রসঙ্গে, আয়র্লণ্ড ইতালীর উপর পক্ষপাতী; অতএব ইংলণ্ড ইতালীকে সপক্ষে লইবা মাত্র আয়র্লণ্ড তৎক্ষণাৎ রুষশিবিরে সংমিলিত হইবে।

এরূপ অবস্থায় ঔষধ কি? মিঃ চেম্বার্লেন বলেন, ঔষধ আয়র্লণ্ডকে আত্মশাসন সমর্পণ নহে—তাহাকে সম্পূর্ণরূপে শাসিত রাখাই প্রয়োজন; কারণ তাহাই প্রকৃত ঔষধ।

The only remedy for those proceedings will be forcible suppression of the Irish Legislature and the resumption of the Government of Ireland by the Imperial Parliament.

গ্লাডষ্টোন সম্প্রদায় কেবল মনুষ্যপ্রকৃতির সৎপ্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া, আইরিশদিগের হস্তে আত্মশাসনের আরোগ্য অস্ত্র প্রদান করিতে যাইতেছেন; অভিপ্রায় এই যে, সৎপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া তাহাদিগকে আরোগ্য অস্ত্রের অপব্যবহার করিতে দিবে না। কিন্তু সে অস্ত্র যে আপনাদেরই বক্ষে আসিয়া পড়িবে, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। মিঃ চেম্বার্লেনের কথার তাৎপর্য্য এই। তিনি বলেন যে, আয়র্লণ্ডকে আত্মশাসনাধিকার দিয়া আয়র্লণ্ডের আলষ্টর-উপনিবেশী রাজভক্ত ইংরাজদিগকে আইরিশ ব্যাঘ্রের মুখে ফেলিয়া দেওয়া কোনও ক্রমেই ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে, বৃটিশ উপনিবেশে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠায় গ্রেটবৃটেনকে কষ্ট পাইতে হইয়াছে, বিপদে পড়িতে হইয়াছে,—ইতিহাস ইহার সাক্ষী। ইংলণ্ডের বিপদকালে, আয়র্লণ্ড চিরকালই তাহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে। ফ্রান্স, রুষের মনে করুন, তাহারা মেহরীর প্রতি সানুকূল, তাহারা আরবী পাশার প্রশংসা করিয়াছিল—তাহারা আবদ্দামিয়াজের আরবীকে ইংরেজদ্বেষী হইতে উৎসাহ দেয়।

গ্লাডষ্টোনের প্রাণগণের।

মিঃ চেম্বার্লেনের প্রবন্ধের সারাংশ এই। আইরিশ আত্মশাসন বিল লইয়া যে কেবল লেপনী ও জিহ্বাযুদ্ধ চলিয়াছে, তাহা নহে। ইহাতে রুষিয়া, এই বিলের প্রবর্ত্তক ও অনুষ্ঠাতা মিঃ গ্লাডষ্টোনের পদে পদে জীবনসংশয়। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এ কথার উপসংহার করিব।

ঘটনাটি অতি অল্প দিন হইল ঘটিয়াছিল। এতদ্বারা পাঠক বুঝিবেন,—রাজমন্ত্রীর বিপদ কত এবং রাজনীতির জন্য ইংলণ্ডের ইতর লোকেও কিরূপ মিশ্র হইয়া উঠে; কত দূর "মরিয়া" হইয়া কার্য্য করে।

উইলিয়ম হেনরি টাউনসেণ্ড বন্দুকের কারখানায় কারিকর,—সে সেফীল্ড নগরে কার্য্য করে। বিগত এপ্রিলের প্রথমে সে লণ্ডনে আসে ও মিঃ গ্লাডষ্টোনকে এক পত্র লেখে। তাহার পত্রখানি এই :—

April 5, 1893.

Mr. Gladstone.—Do drop that cursed Bill. Say something about it in the House to-night. I am going away into the country. You gave me such a shock yesterday looking so cheerful and happy. There was such a look of my old father. A quiet day with nature will quiet my nerves. I had never seen you before, and your appearance compelled me to raise my hat with respect. I had been waiting for you since morning. After reading the news of Saturday I left my home, wife, and little ones. If you are removed, the Bill is as dead as Queen Anne. I was in Brighton on Saturday expecting to find you. If it had not been for my sudden revulsion of feeling, nothing could have saved either of us yesterday. I could have fired six shots before any one laid a hand upon me. I will give you another chance. I have a strong opinion of your cleverness, and I firmly believe that, if you will it, that Bill will become law in spite of Salisbury, Balfour, Chamberlain, and the Lords. But it shall not if by taking one life, or two—yours and mine—hundreds and perhaps thousands of loyal Ulstermen will be saved. Surely that would be sufficient justification. I shall look anxiously at to-morrow's papers for an answer.—W. H. Townsend.

এই পত্রের খামের উপর মিঃ গ্লাডষ্টোনের সেক্রেটরীকে সম্বোধন করিয়া লোকটা লেখে,—

The Secretary who opens this letter and decides not to show it to the old man will injure his master and Secretary who opens this letter and decides not to show it to the old man will be inflicting and injury upon him.

এই পত্র লেখার পর টাউনসেণ্ড, সুযোগ পাইয়া পত্রে উল্লিখিত নিজের প্রতিজ্ঞানুসারে মিঃ গ্লাডষ্টোনকে গুলি করে। গুলি ব্যর্থ হয়। টাউনসেণ্ড ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হয়। অনেকেই বলিতে পারেন, টাউনসেণ্ড উন্মাদ। হাঁ, রাজনৈতিক উন্মাদ বটে।

সাইকিন্ সেঞ্চুরীর তৃতীয় রাজনৈতিক প্রবন্ধে বিলক্ষণ চিন্তাকর্ষক। ইহাতে মিশরে খেদিব ও লর্ড ক্রোমার।

মিশরের ইংরেজ রাজনীতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সহ, তথাকার বিগত কয়েক মাসের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়া, মিশরের খেদিবের সহিত বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড ক্রমারের সংঘর্ষের কারণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রবন্ধের লেখক মিঃ উইলফ্রেড ব্লাণ্ট। মিঃ ব্লাণ্ট বলেন যে, মিসর সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ইংরেজ সাধারণ্যে যে সকল কথা সর্ব্বদা প্রকাশিত হয়, সে সমস্তই এক পক্ষের জবানী কথা। অপর পক্ষের

প্রকৃত কথা, অর্থাৎ মিসর ও মৈশবিদিগের মর্ম্মকথা আদৌ অব্যক্ত। মিঃ ব্লাণ্ট তাহারই কতক আলোচনা করিয়াছেন।

মিঃ ব্লাণ্ট মিসরপ্রবাসী ইংরেজ। মিসরে ইংরেজশাসন তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, স্বয়ংবিদ্ধ হইয়া সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মিসরে ইংরেজ শাসন আপাততঃ কিয়ৎপরিমাণে আবৃত হইলেও, মিসরকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করাই, মিসরে ইংরেজ রাজনীতির সঙ্কল্প। মিসরবাসী স্বভাবতঃই এ গতির যথাসাধ্য প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পায়; সুতরাং ইংরেজ নৈসরে সংঘর্ষ। পক্ষান্তরে, ইংরেজের শাসন বা রক্ষণাধীনে মিসরে (এক ইথিওপিয়া ভিন্ন) কোনও উন্নতিই হয় নাই ও সর্ব্ব প্রকারেই তাহার অবনতি হইতেছে। ইংরেজ শাসনে মিসরবাসী মর্ম্মান্তিক আলাতন হইয়াছে। তদ্দ্বারা তাহাদের জাতীয় অবসাদন হইতেছে। একটা স্বাধীন জাতি, জাতীয় অবসাদ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, সুতরাং স্বজাতীয় স্বার্থরক্ষাপে মিসরে স্বদেশহিতৈষীদিগের জাতীয় দল গঠিত হইয়াছে। মিসরবাসী-মাত্রেই এই দলের অন্তর্ভুক্ত ও অনুগত। কারণ, ইংরেজ আস্তে আস্তে মিসরবাজের ও মিসররাজ্যের সমস্ত স্বত্বাধিকার একে একে গ্রাস করিতেছেন। মিসরের স্বদেশহিতৈষী দল ইহার প্রহরা দেয়, ইহার প্রতিঘাত করে, ইহা নিবারণ করিতে প্রয়াস পায়; সুতরাং ইংরেজের নিকট মিসরবাসী মন্দ। মিসরবাজ খেদিব তীক্ষ্ণবুদ্ধি, স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রিয় যুবক। কিন্তু তিনি এত দিন স্বদেশহিতৈষী দলভুক্ত ছিলেন না। তিনি ইংরাজী বা ইংরাজ দলেও ছিলেন না। তিনি অন্তের অলক্ষ্যে নিজে সকলকেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। লর্ড ক্রোমার,—মিঃ ব্লাণ্ট বলেন,—ভ্রমবশতঃই বুঝিয়াছিলেন যে, খেদিব তাঁহার পকেটস্থ, তিনি খেদিবকে যে দিকে ফিরাইবেন, খেদিব সেই দিকেই ফিরিবেন। কিন্তু অতঃপর ক্রোমারের ভ্রম সপ্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। খেদিব এখন স্বদেশহিতৈষী দলভুক্ত; তিনি তাঁহার মন্ত্রী নিয়োজনকল্পে সম্প্রতি সম্যক্ স্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছেন; কাজেই লর্ড ক্রোমার চটিয়াছেন,—প্রমাদ গণিতেছেন।" মন্ত্রীঘটিত ব্যাপার মিটিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু বিষ কাটে নাই।

মিসরে ইংরেজ শাসনসম্বন্ধে মিঃ ব্লাণ্ট অনেক কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি তথায় ইংরেজ প্রবর্ত্তিত আইন ও ইংরেজী প্রণালীর বিচারসম্বন্ধে বলিতেছেন,—

মিসরে ইংরেজ শাসন।

The whole London Press and Parliament seem to have swallowed the astonishing fable of our heaving reformed Egyptian Justice. We have reformed it only in the sense of having turned it topsy-turvy. In 1884 we abrogated the old law which was a good law and only wanted better administering and which the people understood and respected; and we introduced a hybrid monstrosity bred I know not by what male parent out of the Code Napoleon. This has upset the whole idea of legal right and wrong in the native mind and has caused a general demoralisation among them which is noticible in increased crime and an absolute distrust of law as having any connection with justice or fair dealing. The native courts have become a paradise of swindling rogues, lawyers, touts and

false witnesses. The Judges do not understand the Law themselves, nor are they any longer kept in check, as has always been the case even in the worst governed Eastern Countries, by public opinion, which understood the right and wrong of their decisions. No poor man,—such at least,—my experience—seems to have the smallest practical chance of getting justice from the courts and to think any longer of the law as a possible remedy for wrong.

পাঠক মিসরীয় আইন আদালতের সহিত ভারতীয় আইন আদালতের তুলনায় সমালোচনা করিতে পারিবেন। ইংরেজের আইনে সর্ব্বত্রই বিচারপ্রণালী একই রূপ,—বিচার বহুব্যয় সাপেক্ষ, আইন অবোধ্য, ও আদালত, উকীলে, জুয়াচোরে, মিথ্যাসাক্ষী, মোক্তার ও দালালে পরিপূর্ণ হয়, ইহা বিচিত্র বটে। অন্ততঃ এ সম্বন্ধে ভারত ও মিসর একই রূপ, দেখা ও জানা যাইতেছে।

মিসরে কোরাণপাঠের বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে; গ্রাম্য পাঠশালার দার রুদ্ধ, মসজিদ ধ্বংসমুখে পতিত; মিসরের সর্ব্বত্র মদের দোকান বসিয়াছে। মিঃ ব্লাণ্ট লিখিলেন;—

Every year adds to the sum of native degradation. Is it to be wondered at then if honest and good citizens are all on the side opposed to us?

বর্ষ্যারম্ভ সংখ্যায় উত্তর আমেরিকার পক্ষীজাতিসম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। কিন্তু দুই দুইটা জীবন রাজনৈতিক প্রবন্ধের পর, উত্তর আমেরিকার পক্ষীজাতির কথা পাড়িয়া, এই পচা গ্রীষ্মের দিনে আর আমরা পাঠককে পালাবে ফেলিব না। তবে কি না, উত্তর আমেরিকার পক্ষী কিছু প্রেমিক বেশী, প্রণয় করিতে, পরিণয় ঝুলাইতে, তাহারা বড়ই তৎপর, তাই কেবল সেই কথাটাই বলিতেছিলাম। পাশ্চাত্য মনুষ্যজাতির ন্যায় পাশ্চাত্য পক্ষীজাতিও কোর্টসিপ করিয়া প্রেম করে। পাশ্চাত্য যুবকযুবতী যেমন বলে, পিকনিকে ও পার্টিতে পরস্পরে প্রেম করেন, যথাক্রমে প্রণয়িনী ও প্রণয়ী পছন্দ করেন ও করিয়া কোর্টসিপের কোটায় উপস্থিত হন,—পাশ্চাত্য পক্ষীরা, বিশেষতঃ উত্তর আমেরিকার বিহঙ্গবিহঙ্গীরা ঠিক সেইরূপ পার্টী পিকনিকে ও পক্ষীর "সঙ্গে" প্রণয় করে,—প্রণয়পাত্র ও প্রণয়পাত্রী পছন্দ করিয়া লয়। এজন্য সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ বসন্তসমাগমে বিহঙ্গকুলের বৈঠক বসে। এবং সেই বৈঠকে, অন্যান্য আমোদ প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়ের ইসারা ইঙ্গিতও আদান প্রদান চলিতে আরম্ভ হয়। ঠিক মানুষমানুষীর মত লাবণ্যগত স্ব স্ব রুচি প্রবৃত্তি অনুসারেই পক্ষী পক্ষিণীরা প্রণয় করে। তাহাদের রূপতৃষ্ণা অবিকল মানুষের মত, তাহাদের রূপপ্রদর্শন-স্পৃহাও সেইরূপ।

In the early spring [illegible] the cock birds begin to utter their love calls, and their plumage becomes gradually developed into fulness and beauty.

The cocks' love calls are soon followed by demonstrations of more decisive and often very remarkable character. These are chiefly of three kinds, named respectively, "strutting" "drumming" and "dancing."

পুনশ্চ,—

It is a pleasing and interesting sight to watch the male courting his mate uttering at the same time *low cooing notes*, and strutting along the coy female in the most stately manner possible, bowing his head, making his obeisance to her while a handsome bird at all times, he certainly looks his best during this love-making period.

বসন্তের আরম্ভেই পারাবত তাহাদের প্রণয়-ডাক ডাকিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে তাহাদের পক্ষ ও পুচ্ছ বিশিষ্টরূপ বিকশিত হয়; তাহাদের রূপলাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে।

মোরগের প্রণয়-ডাক, অধিকন্তু প্রেমের অধিকতর প্রগাঢ় লক্ষণ প্রদর্শন করে। প্রথমে তাহাতে প্রণয়িনীকে লক্ষ্য করিয়া, প্রণয়িনীর মন হরণ করিবার জন্য "পেকম" করে; পক্ষপুট ও পুচ্ছ বিস্তার বা বিকাশ করে; প্রণয়িনীকে প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করে; কখনও পুচ্ছ উচ্চ, কখনও নিম্ন করে, কখনও বাঙ্কে, কখনও বাঁকা করে; হেলিয়া দুলিয়া, খেলিয়া, কটাক্ষ করিয়া, কণ্ঠ কাঁপাইয়া, সুস্বরে কণ্ঠধ্বনি করিয়া, প্রণয়িনীর মনোযোগ আকর্ষণ করে; মন হরণ করিবার প্রয়াস পায়। সে চঞ্চুপুট বাজাইয়া বাদ্য করে, পক্ষপুট প্রচ্ছন্ন করিয়া অর্দ্ধাবৃত করে,—নানা রকমে রূপ প্রদর্শন করে. শুশ্রূষার পরিচয় দেয়।

পাটরিজ শুধু ডাক করিয়া গান গায়; কক্ক, কোমল মৃদুস্বর মধুর করে,—তাহার লজ্জাবনতমুখী প্রণয়িনীকে প্রেম সম্বোধন করে, তাহার প্রণয় প্রার্থনা করে। মস্তক অবনত করিয়া প্রণয়িনীর গ্রীবা পক্ষস্পর্শ করে, যেন বলে,—"দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

কেমন? ঠিক মানুষের মত কি না? মানুষমানুষীর মত বিহঙ্গবিহঙ্গীর "কোর্টসিপ" বাঁসিবাও যায়, কোথাও কোথাও বা পূর্ব্বরাগ পরিণয়ে পরিণত হয়। ঘর-সংসার ও অপত্য-উৎপাদনও তাহারা নরনারীর মত করে। পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসারে তাহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ অর্থাৎ "ডাইভোর্স"ও হয়। কিন্তু অধিক বলিতে গেলে আমাদের—"পুঁথি বাড়ে।"

শ্বাসক্রিয়া।

মেজর জেনেরেল ফ্রেসর তাঁহার "The art of Breathing" নামক প্রবন্ধে,—নিজে নিজদেহে প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন যে, অতিরিক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাস্থ্যকর। কিন্তু এ দেশে পূর্ব্বাপর যে সংস্কার প্রচলিত আছে, তাহাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়োগই কেবল স্বাস্থ্যকর নহে,—মোক্ষপ্রদ। মেজর জেনারেল দেখাইয়াছেন যে, মিনিটে তিন পাঁইট অক্সিজেন গ্রহণ ব্যতীত মনুষ্যজীবন টিকিতে পারে না।

মিসরে-ইংলণ্ড।

নিউ রিবিউ,—মার্চ। মিঃ এডওয়ার্ড ডাইসি মিসরকে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করার পক্ষপাতী। তাঁহার বিবেচনায়, এ সম্বন্ধে, বৃটিশ মন্ত্রী ও রাজনৈতিকদিগের অচিরাৎ কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত, নহিলে "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট" হইবে। মিঃ ডাইসি,—এই সংখ্যায় প্রকাশিত, তাঁহার মিসর বিষয়ক প্রবন্ধে এই মর্ম্মে বলেন, ইংলণ্ডের 'ইতস্ততঃ নীতি'তে মিসরের অবনতি ঘটিতেছে, অতএব ঘোর-টার ভিতর মুখ লুকাইয়া শাসন করা আর উচিত হইতেছে না। মুখের আবরণ খুলিয়া ইংলণ্ড

মিসর সম্বন্ধে যাহা হয় একটা কিছু শীঘ্রই করিয়া ফেলুন। মিঃ ডাইসি মিসর-অধীকরণের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াও মিসরে এখন যেরূপ ভাবে বৃটিশ শাসন চলিতেছে, তাহার আদৌ অনুমোদন করেন না, তদ্দ্বারা মিসরবাসীর ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই হইতেছে। তাহা, তাঁহার বিবেচনায় পুরাতন বোতলে নূতন সুরা রাখার সমতুল্য। একটি আরব্য রূপক উদ্ধৃত করিয়া তিনি উপসংহার দিয়াছেন যে, "যখন বানর ঘোড়ায় চড়িয়া চলে, তখন বিজ্ঞ লোকেও তাহার সম্মুখে মৃত্যু করে, কিন্তু বানর ঘোড়া হইতে নামিলে সে যে বানর সেই বানর"—মিসরে ইংরেজ-শাসনও ঠিক এইরূপ। ইংরেজ মিসরে ঘোড়ায় চড়িয়া আছেন, (অর্থাৎ মিসর শাসন করিতেছেন) কাজেই মিসরবাসী বিজ্ঞ হইলেও, আর বিজ্ঞ বলিয়াই, তাঁহার তাঁবেদারি করিতেছে; নহিলে তাহারা তাঁহাকে বানর বলিয়াই বুঝে। মিঃ ডাইসির এই উপমা কতটা যথার্থ, বলিতে পারি না। তবে এপ্রিল সংখ্যা "নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরীতে" মিঃ উইলফ্রেড ব্লাণ্ট মিসর-শাসনসম্বন্ধে যে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছেন,—মিঃ ডাইসি, অপর পক্ষের ও বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক হইলেও, তাহা প্রকারান্তরে সমর্থন করিয়াছেন। মিঃ ব্লাণ্ট লিখিত প্রবন্ধের সার-সংগ্রহ যথাস্থলে দেওয়া হইয়াছে।

জর্জ্জ মেরিডিথ প্রসিদ্ধ 'নবেলিষ্ট'। তাঁহার মতে, নবেল লিখিতে, নবেলিষ্টের অভিজ্ঞতা বড় বেশী আবশ্যক নয়,—কল্পনাই যথাসর্ব্বস্ব। অনেকেরই সাধারণতঃ বিশ্বাস এই যে, A man can write best of the things he knows best. অর্থাৎ যিনি যে বিষয় ভাল জানেন, সেই বিষয়েই তিনি ভাল লিখিতে পারেন। কিন্তু জর্জ্জ মেরিডিথ এই সাধারণ বিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলেন, উহা কোনও কাজের কথাই নয়।

জর্জ্জ মেরিডিথ—কবি-কল্পনা।

মিঃ ব্রেডবিক ডলম্যান (৯ম প্রবন্ধ) বলেন,—জর্জ্জ মেরিডিথ তাঁহার উপরি-উক্ত অভিমত অনুসারেই যে সর্ব্বদা কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা নহে; কেন না, তাঁহার নবেলে কল্পনার ন্যায় অভিজ্ঞতারও অনেক পরিচয় আছে। উদাহরণ, তাঁহার রাজনৈতিক নবেল *Beauchamp's career*। সম্প্রতি জর্জ্জ মেরিডিথ *Journalist* অর্থাৎ "সংবাদপত্র-লেখক" নামে, এক নবেল লিখিতেছেন। ইহা অতি শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে। মিঃ ডলম্যান লেখেন যে, এই নবেলে মেরিডিথ তাঁহার সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতা ব্যবহার ও প্রদর্শন করিবেন না, ইহা কে বলিবে, কে বিশ্বাস করিবে?

আমাদের অভিমত।

মিঃ ডলম্যানের তর্কে, আমাদের বিবেচনায় মেরিডিথের অভিমত খণ্ডন হইতেছে না। মেরিডিথ জ্ঞানাভিজ্ঞতা ব্যবহার করিতে একেবারেই যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা নহে, এবং তিনি নিজে তাহা কখনও ব্যবহার করিবেন না, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার "থিওরি" হইতে প্রকাশ পায় না। তিনি বক্ষ্যমাণ বিষয়ে অভিজ্ঞতাকে উচ্চ স্থান দেন নাই, এই মাত্র। নবেলকাব্যে,—কবির কার্য্যে তিনি কল্পনাকেই অধিকতর কার্য্যকারিণী বুঝিয়া, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

জর্জ্জ মেরিডিথ এক সময়ে সংবাদপত্রসম্পাদক ছিলেন, সম্পাদকতা বহুদিনাবধি করিয়া

ছিলেন; সংবাদপত্রের লেখকও ছিলেন। জর্জ মেরিডিথ সম্পাদক ও জর্জ মেরিডিথ নবেলিষ্ট, একই মেরিডিথ দুই ক্ষেত্রে, দুই ব্যক্তি;—অথবা একই ব্যক্তির দুই রূপ অভিন্ন;—রহস্য কিছু বিচিত্র। জর্জ মেরিডিথের যশঃসূর্য্য যখন উদিত হয় নাই, উদয়োন্মুখ হইয়াছে, উদয় হইবে, তিনি তৎকালে যুগপৎ একখানি সংবাদপত্র সম্পাদন করিতেন ও আর একখানি সংবাদপত্রে লিখিতেন। তিনি সম্পাদক ছিলেন, ইণ্ডউইচ্ জর্ণালের। তা' ছাড়া, মধ্যে মধ্যে তিনি সামাজিক ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতেন।

সম্পাদক ও নবেলিষ্ট।

সাহিত্যসেবকগণ প্রায়ই ভালো লোক হয়েন না; না হওয়াই উচিত। রাজনীতিই হউক আর যাহাই হউক, কোনও বিশ্বাসের বা সম্প্রদায়ের, তাঁহারা অন্ধ অনুবর্ত্তী হয়েন না। জর্জ মেরিডিথ কোনও দলেরই গোঁড়া রাজনৈতিক ছিলেন না, এবং নহেন। কিন্তু তথাচ তিনি কোনও কালেই রক্ষণশীল বা 'টোরী' রাজনৈতিক নহেন। তিনি উন্নতিশীল অর্থাৎ উদারনৈতিক দলভুক্ত লিবারেল রাজনৈতিক। অথচ তিনি রক্ষণশীল "টোরী" সংবাদপত্র 'ইণ্ডউইচ জর্ণালের' সম্পাদকতা করিতেন। তাঁহার উদারনৈতিক আসক্তি ও অভিমত সত্ত্বেও, তিনি প্রতি সপ্তাহে রক্ষণশীল রাজনীতির সমর্থক ও স্বার্থ-উদ্দীপক বড় বড় প্রবন্ধ ও 'কলম কলম' 'প্যারা' লিখিতেন। অনায়াসে আত্মগোপিত উদারনৈতিক অভিমতের খণ্ডন করিতেন; উদারনৈতিক সংস্কারের উপর খড়্গহস্ত হইয়া তাহার প্রচণ্ড প্রতিবাদ করিতেন। তাঁহার প্রবন্ধাদিতে আন্তরিকতার অভাব বা অন্ন বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের চিহ্নও কিছু মাত্র পরিলক্ষিত হইত না। আবার এই সময়ে, তাঁহার বন্ধু, বান্ধব আত্মীয় স্বজনগণ, প্রকাশকের ইচ্ছা ও আদেশ মত নবেল লিখিয়া অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিবার অনুরোধ করিলে, তিনি সে অনুরোধে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। তিনি নিজের অনুরাগ, আসক্তি ও অভিমত উপেক্ষা করিয়া, কোনও রূপেই 'ফরমাসী' কাব্য সাহিত্য লিখিতে স্বীকৃত হইতেন না। অথচ সংবাদপত্রের বেলায় প্রতি মুহূর্ত্তে আত্মানুরাগের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া, আত্মাভিমত বলিদান দিয়া, রক্ষণশীল টোরীপত্রের সম্পাদকতা করিতেন; তাহাতে প্রবন্ধ প্যারা লিখিতেন। ঘটনা বিলক্ষণ বিচিত্র ঘটে; কিন্তু আশ্চর্য্য নহে।

জর্জ মেরিডিথ ও রাজনৈতিক সংবাদপত্র।

মিঃ জোন্সবাস, জর্জ মেরিডিথের এই আত্মবিরোধী চরিত্রবৈচিত্র্যে কিছু বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন; ইহার সামঞ্জস্য করিতে সমর্থ হন নাই, সে বিষয়ে বড় বেশী প্রয়াসও পান নাই। কিন্তু জর্জ মেরিডিথের এই চরিত্র-বৈচিত্র্য সহিতের বিস্ময়কর বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আর তিনি তাঁহার সেই আত্মবলিদানে (যদি সত্যসত্যই "বলিদান" হয়) প্রত্যবায়ভাগী হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, সংবাদপত্রসম্পাদনে সম্পাদকের নিজের অভিমত, সংবাদপত্রের অভিমতেই ডুবাইতে হয়। সম্পাদক নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন না,—সংবাদপত্রের অভিমতেরই ঘোষণা করেন। জর্জ মেরিডিথ তাহাই করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব বা অভিমত ডুবিয়াছিল বটে,—কিন্তু সবিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিলে, তাহা অন্যায় নহে। কোনও সাম্প্রদায়িক পত্রের সম্পাদকতা করা না করা, তাহাতে লেখা

বা না লেখা বতন্ত্র কথা; কিন্তু সংবাদপত্রসম্পাদকের ও লেখকের কিছুমাত্র ব্যক্তিত্ব নাই,—না থাকাই উচিত,—সংবাদপত্রের ব্যক্তিত্বই প্রবল। সংবাদপত্রসম্বন্ধে আমরা যত দূর জানি, ও যতটুকু বুঝি, তাহাতে ইহাই সমীচীন পদ্ধতি বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু সম্পাদকের সম্পাদকতা উকিলের ওকালতি বলিয়া কেহ বুঝিবেন না,—উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত বিশেষত্ব আছে; অর্থ মেরিডিথ কোনও বিষয়েরই অবিশ্বাসী ছিলেন না বলিয়াই, সকল বিষয় সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন।

"জাতীয়তা" ও "জাতীয়" শব্দ, জাতি শব্দ হইতে উৎপন্ন হইলেও, জাতি ও জাতীয়তা অর্থাৎ Nation ও Nationality, প্রকৃত প্রস্তাবে এক প্রকার অর্থজ্ঞাপক নহে। অতএব এই সংখ্যা নিউ রিবিউর ৮ম প্রবন্ধের লেখক মিঃ জে, পি, মাহাফী জাতি কিসে হয়। এরূপ বিবেচনা করেন না। What is a Nation "অর্থাৎ জাতি কি?" এই প্রশ্ন করিয়া, অনেক বিচার-বিশ্লেষণের পর মিঃ মাহাফী তাহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায়,—একবংশীয় ও একজাতীয় লোকের সমষ্টি হইলেই জাতি হয় না; একধর্মাবলম্বী লোক হইলেও একজাতি হয় না। একভাষা-ভাষী হওয়াও জাতি নহে। জাতি ভৌগোলিক অবস্থিতির উপরও নির্ভর করে না। এক রাজার অধীনস্থ ও এক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও জাতি হয় না। একই সমাজ, একই শাস্ত্র, একই ভাব, একই অভাব সাধারণ হইলেও, মানুষ একজাতি বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না। প্রবন্ধলেখক প্রাচীন ও নবীন ইতিহাস হইতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

একবংশ হইলেই একজাতি হয় না; যেমন কাফ্রীরা একবংশোদ্ভূত, কিন্তু একজাতি নহে; ইহুদিদিগকেও আর একটা জাতি বলা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, ইংরেজ একই বংশ হইতে উদ্ভূত নহে,—বহুশতের বীজে গঠিত, অথচ একজাতি। বহু বংশ ও বহু বর্ণ একজাতি হইতে বিশেষ বাধা দেয় না।

একভাষা-ভাষী হইলেও একজাতি হয় না;—কেন না; গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জর্ম্মনি প্রভৃতি এক একটি জাতির এক একটি রাজ্য, অথচ গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স ও জর্ম্মনিতে বহু বহু ভাষা প্রচলিত আছে। পক্ষান্তরে ইতালীতে একই ইতালীয় ভাষা (ভিন্ন ভিন্ন আকারে) প্রচলিত থাকিলেও, ইতালীয়গণ ফ্রান্স জর্ম্মানি প্রভৃতির প্রাচীন ও পরিপক্ক জাতীয়তার হিসাবে একজাতি নহে।

একধর্মাবলম্বী হইলেও একজাতি হয় না; কারণ পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতিসমূহ কোথাও একধর্মাবলম্বী নহে।

জাতি ভৌগোলিকও নহে; যেহেতু দেশের ও রাজ্যের সীমার সংযোজন ও পরিবর্ত্তন হয়, অরসবাজ্যে তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। নেপোলিয়ন কি সমগ্র য়ুরোপকে একজাতিতে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন? জর্ম্মনি কি প্রুশিয়ার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে এক জাতি ছিল না? বেলজিয়মও অনেক কাল হইতেই একটি বিশিষ্ট ও গৌরবান্বিত জাতি; বেলজিয়ম বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া কি হল্যণ্ড দুই জাতি হইয়াছে?

লোকে এক রাজার অধীন, এক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও একই রাজনীতির দ্বারা শাসিত

হইলেই কি তবে এক জাতি হয়? না, তাহাও নয়। উদাহরণ, ভারত সাম্রাজ্য, আমেরিকার রিপাব্লিক।

জাতি জাতীয়তায় নহে, বংশে নহে, ভাষায় নহে, ধর্ম্মে নহে, ভাবে অভাবে ও অনুরাগেও নহে; সমাজে ও শাস্ত্রেও নহে; জাতি ভৌগোলিক নহে; রাজনৈতিকও নহে। উহা এই সকলেরই সমষ্টি।

এপ্রিল সংখ্যা কন্‌টেম্পোরারী রিবিউতে সাহিত্যাচার্য্যের সবিশেষ আলোচনীয়,—প্রবাসী পণ্ডিত হিমোলাইট টেইন-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। ইংরেজি সাহিত্যের অমর ইতিহাসলেখক মুশো টেইন এদেশীয় ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজে, অন্ততঃ ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসলেখকরূপে, সুপরিচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক মুশো মেত্রিয়েল মরণ করেন যে, টেইন ও রেনাঁর মৃত্যুতে ফরাসীরাজ্যের সাহিত্যমুকুট খণ্ডিত হইয়াছে।

টেইন ও রেনাঁ।

টেইন ও রেনাঁর মস্তিষ্ক ছিল, এক এক খানি সুবৃহৎ "এন্সাইক্লোপিডিয়া," জ্ঞানবিজ্ঞানের এক একখানি প্রকাণ্ড কোষ। টেইন এবং রেনাঁ উভয়েই মনীষী, মৌলিক চিন্তার আবাসস্থল ছিল; উভয়েই মৌলিক ভাবে চিন্তা করিতেন; উভয়েই স্ব স্ব মতে আপন আপন বিজয় মৌলিকতা অঙ্কিত করিয়া, তাহার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁরা উভয়েই য়ুরোপীয় উপস্থিত যুগের শিক্ষক ও অধ্যাপক। ইহাঁরা উভয়েই অনুন্নতবংশীয় প্রজাতান্ত্রিক মধ্যবৃত্ত গৃহস্থসন্তান। উভয়েই সাংসারিক ক্লেশকুক্ষের বক্ষের উপর লালিত পালিত। উভয়েই স্ব স্ব প্রতিভাবলে প্রতিপালিত,—জীবনের যাবতীয় অন্ধকারই ইহাঁরা প্রতিভালোকে উজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। ফরাসী সাহিত্যের আর তিন জন মহাপুরুষ,—সেণ্টব্রাভ, তিইর হুগো ও লামার্টিনের ন্যায় ইহাঁরা উভয়েই শৈশবে পিতৃহীন ও মাতা কর্ত্তৃক লালিত পালিত ও শিক্ষিত হন।

টেইন ও রেনাঁ উভয়েই বৈজ্ঞানিক;—বিজ্ঞানের উপাসক ও উপাচার্য্য; বৈজ্ঞানিক সত্যে স্বতঃ অনুরক্ত। বিজ্ঞান উভয়েরই ব্রত; বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার ও প্রচার উভয়েরই লক্ষ্য। টেইন, অতি নিশ্চিত, সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত ও প্রতিপাদিত প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যতীত আর কিছুই বিশ্বাস করেন না; তাহার ন্যূন ও তাহার অতিরিক্ত এক পদও অগ্রসর হয়েন না,—এক বিন্দুও গ্রহণ করেন না; এক বিন্দুও সত্য বলিয়া অনুমানও করেন না; অলোচ্য ও বর্জ্জনীয়ের মধ্যেই আনেন না। টেইন প্রতিপাদিতের ও প্রতিপাদ্যের অধিকারের মধ্যেই আবদ্ধ; তিনি বিজ্ঞানের "এলাকা" ছাড়াইয়া কিছুতেই অনুমানের ও অজ্ঞাতের রাজ্যে গমন করেন না। কিন্তু রেনাঁ তাহা করেন। রেনাঁ বিজ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়াও বিজ্ঞানাতীত বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি অনির্দ্দিষ্ট, অনবধারিত, অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্যের রাজ্যেও বিচরণ করেন। রেনাঁর কল্পনা তাঁহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা-গবেষণার বহু উপরে উড্ডীয়মানা হয়। রেনাঁ অনেক সময়েই তাঁহার আত্ম যুগ অপেক্ষা উচ্চে উঠেন। রেনাঁর মত অনেক সময়েই কিয়ৎপরিমাণে পক্ষপাতে আত্ম-বিরোধী; তজ্জন্যই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখীগণ রেনাঁকে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মতাবলম্বী লোক বলিয়া দাবী করিতে পারেন।

টেইন ও রেনাঁর।

ইদানীং ইংরেজী সাহিত্যের আদর আধিপত্য বাড়িয়াছে। কিন্তু বিগত শতাব্দে য়ুরোপে, ইংরেজি সাহিত্য একটা গণ্যের মধ্যে ছিল না; প্রায় নগণ্যের মধ্যেই ছিল। তখন আদর আধিপত্য ছিল, ফরাসী ভাষার ও ফরাসী সাহিত্যের। শিক্ষিত

ফরাসী সাহিত্য। লোক মাত্রেরই ফরাসী জানা আবশ্যক হইত। যিনি সুমার্জ্জিত ফরাসী ভাষা না জানিতেন,—ফরাসী সাহিত্যে যাঁহার অধিকার না থাকিত; তিনি কদাচিৎ শিক্ষিতের মধ্যে গণ্য হইতেন। মধ্য যুগের আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপর ফরাসী ভাষায় শিল্প, বিজ্ঞান, কাব্য, নাটক, ধর্ম্মাদি বিবিধ বিদ্যা আলোচিত হইয়া ও তত্তৎ বিদ্যায় নব নব আবিষ্কার উদ্ভাবিত হইয়া, ফরাসী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে।

পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে ফরাসী সাহিত্যের প্রচুর প্রভা দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য

সাহিত্যের যুগ-বিভাগ;— সাহিত্য তিনটি যুগে বিভক্ত হইতে দেখা যায়; যথা "ক্লাসিক", "রোমান্টিক" ও "সায়ান্টিফিক" যুগ। এই তিন যুগের তাৎপর্য্য, অতি স্থূল

যুগের অর্থ। অর্থে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রাচীন ভাষায় লিখিত সাহিত্যের ও সাহিত্যাচার্য্যদিগের ও প্রাচীনকালের শিল্পী ওস্তাদদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীর অনুকরণ ও অনুসরণই "ক্লাসিক"। মধ্যকালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে যত দিনাবধি প্রাচীন নিয়মাবলী অনুকৃত হইয়াছিল, তত দিন তাহাদের ক্লাসিক কাল, অর্থাৎ প্রাচীনানুসারী সাহিত্যযুগ। ক্লাসিকের পর রোমান্টিকের আরম্ভ। রোমান্টিকের অর্থ,—প্রাচীনদিগের পথ ও নিয়মাবলী হইতে অল্পবিস্তর অবসরগ্রহণ ও এ কালের বুদ্ধি, কল্পনা ও রুচি অনুসারে শিল্প সাহিত্যাদির স্বাধীন সৃষ্টি। রোমান্টিকের পর সায়ান্টিফিক অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক যুগে, শিল্পসাহিত্যাদি সমস্ত বিদ্যা ও সংসারের সর্ব্ববিধ বস্তুকে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তকরণ; রোমান্টিকের কল্পনাবও পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। এখন য়ুরোপে বৈজ্ঞানিক যুগ চলিতেছে।

ফ্রান্সে ১৮২০—৫০ রোমান্টিক যুগ, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাল "ক্লাসিক"। ১৮৫০ সালের পর হইতে বৈজ্ঞানিক যুগের আরম্ভ। টেইন বৈজ্ঞানিক যুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক ও প্রতিনিধি। রোমান্টিক, ক্লাসিকের প্রতিঘাত। পণ্ডিত মৃতপ্রায় প্রাচীন রীতির পল্লিত গলিত নিয়মাবলীর নিয়ত একঘেয়ে অনুকরণে, অর্থাৎ ক্রমাগত ক্লাসিকের চর্ব্বিতচর্ব্বণে সাহিত্য প্রাচীন প্রণালী, পদ্ধতি ও সংস্কৃতে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ হইলে, একান্ত অসার ও যৌলিকতাবিহীন হইয়া পড়ে। সংস্কৃতরচনায় অধঃপতনের সময় এ দেশে যেরূপ ঘটিয়াছিল, অবস্থাটা প্রায় ঠিক সেইরূপ। লম্বা লম্বা পদ, সন্ধি ও সমাসের আড়ম্বরে রচনা ভারাক্রান্ত; পদের ঘটা আর ছন্দের ছটাই

তাহার একমাত্র সম্বল, ক্লাসিক কালের অন্তকালে সাহিত্য অন্তঃসার-

ক্লাসিক ও রোমান্টিক। শূন্য, অর্থহীন, ও অনুকরণের অভিদূষিত ইতরতাব্যাপক হইয়া উঠে। কথার কারিগরি ও অন্যের নকল করাইবার কৌশলেই যখন সাহিত্য পর্য্যবসিত হয়, এতাদৃশ অবস্থার প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী। অতএব রোমান্টিক রীতির এই সময়ে আবির্ভাব। রোমান্টিক প্রচলিত হইয়া সাহিত্যের ও অপরাপর শিল্পের স্বাধীনতা পুনরুজ্জীবিত করে। মৌলিকতার আদর বজায় রাখে এবং লেখক ও পাঠকদিগের রুচি

প্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত করে। সাহিত্যে চিন্তাস্রোত পুনর্ব্বার সচল ও সবল করে; রচনার জীবনী-শক্তি পুনঃসঞ্চারিত করে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সাহিত্যের সমস্ত অভাবের বিমোচন হয় নাই, তদ্দ্বারা সাহিত্যের সম্যক্ প্রয়োজনের পরিপূরণ হয় নাই। রোমান্টিকের প্রধান অসম্পূর্ণতা, তাহাতে বৈজ্ঞানিক একতার অভাব। অতএব সাহিত্যাংশে তাহার কার্য্য, অনেকটা অনুরাগ ভাবাভাবের উপরেই সংস্থাপিত। কেবল কবি-কল্পনার অত্যুচ্চ উচ্ছ্বাসে, সাহিত্যের ও শিল্পের দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু রোমান্টিক তাহাই করিতে তৎপর, অসাধ্যসাধনে অভিলাষী হয়। ইহা পুরাতনের স্থলে অথবা নূতন অনুকরণের ও আলঙ্কারিক অভাব বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া তাহা সজীব রাখিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং স্বভাবতই উহার পতন হয়। রোমান্টিক সম্বন্ধে যুর্গো মোরস লিখেন,—

With its superficial electicism, it was lacking in its confused syncriticism unity of action, in definiteness of aim, in organic principle. It had replaced conventions by new conventions, the antiquated rhetoric of the classic writers by a rhetoric which from the first day seemed also faded; it had fallen, in its turn, into vague declamation and noisy commonplace; and it had made the fatal mistake of supposing that efforts of imagination and flights of fancy could take the place of serious study and acquired knowledge, and that the secret things of history and the human heart could be got at by guess work and delineated by the clever sweep of the brush. Its philosophy, at the same time, had fallen into utter helplessness, while obstinately refusing the fresh impulsion of the spirit of research which was even then creating a new science of nature of man, and re-laying the experimental bases of psychology.

রোমান্টিকের পতনের পর, ফ্রান্সে সাহিত্যক্ষেত্রে যে বৈজ্ঞানিকযুগের আরম্ভ হইয়াছে,—মর্ম্ম বলেন, টেইন তাহার দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক ((Philosopher and theorist) মেরিমি, সেণ্ট বেভে, অগষ্ট কোমৎ প্রভৃতি ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বার্ত্তাবহ। বেলেস নিয়ার, সিলেট, বার্সিও লেগেঞ্জ ও অন্যান্য শিল্পীগণ ইহার ফল। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের, কাব্যের, দর্শনের ইতিহাস ও উপাখ্যানের উপাসক এবং উপাচার্য্য ভিক্টর হুগো, সিসলি, হেবিডিয়া, বোম, কৌলস্ হুবার্ট, জোলা এবং টেইন। অগষ্ট কোমতের প্রত্যক্ষবাদপ্রসূত বৈজ্ঞানিক পরিমাণ-প্রণালী,—কেবল, তত্ত্ববিদ্যায় নহে, ঐতিহাসিক সাহিত্যে নহে,—কাব্যে,—নাটক নবেলেও এখন প্রচলিত।

Alike in poetry and plastic arts we find the same striving after technical accuracy, the same effort to come to closer terms with nature, to adhere more strictly to the historic verity. The novelists, whether they are describing the present or reanimating the past, become scrupulous in their observation of life and manners and enacting in their demands for positive evidence.

আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের গতি কোন স্রোতে চলিয়াছে, উপরি-উদ্ধৃত বিবৃতি হইতে

পাঠক অনুধাবন করিবেন। সবত্র করাসী সাহিত্যে ও শিল্পে এখন বিজ্ঞানের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ, যাথার্থিক সত্য ও ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধান, ও প্রত্যক্ষ প্রমাণাকাঙ্ক্ষা ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। কি দার্শনিক, কি কবি, কি ঐতিহাসিক, কি ভাষ্যকর, কি চিত্রকর, কি নাটককার, কি নবেলিষ্ট, সকলেই সমভাবে তত্ত্বজ্ঞ তৎপর তটস্থ, স্ব স্ব কার্য্যে তাহাদের তত্ত্ব উদ্ঘাটনে নিযুক্ত।

করাসীসাহিত্যে বিজ্ঞান বিপ্লব।

টেইন বৈজ্ঞানিক লেখকদিগের মধ্যে অধিকতর বৈজ্ঞানিক। তিনি বৈজ্ঞানিক যুগের সবিশেষ প্রতিনিধি। মনর বলেন,—He was emphatically the representative of his epoch and of his moment. টেইনের থিওরি অনুসারে, প্রতিভা তিন শক্তিতে প্রস্ফুট হয়। জাতি, কাল ও অবস্থাবস্তী কারণ। মনর বলেন, এ "থিওরি" অবথার্থ হইতে পারে, অযথার্থ বলিয়া অনেকে ইহাকে উপহাসও করিয়া থাকে, টেইন নিজেই তাঁহার থিওরির প্রত্যক্ষ প্রমাণস্থল। তাঁহার প্রতিভা বিশ্লেষণ করিলে, তাহার মূলে উহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হয়।

টেইনের থিওরি।

টেইনের 'প্রণালী' পূর্ণমাত্রায় বৈজ্ঞানিক, তাঁহার বচনার প্রত্যেক পদে গণিত শাস্ত্রের প্রগাঢ় সূক্ষ্ম হিসাব,—অ্যানিলিষ্ট পরিমাপ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মনর বলেন,—টেইনের রচনা রসহীনা নহে।

তিনি শিল্পীর চক্ষে স্বভাব সন্দর্শন করিতেন ও ইতিহাস অধ্যয়ন করিতেন। তিনি বর্ণ এবং আকারের সন্নিবেশ আবশ্যকতা বুঝিতেন ও তাহা উপভোগে সমর্থ ছিলেন। তাঁহার, সৌন্দর্য্যানুভবশক্তি, ভাবুকতা ও শিল্প সাহিত্যে অলঙ্কারপ্রিয়তা সন্নিবেশ বলবতী ছিল। তাঁহার রচনাসৌন্দর্য্য প্রায় চিত্রপটের ন্যায়। তাহা চিত্রের ছায়ালোক ও চিত্রকরের চারু স্পর্শে সুশোভিত। কিন্তু তাঁহার কল্পনা স্বপ্নাবেশের লেশমাত্রবিরহিত। তাহা যাথার্থিক বৌদ্ধবৎ প্রখর, নিরেট, অবয়ববিশিষ্ট ও বর্ণযুক্ত।

ইহা বিচিত্র বটে। গণিতবিজ্ঞানের নীরস প্রশমায় সহিত কাব্য-সৌন্দর্য্যের স্বপ্নাবেশ-বিহীন, কল্পনার কুহকাভাবিহীন, এই কোমল সমাবেশ বিচিত্র বই কি? টেইন একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, নৈয়ায়িক, ঐতিহাসিক, কবি, চিত্রকর ও সমালোচক। তিনি গণিতে প্রখর পণ্ডিত, মনস্তত্ত্ববিদ্যায় বিশারদ গ্রন্থকার। টেইন-কৃত ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস অদ্বিতীয়।

কিন্তু টেইনের রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে এমিয়েল মনরের মতাবলম্বী নহেন। এমিয়েল সুপ্রসিদ্ধ করাসী সমালোচক। তিনি বলেন;—

টেইনের রচনা পাঠ করিতে আমার শরীরে কেমন যাতনাময়ী উত্তেজনা উপস্থিত হয়। তাঁহার লেখার ভিতর হইতে কেমন যেন কলকব্জার টানাটানি, মেসিনের কল্‌কব্জার বাহির হইতে থাকে; এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারের গন্ধ নির্গত হয়। তাঁহার টেইন ও এমিয়েল। রচনা অবশ্য বৈজ্ঞানিক, সুন্দর পারিভাষিক পদ-পূর্ণ, তাহা হইতে যেন নিষ্করুণ রসায়ন বিজ্ঞান নির্গত হইতেছে। উহা নীরস, কঠিন, তীক্ষ্ণ,

বর্ণভেদী, প্রখর,—অত্যন্ত আবৃক্ষনশীল। উহাতে কোমলতা, মনোহারিতা, মনুষ্যত্ব, উদারতা, সৌন্দর্য্য ও প্রীতি স্ফূর্তির অভাব। উহা কর্ণ এবং হৃদয়কে ভটস্থ করে। উহা যেন গলা টিপিয়া ধরে, বাতাস বাহির হইয়া যায়, দীর্ঘ করিয়া শ্বাস রুদ্ধ করে। তাঁহার নীতি দর্শন ও সাহিত্য-রীতির কঠোরতা,—তাহার রচনায় এই ক্লেশসঞ্চারণের কারণ। তৎপ্রবর্ত্তিত মনোবিজ্ঞানের মনুষ্যজাতির প্রতি প্রয়োগ ঘৃণা-প্রণালী হইতে, এ যাতনা উদ্ভূত; আর উদ্ভূত সাহিত্যে তৎকৃত সাহিত্যের পরিতাপিক প্রচণ্ডতা হইতে। টেইনের গ্রন্থপাঠে বিস্তর শিক্ষা লাভ হয়, কিন্তু দেহের ভিতর হইতে যেন প্রাণ বাহিরিতে থাকে। উহা যেন ঝলসায়, শুষ্ক করিয়া ধরে,—মন প্রাণ কাতর করে। টেইন কখনও উদ্দীপ্ত করেন না, কেবল ক্লান্ত করেন। এই কল বার্কিনী-কৃত সাহিত্যই, বোধ করি, ভবিষ্যতে প্রচলিত থাকিবে। ঐক প্রণালীর সহিত ইহার বিষম বিপরীত সম্বন্ধ। উহা "জীবনের" পরিবর্ত্তে বীজগণিত প্রদান করে, মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সঙ্কেত দেখায়,—উহা সুখ-সম্ভোগের পরিবর্ত্তে, সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থিত করে; উহা স্বপ্নাবল্যের আনন্দের পরিবর্ত্তে,—চুলীবিকাশিত চোরার বাষ্প-ধোঁয়ে দেহ পূর্ণ করে। উহাতে কাব্য-কবিতার বিলয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদের বিজয়।

উপরি-উদ্ধৃত রচনাভঙ্গীতেই স্বতঃই সন্দেহ হয় যে, এবিষয়ের সমালোচনা অভ্যুক্তি বিহীন নহে। কিন্তু তবুও, বৈজ্ঞানিক সাহিত্য-প্রণালী যে খুব কঠোর, ইহাও নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ যাহা বিজ্ঞানের অতীত, তাহাতেও কিন্তু বৈজ্ঞানিকের অনুরাগ থাকা আবশ্যক। টেইনের সে অনুরাগ একেবারেই ছিল না, ইহা বলা বড় কঠিন। কিন্তু তদীয় গ্রন্থাবলীতে সে অনুরাগের অত্যন্ত অভাব। জড়-জীব-বিজ্ঞান যতই উন্নত হউক না, জীবনধারণের জীবনীশক্তি,—জড়ের আভ্যন্তরিক সত্তা,—সে বিজ্ঞানের অতীত, বীজ হইতে অঙ্কুর, পল্লব হইতে মুকুল; মুকুল হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল যে আভ্যন্তরিক অজ্ঞাতশক্তি সঞ্চারে উৎপন্ন হয়, তাহা বিজ্ঞানে অনিণীত, বিজ্ঞান তাহার বিশ্লেষ করিতে পারেন না; বুঝিবারই শক্তি নাকেন না। তাহা মনুষ্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা রহস্যময়, প্রকৃতির নিগূঢ় গৌরবময়,—সেই অজ্ঞাত, অজ্ঞাতব্য অস্তিত্ব টুকু, তত্ত্বজ্ঞানে, তাঁহার সমগ্র রচনাবলীতে, তাহার সত্তা স্বীকৃত নাই, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত করা নাই। এই কারণেই,—তৎকৃত গ্রন্থাবলী কঠোর, দুরূহ, সৌকুমার্য্যের আকর্ষণ-বিহীন, তৎপ্রকাশিত মনোভাবমাত্রই অমনোরম। তাঁহার নিরাকরণ নৈয়ায়িকসুলভ যুক্তি তর্কে পাঠকের প্রাণ কাঁপে, অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে।

আমাদের মন্তব্য।

টেইন মনুষ্য-শরীরের অভ্যন্তরে,—তাহার হৃদয়ে ও মনে আর কিছুই দেখিতে পান না; দেখিতে পান, কেবল একটি দুরন্ত জানোয়ার,—একটি সভ্য, অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য জন্তু,—একটি 'অ্যানিমল' Animal, Human animal বা মানব জানোয়ার। বিবিধজাতীয় মানব জানোয়ারের বিবিধ তথ্য জানিবার ও জানাইবার জন্য, টেইন ইতিহাস অধ্যয়ন ও প্রণয়ন করেন। তিনি তাহাদের আকার, প্রকার, হস্ত পদাদানুসারে তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করেন। যে শ্রেণীর মনুষ্য জানোয়ার

মনুষ্য-জানোয়ার।

তাহার শ্রেণীর অনুকূল শৃঙ্খলানুসারে সমষ্টিক কার্য্য করে, তিনি কেবল তাহাদেরই প্রশংসা করেন।

মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে এই বিষম অভিমত ও মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে অসুকূলতির অভাব-সত্ত্বেও টেইন সম্যক প্রকারে সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। সরল, জ্ঞানশীল, উদার, অনাপরায়ণ, অনাধিক,—পবিত্র, পুণ্যশীল, প্রকৃতপ্রস্তাবে টেইনের মত ধর্ম্মাত্মা লোক, ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যেই বা কয় জন আছেন? সর্ব্বোপরি টেইন সত্যপ্রিয়। তাঁহার ন্যায় সত্যপ্রিয় লোক বস্তুতই সংসারে বিরল। সত্যের জন্য তিনি সংসারের সুখ ও সুখ্যাতিলাভই বলিদান দিতে পারিতেন।

টেইন, কেমন লোক?

১৮২৮ খৃঃ অব্দে টেইনের জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি পিতৃহীন হন। মাতার তত্ত্বাবধানে তাঁহার শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। উনিশ বৎসর বয়স অবধি প্যারিস নগরে, শিক্ষা ও শিক্ষার সূচনা পাইয়া, বৃত্তি বৎসর বয়ঃক্রমে, টেইন Ecole Normale বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এই বিদ্যালয়ে ফরাসী সাহিত্যের ভাবী মহাপুরুষদিগের অনেকেই শিক্ষিত হইতেছিলেন। সকল সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে, শ্রেষ্ঠত্বে টেইন সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। দর্শনশাস্ত্রের উপাধিপরীক্ষাতেও তিনি আদ্য-শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু এই দর্শনশাস্ত্রেই স্বাধীন ধার্ম্মিক মত পোষণা-পরাধে তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়।

টেইনের জীবনী,—ও তাঁহার গ্রন্থাবলী।

অতঃপর স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া প্যারিসে আসেন। "প্রাইভেট টিউসন" করিয়া "ব্যাচেলোরের" দিন গুজরান হয়। এই সময়ে টেইন প্রাকৃত-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, তাঁহার বিবেচনায়, ধার্ম্মিক পণ্ডিতের পক্ষে, এ অধ্যয়ন অপরিহার্য্য। ১৮৫৩ অব্দে, তাঁহার ফরাসী সাহিত্যসম্বন্ধীয় প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। পর বৎসর পুস্তকাকারে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ অব্দে তাঁহার "পিরানিস-ভ্রমণ" প্রকাশিত হয়। "উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী ধার্ম্মিক পণ্ডিত-সম্প্রদায়" বলিয়া আর এক পুস্তক ঐ বৎসরেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

এখন টেইন বিখ্যাত সমিতিভুক্ত লোক। সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তাঁহার প্রবন্ধ পাইবার জন্য বড় বড় সংবাদ ও সাময়িকপত্রের সম্পাদক ও অধ্যক্ষিকারীগণ উদ্যত। "রেভিউ ডেস ডো মাণ্ড" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পত্রে টেইনের বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার পাণ্ডিত্যে লোকে বিস্মিত হইল। খ্যাতি প্রতিপত্তি দিগ্‌দেশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল।

১৮৬৩ সালে টেইনের অক্ষয়কীর্ত্তি "ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস" প্রকাশিত হয়। এখন তাঁহার সময় হইল,—অটল। জীবনে জ্যোৎস্না হাসিল। পৃথিবী হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। টেইন সংসারে সুখী হইলেন। উপযুক্ত পাত্রীতে তাঁহার বিবাহ হইল। সৌভাগ্য লক্ষ্মীর সুহাসিতে, সমস্ত সংসারই হাস্যময় হয়। অন্ধকারের মধ্য হইতেও আলোক-রেখা ছুটিয়া আসে। শত্রুপক্ষও অতঃপর আত্মকৃত পূর্ব্ব ত্রুটী সংশোধনার্থে টেইনকে বাক্যপ্রদান

প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হওয়ার ক্ষতিপূরণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে প্রফেসর ও পরীক্ষকের পদ প্রদান করিলেন।

টেইনের প্রথম কয়েক খানি মাত্র গ্রন্থের নাম মাত্র আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বহু বিষয়ে, বিবিধ ও বহু গ্রন্থ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তিন খানি গ্রন্থ, যথা "ইন্‌টেলি-জেন্স" (Intelligence) নামক দর্শনশাস্ত্র, "ইংরাজী-সাহিত্যের ইতিহাস" ও The Sources of Contemporary France নামক তৎসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ এক প্রকাণ্ড কাণ্ড। ইহারা সাহিত্যজগতে এক অত্যুচ্চ অবস্থানী "মনুমেণ্ট।" শেষোক্ত গ্রন্থখানি এত বৃহৎ যে, তাহার সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহে বড় বড় বার খণ্ড বই হইয়াছিল। বিগত মার্চ্চ মাসে টেইনের মৃত্যু হইয়াছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। "পদব্রজে" একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। লেখক পদব্রজে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে 'লছমনঝোলা' দেখিতে গিয়াছিলেন,—বর্ত্তমান প্রবন্ধ সেই যাত্রার কৌতুকজনক বিবরণ। স্থানে স্থানে বর্ণনা বড় মনোহর ও ঘটনা ঔপন্যাসিক। লেখক চলিত ভাষা বেশ লিখিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু স্থানে স্থানে চলিত ও সাধুভাষার সংমিশ্রণ বিচুড়ির মত বোধ হয়, ও কাণে কেমন অদ্ভুত রকম শুনায়। মোটের উপর প্রবন্ধটি পড়িয়া বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "সামকৌতুক" কৌতূহলের উদ্দীপক ও মনোহর হইয়াছে। "মনুষ্য পুত্রকন্যাদিগের হয় (১) বাহ্য নৈসর্গিক পদার্থের নানানুসারে, অথবা (২) আধ্যাত্মিক গুণের নানানুসারে, অথবা (৩) মানব-উপজীবিকা-সূচক নানানুসারে, অথবা (৪) দেবতার বা (৫) সাধু পুরুষের নানানুসারে নাম, অথবা (৬) সংযুক্ত নাম রাখে।" ১ম—চন্দ্র, সূর্য্য, গোলাপ প্রভৃতি; ২য়—দয়া, শান্তি, ক্ষমা প্রভৃতি; ৩য়—Mr Smith, Mr Carpenter প্রভৃতি, ৪র্থ ও ৫ম—কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা, Moses ইত্যাদি, ৬ষ্ঠ—সংযুক্ত নাম—যথা,—Jhon carpenter, James Smith প্রভৃতি। "ইংরাজদিগের মধ্যে নৈসর্গিক বাহ্য পদার্থানুসারে নাম, মনের উপ-জীবিকা-বৃত্তি অনুসারে নাম, এবং সাধুপুরুষদিগের নাম অধিকতর প্রচলিত দেখা যায়। হিন্দু-দিগের মধ্যে বাহ্য নৈসর্গিক পদার্থের, দেবতা ও সাধু পুরুষদিগের নামানুসারে, ও আধ্যাত্মিক গুণের নামানুসারে নাম অধিক পরিমাণে প্রচলিত দেখা যায়। হিন্দুদের মধ্যে মানব-উপজীবিকা-সূচক নাম অতি বিরল; ইংরাজদের মধ্যে চলিত আছে। কিন্তু ইংরাজদের মধ্যে আধ্যাত্মিক গুণের নামানুসারে নাম নাই। হিন্দুদের মধ্যে আছে।" লেখক বলেন,—"ইহার দ্বারা হিন্দু-দিগের ধর্ম্মানুরাগ বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।" "ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদিগের মধ্যে দেবতার নামানুসারে নাম রাখার প্রথা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে" দেখিয়া, লেখক স্থির করিয়া-ছেন যে, "ইহাতে তাঁহাদিগের জাতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসের শিথিলতা প্রমাণিত হইতেছে।" তার পর লেখক মহাশয় বাঙ্গালা মাসের ইংরাজি, ও ইংরাজী মাসের বাঙ্গালা অনুবাদ সহ, দুটি

তালিকা দিয়াছেন,—Mr. Wood—কাঠ বাবু, সত্য বাবু—Mr Frouth. এক একটি অতি প্রাচীন হিন্দু নাম ইয়ুরোপখণ্ডে ব্যবহৃত হয়। যথা, বাক মন্ত্রট, দেবদত্ত, (Issche, Mammat, Diodati) অষ্ট্রেলিয়ার একজনের নাম আছে, Bosisto,—বশিষ্ঠ। লেখক তাঁহার এক বন্ধুকে স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীটের দোকান হইতে ঐ বশিষ্ঠ সাহেবের মার্কার তৈল কিনিয়া ব্যবহার করিতে অনুরোধ করায়, তিনি অবাক্ হইয়াছিলেন। লেখক বাঙ্গালীদের "মেবেলী" নাম রাখার বড় বিপক্ষ, মলিনীকান্ত, মোহিনীমোহন, মোহিনীমোহন, রমণীমোহন প্রভৃতি অনেক নামের শেষ বর্ণটি বাদ দিলে, তাহারা মলিনী, মোহিনী, মোহিনী, রমণী হইয়া যায়, এবং পুরুষের নাম মেবেলী হইলে সত্য সত্যই খারাপ শুনায়। লেখক আর একটি নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন,—"অন্যান্য হিন্দু অথবা বৌদ্ধ দেশ হইতে, উত্তম নূতন নাম সকল গ্রহণ করা আমাদের বঙ্গদেশে এক্ষণে, আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যথা, বিনায়ক, ধর্মপাল, গুণবন্ত, গুণশেখর, সুমঙ্গল প্রভৃতি।" শ্যামদেশের এক রাজকুমারীর নাম ছিল—"কুমারীরত্ন।" সেই নামের লেখক তাঁহার এক আত্মীয়বালিকার ঐ নাম রাখিয়াছেন। এক শ্যামরাজকুমারের নাম আছে "বস্তিসোভন,"—লেখকের অনুরোধসত্ত্বেও, তাঁহার নিকটসম্পর্কীয় এক বালকের পিতামাতা, কটুনটে বলিয়া ছেলের নাম "বস্তিসোভন" রাখেন নাই। অনেক বাঙ্গালী, ছেলেমেয়ের ইংরাজী নাম রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন;—এটা বোধ করি, যাঁহারা ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখেন, তাঁহাদের দলেই আরম্ভ হইয়াছে। দিন কতক পরে উইলসন চৌধুরী, ম্যাক্‌কার্সন মুখুয্যে প্রভৃতি শুনিলে নিতান্ত চকিত হইব না। "মাইকেল মধুসূদন" ত গা-সহা হইয়া গিয়াছে। "কোন্নগর-নিবাসী কোনও ব্যক্তি তাঁহার কন্যার নাম 'ভিক্টোরিয়া ক্রিম' রাখিয়াছেন।" এই ব্যক্তি ইংরাজী নাম রাখিয়া সখ ও রাজভক্তি, উভয়ই চরিতার্থ করিয়াছেন,—এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন, দেখিতেছি। লেখকের আর এক হিন্দু বন্ধু কন্যার নাম রাখিয়াছেন, রমলা—Romola জর্জ এলিয়টের এক উপন্যাসের নাম। আমরা একবার এক নিমন্ত্রণস্থলে একটি বালকের নাম শুনিয়াছিলাম 'বিপদ চন্দ্র'—ছেলের বাপ বোধ করি পেট্রিয়ট্ ছিলেন। "বিপদচন্দ্র" কিন্তু কিছু দুষ্ট; তাহা দেখিয়া আর এক জন নিমন্ত্রিত বলিতেছিলেন,—"ও নামটা বদলাইয়া 'লিটনচন্দ্র' না করিলে মানাইবে না।" হাইকোর্টের এক জন সেকেলে সর্ব্বজনপ্রিয় ইংরাজ জজ বাঙ্গালীদের বড় ভালবাসিতেন,—তিনি তাঁহার মেয়েদের বাঙ্গালা নাম রাখিয়াছিলেন,—'কামিনী', কি আর কিছু। দীর্ঘনামের প্রতি বৃদ্ধ লেখকের কিছু বিতৃষ্ণা, "পদ্মলিনীমিত্র-নবা" তাঁহার অপছন্দ। অনেকে জাতিবিচার হইতে নাম রাখেন, যেমন "রেশা।" অনেক আদরের নাম চিড়িয়াখানার আমদানী, যেমন—'টুসটুসী।' অনেকের নাম আবার "জল সমুদ্র নদী" হইতে গ্রহণ করা হয়; যেমন,—'সাগর'—বলিয়া রাখা উচিত যে, বঙ্কিম বাবুর "দেবী চৌধুরাণী" বাহির হইবার আগে এক পাড়াগেঁয়ে ধনশালী আহুরে মেয়ের এই নাম রাখিয়াছিলেন। দিন কতক বঙ্কিম বাবুর নায়কনায়িকার নামে নাম রাখিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল,—কিন্তু ইদানী বঙ্কিম বাবু খুব জব্দ করিয়াছেন,—'সীতারাম' 'রেমাহাতী' আর একালে চলিতেছে না।—"নাম সম্বন্ধে অনেক লেখা যাইতে পারে," —বাহুল্য ও অবান্তরবশতঃ লেখক তাহাতে অক্ষম। এই জন্য তিনি এসম্বন্ধে যিনি যা জানেন,

লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা তাই দুই একটা কথা নায়কৌতুকের সঙ্গে চালাইয়া দিলাম। আশা করি আর কেহ নূতন নায়কৌতুকের অবতারণা করিবেন। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের পাণ্ডিত্যপূর্ণ "মৃন্ময়ী সমালোচনা" এ সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। গ্রন্থকার সবিনয়ে তাঁহার সমালোচনা শেষ করিয়া আমাদের সুখী করিয়াছেন। "শিক্ষা সঙ্কট" একটি উপাদেয় প্রবন্ধ,—এখনও শেষ হয় নাই। 'কল্যাণীমন্দির' ক্ষুদ্র গল্প;—গল্পটি পড়িয়া আমরা সুখী হইতে পারি নাই। কিরণ সিংহ এক যুবকপুত্র যুবক,—গৃহে তাহার বৃদ্ধা জননী রোগশয্যায়। বঙ্গদেশে তখন দুর্ভিক্ষ; লোকে অনাহারে মরিতেছিল। কিরণের এক হাতী ছিল, তাহারই নাম 'কল্যাণী'। কল্যাণীর দুগ্ধ দিয়া কিরণ তাহার মাতার কথঞ্চিৎ রক্ষা করিত; এবং কতকটা বৃত্তজ্ঞতা ও কতকটা ভালবাসার সহিত হাতীকে পালন করিয়া আসিতেছিল। ক্রমে দুর্গাবিপতি দুর্জ্জয়সিংহের কাণে গেল,—লোকে না খাইয়া মরিতেছে, আর কিরণ মানুষের আহার্য্য দিয়া একটা হাতী পুষিতেছে। অমনই হুকুম হইল,—সে আজ কিরণকো,'—যেমন বলা,—অমনই হুকুম তামিল হইল,—কিরণকে বিচারার্থ রাজসভায় ধরিয়া আনা হইল। দুর্জ্জয়সিংহ কিরণের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেই দিয়াছেন, অমনই "দুর্গাময় অকস্মাৎ কোলাহল জাগিয়া উঠিল,—ভিড় ঠেলিয়া অসংখ্য লোক প্রবেশ করিয়া ধরাধরি করিয়া কি একটা বৃহদাকার জিনিস সেই সভার মাঝখানে হুমড়ি করিয়া ফেলিয়া দিল। সকলে সভয়ে বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল,—একটি ছিন্নশির বৃহদাকার বন্য হাতী। কেহ তাহার অর্থ কিছু বুঝিল না—কিন্তু কিরণসিংহ তাহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সহসা একবার চীৎকার করিয়া থামিয়া গেল, নীরবে তাহার নেত্র দিয়া দরদর ধারা বহিতে লাগিল।" যেই দরদর ধারা বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, অমনই আবার আর একটা কোলাহল, তার পর সুরথসিংহ নামক এক জন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ও দুর্জ্জয়-সিংহের পরাজয়,—কিরণসিংহের মুক্তি ও সুরথের সেক্-সহরে পড়া,—এবং অবশেষে "বণজীরের প্রান্তবর্ত্তী মহলানদীর তীরে কিরণসিংহ কর্ত্তৃক "কল্যাণীমন্দির" নামে একটি মন্দির নির্ম্মাণ; সেই মন্দিরে "প্রস্তরময় বেদীর উপর এক প্রস্তরময়ী হাতীমূর্ত্তি।" এখনও সেই মন্দির মহলা-তীরে বর্ত্তমান আছে।—ইতি গল্প শেষ। কিন্তু কথা এই যে, করুণরসাত্মক বিষয় হইলেই করুণ রস জমে না। ইতর প্রাণীর বিষয় লইয়া, কবাসী লেখক 'পিয়ের লোটি' কেমন চমৎকার করিয়া করুণরসের অবতারণা করিয়াছেন, বর্ত্তমান গল্প-লেখক লোটির 'Death and pity' নামক বহিখানি পড়িলে তাহার আভাস পাইবেন। করুণরসের অবতারণায় লেখকের হাত থাকিলে গল্পটি সুন্দর শ্রী ধারণ করিত।

সাধনা। জ্যৈষ্ঠ। এবারকার সাধনার প্রথম ও প্রধান প্রবন্ধ "খণ্ডগিরি"। লেখক স্বভাব সুলভ উৎসাহের সহিত উৎকলের তদানীন্তন প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজের একটি অতি মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "একই পাহাড় সাধারণতঃ খণ্ডগিরি নামে অভিহিত—মধ্যে কেবল একটিমাত্র নিম্ন পার্ব্বত্যপথ ব্যবধান হইয়া এই গিরিখণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, নাম হইয়াছে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি। বহু পুরাতন দিনে স্বাধীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এইখানে তপোবনে থাকিয়া নিভৃতে ধর্ম্মালাপে কালযাপন করিতেন। তখনও ভূবনেশ্বর সহর তুলিয়া উঠে নাই এবং একাম্রক্ষেত্রে শিব আসিয়া বাস করেন নাই; একদিকে যবনগিরি অনতিদূর জনস্থানের

গিরিদেশে অশোকের শাসনলিপি স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, অন্য দিকে বিবিধ অবয়বশীর্ষ পাষাণে নীলাদ্রিশ্রেণীর উন্নত প্রাচীরে দৃষ্টি প্রতিহত হইত, সম্মুখে ভূকৈলাসের স্থানে কুটীর-প্রাসাদ-সমাচ্ছন্ন বৌদ্ধ লোকালয়—প্রতি প্রভাতে সেইখানে গিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সন্ন্যাসীরা ভিক্ষান্ন ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেন। পথগিরি গুহায় গুহায় পরিপূর্ণ। মানবের বুদ্ধি পাষাণ কাটিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র গিরিখণ্ডকে আপন বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে—তলার উপর তলা, ঘরের পর ঘর, বাহারের বিচিত্র আকারের গিরিকর্ত্তিত স্তম্ভ এবং স্তম্ভের শিরোদেশে ব্র্যাকেটাকার উন্নতবক্ষ নারীদেহ পাষাণ-হারভার বহন করিতেছে। বৌদ্ধ রাজা ও রাণীরা সন্ন্যাসীদিগের জন্য অব্যয়ে এই সকল চারু শিল্পখচিত গুহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখনও রাণীগুম্ফা একজন বৌদ্ধ রাণী-সন্ন্যাসিনীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। বৌদ্ধ যাজকেরা পথগিরির শিখরদেশে দাঁড়াইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গম্ভীর স্বরে সঙ্ঘ ধর্ম্ম ও বুদ্ধের শরণমন্ত্র ধ্বনিত করিতেন; গিরিপ্রাঙ্গণ হইতে মধুর নিনাদে সান্ধ্য ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইত; তাহার তালে তালে উপত্যকে উপত্যকে একটা মহা আনন্দ জাগিয়া উঠিত। ধবলগিরিশৃঙ্গ হইতে অপর সন্ন্যাসীর দল এই উৎসব-আনন্দে যোগদান করিতেন; সেখান হইতেও সঙ্ঘ ধর্ম্ম বুদ্ধ নাম উত্থিত হইয়া দিগ্-দিগন্তরের শৈলশিখরে প্রতিধ্বনিত হইত। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তখন উড়িষ্যায় ধর্ম্মগুরু। কর্ম্মফলবাদ যত বলে দুষ্কৃতের বল দুঃখ অনিবার্য্য, দুর্ব্বল মানবহৃদয় সান্ত্বনা মানে না—দুর্ব্বলতাকে দমন করিতে না পারিলেও দুঃখ হইতে সে অব্যাহতি চায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দেখিলেন, জ্ঞান সর্ব্বসাধারণকে সান্ত্বনা দিতে অক্ষম, তাহাতে লোকে নিরাশ হইয়া পড়ে। তাঁহারা সহজ বিধি দিলেন, যাজকমণ্ডলীসমীপে দুষ্কৃত স্বীকার করিলেই পাপ হইতে মুক্তি। মুক্তিলাভের সহজ উপায় দেখিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে এই পথ অবলম্বন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীরা মাথাজপের ব্যবস্থা দিলেন, আত্মনিবেদনের অনুষ্ঠান প্রতিপন্ন করিলেন এবং স্থলবিশেষে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রও দিতে লাগিলেন, এইরূপে স্পষ্টতঃ না হইলেও নিঃশব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানমার্গচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণের তন্ত্রজালে জড়িত হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ্যের সহিত ধর্ম্মিতাবৃদ্ধি সহকারে প্রাচীন বৌদ্ধ সফলতা বিলুপ্ত হইয়া আসিল। এবং ব্রাহ্মণ্য যখন যথাযথক বৌদ্ধাচারকে নীয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে আপত্তি করিল না, তখন এদেশে বৌদ্ধ মতের বিশেষ সার্থকতা রহিল না—বৌদ্ধধর্ম্ম দেশান্তরিত হইয়া গেল। যেখানে যেখানে বৌদ্ধ মঠ ছিল, ব্রাহ্মণ মঠধারী সিয়া সেখানে শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করিলেন। স্থানে স্থানে বৌদ্ধ মঠে হিন্দু দেবদেবীরও প্রতিষ্ঠা হইল। পথগিরিও বাদ গেল না। গণেশ আসিয়া একটি গুহা অধিকার করিয়া বসিলেন। এবং গিরিপাদমূলে বাসা বাঁধিয়া বৈষ্ণব বাবাজী একবার হইতে বৌদ্ধ মূর্ত্তির হিন্দু নামকরণ শুরু করিয়া দিলেন।" "ভারতবর্ষে" তৃতীয় প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। "বরাবরস্ পর্ব্বতের আহ্বে লেখিয়ো" সিংহলবাসী বৌদ্ধদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন," বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। এই বরাবরী শ্রবণকারী কেমন উদার ও নিরপেক্ষ ভাবে বৌদ্ধভাবের ছবি আঁকিয়াছেন! আর এক জন বৈদেশিক, মিসেস্ গর্ডন কমির, তাঁহারই "সিংহলজগতে" বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন;—তাঁহার পক্ষপাতদুষ্ট অনুযায়, সঙ্কীর্ণ মতের সহিত এই মুক্তহৃদয় উদার বরাবরীর অভিমতের কত অন্তর।

জ্যৈষ্ঠ মাসের "নব্যভারত" আষাঢ় সংখ্যার সঙ্গে বাহির হইবে। "অনুসন্ধান" আর আমাদের হস্তগত হয় নাই,—ব্যাপার কি?

বৈদিক প্রবন্ধ।

৩

ঋগ্বেদের সময়ে গোহত্যার প্রথা প্রচলিত ছিল কি না।

পাঠকদিগকে পুনর্ব্বার সাবধান করা আবশ্যক মনে করি যে, আমরা কেবল ঐতিহাসিকতত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত। গোহত্যার দোষদর্শন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

যাঁহারা বলেন, ঋগ্বেদরচনাকালে গোহত্যা প্রথা প্রচলিত ছিল, হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহাদের মতের যে একবারে কোনও পোষক প্রমাণ পাওয়া যায় না, এমন নহে। অনেক স্থলে এরূপ লিখিত আছে যে, সত্যযুগে "গবালম্ভ" অর্থাৎ গো-বধ প্রচলিত ছিল, কলিযুগে তাহা রহিত হইয়াছে; সুতরাং সত্যযুগকে বেদ-প্রচারের সময় বলিয়া গণ্য করিলে, বেদরচনাকালে—এবং যে ঋগ্বেদ সচরাচর সকল বেদ হইতে প্রাচীন বলিয়া গণ্য হয়, তাহার রচনাকালে,—গোহত্যা প্রচলিত ছিল, অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তদ্ভিন্ন কেহ কেহ বলেন যে, তখন ঋষিরা গরুকে হত্যা করিয়া আবার জীয়াইয়া দিতেন। বলা বাহুল্য যে, এই বালোচিত কথায় এক্ষণে অল্প বিবেচক লোক সায় দিবেন। ভবভূতির ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিও স্বীয় নাটকে বসিষ্ঠকে গোমাংস ভোজন করাইয়াছেন,—এবং অতিথি আসিলে গোমাংস দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন করা হইত—ইহারও কোনও কোনও স্থলে আভাস পাওয়া যায়। ফলতঃ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পশু-যাগের ইতিহাসে অতি প্রাচীনকালে গোহত্যার প্রচলন থাকা স্বীকৃত হইয়াছে। সায়ণাচার্য্যও কোনও কোনও ঋকের গোহত্যাপ্রতিপাদক অর্থ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ঋগ্বেদরচনাকালে গোহত্যাপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু স্বাধীন অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কোনও ব্যক্তির মতেই সায় দেওয়া উচিত নহে।

গোহত্যার অনুকূলে যেমন প্রমাণ আছে, তাহার প্রতিকূলে তেমন প্রমাণ আছে কি না? অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় প্রমাণের সামঞ্জস্য দ্বারা কোন্ পক্ষ বলবৎ হয়? মোক্ষমূলর সাহেব ঋগ্বেদকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বেদ বলিয়াছেন সত্য—কিন্তু তাঁহার ভ্রম হইতে পারে। অন্যান্য অনেক পণ্ডিত যজুর্ব্বেদের কোনও কোনও অংশ ঋক্ অপেক্ষা প্রাচীন মনে করেন। আমার বিবেচনায়, এই মত বিশেষ আদরণীয়। তাহা হইলে এরূপ সম্ভব কি না যে, অতি প্রাচীনকালীন যাগে গোবলি প্রচলিত থাকিলেও, ঋগ্বেদের সময়ে অপ্রচলিত হইয়াছিল? ঐতরেয় ব্রাহ্মণকে যদি ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগের সমকালীন গ্রন্থ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্রাহ্মণের প্রমাণ অনুসারে গোহত্যা তৎকালে একবারে রহিত হইয়া যাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব, ঋগ্বেদের মধ্যেই অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তির অন্বেষণ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত স্বীয় অনুবাদে যে তালিকা দিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে তাহার এগারটি প্রমাণের আমরা আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে গোহত্যা ঋগ্বেদী ঋষিদের সম্বন্ধে প্রথা—এরূপ নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে অবশিষ্ট তিনটি প্রমাণের আলোচনা করা যাইতেছে।

দ্বাদশ প্রমাণ।

বিশ্বামিত্রের পুত্র রেণু ঋষি কহিতেছেন—

কর্হি বিৎসা ত ইন্দ্র চেত্যা সং অস্মত্ত্বয়ন্তিনো মঘ এবং।
বিশ্বজুবো বয়শসদে ন গাবঃ পৃথিব্যা আপৃগনুষা পবন্তে॥ ১০—৮৯—১৪।

রমেশ বাবু অনুবাদ করেন,—

"হে ইন্দ্র! যে অস্ত্র ক্ষেপণ করিয়া পারাত্মা (পাপাত্মা?) রাক্ষসকে বিনাশ করিলে, তোমার সেই নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র কোথায় রহিল?—যেরূপ গোহত্যা স্থানে গাভীগণ হত হয়, তদ্রূপ তোমার ঐ অস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়া যজ্ঞদ্বেষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া শয়ন করে।"

এইরূপ অনুবাদ করিয়া দত্ত মহাশয় বিজয়দুন্দুভিবাদনের ন্যায় একটি টিপ্পনী করিতেছেন,—

"গোহত্যা প্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, নচেৎ গোহত্যার জন্য ভিন্ন স্থান নির্দ্ধারিত থাকা সম্ভব নহে।"

দত্ত মহাশয়ের বিবেচনায় এইটি অকাট্য প্রমাণ। তিনি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে Slaughter House দেখিয়া আসিয়াছেন,—ইদানীন্তন এদেশেও তাহার অপ্রতুল নাই। দত্ত মহাশয় পাঠকবর্গকে বলিতেছেন, দেখ, নারকেলডাঙ্গার Slaughter Houseএর মত সেকালে গোহত্যার জন্য ভিন্ন স্থান পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত ছিল—আর কি চাও?

ঋষি মহাশয়েরা মধ্যে মধ্যে গোমাংসভোজনের স্পৃহা হইলে বৎসতরীকে Slaughter Houseএ পাঠাইয়া দিয়া জবাই করাইয়া আনিতেন। ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে না যে, তৎকালে "গোহত্যা প্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল?"

আমাদের সংস্কার ছিল যে, Slaughter Houseএর সৃষ্টি বর্ত্তমানযুগের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ফল। বেণু ঋষির সময়ে যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এতাদৃশ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল যে, সেকালের মিউনিসিপ্যালিটীরা যে সে স্থানে গোহত্যা করিতে দিত না, এক একটি স্বতন্ত্র স্থান তজ্জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিত,—এবং তাহার বাহিরে গেলে By Law অনুসারে দণ্ডবিধান করিত, তাহা দত্ত মহাশয়ের নিকট প্রথম শিক্ষা করিলাম।

ফলতঃ দত্ত মহাশয় "ভিন্ন স্থান"—কোথা হইতে পাইলেন?—মূলে কেবলমাত্র আছে "শসনে"—তাহার অর্থ বধের স্থানে। বধের স্থান বলিলে যে ভিন্নরূপে নির্দ্ধারিত বধের স্থান বুঝিতে হইবে, এমন নহে।

মূলে কেবল আছে,—"শসনে গাংবো ন" অর্থাৎ বধের স্থানে, "গো" গণের ন্যায়। বধের স্থানের পরিবর্ত্তে দত্ত মহাশয় "গোহত্যা স্থানে" এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ গা-জুরি।

দত্ত মহাশয় অনুবাদের ভূমিকায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, সায়ণকে অবলম্বন করিয়া ঋগ্বেদের অনুবাদ করিবেন,—এমন কি, যদি সায়ণের অর্থ কোন স্থানে অনুবাদে না দেন—তবে টীকায় তাহা দিবেন। এ স্থানে দত্ত মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় নাই। তাঁহার অনুবাদ সায়ণসম্মত অনুবাদ নহে। ঐ কথাটি তাঁহার পাঠকগণকে বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল, তাহাও দেন নাই।

"গুহ্"—অব্যক্তশব্দকরণে এই ধাতু হইতে "গো"-শব্দ নিষ্পন্ন হয়; যাহারা মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে পারে না, তাহারা সকলেই "গো", অর্থাৎ পশু। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে "গো" বলিলে কেবল পশুই বুঝায়, বিশেষ করিয়া আমরা যাহাকে গরু বলি—কেবল তাহাকেই বুঝায় না। সায়ণাচার্য্য

এ কথা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তজ্জন্য তিনি প্রস্তাবিত বেদাংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; যথা—

"শসনে রিশসনস্থানে গাবো ন পশব ইব।" অর্থাৎ বধের স্থানে পশুগণ যেমন শসন করে।"

এস্থলে পাঠকবৃন্দ বিচার করুন, দোষের প্রমাণ কোথায়? ফলতঃ, দত্ত মহাশয় প্রথমতঃ ভুল অনুবাদ করিয়াছেন; তাহার পর, ভুল টিপ্পনীর যোজনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার যশের উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই।

যে সূক্তটিতে এই ঋক্ নিবিষ্ট, ঐ সূক্তটির আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, একদা বেণু ঋষির যজমানেরা কোনও ভীষণ সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। সেই সংগ্রামে ইন্দ্রের সাহায্য পাইবার জন্য তৎকালীন প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সোদ্বারা ইন্দ্রের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, এবং সেই আরাধনার জন্য ঋষি এই সূক্তটি রচনা করেন। যাহাদের সহিত যুদ্ধ হইবে, তাহারা একদা বেণুর যজমানের মিত্র ছিল, এক্ষণে শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১২শ ঋকে ঋষি বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! অকপর্দিরূপের ন্যায় দীপ্তিশালী তোমার অস্ত্র এক্ষণে নিক্ষিপ্ত হউক; বৃক্ষের উপরে যেমন বজ্রপাত হয়, তেমনি তোমার অস্ত্র এই "দ্রোঘমিত্র" (অর্থাৎ মিত্রদ্রোহী শত্রুপক্ষীয়) গণের উপর শব্দ করিতে করিতে পতিত হউক।" পরে ১৪শ ঋকে (যেটি এই প্রবন্ধের ঋক্) ঋষি এইমাত্র বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তোমার সেই আয়ুধ এই শত্রুগণের উপর কবে ক্ষিপ্ত হইবে? যে আয়ুধ দ্বারা তুমি রাক্ষসগণকে বিদ্ধ করিয়াছিলে, তদ্দ্বারা তাড়িত হইয়া কবে আমাদের এই মিত্রদ্রুগণ (অর্থাৎ মিত্রের প্রতি ক্রূর কর্ম্মের আচরণকারীগণ) বধের স্থানে পশুগণের ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিবে?" এই ত হইল বেণু ঋষির কথা। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দে তাঁহার এই কথাতে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহাকে গো-হত্যাকারী বলিয়া সভ্য জগতে প্রমাণ করিয়া দিবেন!!!

ত্রয়োদশ প্রমাণ।

বীতহব্যের পুত্র অকপ-ঋষি বলিতেছেন,—

যন্নিরয়াস ঋবতাব উক্ষণো বশা মেষা অবসৃষ্টাস আহুতাঃ।
শীভাসঃ কপর্দিনো হেষসো রুশা মরুদ্ভির্নো অহভির্পরি ব্রবৎ। ১০—৯১—১৪।

দত্ত মহাশয় অনুবাদ করেন, "যে অগ্নির উপরও বিস্তর ঘোটক, বলবান

বৃষ, পুরুষত্ববিহীন মেষ আহুতিরূপে অর্পণ করা হইয়াছে, সেই অগ্নির উদ্দেশে মনে মনে চিন্তা করিয়া এই সুন্দর স্তব রচনা করিতেছি।"

এ স্থলে দত্ত মহাশয় সায়ণাচার্য্যকে অনুসরণ করিয়াই অনুবাদ করিয়াছেন। সায়ণ বিবেচনা করেন, অশ্বমেধে নানাজাতীয় পশু,—ঘোটক, বৃষ, মেষ ইত্যাদি বলিদান হইত, এবং এ স্থলে তাহারই উল্লেখ আছে। অশ্বমেধও অতি প্রাচীনকালীন যাগ ছিল, তাহাও কলিতে অনাচরণীয়। ঋগ্বেদের সময়ে যে অশ্বমেধ এক বারে উঠিয়া গিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে অশ্বমেধ সাধারণের পক্ষে আচরণীয় যজ্ঞ ছিল না; কদাচ কোনও রাজা পূর্ব্বের প্রথা অনুসারে অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিতেন। সে যাহা হউক, এ স্থলে সায়ণাচার্য্য যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, সেরূপ অর্থ না করিলেও চলে। যখন আমরা প্রতিকূল যুক্তিবিবেচনায় ব্যাপৃত হইব, তখন দেখিব যে, সায়ণসম্মত অর্থ এ স্থলে গ্রহণ করিলে চলিবে না।

সায়ণাচার্য্য মূলের এইরূপ অন্বয় করিয়াছেন—"যস্মিন্ অগ্নৌ উক্ষণঃ সেবকসমর্থা, অশ্বাসঃ অশ্বাঃ ঋষভাসঃ বৃষভাশ্চ বশা বন্ধ্যাববংধ্যাশ্চ মেষাশ্চ অবসৃষ্টাসঃ দেবতার্থমবসৃষ্টাঃ পরিত্যক্তাঃ সন্তঃ অশ্বমেধে আহুতাঃ আজ্যি-মুখ্যেন হুতা ভবন্তি।" আমার বক্তব্য এই যে, "ভবন্তি" এই ক্রিয়াপদ মূলে নাই, সায়ণ ইহার অধ্যাহার করিতেছেন। "ভবন্তি" স্থলে "আসন্" এইরূপ ক্রিয়ার অধ্যাহার করিলে সুন্দর অর্থ হয়। যে অগ্নিতে পুরাকালে অশ্ব বৃষ মেষ প্রভৃতি আহুতি স্বরূপ প্রদত্ত হইত, আমি সেই অগ্নিকে এক্ষণে আমার স্তুতিমাত্র উপহার প্রদান করিতেছি। ভরদ্বাজ ঋষিও বলিয়া গিয়াছেন, (৪র্থ প্রমাণ দেখিবেন) "হে ইন্দ্র! পূর্ব্বে মাংস তোমার যেমন প্রীতিকর ছিল, এক্ষণে আমার ঋক্ তেমনি তোমার প্রীতিকর হউক।" আমার বিবেচনায় অরুণ ও ভরদ্বাজের তাৎপর্য্য তুল্য। ঋকের এই অর্থ করিলে গোহত্যা কেবল অতীতবার্ত্তাস্বরূপ এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে, দেখা যায়।

চতুর্দ্দশ প্রমাণ।

এক্ষণে আমরা বিপক্ষগণের শেষ প্রমাণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

কক্ষীবদ্গোত্রীয় শবর ঋষি বলিতেছেন—

"যা দেবেষু তন্বং ঐরয়ন্ত যাসাং সোমো বিশ্বা রূপাণি বেদ।
তা অস্মভ্যং পয়সা পিন্বমানাঃ প্রজাবতীরিন্দ্র গোষ্ঠে রিরীহি।" ১০—১৬৯—৩।

দত্ত মহাশয় অনুবাদ করেন,—"গাভীগণ আপনার শরীর দেবতাদিগের

যজ্ঞ দান দিয়া থাকে; সোম তাহাদিগের অশেষ আকৃতি অবগত আছেন। হে ইন্দ্র! তাহাদিগকে দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়া এবং সন্তানযুক্ত করিয়া আমাদের অন্ত গোষ্ঠে পাঠাইয়া দাও।" এস্থলে গাভীগণ বলিয়া অনুবাদ করা দত্ত মহাশয়ের ভ্রম হইয়াছে। সমগ্র সূক্তটির "গো" দেবতা; অর্থাৎ 'গো বিষয়ক এই সূক্ত। সর্বশুদ্ধ চারিটি ঋক্ এই সূক্তে। প্রাতঃকালে যখন 'গো'গণ ঘাস খাইতে বনে যাইত, তখন প্রথম ও দ্বিতীয় ঋকের দ্বারা তাহারা অনুমন্ত্রিত হইত; যখন সায়ংকালে বন হইতে ফিরিত, তখন তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকের দ্বারা অনুমন্ত্রিত হইত। এস্থলে 'গো'-শব্দে পশুমাত্রকে বুঝায়।

২য় ঋকে আছে, "যা অ গিরসস্তপসেহ চক্রুঃ", অর্থাৎ যে 'গো' গণকে অঙ্গিরা নামক ঋষিরা তপস্যা দ্বারা নির্মাণ করিয়াছিলেন। সায়ণ ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করেন—

"যাশ্চ গা অঙ্গিরস ঋষয়ঃ তপসা পশুপ্রাপ্তিসাধনেন চিত্রাবাগাদিলক্ষণেন ইহ অস্মিন্ লোকে চক্রুঃ কৃতবন্তঃ।"

ইহাতে এই সূক্তে সায়ণও 'গো' শব্দে সামান্যতঃ সকল পশুকেই বুঝিয়াছেন, দেখা যায়।

অতএব, "গাভীগণ" বলিয়া দত্ত মহাশয় যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। তাহার উপর আরো বক্তব্য যে, "ঐববৎত" এই ক্রিয়া অতীতার্থজ্ঞাপক। সায়ণ যদিও বর্তমান অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু ধাতুর অবয়ব অতীতার্থপ্রকাশ করে। তাহাতে 'গো' শব্দে গাভী বুঝিলেও 'গো'বলি কেবল পুরাবৃত্তমাত্র হয়।

অবশেষে আরো বক্তব্য যে, এই সমুদায় সূক্তটির আধ্যাত্মিক অর্থ করা যায়। সেই অর্থে 'গো'শব্দ জ্ঞান, এই অর্থ প্রকাশ করে। পণি কর্তৃক "গো"-হরণ বলিয়া যে একটি বৈদিক আখ্যায়িকা শুনা যায়, তথায় 'গো'শব্দের অর্থ "জ্যোতিঃ" বা জ্ঞান। অঙ্গিরা ঋষিরা তপস্যা দ্বারা সেই অপহৃত 'গো'গণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; অর্থাৎ লৌকিক জ্ঞানে জড়িত ও আবৃত ব্রহ্মজ্ঞানকে তাঁহার ভূমণ্ডলে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই অর্থ সমুদায় সূক্তে যোজনা করিলে দৃষ্ট হইবে, ইহাতে 'গো'হত্যার গন্ধমাত্র নাই।

উপসংহার।

দত্ত মহাশয় সমুদায় ঋগ্বেদ অন্বেষণ করিয়া এই চৌদ্দটি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পাঠকগণকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এই তালিকার অতিরিক্ত আর কোনও স্থানে ঋগ্বেদে গোহত্যার প্রমাণ আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তবে দত্ত মহাশয় যে তালিকা দিয়াছেন, তদতিরিক্ত কেবল আর এক স্থানে গোহত্যার আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে ১—১৬৪—৪৩ ঋকে,

"উক্ষাণং পৃশ্নিম্ অপচন্ত বীরাঃ"

আছে। দত্ত মহাশয় তাহার অনুবাদ করেন, "বীর শুক্লবর্ণ বৃষ পাক করেন"। এই অনুবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ইহা সায়ণসম্মত অনুবাদ নহে। সায়ণ যেরূপ অর্থ করেন, তদনুসারে ইহার অর্থ—"ঋত্বিকগণ শুক্লবর্ণ সোমকে সম্পাদন করিয়াছেন।" "করেন" মূলে এমন কোনও শব্দ নাই। বোধ হয়, এই অনুবাদকে সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত স্মরণ করিয়া, দত্ত মহাশয় ইহা তালিকাভুক্ত করেন নাই। তাহা হইলে কি হয়?—যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—তাহাতে পাঠক ভ্রমে পতিত হইতে পারেন।

তবে স্বীকার্য্য, "উক্ষন্" শব্দে বৃষও বুঝায়। মূলে যদি সে অর্থও গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, পরঋকেই উক্ত হইয়াছে—

"তানি ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন্।"

অর্থাৎ প্রাচীন ঋত্বিকগণ যে বৃষ-পাক করিয়াছিলেন, (করেন নহে; মূলে আছে—অপচন্ত) তাহা আদিমকালীন ধর্ম্ম ছিল, তাহা ঋগ্বেদের সময়ের ধর্ম্ম ছিল না।

সমগ্র ঋগ্বেদে দশ সহস্রেরও অধিক ঋক্ আছে। দত্তমহাশয় চৌদ্দটি গো-হত্যাপ্রতিপাদক ঋকের তালিকা দিয়াছেন, আর উপরের ঋকটিকে ধরিলে ১৫টি হয়। তন্মধ্যে কোনও কোনওটিতে—প্রকৃতপক্ষে আদৌ গোহত্যার কোনও কথাই নাই। কোনও কোনওটিতে কেবল উপমা, দৃষ্টান্ত, পুরাবৃত্ত, ব্যঙ্গোক্তি, অথবা কাল্পনিক ব্যক্তির কথোপকথনস্থলে গোহত্যার উল্লেখ আছে। এক্ষণে নিরপেক্ষ পাঠকবৃন্দ বিচার করুন যে, দশ সহস্রাধিক ঋকের মধ্যে যদি কেবল এই অল্পসংখ্যক স্থলে ঈদৃশভাবে গোহত্যার কথা থাকে,

তবে কি ঋগ্বেদী ঋষিরা স্বয়ং গোহত্যা করিতেন, বা গোমাংস ভোজন করিতেন বলিয়া স্বীকার করা যায়? গোমাংসভোজন সেকালে প্রচলিত থাকিলে কি ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট ও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইত না?

অনুকূল যুক্তি।

কিন্তু সম্ভব অসম্ভবের কথায় প্রয়োজন কি?—চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যের সমকালীন রামচন্দ্র খাঁ নামক বৈষ্ণবের অবমাননাকারী এক ব্যক্তির বিবরণ দেখা যায়। বৈষ্ণবের অবমাননার ফলে তাহার দুর্গতিবর্ণনস্থলে লিখিত আছে—

"দস্যুবুদ্ধি রামচন্দ্রের, রাজার না হয় ভয়।
কৃষ্ণ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ক্ষয়।
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি মনে ত্রাস উপজিল।"

অন্ত্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ।

"ম্লেচ্ছ উজির" অর্থাৎ মুসলমান রাজকর্মচারী; "অবধ্যবধ" অর্থাৎ 'গো'-বধ। ইহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাঙ্গলা ভাষা; ইহাতে বৃষের নাম "অবধ্য"। এক্ষণে দেখ, ঋগ্বেদে বৃষ ও গাভীর নাম কি?

প্রথম প্রমাণ।

কণ্ব ঋষি বলিতেছেন—

"প্র শংসা গোষু অঘ্ন্যং ক্রীলং যদর্ষো মারুতম্।" ১—৩৮—৫।

অর্থাৎ, "পশুগণের মধ্যে অবধ্য বৃষের ন্যায় বলদৃপ্ত মরুদ্গণের স্তব কর।" মূলে আছে, "অঘ্ন্যং"। "অঘ্ন্য" অহন্তব্য=অবধ্য। "গোষু অঘ্ন্যমিব"=পশুগণের মধ্যে "অবধ্যের" ন্যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ন্যায় যে কণ্ব ঋষির ভাষায় "অবধ্য" বলিলেই বৃষ বুঝাইত, কে বলিবে, তিনি গোহত্যাকারী বা গোমাংসভোজী ছিলেন?

দ্বিতীয় প্রমাণ।

দীর্ঘতমা ঋষি বলিতেছেন—

সুরভিসাতমবতী হি ভূষা অধো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
অদ্ধি তূর্ণং অঘ্ন্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী। ১—১৬৪—৪০।

দত্ত মহাশয় নিজেই অনুবাদ করিয়াছেন, "হে অহননীয়া গাভী! তুমি শোভন তৃণশস্যাদি ভক্ষণ কর, এবং প্রভূত দুগ্ধবতী হও। তাহা হইলে আমরা

ও প্রভূত ধনবান হইব। সর্ব্বকাল ধরিয়া তৃণ ভক্ষণ করে, এবং সর্ব্বত্র গমন-করতঃ নির্ম্মল জল পান করে।" কিন্তু এখানে আর দত্ত মহাশয়ের টীকা টিপ্পনী নাই। প্রথম প্রমাণে বৃষের নাম—অঘ্ন্য=অবধ্য; এই প্রমাণে গাভীর নাম অঘ্ন্যা=অবধ্যা; যে কালের লোকে অবধ্য বলিলে বৃষ, অবধ্যা বলিলে গাভী বুঝিত, পাঠক কি বিবেচনা করিতে পারেন, সেকালে "গোহত্যা প্রথা বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল?" "হে অহননীয়া! তুমি সর্ব্বকাল ধরিয়া তৃণ ভক্ষণ কর", বলিলে কি গোহত্যার বিধি বুঝায়, না গোহত্যার নিষেধ বুঝায়?

তৃতীয় প্রমাণ।

যে বসিষ্ঠকে নাটকে ভবভূতি বৎসতরী যোজন করাইয়াছেন, সেই বসিষ্ঠেরই পুত্র বামদেব ঋষি বলিতেছেন—

অস্ত শ্রোত্রা হুতস্য সংযক্ দেবস্য চিত্রভানো অর্ত্যেষু।
শুচি ঘৃতং ন তপ্তম্ অঘ্ন্যায়াঃ স্পার্হা দেবস্য মহনেব বেদোঃ। ৪—১—৬।

"শুচি ঘৃতং ন তপ্তম্ অঘ্ন্যায়াঃ", অর্থাৎ "অঘ্ন্যার" (গাভীর) তপ্ত উজ্জ্বল ঘৃতের ন্যায়। বামদেবের চক্ষেও যখন গাভী অবধ্য, তখন বসিষ্ঠের চক্ষেও তাহাই ছিল, সন্দেহ নাই। বসিষ্ঠ ও বামদেবের সময় গাভী অবধ্য পশুর মধ্যে পরিগণিত।

চতুর্থ প্রমাণ।

আর বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দার, তিনি কি বলেন, দেখ।

অতীমঘ্ন্যা ঊত শ্রীণন্তি ধেনবঃ শিশুং।
সোমমিন্দ্রায় পাতবে। ২—১—৯।

অর্থাৎ, "অবধ্য ধেনুগণ নবজাত সোমরসকে ইন্দ্রের পানের জন্য স্বীয় দুগ্ধের দ্বারা মিশ্রিত করিতেছে।" দেখা যায়, বিশ্বামিত্র ও মধুচ্ছন্দার সময়েও (বাস্তবিক ইঁহারা বসিষ্ঠ ও বামদেবের সমসাময়িক ঋষি) গাভী অবধ্য হইয়াছে। বেণু ঋষি মধুচ্ছন্দারই ভ্রাতা, এক্ষণে পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করুন, বেণুর সময়ে গোহত্যা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, না একবারে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল?

পঞ্চম প্রমাণ।

যে ভরদ্বাজকে দত্ত মহাশয় গোখাদক প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারই পুত্র পায়ুনামক ঋষি বলিতেছেন,—

যঃ পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা সমক্তে যো অশ্ব্যেন পশুনা যাতুধানঃ।
যো অঘ্ন্যাযা ভরতি ক্ষীরমগ্নে তেষাং শীর্ষাণি হরসাপি বৃশ্চ। ১০—৮৭—১৬।

অর্থাৎ, "যে নরমাংসভোজী অশ্বমাংসভোজী রাক্ষস আমাদের "অঘ্ন্যা"র গলীন চুনি যবে, হে অগ্নি, তুমি তাহার শিরশ্ছেদ কর।" সকলেরই এক বুলি—"অবধ্যা"! "অবধ্য"!! "অবধ্য"!!!

মাদৃশ অল্পশ্রুত ব্যক্তি স্বল্প চক্ষে যে কয়েকটি প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহা প্রদত্ত হইল। অনুসন্ধান করিলে, এই পক্ষে আরো প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। নিরুক্তকার যাস্ক "অঘ্ন্য" শব্দের ব্যাখ্যায় ইহা গবয়ের নাম। কেন না, পক্ষ "অহন্তব্যা ভবতি" এইরূপ লিখিয়াছেন।

যজুর্ব্বেদ প্রাচীন না ঋগ্বেদ প্রাচীন, এস্থলে আবার এ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে প্রস্তাবটি বড়ই বাড়িয়া যায়। যে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের মন্ত্র লইয়া যজুঃসংহিতা আরম্ভ হইয়াছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উহা অতি আদিমকালীন মন্ত্র। শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুঃসংহিতা, উভয়েই ঐ মন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আমার বোধ হয়, ঋগ্বেদের অনেক পূর্ব্বে ঐ মন্ত্র রচিত। উহার ভাষা অতি প্রাচীন; উহাতে সমাজের চিত্র যতই হীন ও আদিম। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রাচীন যজুষ্ মন্ত্রেও গাভীর নাম অঘ্ন্যা। যথা—

"আপ্যায়ধ্বম্ অঘ্নিয়া দেবভাগং উর্জ্জস্বতীঃ পয়স্বতীঃ।
প্রজাবতীঃ অনমীবা অযক্ষ্মা মা বস্তেন ঈশত মাঘশংসঃ। ইত্যাদি।

এখানে "অঘ্ন্যায়" পরিবর্ত্তে কেবল "অঘ্নিয়া" এই আকার; অর্থ সমান।

যদি এই বেদাংশকে ঋক্‌মন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে ঋগ্বেদের পূর্ব্বেই গোহত্যা ভারতবর্ষে রহিত হইয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন হয়। আমরা মধুচ্ছন্দা নামক ঋগ্বেদের ঋষির সময়ে সোমযাগে কিরূপ অনুষ্ঠান ছিল, তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে তৎকালে পশুবলিতে গোবলি হইত কি না—এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা কিছু বলা যায়, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ঋগ্বেদে গোমাংস, সোমরস ও হবির ন্যায় দেবতাদিগকে আহুতি দেওয়া হইতেছে, এমন কোনও স্পষ্ট প্রমাণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যদিও অল্পসংখ্যক স্থলে বৃষ্টান্তাদিস্বরূপ গোবধের উল্লেখ দেখা যায়, তেমনি আবার অনেক স্থলে গাভী এবং বৃষ উভয়েই স্পষ্ট অবধ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, দেখা যায়। ইহাতে এইরূপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, বৈদিক যুগের প্রথমাবস্থায় গোবলি প্রচলিত ছিল, এবং ক্রমশঃ তাহা একবারে উঠিয়া গিয়া, উক্ত যুগের মধ্যভাগে ঋগ্বেদসঙ্কলনকালে বৃষ এবং গাভী অবধ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ঋগ্বেদকে

আদিমকালীন রচনা বলিয়া অনেকের যে কুসংস্কার আছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। এক্ষণেও করিতেছি। ঋগ্বেদের অনেক অংশ মহারাজাধিরাজ পিজবনপুত্র সুদাসের রাজ্যকালে বা তাহার পরে রচিত। বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, উভয়েই এই সুদাস রাজার রাজ্যকালে জীবিত ছিলেন, উভয়েই উক্ত রাজা কর্তৃক সম্মানিত ও পূজিত হইয়াছিলেন। সুদাস রাজা, সমকালীন অনেক রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, সিন্ধু হইতে সরযূ ও শোণ পর্য্যন্ত আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের রচনা-কালের নির্ণয়পক্ষে সুদাস রাজার রাজত্বকাল একটি বিশেষ সীমাচিহ্ন। ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডল বিশ্বামিত্রের, ৪র্থ মণ্ডল বসিষ্ঠপুত্র বামদেবের, এবং ৬ষ্ঠ মণ্ডল স্বয়ং বসিষ্ঠের অধিকাংশ রচনা। তদ্ভিন্ন অন্যান্য মণ্ডলেও বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রবংশীয় অনেক ঋষির রচনা দেখা যায়। এই সমগ্র অংশ সুদাস রাজার রাজ্যকালে বা তাহার অব্যবহিত পরে বিরচিত। অবশিষ্ট অংশের মধ্যে, রচনার ভঙ্গীতে গৃৎসমদ ঋষির রচিত সমগ্র দ্বিতীয় মণ্ডল, বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সময়ের পরে রচনা বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কেবল অত্রি, ভরদ্বাজ ও কণ্ব এবং তদ্বংশীয় ঋষিরা সুদাসের পূর্ব্বে বা পরে জীবিত ছিলেন, তাহা এখনও নিশ্চয় জানা নাই; ফলতঃ, তাঁহারা যদি সুদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়েন, তাহা হইলে বড় বেশী পুরাতন হইবেন না। * সুতরাং ঋগ্বেদকে প্রধানতঃ সুদাস রাজার যুগের রচিত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। ঐ সময়ে বিন্ধ্যের উত্তরে প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যাধিকার বিস্তৃত ও বদ্ধমূল হইয়াছিল। সরযূ ও শোণের অপর পারেও আর্য্য রাজত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু উক্ত আর্য্য রাজাদের মধ্যে অনেকেই ইন্দ্রপূজক বা বৈদিক যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ছিলেন না। এই ভূ-খণ্ডেই পরে বেদবিরোধী বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব ও সমধিক প্রচার হইয়াছিল। যাহা হউক, ঋগ্বেদের অধিক অংশই যে আর্য্য সাম্রাজ্যের অতি সমুন্নত অবস্থায় রচিত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ অসম্ভব।

রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ সুদাসের সময়ে ঋষির অতি উন্নত অবস্থা। বিদ্যোৎসাহী এবং প্রতিভার পুরস্কর্ত্তা মহারাজ সুদাস, স্বয়ং একজন ঋক্‌রচয়িতা ছিলেন, এবং তাঁহার রচিত অন্ততঃ একটি অতি সুন্দর সূক্ত কালের স্রোতে

---

* যে সাত জন প্রধান ঋষি এবং তদ্বংশীয়েরা প্রায় সমগ্র ঋগ্বেদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুদাসের সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে বা পরে জীবিত ছিলেন।

ভাসমান হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, কৃষিবিদ্যার উন্নতিসাধনে সুদাস রাজার সমধিক যত্ন ছিল। সুদাস রাজা বলিতেছেন—

অস্মভ্যং দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ শিক্ষতাং পিতেব নস্তদিহ বিদ্যতাং নরঃ।
অচ্ছিদ্রোক্ষী পীপয়দ্ যথা নঃ সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ॥ ১০—১৩৩—৭।

অর্থাৎ, "হে পরমেশ্বর! আমাদিগকে তুমি সেই বিদ্যার উপদেশ প্রদান কর—যাহা তোমার উপাসকের কামনার বস্তু সকল উৎপাদন করে;—সেই বিদ্যার প্রভাবে বিপুল আপীনবিশিষ্টা ধরিত্রী যেন—যেন সহস্র ধারায় দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন।"—যে কালের রাজার এইরূপ প্রার্থনা—সেকালের প্রজারা নিশ্চয়ই অশেষ বিশেষ প্রকারে মৃত্তিকা হইতে ধন উপার্জ্জনে ব্যস্ত ছিল। কৃষিকার্য্যের দ্বারা মনুষ্য তখন আপনার সমুদায় ভোগের সামগ্রী উৎপাদন করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে, এবং রাজারা তখন কৃষিবিদ্যার উন্নতি-সাধনের জন্য বিশেষ যত্নবান। এদেশে বৃষ ও গাভী কৃষির প্রধান সহায়; সহজেই অনুমান করা যায়, সুদাসের ন্যায় কৃষিবিদ্যার অনুরাগী রাজাধিরাজেরা আপন আপন রাজ্যে গোহত্যা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাই ঋগ্বেদে বৃষ "অঘ্ন্য" এবং গাভী "অঘ্ন্যা" বলিয়া অভিহিত। পূর্ব্বকালীন গোহত্যাপ্রথার স্মৃতি তখনও বিলক্ষণ জাগরূক ছিল; কিন্তু রাজশাসনে গোহত্যা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এদিকে যেমন রাজশাসন—অপর দিকে তেমনি ঋষিদের "মা হিংস্যাঃ সর্ব্বা ভূতানি" এই মহাবাক্য। আর্য্যাবর্ত্তের সদাচারপরায়ণ আর্য্যেরা ক্রমে ক্রমে চৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায়, যাহারা গোমাংসভোজী, তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—

"———গোঘ্ন খাও গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায় তাতে হেন পিতা।
পিতা মাতা মারি খাও এ যা কোন্ ধর্ম্ম?
কোন্ কলে কর তুমি এমন বিকর্ম্ম?"

চৈতন্যচরিতামৃত; আদিলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে যুগপৎ কারুণ্য ও রাজশাসন এবং ধর্ম্মোপদেশের ফলে, আর্য্য-শাসিত আর্য্যাবর্ত্তে ঋগ্বেদরচনাকালে গোহত্যাপ্রথা রহিত হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

মাধুরী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বেলডাঙ্গার রায়েরা বহুদিনের বনিয়াদি বড়লোক। আগে তাঁহাদিগের দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ ছিল। সে প্রতাপে সকলের থরহরি কম্প হইত। কবিতাপ্রিয় ঠান্‌দিদিরা এখনও বলেন, তাঁহাদের হাঁপে দাপে তখন বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। দেশে চোর ডাকাতের ভয় ছিল না, দুরাচার দুষ্কৃতির তিষ্ঠিবার যো ছিল না, অন্যায় অত্যাচার ও জুলুম অবরদস্তি হইতে পারিত না। চাল সড়কি লইয়া বাছা বাছা বহুতর মালের পাক ও লাঠিয়াল সদাই হাজির থাকিত। মনিবের ইঙ্গিত পাইবা মাত্র তখনই তাহারা গ্রামকে গ্রাম উজাড় করিয়া দিয়া আসিত। রায়েরা নবাবের বড় একটা ভয় রাখিত না। পক্ষান্তরে, নবাব সুবাকে তাহাদের সঙ্গে একটু বুঝিয়া সমঝিয়া চলিতে হইত। আর পার্শ্ববর্ত্তী যত হীনবল ক্ষুদ্র জমিদার ও রাজা রাজড়া সদাই সশঙ্কিত থাকিত। পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত রায়েরা ক্রমশই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সহিত কাটাইয়া আসিয়াছিল। সা সুজা যখন বাঙ্গালার সুবেদার, তখন তিনি এই রায়েদের নিকট বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতা রক্ষার জন্যই হউক, অথবা আরও অধিক উপকার পাইবার প্রত্যাশায়ই হউক, তিনি দিল্লী হইতে ইহাদের জন্য রাজ-উপাধির এক ফারমান আনাইয়া দেন। শুনা যায়, সুজা নাকি স্বয়ং বেলডাঙ্গায় আসিয়া গজপতি রায়কে এই উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়া যান। অশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত রাজ্য করিয়া, এক মাত্র পুত্র রাখিয়া, গজপতি রায় পরলোক গমন করেন। সে পুত্রের নাম হলায়ুধ। হলায়ুধ বড় তেজস্বী, বীরস্বভাব ও কূটবুদ্ধি ছিলেন, তিনি বাহুবলে, ততোধিক বুদ্ধিবলে, রাজ্য বিলক্ষণ বিস্তার করিয়া গেলেন। বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রনাথ বড় শাস্ত্রানুরাগী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাকে কিন্তু অধিকদিন রাজত্ব ভোগ করিতে হয় নাই। যৌবনেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহারও একটি ভিন্ন পুত্র ছিল না। সে পুত্রের নাম দেবীবর।

দেবীবরের স্বভাবটি যেন যাযাবরের ছাতা। দেবীবর শান্ত, ধীর, বিনয়ী, ধর্ম্মপ্রিয়। তিনি বিবাদ বিসংবাদ ভালবাসেন না, মিথ্যা ও কপটাচার দেখিতে পারেন না, দিনরাত্রি ধরিয়া অষ্টপ্রহর বিষয়চিন্তাকে পাপ বলিয়া মনে করেন। বাসবংশের সে তেজঃপূর্ণ উষ্ণ রক্ত তাঁহার শিরায় নিরায় প্রবাহিত ছিল, কিন্তু সে তেজ হীনবলকে নিগৃহীত না করিয়া, তাহাকে রক্ষার জন্য প্রদর্শিত হইত। সে তেজ অগ্নিসম দীপ্তি পাইত—যে আর্ত্ত, সে আসিয়া তাহার উত্তাপে জীবন রক্ষা করিত, আর যে অত্যাচারী, সে তাঁহার সুমুখ হইতে ছুটিয়া পলাইবার পথ পাইত না। দেবীবর ভাবিতেন, পীড়িতের রক্ষা, দরিদ্রের দুঃখমোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার—ইহাই যদি করিতে না পারিলাম, তবে বৃথার মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছি। এজন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে অনেক কষ্টে পড়িতে হইয়াছে, কত রকমে কত বার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তথাপি তিনি এক-দিনের তরেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি নির্জ্জনে ঈশ্বরারাধনায় অতিবাহিত করিতেন। দেখিয়া, তাঁহাকে কেহ রাজর্ষি বলিত, কেহ যুধিষ্ঠিরের সহিত তুলনা করিত, কেহ বা দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ বলিয়া উপমা দিত। তাঁহার আরও একটি নাম ছিল। সেই নামে তিনি দেশসম্ব আবালবনিতা সকলের নিকট সমাদৃত। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। যে যখন আসিয়া যেরূপ দায় জানাইত, তখনই তাহাকে প্রার্থিত অনুসারে দান করিতেন। তাঁহার ভাণ্ডার দুঃখী কাঙ্গালী অতুর অতিথির জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিত। অতিথিশালায় রাত্রি দুই প্রহরের পরও দুই শত লোকের আহার নিত্য মজুদ থাকিত। তাঁহার অসামান্য বদান্যতা ও অমব্যয় দেখিয়া, সকলে তাঁহার নাম দিয়াছিল—"দেনো দেবী।"

"দেনো দেবীর" কীর্ত্তিসম্বন্ধে আজিও অনেকের মুখে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এক দিন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কন্যাদায় জানাইলেন। তখন মফঃস্বল হইতে এক কিস্তি চালান আসিয়াছিল। স্তূপাকারে সে টাকার রাশি সম্মুখে পড়িয়াছিল। দেবীবর তৎক্ষণাৎ দুই হস্তে অঞ্জলি পুরিয়া তাহা হইতে টাকা লইয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। গ্রহণ করিতে ব্রাহ্মণের হাত হইতে কয়েকটি টাকা সেই অর্দ্ধ-রাশির উপর পড়িয়া গেল। অমনি দেবীবর সেই স্তূপীকৃত সমস্ত টাকা সেই ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিলেন। দেখিয়া ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিল। দেবীবর বলিলেন, "ঠাকুর, আপনার হাতের কোন্ টাকাটি এই ক দায় মেটা মিটাইয়া গেল, তাহা কেমন করিয়া ঠিক্ করিব? আমি কি দত্তাপ-

হইল। রাজা স্থায়ী হইবে?" আর এক দিন এক ব্যক্তি আসিয়া মাতৃদায় জানাইলে দিবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি রকমে শুদ্ধ হইতে চাও?" যাহার দিবে দেখিয়া সংস্থান নাই, সে এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? রাজা তাহাকে নীরব পারিয়া আবার বলিলেন, "বল, তোমার মনের ইচ্ছা কি?" সে কিছু বলিতে গড়াইয়া রাজার দিকে চাহিল। চাহিবামাত্র নয়নের কোণ দিয়া অশ্রুধারা শ্রাদ্ধের পড়িল। তৎক্ষণাৎ আপন পুরোহিতকে ডাকাইয়া দেবীবর এক ঘট তছিলেন, কর্দ্দ করিয়া সমস্ত টাকা গণিয়া দিলেন। পুরোহিত কি বলিতে যাইতে উঠিয়া রাজা তিরস্কারদৃষ্টি করিলেন। আর বলিতে সাহস হইল না, পুরোহিত ইচ্ছামত চলিয়া গেলেন। দেবীবর একাকী মনে মনে বলিলেন, "যদি লোকেরকৃত পরই দান করিতেই না পারিলাম, তবে সে দান করিয়া সুখ কি?" এমনি র্য্য ছিল, আছে, তা আর কত বলিব? এরূপ ব্যাপার যখন নিত্যনৈমিত্তিক অনেকে তখন আর কি পোটাকত উদাহরণ দিব? আজিও প্রাতে ই যায়, সে প্রাতঃস্মরণীয় সেই "বেলো দেবীর" নাম উচ্চারণ করে। তাহাকে "বেলো নাম করিলে দিনটা যায় ভাল। আজিও সে অঞ্চলের স্ত্রীলোকে তাকিয়া দেবীর" নাম করিয়া উনানে হাঁড়ি চড়ায়। তাহাদের ধারণা, হাঁড়ি আজিও গেলেও সেই পবিত্র নামের গুণে আপনা-আপনি বোড়া লাগিয়া যায়। তাহা সে গল্প করিতে করিতে বৃদ্ধেরা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন। বালকে পলিটি-শুনিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে। আর আমরা সেই পুণ্যময় দান খাই। ক্যাল ইকনমির মূলে সদ্বিচার করিতে গিয়া, সেই হারাইয়া হা করে

সুখের বিষয়, এমন দেশে উপাধি-উৎপীড়িত এমন ভীষণ আকা বরের নাই; আর মিউনিসিপ্যালের ময়লার গাড়ির ন্যায় দেশের অঞ্চলপূ ার্থিক কাগজেরও এত হুড়াহুড়ি বাড়ে নাই, কাজেই তখনও নীরবে নির্জ্জনে তিনি ভাবে অনেকে দান ধ্যান করিতে পারিত। দেবীরায়ের সৌভাগ্য যে পক্ষী- তেমন সময়ে অন্বিয়াছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য দান দেখিয়া শঙ্কারিত বেরাও—কেই বা তাঁহার শত্রু ছিল?—তাঁহার যশ না করিয়া থাকিতে পা যে না। তবে বৃদ্ধ দেওয়ান মুকুন্দরাম ভাবিতেন, জল চালিতে চালিতে কল কালি ক্রমে শূন্য হইয়া পড়িবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? পূর্ব্বপুরুষ প্রভৃত অর্থ এরূপ বাখিয়া গিয়াছেন বটে, এবং বার্ষিক আয়ও কম নয় সত্য, তথাপি রাজে অকাতরে দান করিলে কি জানি ভবিষ্যতে কি ঘটিতে পারে! সাহে মা, প্রভুকে কিছু বলিতে ইচ্ছা হইত; কিন্তু অগ্রসর হইতে সাহস হইত

রাণী জানি
এক দিন তে পারিলে যদি তিনি কিছু উপায় করিতে পারেন, এই বিবেচনায় হৈমবতী প্রধানা পরিচারিকা দ্বারা সে কথা রাণীর কানে তুলিলেন। রাণী যতটুকু পারেন একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মে দেওয়া ব রি, তাঁহার সহায়তা করাই আমার কর্ত্তব্য; স্বামীর ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা অবধি ব মার কার্য্য নহে।" অবাধ শুনিয়া মুকুন্দরাম আক্ষেপ পাইলেন। সেই দিনের কোনও কথা না তুলিয়া, ভগবানের উপর ভর করিয়া রহিলেন। উপনীত র পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। দেবীবর প্রৌঢ়াবস্থায় মধ্যসীমায় করিয়াও হইলেন। তাঁহার বড় ক্ষোভ, ভগবান তাঁহাকে নানা ধনে ধনী সময় উৎসন্তানরত্নে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। রাণী হৈমবতীরও সন্তান হইবার হৈমবতীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর যে কিছু হয়, এমন আশাও কাহারও নাই। বিধাতার জন্য বড়ই মনের কষ্টে কালযাপন করেন। সন্তানকামনায় নিত্য সেই ক ট যুক্তকরে কাতরে প্রার্থনা করিতেন। কত দিন পরে বিধাতা তিনি এ প্রার্থনা বুঝি শুনিলেন। রাণীর গর্ভলক্ষণ দেখা দিল। যথাসময়ে কোলায় অনুপমরূপলাবণ্যময়ী কন্যা প্রসব করিলেন। দেশময় আনন্দের তাহাতে পড়িয়া গেল। সে দিন বুড়া মুকুন্দরামও আনন্দে যে যাহা চাহিল, বস্তুতঃ, তাহাই বিলাইল। কন্যার রূপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়া গেল। সে রূপ, যেন স্নিগ্ধ মধুর নয়নারাম আলোকরা রূপ কেহ কখন দেখে নাই। তাহার চা সোণায় নাই, বৈশাখী চাঁপায় নাই, স্থিরা সৌদামিনী দেখি নাই তাহাতে বলিতে পারি না; তাহা দুধে আলতায় ফলে না, হরিতাল গুলিয়া ময়—কে হিঙ্গুলের ছিটা দিলেও ঠিক মতনটি মেলে না। তাহা জ্যোৎস্না সকলই রিতময়—মধুরতাময়। তাহার হাসি, তাহার চাহনি, তাহার অঙ্গভঙ্গী মধুধার মধুরতাপূর্ণ। সে মাঝে মাঝে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদে, তাহাও যেন কর্ণে অবরোধ চালিয়া দেয়। মেয়ে যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাহার অবয়বে করিবার মাধুর্য্য আরও ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। আনন্দে রাজারাণী পরামর্শ করি মেয়ের নাম রাখিলেন,—মাধুরী।

রাজা ন্তর কথা ফুটিল। সেই অমৃতমাখা আধ আধ কথা শুনিতে শুনিতে বকি রাণী মাঝে মাঝে ইষ্টদেবতার আরাধনাও ভুলিয়া যাইতেন। সে শিশু কি খাকিত, কি খেলিত, কি হাত নাড়িত, কেন হাসিত, কেন কাঁদিত, কেন পুনর্ব্বার খাকিবা কোল হইতে হামা দিয়া ছুটিয়া যাইত, আবার কেনই বা ার ছুটিয়া বাঁপাইয়া কোলে আসিত, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন

না। দেখিয়া দেখিয়া রাজা হাসিতেন, রাণী হাসিতেন, শেষ পিতামাতার পানে চাহিয়া শিশুও উচ্চে হাসির লহর তুলিত। অমনি বিহ্বলপ্রাণে দুই জনে আদরে তাহাকে বুকে করিয়া বারম্বার চুম্বন করিতেন।

শিশু ক্রমে বালিকা হইল। তখন সে খেলাঘর বাঁধিত, যতনে কাপড়খানি সর্ব্বাঙ্গে মুড়িয়া বৌ সাজিত, পুতুলের বিবাহ দিয়া আদর কখন বা শাঁখ বাজাইয়া পুত্রবধূ ঘরে আনিত, একমনে কত ধুলার রান্না রাঁধিত, আবার রাঁধিতে রাঁধিতে ছুটিয়া গিয়া মাতার সঙ্গে কত আবোলতাবোল পরামর্শ করিত। হর্ষবিকসিতমুখে মাতা কন্যার দিকে চাহিয়া থাকিতেন, আনন্দে বক্ষঃস্থল নৃত্য করিত। অগণিত দাসদাসী, কিন্তু কন্যাকে কাহারও কাছে দিয়া হৈমবতীর মনের তৃপ্তি হইত না। তিনি আপনি তাহাকে খাওয়াইতেন, আপনি তাহাকে ঘুম পাড়াইতেন মুছাইতেন, আপনিই তাহার খেলানাগুলি যতনে তুলিয়া রাখিতেন। বিশেষ কর্ম্মবশতঃ এক আধ ঘণ্টা রাজার কাছে রাখিয়া গেলেও কাজ করিতে করিতে মাঝে মাঝে ছুটিয়া আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। দেখিয়া রাজা হাসিতেন। হৈমবতী রাগিয়া যাইতেন। আবার পরক্ষণে পিতার দেখাদেখি বালিকা উচ্চে হাস্য করিয়া উঠিত, সুতরাং রাণীও না হাসিয়া থাকিতে পারিতেন না।

চারি—পাঁচ—ছয় করিয়া ক্রমে বালিকার বয়স বাড়িতে লাগিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই উজ্জ্বলমধুর রূপ আরও অধিকতর উজ্জ্বলমধুর হইয়া ফুটিতে লাগিল। সেই—কি উপমা দিব?—উপমারহিত স্নিগ্ধসুন্দর মুখমণ্ডল, সেই মুখমণ্ডলে সেই ঈষচ্চঞ্চল অথচ স্থিরনম্র মধুরকটাক্ষযুক্ত ভাসাভাসা আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল, সেই নয়নের উপর সেই নিবিড়কৃষ্ণ সুবঙ্কিম সূক্ষ্মরেখাবৎ ভ্রূ—কি সুন্দর, কি মধুর! সুন্দর তাহার কি নয়? তাহার বাহু সুন্দর, বাহুতে অঙ্গুলি সুন্দর, অঙ্গুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নখরাজি আরও সুন্দর। মধুর তাহার সকলই। বালিকা কথা কহে, যেন মধুবৃষ্টি করে; হাসে, যেন হাসির রেখায় রেখায় মধুর প্রপাত বহে; আর হাসিতে সেই নিটোল গালে যে দুটি ক্ষুদ্র টোল পড়ে, তাহা এত মধুর যে বর্ণনাতীত। মাথার উপর মিশ্‌মিশ্ করিতেছে কুচ্‌কুচে কোঁকড়া কোঁকড়া ঘন কৃষ্ণকেশরের ভার এক রাশি চুল,—বালিকা যখন সেই আগুল্‌ফলুণ্ঠিত কেশরাশি খুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তখন যে দেখে, সেই রাজলক্ষ্মী ভাবিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়ায়। বালিকা কখনও ছাদের উপর আসিয়ার কাছে গিয়া দাঁড়ায়, কখনও জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া থাকে, পথিক সে রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে, তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা পথ-

ক্রমে কোথায় চলিয়া যায়, দেখে শিয়া সে যাহাকে পায়, তাহারই কাছে আগে সেই সচল প্রতিমার গল্প না করিয়া থাকিতে পারে না।

মাধুরী আরও ভাগর হইল। ক্রমে একাদশে পা দিল। শৈশবের সেই তরল সৌন্দর্য্য বয়সের সঙ্গে যেন প্রগাঢ় হইয়া আরও এক নূতন শোভা বিস্তার করিল। বালিকা এখন খেলাঘর বাঁধে না, পুতুলের বিবাহ দেয় না, ধুলার রান্না রাঁধে না। নিত্য প্রাতে উঠিয়া দাসীর সঙ্গে পুষ্পোদ্যানে গিয়া স্বর্ণসাজি ভরিয়া ফুল তুলে। বালিকা এ গাছ হইতে ও গাছে যায়; ফুল ভাবে, এত দিনে বুঝি তাহার কুলজন্ম সার্থক হইল। সে অমনি বায়ুভরে হেলিয়া পড়িয়া ছুটি করিয়া মাথা বাড়াইয়া দেয়। বালিকা শিরীষকোমল হস্তে সেই ফুল তুলিয়া সাজি সাজাইয়া রাখে। ফুল আনিয়া বালিকা স্বহস্তে পিতা-মাতার পূজার আয়োজন করিয়া দেয়। তাঁহারা পূজায় বসিলে, সে একধারে গিয়া আপনিও পূজা করিতে বসে। মাতার নিকট সে শিবপূজা শিখিয়াছিল।

হৈমবতী রাজমহিষী হইলেও তিনি রাঁধিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহাকে রন্ধনশালায় দেখিলে পাচিকারা শশব্যস্ত হইয়া পড়িত, কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুনিতেন না। অন্ততঃ দুইখানা ব্যঞ্জনও স্বহস্তে রাঁধিয়া স্বামীর পাতে না দিতে পারিলে, তাঁহার মনে হইত, স্বামীর সে দিন অর্দ্ধাশন তিন্ন হইল না। মাধুরী মাতাকে রন্ধনশালায় দেখিলে ছুটিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে যাইত। হৈমবতী তাহাতে বড় আনন্দ অনুভব করিতেন। ইহার মধ্যে তিনি মেয়েকে চারি পাঁচ রকম রাঁধিতে শিখাইয়াছিলেন। পিতা খাইতে বসিলে সে আর কোথাও থাকিত না। হয় বাতাস করিত, না হয় এটা ওটা পরিবেশন করিত, কোনও দিন বা নিজে একটা রাঁধিয়া মার রান্না ভাল কি তার রান্না ভাল, ইহার বিচারের জন্য পীড়াপীড়ি করিত। রাজা মহাবিপদে পড়িতেন। তিনি যদি তাহার রান্নার সুখ্যাতি করিতেন, তাহা হইলে বালিকা রাগিত, মার নিন্দা তাহার সহিত না। আবার যদি রাণীর রান্না ভাল বলিতেন, তাহা হইলেও অভিমানের আর সীমা থাকিত না। রাজা হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "তোমরা দুজনেই বাঁধ ভাল।"

বালিকার রূপের কথা বলিয়াছি, কিন্তু সে হৃদয় রূপ হইতে আরও কত মধুর। সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত দয়া, এত সহানুভূতি, এত পরদুঃখকাতরতা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত। মাধুরী কাহারও কান্না সহিতে পারিত না, দুঃখ যন্ত্রণা দেখিতে পারিত না, হাহুতাশের কথা শুনিলে দুই চক্ষে দর দর ধারা গড়াইয়া

পড়িত। কে জানে, এত কোমল হৃদয় সে কোথায় পাইয়াছিল? সে প্রতি দিন দাসীর দ্বারা প্রতিবেশীদিগের সংবাদ লইত, যাহার যে অভাবের কথা শুনিত, তখনই তাহার মোচন করিতে সাধ্যমত যত্ন পাইত। কাহারও পীড়ার কথা শুনিলে সে যত দিন না আরোগ্যলাভ করিত, তত দিন তাহার বাড়ী দুই বেলা হাঁটিতে হাঁটিতে দাসীর পায়ে ব্যথা ধরিয়া যাইত। বালিকা ঔষধ ও পথ্যের খরচ পাঠাইয়া দিত। আপনার কাছে না থাকিলে মার কাছে চাহিয়া দিত। মাও তেমনি কোমলতা ও মমতাময়ী মা, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিতেন। বালিকা হাসিমুখে তাহাই সেই গোলাপসুকুমার সুন্দর মুঠার ভিতর পুরিয়া কুঞ্চিত কুন্তলদাম দুলাইতে দুলাইতে আনন্দে ছুটিয়া যাইত; অবাক্ হইয়া দাসী তাহার পশ্চাৎপানে চাহিয়া থাকিতেন। চাহিয়া চাহিয়া এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া নিঃশব্দে কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইতেন।

এক দিন বালিকার বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আসিতে একটু বেলা হইয়া গিয়াছিল। আসিতে বালিকা দেখিল, বহির্দ্বারে দুই জন লোক রাজার সহিত সাক্ষাতের জন্য কাতরে প্রার্থনা করিতেছে, দ্বারবানেরা কিন্তু দ্বার ছাড়িতেছে না। দেখিয়া বালিকার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। পরিচারিকা দ্বারা সেই লোক দুটিকে ডাকাইয়া তাহাদের প্রার্থনা শুনিয়া বালিকা দৌড়িয়া গিয়া মাতার নিকট সব বলিল। মা মেয়ের মুখচুম্বন করিয়া যাহা দরকার তাহা প্রদান করিলেন। বালিকা তাহা সেই লোক দুটিকে দিল। তাহারা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বালিকা দ্বারবানদিগকে ডাকিয়া তাহারা যে বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া দিল। কিন্তু পিতার নিকট কিছু বলিল না, মাতাকেও তাহা বলিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিল। কি জানি, রাজা যদি রাগ করিয়া গরিব দ্বারবানদিগকে কোন শাস্তি প্রদান করেন।

দ্বারবানদিগের বস্তুতঃ কোন দোষ ছিল না। এ সেই বুড়া মুকুন্দরামের কাজ। মুকুন্দরাম দানের বড় বাড়াবাড়ি দেখিয়া অন্য উপায় না পাইয়া, প্রহরীদিগকে পাহারা একটু কড়াকড় করিতে বলিয়াছিলেন। এখন তাহাদের মুখে সমস্ত শুনিয়া মুকুন্দরাম অনক্কোপার হইয়া, চাকুরিতে জবাব দিবেন, কি না বলিয়া কহিয়া দেশান্তরী হইবেন, অথবা আত্মহত্যাই করিবেন, ইহা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে অতিথিশালার অধ্যক্ষ আসিয়া বলিল, "মহাশয়, কর্দ্দ না বাড়াইলে আর চলে না, আমরা মারা যাই!"—"চলে না! সে কি কথা এত দিন চলিয়া আসিল আর আজ বল চলে না"—মুকুন্দরাম যত কিছু কহি

আসিয়া কিন্তু মুকুন্দরাম গালে মুখে চড়াইতে আরম্ভ করিলেন, রাগে আপনাকেই আপনি একটা কটু গালি দিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কি করিবেন, রাজাজ্ঞা অমান্য করিবার ক্ষমতা নাই। আদেশমত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পদিন মধ্যে সব ঠিক্ হইল। রাজা মাধুরীকে সংবাদ দিলেন। বালিকার আনন্দের সীমা রহিল না।

দেখিতে দেখিতে কত রোগী আসিয়া সেইখানে আশ্রয় লইল। বালিকার বিস্তর কাজ বাড়িয়া গেল। রোগীদিগের তত্ত্বাবধান করিতে, তাহাদের পথ্যের ব্যবস্থা করিতে, শুশ্রূষার উপায় করিতে সকল দিন আহার নিদ্রার সময় ঠিক থাকিত না। হয় ত কাহাকেও নিজেই জল আনিয়া দিতেছেন, যে যন্ত্রণায় বড় ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহাকে আপনিই পাখার বাতাস করিতেছেন, কেহ অবসন্ন ভেবে অচৈতন্য হইয়া আছে, তাহার শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে কোমল হাত খানি তাহার কপালে বুলাইতেছেন। সকলে ভাবিত, একি মাধুরী না মনুষ্যাকারে কোন স্বর্গের দেবকন্যা! সেই রোগনিবাসে যে আসিত, সেই তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। বালিকা যখন সেই গৃহে আসিত, তাহার পবিত্র নিশ্বাসে তথাকার দূষিত বায়ু দূরে পলাইত। রোগীর মুহূর্ত্তের জন্য সকল যন্ত্রণা দূরে যাইত, তাহারা শান্তিময়ী সাক্ষাৎ আশাদেবীকে সুমুখে দেখিয়া পুলকিত হইত। যাহার চক্ষু মেলিবার সামর্থ্য থাকিত না, সেও তখন একবার জোর করিয়া চাহিয়া সেই পবিত্রমূর্ত্তি দেখিয়া আশায় বুক বাঁধিত। ঔষধ বা চিকিৎসার গুণে যত হউক না হউক, বালিকার সস্নেহ শুশ্রূষায় রোগীগণ শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিত।

রাজা যার তার মুখে কন্যার অলৌকিক গুণের কথা শুনিতেন, আনন্দে চক্ষে অশ্রু উথলিয়া উঠিত। রাণীর কিন্তু একটা বড় আশঙ্কা উপস্থিত হইল। কি জানি, সদাই রোগীর সঙ্গে থাকিয়া যদি তাঁহার বাছারই কোন রোগ জন্মে! সে কথা মনে ভাবিতেও তিনি শিহরিয়া উঠিতেন। রাণী সদাসর্ব্বদা তাহাকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিতেন, তাহাতে কিন্তু পরদুঃখকাতরার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিত। তাহার সেই দুঃখমলিন মুখখানি দেখিলেও রাণী অস্থির হইয়া পড়িতেন। কাজেই আর নিষেধ করিতেও প্রবৃত্তি হইত না।

রাণী এক দিন রাজাকে গিয়া তাঁহার আশঙ্কার কথা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "ছিঃ তুমি অল্পবুদ্ধি, তাই বুঝিতে পার না। দেখিতেছ না, ও ত মেয়ে নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী কার শাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া এখানে আসিয়া জন্মিয়াছেন।"

রাণী অমনি রাজার মুখে হাত দিয়া বলিলেন, "ষাট, ষাট, অমন কথা মুখে আনিতে নাই। ও আমার লক্ষ্মীর দাসী।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আরও দুই বৎসর চলিয়া গেল। মাধুরী দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইয়া ত্রয়োদশে পড়িল। মেয়ে মানুষের এই বয়স হইতে—যে অতি কুৎসিত,—তাহারও একটু সৌন্দর্য্য বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়, সৌন্দর্য্যের সেই কবিতাময়ী মূর্ত্তি মাধুরীর কথা তবে আর কি বলিব? তাহার আজিকার সেই ঈষৎ ব্রীড়াসঙ্কোচ মনোমুগ্ধকরশোভা দেখিয়া সবাই বুঝিল, সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা কেবল রূপে নহে,—সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা রূপে এবং লজ্জায়। মাধুরী এখন আর যখন তখন যেখানে সেখানে যায় না, যায় তার সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহে না, চাহিতে সে লীলাচঞ্চল চক্ষু একটুতেই কোমল আবরণে ঢাকিয়া পড়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গপরিপুষ্টি ও সেই লাজগম্ভীর ভাব দেখিয়া রাজারাণী বিস্মিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য, সেই চির আদরের পুতলীকে পূর্ব্বের ন্যায় তেমন করিয়া সর্ব্বদা কাছে ডাকিতে রাজার কেমন বাধ বাধ ঠেকে, মেয়ের সমুখে রাজার কাছে আসিতে হইলে রাণীও কেমন আর মাথার কাপড় খানা ভাল করিয়া টানিয়া না দিয়া আসিতে পারেন না। মাধুরীও পিতামাতাকে একত্র দেখিলে একটু এদিক্ ওদিক্ করিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া আসে। রাজারাণী উভয়েই বুঝিলেন, মেয়ে আর আইবুড় রাখা ভাল দেখায় না।

রাজার বড় ইচ্ছা ছিল, তিনি অষ্টমেই গৌরীদান করেন, কিন্তু রাণীর কিছুতেই মত হইল না। তিনি বলিতেন, একটমাত্র মেয়ে, তার কচি বয়েস—এখন কোথায় আদর যত্ন করিব, নিজের হাতে খাওয়াইব পরাইব, তাহা না হইয়া কোথায় পরের ঘরে পাঠাইয়া দিব? কে দেখিবে, কে আবদার সহিবে? কেই বা তাঁহার মত করিয়া তাহাকে লালনপালন করিবে? তিনি বিশ্বাস করিয়া কোনও দাসীর হাতে তাহার পরিচর্য্যার ভার দেন না, রাজার কাছে রাখিয়াও বেশ সুস্থমনে থাকিতে পারেন না, এক দণ্ড না দেখিলে সব শূন্য বলিয়া বোধ হয়—তিনি কি সেই মেয়ে এই বয়সে পরের হাতে দিয়া

দিতে পারেন? রাজা যে এ সব কথা না বুঝিতেন, তাহা নহে; তিনি নিজেও কন্যাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিতেন; কাজেই সাত পাঁচ ভাবিয়া সে সম্বন্ধে আর কোন কথা পাড়িলেন না। তার পর, একাদশ বর্ষে কন্যার বিবাহ দিতে রাজার আর এক বার ইচ্ছা হইয়াছিল। সে কথা রাণীর নিকট উত্থাপন করিলে তিনি ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোমার ও কি কথার শ্রী! মেয়ে কি আমার এতই বুড়া হইয়াছে?" রাজা বলিলেন, "তাহা বলিতেছি না, তবে এখন তোমার ইচ্ছা।" রাণীর ইচ্ছা হইল না, সুতরাং রাজাও আর সে জন্য তখন বিশেষ কিছু চেষ্টা করিলেন না। তার পর, দুই বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে। অবশ্যই যে একাদশে বুড়া হয় নাই, ত্রয়োদশে কখনই তাহাকে বুড়া মনে করা যায় না। রাণীর বিশ্বাস, তাঁহার মেয়ে আজিও তেমনি ছোটটিই আছে—তাহার কিসের বয়স? কিন্তু তবু তিনি আজ বিবাহের কথার সায় না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই মঙ্গলের কথায় মত করিতেও হৈমবতীর কান্না আসিল। তিনি বলিলেন, "আমি মাধুরীকে ছাড়িয়া থাকিব কেমন করিয়া?"

দেবীবর বলিলেন, "আমিই কি তাহা পারিব?"

"সে কি কথা; মেয়ে যতক্ষণ আইবুড় থাকে, ততক্ষণই বাপমার, তার পর বিবাহ দিলেই সে পরের হইয়া যায়। না ছাড়িয়া থাকিয়া করিবে কি?"

দেবীবর বলিলেন, "কাজ কি আমার রাজপুত্র জামাতায়? আমার যাহা আছে, সবই তো মাধুরীর। আমার ইচ্ছা, নির্দ্দোষ কুলশীল, আর ছেলেটি রূপে গুণে চরিত্রে ও লেখাপড়ায় সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হয়, এমন দেখিয়া বিবাহ দিই। তাহা হইলে তাহাকে গৃহে রাখিতে পারিব, মাধুরীও আমাদের কাছ-ছাড়া হইবে না।"

শুনিয়া হৈমবতী আনন্দে গলিয়া গেলেন। তাঁহারও মনের ইচ্ছা তাহাই, কিন্তু কি জানি যদি স্বামী রাগ করেন, সেই ভয়ে এতক্ষণ তাহা বলিতে সাহস হইতেছিল না।

পত্নীকে নীরব দেখিয়া দেবীবর বলিলেন, "কি বল?"

রাণী বলিলেন, "তুমি কি অন্তর্য্যামী, নহিলে দাসীর অন্তরের কথা কেমন করিয়া বলিয়া ফেলিলে?"

দেবীবর কথাটা দেওয়ান মুকুন্দরামকে ডাকিয়া বলিলেন। বুড়া মুকুন্দরাম ভাবিল, "সত্যই তো, এত বড় একটা কথা এত দিন আমার মনেই আসে নাই!"

তৎক্ষণাৎ ঘটকের দলে খবর পৌঁছিল। সংবাদ পাইবামাত্র কাপড়ের পুঁটুলি কোমরে বাঁধিয়া, জুতা হাতে ছাতিবগলে অসংখ্য ঘটকের দল দেশ বিদেশে বাহির হইল। উচ্চ বিদায়ের লোভে দেখাদেখি অনেক চাটুর্য্যে বাঁড়ুর্য্যেও গৃহিণীকে আশ্বাস দিয়া, ঘটক সাজিয়া তাহাদের পিছু লইল। মুকুন্দরাম রাজার আদেশ মত, সকলকে কিরূপ পাত্রের আবশ্যক, তাহা বেশ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা যেখানে যায়, সেখানে গিয়াই আগ্রহের সহিত বাড়ী বাড়ী ছেলের অনুসন্ধান করে। ক্রিয়াবাড়ী, বারোয়ারি তলায়, স্কুলের পথে কোন্ ছেলে বাহির হয়, কে দেখিতে কার্ত্তিকটির মত, এই সব সন্ধানের জন্য ওৎ করিয়া বসিয়া থাকে। চটিতে চটিতে গিয়া যাহাকে পায়, তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, হাটবারে হাটের ধারে অশথ গাছের গোড়ায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। দেখিয়া লোকের কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল। দেশময় ছেলে-ধরার একটা হুজুগ উঠিল। স্কুল পাঠশালায় ছোট ছোট ছেলে পর্য্যন্ত পাঠান অনেকে বন্ধ করিল। বিশেষ যে জাতিতে ব্রাহ্মণ, আর তার ছেলেটি দেখিতে ভাল, সে তাহাকে একেবারে ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিল। প্রতিবেশীরাও তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, সে তাহার মামার বাড়ী গিয়াছে।

তা, কত সম্বন্ধ আসিল, কত ছেলের কথা আনিয়া ঘটকেরা দেওয়ানের কাছে তাহার রূপগুণের ব্যাখ্যা করিল। বুড়া মুকুন্দরাম বড় পাকা লোক, ঘটকদিগের কথার উপর তাহার ততটা বিশ্বাস ছিল না। তাহার জেরার মুখে অনেক শর্ম্মারই মিথ্যা ধরা পড়িল। তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, বাকি কয়েকটির বিষয় অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়া, তাহা রাজার নিকট বলিলেন। রাজা তাহার অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। অনুসন্ধানে তাহা হইতে আবার অনেক গুলি খারিজ করিতে হইল। শেষে রহিল দুটি কি চারিটি। রাজা তখন নিজে তাহার তথ্য লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। একটিও মনঃপূত হইল না। কেহ হয় ত রূপে কার্ত্তিকতুল্য, কিন্তু বোকার একশেষ; কেহ বা রূপবান্ ও গুণবান্ দুই বটে, কিন্তু চরিত্রে অতি কুৎসিত; কাহারও বিদ্যাবুদ্ধি চরিত্র আর আর সব ভাল, কিন্তু বড় একটু ময়লা। দেখিয়া দেখিয়া রাজা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু একটিও পছন্দসই পাত্র মিলিল না। ঘটকদিগকে রাজা দ্বিগুণ পুরস্কার হাঁকিলেন, তাহারাও আবার দ্বিগুণ উৎসাহে পঙ্গপালের ন্যায় গ্রামে গ্রামে পড়িয়া নিরীহ বাসিন্দাদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

বেলডাঙ্গা হইতে মনোহরপুর বড় অধিক দূর নয়। কথাটা যখন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন অবশ্য দুর্য্যোধন খুড়ার শুনিতে বাকি রহিল না। তিনি ঠাহরিলেন, এই এক মস্ত দাঁও। অনেকবার অনেক রকম মিথ্যা করিয়া দায় জানাইয়া তিনি দেবীবর রায়ের নিকট বিস্তর টাকা লইয়াছেন। যদি দুর্গার ইচ্ছায় এই দাঁওটা লাগাইতে পারেন, তাহা হইলে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পায় উপর পা দিয়া বসিয়া খাইবার মত একটা সংস্থান করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু এ দাঁও লাগে কেমন করিয়া? যেখানে তাঁর যত ছেলে জানা ছিল, একে একে সকলের কথা মনে করিলেন, কোনটিই তত সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইল না। হঠাৎ ভুবনের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি জানিতেন, রূপে গুণে অমন ছেলে হাজারের মধ্যে একটিও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তবুও একবার বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলেন। বিফল হইবার বিশেষ কোনও কারণ দেখিলেন না। দুর্য্যোধন খুড়া আসিয়া মুকুন্দরামকে পাত্রের সংবাদ দিলেন। মুকুন্দরাম বলিলেন, "বেশি কথা কহিও না, ঠাকুর, যার তার সম্বন্ধ নয়, রাজকুমারী মাধুরীর বিবাহ, যদি যোগ্যপাত্র হয়, তবেই কথা পাড়িও, নহিলে অনর্থক হায়-রাণ করিও না।"

দুর্য্যোধন খুড়া সাহস করিয়া বলিলেন, "তা—তা আর জানি না? সে পাত্র (বুঝলে কি না) নিখুঁত, তার যোড়া নাই। আর (বুঝলে কি না) রাজকুমারীর যথার্থই যোগ্য।"

মুকুন্দরাম বলিলেন, "বুঝলেম বটে, কিন্তু বলিতেছিলেন, তাঁর পিতা বিদেশে, তবে কথা কহিব কার সঙ্গে?"

হুঁ। তা, সে জন্য চিন্তা কি? (বুঝলে কি না) আমিই পত্র লিখিয়া সব ঠিক্ করিব। রাজি হইবে না? সেও কি কথা? অ্যাঁ—বুঝলে কি না।

মুকুন্দরাম বলিলেন, "তবে এখন যাও ঠাকুর, তোমার পত্রের জবাব আসিলে তার পর আসিও।"

দুর্য্যোধন খুড়া কাজেই চলিয়া আসিলেন। হরিহরকে সবিশেষ বিবরণ লিখিলেন। হরিহর দেবীরায়ের নাম বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সেই বিদেশে থাকিয়া তথাকার বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট দেবীরায়ের অলৌকিক গুণের কথা বলিতে বলিতে মোহিত হইয়া যাইতেন। সেই দেবীরায়ের অলোকসামান্যা একমাত্র কন্যার সহিত তাঁহার—তুলনায় কীটস্য কীট তিনি—তাঁহার পুত্রের সম্বন্ধ! প্রথম পত্র পড়িয়া হরিহর ভাবিলেন, খুড়া কি ক্ষেপিয়াছে? তিনি

দুর্য্যোধনের পত্রের অন্যান্য জবাব দিলেন, কিন্তু আসল কথা সম্বন্ধে কিছু লিখিলেন না। দুর্য্যোধন ব্যস্ত হইয়া তদ্বি করিয়া আর এক পত্র লিখিল। তখন, কাজেই হরিহর তাঁহাকে চেষ্টা দেখিতে লিখিলেন, এবং নিজেও যে শীঘ্র বাড়ী আসিতেছেন, তাহাও জানাইলেন। দুর্য্যোধন ছুটিয়া গিয়া সে কথা মুকুন্দরামকে জানাইল। মুকুন্দরাম বলিলেন, "ভাল, তিনি বাড়ী আসুন।"

হরিহর বাড়ী আসিলেন। দুর্য্যোধনের রাজবাড়ীতে আনাগোনা পড়িয়া গেল। অন্যে যাহাতে ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারে, এননই চাপিয়া চলিতে লাগিলেন। হরিহরকেও স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন, দেশের লোক জন বড় খারাপ, কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না, খুব সাবধান! যেন ইহার বাষ্পও কেহ টের না পায়। ভাইপো খুড়া অপেক্ষা আরও চাপিয়া চলিতে লাগিলেন। এত তাড়াতাড়ি দেশে আসিয়াই যে বাড়ীখানা করিবার মতলব, তাহা খুড়া ভাইপো দুইজনে পরামর্শ করিয়াই করিয়াছিলেন। ছেলে যো পছন্দ হইবারই কথা, তার উপর যদি বাড়ী ঘরখানার একটু চটক থাকে, তাহা হইলে সম্বন্ধটা হাতছাড়া হইবার আর বড় একটা ভয় থাকে না। বিশেষ, রাজাই না হয় সে দিকে লক্ষ্য না করুন, কিন্তু পাঁচ জনেও তো কাণ ভাঙ্গাইতে পারে। এসব পরামর্শ নিভৃতে কেবল খুড়া ভাইপোতেই হইত, তারাসুন্দরীও ইহার কিছুই জানিতেন না। হরিহর ইতিপূর্ব্বে একদিন নিমন্ত্রণরক্ষার ছল করিয়া নিজেও বাড়ীখানা দেখিয়াছিলেন। রাজার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। রাজাও সেই অবধি গোপনে ছেলেটির সমস্ত সংবাদ লইতে আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দরাম নিজে একদিন গঙ্গাস্নানের নাম করিয়া কাশীপুরে গিয়া ভুবনকে দেখিয়া আসিল। চাঁদপানা ছেলে। বুড়া আসিয়া রাজার কাছে শতমুখে সুখ্যাতি করিতে লাগিল। রাজারাণী উভয়েরই মত হইল। দুর্য্যোধন নিত্যই তেমনি রাজবাড়ীতে হাঁটাহাঁটি করিতেন। যে দিন মুকুন্দরাম আসিয়া সংবাদ দিল, রাজা সম্মত হইয়াছেন, শীঘ্রই প্রধানত পাত্র দেখিতে যাওয়া হইবে; সে দিন আর খুড়া মহাশয়ের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। হরিহরেরও সে কথা শুনিয়া আনন্দে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল. সেই আনন্দবেগ সামলাইতে না পারিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি ভার্য্যা তারাসুন্দরীকে সব কথা বলিতে গেলেন।

তার পর, যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়াছি।

দানব নামে প্রসিদ্ধ। দেবদলের ও অসুরদলের সাধারণ শত্রুতাই দানবসংজ্ঞায় আখ্যাত হইত। আমাদিগের দেশে দেবশব্দ উত্তমার্থে ও অসুরশব্দ মন্দার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু পারসিকেরা উল্লিখিত উভয় শব্দ বিপরীত অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এতদ্দেশীয় ধর্মশাস্ত্রে দেবগণের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, পারসিক ধর্মশাস্ত্রকারেরা অসুরবর্গের সেই সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, ধর্মবিরোধ হেতু উভয়দলের সামাজিক রীতি-নীতি বিলক্ষণ বিভিন্ন হইয়া উঠে। সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্ত্তনে যেমন ধর্ম্মের ভিন্নতা ঘটে, ধর্ম্মের ভিন্নতা ঘটিলেও তদ্রূপ সামাজিক আচার-ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। দেবদল সোমরসপানে অত্যন্ত ছিলেন, অসুরেরা মাদক-সেবন ঘৃণার্হ জানিয়া সোমরসের অত্যন্ত নিন্দা করিতেন; উভয়দলের মধ্যে কালক্রমে এইরূপ অনেক রীতি-নীতির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল।

বহুকাল সংগ্রামের পরে দেবদল ভারতবর্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন, ও অসুরদল পারস্যদেশে বাস করিতে থাকেন। ইহার অল্পকাল পরেই অসুরবংশে মহাপুরুষ স্পিতামা জরথস্ত্র আবির্ভূত হন। ভৃগু, জাবালি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যাদৃশ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, মহাপুরুষ স্পিতামা জরথস্ত্রও পারসিক ধর্ম্মের সেই প্রকার উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এব্রাহিম, মুসা, গৌতম, যীশু, মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, স্পিতামা জরথস্ত্রও সেই স্থানের অধিকারী। এসিয়ার প্রায় প্রত্যেক দেশেই এক এক ধর্ম্মের ও এক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতবর্ষের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করা অনাবশ্যক; এদেশে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বোধ হয়, তত অধিকসংখ্যক মহাপুরুষ আর কোনও দেশেই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ক্রমাগতই এদেশে মহাপুরুষের জন্ম হইতেছে; ঋষিদিগের পরবর্ত্তী কালে শাক্য, শঙ্কর, চৈতন্য ও নানক প্রভৃতি কত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে অন্তঃক্ষেত্র আনন্দসলিলে আপ্লুত হইয়া পড়ে। চীনে কংফুসিয়স্, তুরফে যীশু, ও আরবে মহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিধাতা পারস্যদেশকেও মহাপুরুষপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত রাখেন নাই; প্রায় সকল দেশের প্রথমেই পারস্য দেশে মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে। মহাপুরুষ স্পিতামা জরথস্ত্র ঠিক কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। প্রায় সকল মহাপুরুষের প্রকৃত নামের সহিত আচার্য্যবাচক একটি নাম থাকে। খৃষ্ট, বুদ্ধ,

চৈতন্য প্রভৃতি নাম তাহার দৃষ্টান্তস্থল। জরথস্ত্র নাম তদ্রূপ আচার্য্যবাচক বলিয়া, মহাত্মা স্পিতামার উত্তরাধিকারী পুরোহিতগণও উক্ত নামে অভিহিত হইতেন; তদ্ধি বন্ধন পারসিকধর্ম্মাবলম্বী ইদানীন্তন কোন কোন লেখক স্পিতামার আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, খৃষ্টীয় শকারম্ভের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা স্পিতামা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের মতে স্পিতামা জরথস্ত্র বুদ্ধদেবের সম-সাময়িক; কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যে ভ্রমপ্রমাদমূলক, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্পিতামা জরথস্ত্রের পরবর্ত্তী পারসিক আচার্য্যগণ "জরথস্ত্র" নামে অভিহিত হইতেন বলিয়া, তিনি শাস্ত্রে "জরথস্ত্রোত্তম" নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। বেদের প্রাচীন অংশে যখন তাঁহার ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—প্রাচীন আর্য্যবাসভূমিতে তাঁহার যশঃসৌরভ বিকীর্ণ হইয়াছিল, এ কথা যখন পুরাবৃত্তে পাঠ করা যায়, তখন তাঁহাকে কি প্রকারে বুদ্ধের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে? খৃষ্টাব্দের ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে লিডিয়াবাসী গ্রীক লেখক হ্যাহস্ বলিয়াছেন, মহাত্মা জরথস্ত্র ট্রয়-সমর সংঘটিত হইবার ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যদি খৃষ্টাব্দারম্ভের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্পিতামার আবির্ভাবকাল হইত, তাহা হইলে শতবর্ষ অতীত হইতে না হইতে সুপণ্ডিত হ্যাহস্ যে উল্লিখিত প্রকার ভ্রান্তসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ইহা কখনই মনে করা যায় না। আরিষ্টটল্ ও ইউডক্সস্ প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকেরা বলেন, ট্রয়সমরের পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্পিতামা জরথস্ত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ট্রয়সমরের কালনির্ণয়সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকাতেই বোধ হয়, তাঁহাদিগের গ্রন্থে ঈদৃশী উক্তির সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত প্লিনি, মুসার ধর্ম্মের সহিত জরথস্ত্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের উপমা করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন, মুসা জন্মগ্রহণ করিবার কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জরথস্ত্রের জন্ম হইয়াছিল। অনেকে তাঁহাকে য়াহুদীজাতির পূর্ব্বপুরুষ এব্রাহিমের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করেন। মহাত্মা জরথস্ত্র ও তদীয় শিষ্যানুশিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক যে ধর্ম্মশাস্ত্র বিরচিত হয়, উত্তরকালে লেখকগণ তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক বিবিধ সাহিত্য-গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত সাহিত্য খৃষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বেই সম্পূর্ণাঙ্গ ও বিলক্ষণ শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কোনও সাহিত্য সম্পূর্ণাঙ্গ ও বিলক্ষণ শ্রীসম্পন্ন হইতে বহু শতাব্দী অতীত হইয়া যায়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হয়, মহাত্মা স্পিতামা

সেই সকল ঋষির প্রতি সম্মান রক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। অঙ্গিরা ও অথর্ব্বান্ ঋষি অগ্নিপূজক ছিলেন, তাহারা অথর্ব্ববেদের লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেবদলভুক্ত আর্য্যদিগের সহিত তাঁহারা যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মভাবের সহিত পারসিক ধর্ম্মভাবের বিলক্ষণ যোগ। ইহাতে অনুমান হয়, ইঁহারাই অহুর ধর্ম্মের আদি সংস্থাপক। অথর্ব্ববেদের সহিত পারসিক শাস্ত্র বেন্দিদাদের যে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও কারণ এতদ্বারা অনেক পরিমাণে নির্দ্দেশিত হইতে পারে। যজুর্ব্বেদোক্ত গায়ত্রী-আসুরিক, পঙ্‌ক্তি-আসুরিক প্রভৃতি সাতটি আসুরিক মন্ত্র কি হেতু জেন্দ-আভেস্তার অন্তর্গত গাথায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ইহাতে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যাহা হউক. দেবদলভুক্ত আর্য্যদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার পর হইতেই অসুরগণের ঈশ্বরজ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। অবশেষে তাঁহাদিগের বংশে মহাপুরুষ জরথুস্ত্র আবির্ভূত হন। নবীন-ধর্ম্মতত্ত্ব ও নবীন-ধর্ম্মভাব প্রচার করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি অগ্নিপূজক পুরোহিত-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু বহু-ঈশ্বরবাদে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। একমাত্র অহুরা-মাজ্‌দাই তাঁহার উপাস্য ছিলেন। অহুরা-মাজ্‌দাশব্দের প্রকৃত অর্থ পরমেশ্বর। সেই পরমেশ্বর যে সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, প্রেমিক ও পুণ্যময়, ইহা জরথুস্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে মনুষ্য প্রার্থনা করিলে, তিনি যে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন, এ বিশ্বাসের পরিচয় জরথুস্ত্রের উপদেশাবলীতে প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্মার অমরত্বে ও পরলোকের অস্তিত্বে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। জরথুস্ত্রপ্রণীত গাথায় ও সমগ্র আভেস্তা-সাহিত্যে ঐ বিশ্বাসের জাজ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। পারসিক ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বর্গ ও নরকের উল্লেখ আছে। উক্ত শাস্ত্রে স্বর্গ, "সঙ্গীতাবাস", ও নরক, "বিনাশাগার" নামে আখ্যাত। উল্লিখিত নবীন-ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাব লইয়া মহাত্মা স্পিতামা জরথুস্ত্র অহুরধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। অগ্নিপূজকেরা যখন নানা স্থান হইতে সমবেত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের পূজা করিতেন, মহাপুরুষ স্পিতামা তৎকালে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাদিগকে প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুরা-মাজদার শক্তিপ্রকাশ অনুভব করিতে বলিতেন, ও মধুর তেজস্বিনী ভাষায় জড়বাদ ও বহুঈশ্বরবাদের অসারতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেন। অসংখ্য লোক অবহিতচিত্তে সেই স্বর্গীয় পুরুষের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। মহাত্মা জরথুস্ত্র আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া বোধ করিতেন। ঈশ্বরের বাণী ও আদেশ শ্রবণ

করিতেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি বিংশতি সহস্র ধর্ম্মমূলক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। ৯৫০ খৃষ্টাব্দে মাসুদি নামক এক মুসলমান ইতিহাসলেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তিনি বলেন, জরথস্ত্র প্রথমতঃ আভেস্তা গ্রন্থ রচনা করেন; পারসিকেরা তাহার মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় তিনি পুনরায় তাহার ব্যাখ্যামূলক জেন্দ নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথম খানি আভেস্তা ভাষায়, ও দ্বিতীয় খানি পহ্লবী ভাষায় বিরচিত। বোধ হয়, এই জন্য সমগ্র পারসিক ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম জেন্দ-আভেস্তা হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সমগ্র পারসিক ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইবার জন্য বিস্তর আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা পারসিক-শাস্ত্র-শিক্ষার্থী হইয়া কীদৃশ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইলে পাঠকেরা বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন। ডুপেরো নামক এক ফরাসী পণ্ডিত, জেন্দ-আভেস্তার বিষয় জানিবার জন্য, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, ফরাসী বণিকদিগের জাহাজে সামান্য নাবিকের ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক, ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের পশ্চিমোকূলে উত্তীর্ণ হন। পারসিক পুরোহিতেরা প্রথমতঃ তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধে কোনও কথা ব্যক্ত করেন নাই। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ী পুরুষ ছিলেন বলিয়া, ফরাসী গভর্নমেণ্টের সহায়তায় সাত বৎসর তথায় অবস্থান পূর্ব্বক, আভেস্তা ও পহ্লবী ভাষা শিক্ষা করিতে সমর্থ হন, ও প্রচুর অর্থে ১৮০ খানি পারসিক শাস্ত্রগ্রন্থ ক্রয় করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। বলা বাহুল্য, ঐ সকল গ্রন্থ তৎকালে মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে জেন্দ-আভেস্তা সম্বন্ধীয় তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই ঘটনার পর হইতেই ফ্রান্স, ডেন্মার্ক ও জর্ম্মণির অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা, উক্ত বিষয়ের তত্ত্বসমূহ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের চেষ্টাও প্রচুর সুফল প্রসব করিয়াছে।

মাসিডনাধিপতি আলেক্‌জণ্ডার পারস্য আক্রমণ না করিলে পারসিক ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের বিপর্য্যয় ঘটিত না। ডায়োডোরস্ ও কর্টিয়স্ প্রভৃতি ইতিহাসলেখকেরা বলেন, আলেক্‌জণ্ডার পারস্য জয় করিলে পর, থাইস্ নামক তদীয় এক পারিষদ, তাঁহাকে পার্সিপোলিসের রাজপ্রাসাদ দগ্ধ করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। জারাক্সস্ নামক পারস্যরাজ গ্রীস আক্রমণকালে গ্রীকদিগের দেবমন্দিরসমূহে অগ্নিপ্রয়োগ করিয়াছিলেন; তজ্জন্যই থাইস্ প্রতিশোধলিপ্সু হইয়া আলেক্‌জণ্ডারকে উল্লিখিত দুষ্কর্ম্মে উত্তেজিত করেন। মাসিডনরাজ তৎকালে সুরাপান করিয়া প্রমত্ত হইয়াছিলেন; তিনিও হিতাহিতবিবেচনাপরিশূন্য

হইয়া, আকস্মিক উত্তেজনাবশতঃ, একদা গভীর রজনীতে পারস্যপতির প্রাসাদে অগ্নিপ্রয়োগ করেন। ঐ প্রাসাদে দুই খানি মাত্র পারসিক ধর্ম্মশাস্ত্র সুরক্ষিত ছিল। ইতিহাসলেখকেরা বলেন, এক খানি গ্রীকদিগের দ্বারা অপহৃত হইয়াছিল; আলেক্‌জণ্ডার কর্ত্তৃক রাজপ্রাসাদে অগ্নিপ্রয়োগ হইলে, অপর খানিরও অনেকাংশ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। সাসানিয়ান বংশীয় নৃপতিগণ, সমগ্র পারসিক শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা করেন; তাঁহাদিগের চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে ফলবতী হইয়াছিল। অবশেষে পারসিকেরা মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হন। তাঁহাদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াই পারসিকধর্ম্মাবলম্বী অনেক গুলি লোক ভারতের পশ্চিমোপকূলে আসিয়া আত্মরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা করেন। অবশিষ্ট লোকেরা পারস্যে অবস্থান পূর্ব্বক, মুসলমানদিগের দ্বারা নিগৃহীত হইতে থাকেন। তৎকালে ভারতপ্রবাসী পারসিকেরা শাস্ত্রবিধি জানিতে হইলেই পারস্যস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বী আচার্য্যদিগের উপদেশপ্রার্থী হইতেন। ভারতের বর্ত্তমান পারসিকগণ উল্লিখিত ভারতপ্রবাসী পারসিকগণেরই বংশধর। বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! যে আর্য্যজাতির দুইটি প্রধান দল পূর্ব্বকালে বিবাদের বশবর্ত্তী হইয়া আদিমবাসভূমি হইতে পৃথকীভূত হইয়াছিলেন, তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে শান্তিক্ষেত্র পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সম্মিলিত করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারাও ভারতীয় আর্য্যগণের কীর্ত্তিকলাপে বিমুগ্ধ হইতেছেন, আমরাও মহাপুরুষ স্পিতামা জরথুস্ত্রের মহত্ব অনুভব করিতেছি।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

কাহার ভ্রম?

বল্লভের প্রতি হিরণ্ময়ী।

তোমায় তখন দেখি নাই। জগতে সকলে যেমন তোমায় জানিত, আমিও সেইরূপ জানিতাম। যেমন সহস্র নরনারী তোমার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিল, আমিও সেইরূপ হইয়াছিলাম। সকলে যেমন তোমার গ্রন্থসমূহ পাঠ করিত, আমিও সেইরূপ পাঠ করিতাম। প্রভেদ ক্রমে ঘুচিল। কেবল পড়িয়াই তৃপ্তি হইত না, আরও জানিবার জন্য কৌতূহল হইত। পড়িয়া তৃপ্তির

অভাব নহে, তৃপ্তির সহিত অতৃপ্তি মিশ্রিত। চিত্ত, কল্পনা, মন গ্রন্থের বাহিরে গমন করিত।

মনে পড়ে, রাত্রি জাগরণ করিয়া একা তোমার গ্রন্থ পাঠ করিতাম। জ্যোৎস্নাপক্ষে ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী তিথিতে জ্যোৎস্নালোকেই পড়িতাম। ভাষার লালিত্য, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ভাবের সরসতা, কোমলতা, গাঢ়তা দেখিয়া যেমন পুলকিত হইতাম, হৃদয়তত্ত্বের অভিজ্ঞতা দেখিয়া সেইরূপ বিস্মিত হইতাম। কত প্রেম, কত আশা, কত সুখ পৃষ্ঠার পৃষ্ঠায় সঞ্চিত রহিয়াছে! তাহার মধ্যে কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা, কত কাতরতা জাগিয়া রহিয়াছে। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য-বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। তটভগ্নকারিণী তীব্র-বাহিনী স্রোতস্বিনী, জ্যোৎস্নাস্নাত নিশীথিনী, মলয়ান্দোলিত-স্ফুটকুসুম উপবন, ছায়াতরুপরিবৃত শীতলসলিল তড়াগ, বিহঙ্গকূজন, প্রভাতের ও সায়ংকালের শোভা এবং রহস্য, তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী, অন্ধকার গহ্বর, মনুষ্য-কোলাহল-পরিপূরিত নগর নগরী, একে একে চক্ষের সম্মুখ দিয়া যাইত। গ্রন্থ-বর্ণিত নরনারী যেন চিরপরিচিতের ন্যায় প্রতীত হইত, কাহারও সুখে সুখ, কাহারও দুঃখে দুঃখ, কাহারও ব্যবহারে আনন্দ, কাহারও ব্যবহারে ক্রোধ হইত। পড়িতে পড়িতে কখন চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত হইত, শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত, সে রাত্রে আর নিদ্রা হইত না। আপনার দুঃখ শোক ভুলিয়া যাইতাম, বাস্তব জগৎ বিস্মৃত হইয়া কল্পিত জগতে উপনীত হইতাম। অপূর্ব্ব সৃষ্টিকুশলী প্রতিভার কুহকে মুগ্ধ হইতাম।

প্রকৃত জগতে আর কল্পিত জগতে প্রভেদই বা কি। এই জগৎ, এই জীবন-সংগ্রাম, এই অর্থপিপাসা, দুই দিন পরে ত সকলই কল্পনায় পরিণত হইবে। যে রাজত্বের জন্য পুত্র পিতাকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে হত্যা করিতেছে, সে রাজত্ব কে ভোগ করে, সে রাজত্বের কি অবশিষ্ট থাকে ? কোনও রাজ্যের বংশধর পর্য্যন্ত চিরকাল থাকে না। যে মোগল সাম্রাজ্যের তুল্য দ্বিতীয় সাম্রাজ্য জগতে হয় নাই, সেই তৈমুরবংশীয় এখন কে অবশিষ্ট আছে ? সিসরের রাজবংশ কোথায়, সীজরের বংশ কি হইল ? এই যে কৃষাণ লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া মাঠে যাইতেছে, ইহাতে আর রাজরাজেশ্বরে প্রভেদ কি ? যদি এই জগৎকে মিথ্যা স্বপ্নতুল্য বিবেচনা করিয়া কল্পিত জগৎকেই সত্য বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে ক্ষতি কি ? কে তাহাকে ভ্রান্ত বলিতে সাহস করিবে ?

পাঠান্তে মনে হইত, এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির কোনও গভীর প্রদেশে একটা যেন

কাতর ধ্বনি আছে, সহজে শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে শুনিতে পাওয়া যায়। একটা হৃদয়ের অভাব, গভীর দুঃখের প্রতিধ্বনি যেন এই রচনার পশ্চাতে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। তখন সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া স্রষ্টাসম্বন্ধে কৌতূহল জন্মিল। যে ব্যক্তি এই অতুল প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সুখী না দুঃখী? অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তুমি একাকী, নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও, নূতনের জন্য সর্ব্বদাই অস্থির। তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হইল। তুমি যেমন একা, আমিও সেইরূপ একাকিনী। অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু আমি স্বতন্ত্রা, আমাকে কে নিষেধ করিবে?

প্রথমে যখন তোমাকে পত্র লিখিতে সাহস করি, তখন মনে কত আশঙ্কা, কত সঙ্কোচ উদিত হইয়াছিল! আমি অশিক্ষিতা, লিপিকৌশলশূন্যা, কোন সাহসে তোমাকে পত্র লিখিব! চারি দিকে তোমার যশের প্রতিধ্বনি, আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তোমার শ্রবণে পশিবে কেন? এমন কত শত পত্র নিত্য তোমার হস্তগত হয়, তুমি পাঠ কর কিম্বা না কর, উত্তর দিবার অবকাশ হয় না, ইচ্ছাও হয় না। চিত্তের প্রফুল্লতা সম্বরণ করিতে না পারিয়া পত্র লিখিলাম বটে, কিন্তু উত্তর পাইবার আশা কখনও করি নাই। অবশেষে যখন তোমার স্বহস্ত-লিখিত পত্র পাইলাম, সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইল, চক্ষের দৃষ্টি কিছুক্ষণ রহিত হইল। কতবার পাঠ করিলাম, কিছুতে তৃপ্তি হয় না। কেমন স্বচ্ছ, সরল ভাষা, অকপট আন্তরিক ভাব, কেমন বিনয়! বিস্ময়ানন্দে আমার চিত্ত পুলকিত হইল।

তুমি আপনি আসিয়া আমার দর্শন দিলে, আমার নয়নপথের পথিক হইলে। বিনয়াবনমিত নয়নে যখন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, তখন আমার মনে হইল, এই শান্ত সুন্দর পুরুষ কোথা হইতে এমন তেজস্বিনী প্রতিভা পাইল? মনে মনে লজ্জা হইল—কখন তোমায় দেখি নাই, তোমার সহিত পরিচয় নাই, কেমন করিয়া তোমার সহিত বাক্যালাপ করিব? কি বলিয়া তোমায় সম্ভাষণ করিব? তুমিই প্রথমে কথা কহিলে, মধুর বচনে কুশলজিজ্ঞাসা করিলে। তাহার পর কি কথা হইল, সকল কথা স্মরণ নাই; তুমি চলিয়া গেলে তোমার স্মৃতিসৌরভে যেন গৃহ পরিপূর্ণ হইল, তোমার কণ্ঠস্বর যেন শ্রবণে লাগিয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল, আবার কবে তোমায় দেখিব?

হিরণ্ময়ীর প্রতি বল্লভ।

কল্পনার অপেক্ষা সত্য কত সুন্দর। তোমার পত্র পাইয়া চিত্ত যেরূপ চঞ্চল হইয়াছিল, এরূপ পূর্ব্বে কখন হয় নাই। লোকমুখে যখন প্রশংসা শুনিয়াছি, মনে করিয়াছি যে, সে প্রশংসা আমার প্রাপ্য নহে। যদি আমার কোন ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সে প্রশংসা কি আমার প্রাপ্য ? আমি না পাইলে আর এক জন পাইত। যাহা দৈবাধীন, সে জন্য আত্মগৌরবের কোন কারণ নাই। কিন্তু আমার জন্য কে কবে ভাবিয়াছে ? আমি যে পুস্তক রচনা করি, লোকে তাহাই পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করে, এবং লেখকের প্রশংসা করে। কিন্তু যেমন সকল লোকের সুখ দুঃখ আছে, প্রশংসিত লেখকেরও যে সেইরূপ সুখ দুঃখ আছে, কয় জন বিবেচনা করে ? আমি কেন একাকী দেশে দেশে ভ্রমণ করি, কেহ কখন জিজ্ঞাসা করে ? আমি সুখী না দুঃখী, কেহ জানিতে চায় ? হৃদয়ের শোণিতাক্ষরে কত পৃষ্ঠা লিখিয়াছি, কেহ কি ভাবিয়া দেখে ? লোকে যেমন কৌতূহলের সহিত কোনও নূতন জন্তু অথবা অদ্ভুত বস্তু দর্শন করে, সেইরূপ আমাকে সকলে দেখে। লোকের চক্ষে আমি সুখপাঠ্য গ্রন্থসমূহ রচনা করিবার যন্ত্রমাত্র। আমার যে হৃদয় আছে, সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে, কেহ তাহা বিবেচনা করে না। তুমি পাঠ করিয়া নিবৃত্ত হও নাই, গ্রন্থের গভীরতম প্রদেশে হৃদয়ের যে শূন্যতা কাতরতা আছে, তাহা দেখিয়াছ। এই যে পত্র লিখিয়াছ, ইহাতে কেবল কৌতূহলের পরিতৃপ্তি নাই, রমণীহৃদয়ের গভীর বেদনার সহানুভূতি আছে। বলিতে লজ্জা নাই, তোমার প্রশংসায় যেমন আনন্দ অনুভব করিয়াছি, কোনও বিজ্ঞ সমালোচকের দীর্ঘ আলোচনায় এরূপ আনন্দ লাভ করি নাই। তুমি কেবল বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দ্বারা দোষ গুণের বিচার কর নাই, হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা অন্তর্নিহিত ভাবগ্রহণে সমর্থ হইয়াছ।

তোমায় প্রথম দেখিয়া বুঝিলাম, রূপের মোহিনী কল্পনাতীত। মূর্ত্তিমতী বাণীর ন্যায় যখন তুমি আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলে, কিয়ৎকাল আমি মূঢ়ের ন্যায় রহিলাম। সাহস করিয়া তোমাকে চাহিয়া দেখিতে পারি নাই। স্বর্গবীণা-ঝঙ্কারের ন্যায় তোমার কথা শুনিলাম, সেই শব্দে হৃদয়ের যেন কত নিদ্রিত তন্ত্রী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। জীবনের অসম্পূর্ণতা যেন সম্পূর্ণ হইল, হৃদয়ের শূন্য কক্ষ যেন লোকসমাগমে পরিপূর্ণ ও কোলাহলময় হইয়া উঠিল।

আবার তোমায় দেখিয়াছি। আমার অনুরোধে কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আবার তুমি আমার সমীপে আগমন করিয়াছিলে। জ্যোৎস্নানিশীথে উপবনপ্রান্তে সম্বস্রোত নদীতটে তোমায় দেখিলাম। জ্যোৎস্না অন্তঃপ্রকৃতির ন্যায় রহস্যময়ী, নদী অন্তঃসলিলা, অন্তর্দর্শনের উপযুক্ত সময়, অধিক কথোপকথনের উপযুক্ত সময় নহে। নয়নের অগাধ তরল অতলস্পর্শে প্রেমরাশি, হৃদয়ের প্রতিবিম্ব নয়নে তরল দর্পণে ভাসিতেছে। কথায় মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল না। কথা কহিলেও তেমন স্পষ্টরূপে মনোভাব ব্যক্ত হইত না।

তুমি দাতা আমি গ্রহীতা, অতএব আমারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আশ্রয়হীনকে তুমি আশ্রয় দিয়াছ, শান্তিহীনকে তুমি শান্তি দিয়াছ, যাহাকে লোকে ভাষা ও শব্দের ঐন্দ্রজালিক স্থির করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়, তাহাকে তুমি হৃদয়বান্ ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া তাহার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছ। সকলে ঋণ শোধ করা যায়, কিন্তু এ ঋণের শোধ নাই। কারণ হৃদয়ের যে উদারতা গুণে প্রথমে তুমি আমার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলে, তত্তুল্য জগতে কিছুই নাই।

কিন্তু আমি তোমার গুণের যোগ্য নহি, মনে এই আশঙ্কা হয়। যত দিন আমাকে দেখ নাই, হয় ত কল্পনায় আমাকে বহু গুণে ভূষিত করিয়াছিলে। কালে একত্রবাসে সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, লোকমুখে কত কথা শুনিবে, যাহাদের নিকট আমার প্রশংসা শুনিয়াছ, তাহারাই হয় ত আমার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইবে, তোমার বিশ্বস্ত হৃদয়ে ক্রমে সংশয় উৎপাদিত হইবে। সর্ব্বদাই জগতে দেখিতে পাইবে, কল্পনা কোমল, কিন্তু সত্য কঠোর। যত দিন আমাদিগের আলাপ হয় নাই, তুমি আমার হৃদয়ের একাংশ মাত্র জানিতে, তাহা দেখিবার তোমার প্রীতি জন্মে। এখন তুমি সমস্তই জানিবে, আমার দোষগুণ তোমার নিকট কিছুই গোপন থাকিবে না। তখন কি এমন দৃঢ় অনুরাগ থাকিবে, মনের এই অবস্থা থাকিবে? স্নেহের অভাবে আমার হৃদয় দুর্ব্বল, তোমার স্নেহে নির্ভর করিবার প্রলোভন প্রবল, কিন্তু তথাপি আমার এমন ইচ্ছা নাই যে, তুমি আত্ম-প্রতারিত হও।

এ সময় আশঙ্কা অথবা অবিশ্বাসের কথা কহা কর্ত্তব্য নহে। যে আনন্দে আমার হৃদয় পরিপ্লুত হইতেছে, তুমি বুঝিতে পারিতেছ। এত দিনে বুঝিতে পারিতেছি যে, যথার্থ সুখ, যথার্থ আনন্দ ভাষার অতীত, অনুভূতির বিষয়, বর্ণনীয় নহে। বচনাতীত আনন্দই পূর্ণ আনন্দ। জীবনের ক্ষীণ শুষ্কপ্রায় স্রোত

তোমার জীবনপ্রবাহে মিশিয়া বর্দ্ধিতকলেবর হইবা, তরঙ্গ তুলিয়া বহিতেছে। এতদিন যশের আশায় মিথ্যা কাল কাটাইলাম। যশ ক্ষণিক বায়ুবাহিত শব্দ মাত্র; যশের আশায়, যশ লইয়া কত দিন মানুষ জীবিত থাকিতে পারে, কত দিন তৃপ্তিলাভ করিতে পারে! তোমাকে পাইয়াছি, এই জন্য আমার চেষ্টা, আমার পরিশ্রম সার্থক। কল্পিত প্রতিভার বিনিময়ে জীবন্ত মূর্ত্তিমতী প্রতিভা পাইয়াছি। তুমি আমার গৃহে, আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর, কল্পনার অন্ধকার প্রদেশ সকল আলোকিত কর, আমি অভিনব আলোকে নূতন বৃত্তাবলী দেখিয়া চিত্রিত করি। তোমার প্রতিভার আলোকে আমার হৃদয় প্রভাসিত হউক।

বল্লভের প্রতি হিরণ্ময়ী।

এমন সুখের স্বপ্ন এত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল! যে সুখের আশায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম, যাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে সুখ মরীচিকার ন্যায় মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল! তোমাকে দোষ দিতেছি না। আমারই অদৃষ্টের দোষ, বুদ্ধির দোষ। যত বড় আশা করিয়াছিলাম, হৃদয়ে ততই দারুণ আঘাত লাগিয়াছে।

তোমার কি দোষ? তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল দীপশিখাতুল্য। কত পতঙ্গ সেই আলোকে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় তাহাতে পতিত হইয়া দগ্ধ হইতেছে, তুমি কাহাকে নিষেধ করিবে? তোমার আলোক অক্ষুণ্ণ হউক, যাহার ইচ্ছা মুগ্ধ হউক, মরুক। দুঃখ এই, দগ্ধ হইলাম কিন্তু মরিলাম না। অনলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, পুড়িয়া মরিলে কোনও দুঃখ ছিল না। কিন্তু দগ্ধপক্ষ হইয়া ভূমে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, এই দুঃখ। উড়িবার ক্ষমতা গিয়াছে, প্রাণ গেল না।

তোমার কি দোষ? তুমি কাহারও মুখাপেক্ষা কর নাই, কাহাকেও সুখ-দুঃখের সঙ্গী করিতে চাও নাই। আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, আত্মসুখাভিপ্রায়ে তোমার সমীপে আগমন করিয়াছিলাম। দোষ আমার, দুর্ব্বুদ্ধি আমার, তোমাকে কি বলিব?

যদি আমি অধিক সুখের আশা করিতাম, যদি আমার জন্য তোমাকে কোন বিশেষ ত্যাগস্বীকার করিতে বলিতাম, তাহা হইলে আমার দোষ গুরুতর হইত। কিন্তু তুমি স্বয়ং বুঝিয়া দেখ, আমি কি কখন তোমার হৃদয়ে সমগ্র স্থান অধিকার করিতে চাহিয়াছি, অনুরাগে অন্ধ হইয়া কখন কি আত্ম-

বিস্মৃত হইয়াছি? মনে কখন এমন অভিমান হয় নাই যে, আমার জন্য তুমি অন্য সুখ, অন্য কর্ম্ম, অন্য আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিবে।

তোমার জন্য আমি যে লোকাপবাদ স্বীকার করিয়াছি, তাহা তোমায় স্মরণ করিতে বলিতেছি না। আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমস্তই স্বীকার করিয়াছিলাম। তোমার প্রণয়ে ও লোকনিন্দার কোন তুলনা আমার মনে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তুমি কি কখন এ কথা ভাবিয়া দেখ নাই যে, তোমাকে দেখিবার পূর্ব্বে আমি যেমন ছিলাম, এখন তোমায় ত্যাগ করিলে পূর্ব্বাবস্থা আর ফিরিয়া আসিবে না? তোমার নিকটে থাকিয়া লোকের কথায় যেমন উপেক্ষা প্রদর্শন করি, তোমাকে ত্যাগ করিলে তেমন আর পারিব না?

তুমি আমাকে দুর্ব্বাক্য বল নাই, আমার সহিত কখন রূঢ় ব্যবহার কর নাই। তাহা হইলে মনে এরূপ ক্লেশ অনুভব করিতাম না, বুঝিতে পারিতাম, স্নেহের কিঞ্চিৎ লেশ তোমার হৃদয়ে আছে। কিন্তু দুই দিনের পর তুমি এমন উদাসীন হইলে যে, আমার প্রতি চাহিয়াও দেখিতে না। আমি আছি কি নাই, তোমার যেন স্মরণ নাই। তুমি আপনার চিন্তায়, আপনার কল্পনায়, আপনার প্রতিভা লইয়া ব্যস্ত থাক জানি, কিন্তু তোমার মুখ চাহিয়া যাহার দিনরাত্রি কাটিতেছে, তাহাকে কি এক বারও স্মরণ হইত না, যে তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, মুহূর্ত্তমাত্র তাহার চিন্তা করিবার অবসর হইত না? নির্দ্দয়, কল্পনাই কি জীবনের সারসর্ব্বস্ব, জীবনে কি হৃদয়ের কোন অধিকার নাই?

তোমাকে অভিমানভরে মন্দ কথা বলিতেছি, এমন বিবেচনা করিও না। তোমার কোন দোষ নাই, আমিই সম্পূর্ণ অপরাধিনী। বালক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ক্রীড়নকের ন্যায় আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি, আমার আপনার দোষে। কোন সাহসে তোমার হৃদয়ে স্থান পাইবার আশা করিয়াছিলাম? এখনও একটা স্পর্দ্ধার কথা মুখে আসিতেছে, অপরাধ লইও না। আর তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে না, এই জন্য বলিতেছি। এই যশোরাশির মধ্যে তোমার হৃদয়ের অভাব ছিল, আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তুমিও এ কথা স্বীকার করিয়াছিলে। সেই অভাব পূর্ণ করিবার আমার সাধ ছিল। রূপের মোহিনী নাই, গুণের মাধুরী নাই, কিন্তু হৃদয় সর্ব্বস্ব মুক্তহস্তে তোমায় দান করিতে আসিয়াছিলাম। আমার হৃদয় দিয়া তোমার শূন্যহৃদয় পূর্ণ করিব, মনে করিয়াছিলাম। পুরুষের প্রতিভা, রমণীর প্রণয় একত্রিত হইলে, কেমন ফল

কর, ইচ্ছা করিলে তুমি দেখিতে পাইতে। তোমার সে ইচ্ছা হইল না। আমি ব্যর্থমনস্কাম হইয়া ফিরিয়া যাইতেছি।

ফিরিয়াই যাইব। তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে বড় যন্ত্রণা—লোকের গঞ্জনা, হৃদয়ের বেদনা, অতীতের অনুশোচনা। কিন্তু তোমার সম্মুখে থাকিলে আরও যন্ত্রণা। তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইবে—কবেই বা আমায় মনে করিয়াছ? কল্পনাসমুদ্র হইতে নূতন রত্ন তুলিবে, জগৎ দেখিয়া চমৎকৃত, মুগ্ধ হইবে। আবার হয় ত কোন পতঙ্গ প্রতিভালোকে আকৃষ্ট হইয়া আমার মত জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। আলোলিত অগ্নিশিখার ন্যায় ঐ রূপ নয়নমুগ্ধকারী, কিন্তু স্পর্শশীতল নহে। কেবল দাহিকা শক্তি আছে, জুড়াইবার শক্তি নাই। যেমন দাহ করিতেছে, তেমনি স্বয়ং দগ্ধ হইতেছে। আমি আপনাকে দগ্ধ করিয়া তোমায় শীতল করিতে আসিয়াছিলাম, সেই আমার ভ্রম। তুমি যেমন ছিলে, সেইরূপ রহিলে, আমি দগ্ধকলেবরে পঙ্গুর ন্যায় জীবনাবশিষ্ট অতিবাহিত করিব। কিন্তু তুমিই কি সুখী? যে তোমার জন্য সর্ব্বস্ব হাস্যমুখে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিলে যদি কেহ সুখী হয়, তাহা হইলে তুমি সুখী। আমি কোন অভিযোগ করিতেছি না। কল্পনার লীলা অপরূপ, স্বীকার করি; হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলন কেমন যদি জানিতে!

উত্তর।

আমি কি লিখিব? আমি অপরাধী, আমি তোমার অনুপযুক্ত, আমায় তুমি ত্যাগ করিয়া যাইতেছ। আমার বলিবার কি আছে? আমার নীরবে থাকাই কর্ত্তব্য।

নিজ গুণে তুমি আমায় কৃপা করিয়াছিলে, নিজ গুণে এখন নিজে অপরাজিনী হইতে চাহিতেছ। আমার অপরাধের ভার তুমি গ্রহণ করিলে, ইহাতে যদি আমি আপত্তি না করি, তাহা হইলে সে অপরাধের মার্জ্জনা নাই।

সহানুভূতি ও প্রণয়ের লালসা যদি আমি প্রথমে সম্বরণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার নিকট এখন অপরাধী হইতাম না, তুমিও ক্লেশ পাইতে না। সেই চিত্তদৌর্ব্বল্যের বিষময় ফল ফলিয়াছে। দরিদ্র যেমন অর্থলোভ সম্বরণ করিতে পারে না, আমিও সেইরূপ তোমাকে প্রাপ্তির লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। দুর্ব্বল ব্যক্তি যেরূপ যষ্টি গ্রহণ করে, আমি তোমায় সেইরূপ সহায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আপনার জন্য যেমন ভাবিয়াছিলাম, তোমার জন্য

তেমন ভাবি নাই। সেই স্বার্থপরতা আমার প্রথম অপরাধ। তোমার বিবেচনার শেষ পর্য্যন্ত আমার সেই অপরাধ।

যে ক্ষমতায় তোমার চিত্ত আমার প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট হয়, তাহা অতি আকিঞ্চিৎকর। তখন এ কথা তুমি বিশ্বাস কর নাই। যে প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সে কি সকল সময় স্বয়ং গুণবান? প্রতিভা অনেক সময় চন্দ্রালোকের তুল্য। চন্দ্র যেমন সঞ্চিত সূর্য্যালোকের আধারমাত্র, প্রতিভাশালী ব্যক্তিও অনেক সময় তদ্রূপ। সূর্য্যকিরণ অপহৃত কর, চন্দ্রের কি অবশিষ্ট থাকিবে? প্রাণীশূন্য, বৃক্ষলতাশূন্য, পর্ব্বতপূর্ণ দগ্ধ মরুস্থান—ভীষণ, ভয়াবহ। প্রতিভা হরণ কর, অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিকে দেখিবে দুর্ম্মুখ, অহঙ্কৃত, স্নেহশূন্য বাহ্যাড়ম্বরাশ্রিত। আমি কি আত্মপরিচয় দ্বারা তোমাকে প্রবঞ্চিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলাম? হৃদয়ের, স্বভাবের সহস্র গুণে এক মুহূর্ত্তের জন্য কি আপনাকে তোমার সমকক্ষ বিবেচনা করিয়াছিলাম?

যে সময় তোমার মনে হইত, আমি তোমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি, সেই সময় তোমার চিন্তায় আমি মগ্ন। তুমি সম্মুখে থাকিলেও যেন তোমার কল্পিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম, তোমায় দেখিতে পাইতাম না। চক্ষের অন্তরাল হইলে যেমন তোমায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম, সম্মুখে সেরূপ দেখিতে পাইতাম না। রচনায় যেন নূতন ক্ষমতা উৎপন্ন হইল। কবি যখন বলিয়াছিলেন যে, মিলন ও বিরহ উভয়ের মধ্যে তিনি বিরহকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন, তখন তিনি যথার্থ ভাবগ্রহণ করিয়াছিলেন। মিলনে সর্ব্বদা অসম্পূর্ণতা থাকে, বিরহ হৃদয় মনকে পূর্ণ করে। তোমার নিকটে থাকিয়াও যেন বহুদূরে ছিলাম; তুমি সম্মুখে, কিন্তু তোমাকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতাম, কোথাও যেন তোমায় পাইতাম না। যে অভাব তুমি আমার গ্রন্থে লক্ষ্য করিয়াছিলে, সেই অভাব আমার হৃদয়ে। তোমাকে পাইয়া মনে হইয়াছিল, সেই অভাব পূর্ণ হইবে; কিন্তু এক অভাব পূর্ণ হইয়া নূতন অভাব সৃষ্ট হইল। এই অভাবই আমার বল, ইহাই আমার কল্পনার মূল; এবং এই অভাবেই আজি আমি তোমার নিকট অপরাধী।

যদি অনুযোগপূর্ণ পত্র লিখিতে, আমার অপরাধ দেখাইয়া আমায় লজ্জিত করিতে, তাহা হইলে মনে এত অনুতাপ হইত না। তোমার স্বভাবসুলভ গুণগ্রাম হয় ত বুঝিতে পারি নাই, তাহা হইলে হয় ত তোমায় হারাইতাম না। কিন্তু তোমায় হারাইয়াছি কি? তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছ, হয় ত

তোমায় আর দেখিতে পাইব না, তোমার কণ্ঠস্বর আর শুনিতে পাইব না। তথাপি আমার মনে হয়, তুমি আমারই রহিলে, তোমার স্মৃতি, তোমার প্রতিমূর্ত্তি, তোমার চিন্তা আমারই রহিল। আর কি থাকে? মিলনের সুখ অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্য সুখের আশা, জীবনের সুখ কল্পনা, প্রণয়ের সুখ কল্পনা ও স্মৃতি। তোমার নিকট আমি চিরকালই ঋণী। তোমার নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, ইহ জীবনে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না।

আমার অপরাধ গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কৃপাচক্ষে আমায় দেখিও, বলিতে সাহস হয় না। একবার তুমি আমায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ, বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমি তোমার অগাধ স্নেহের উপযুক্ত নহি। এমন ভুল একবার ভাঙ্গিলে আর কোন উপায় নাই। তোমার অনুরাগ হারাইয়াছি। তোমার ঘৃণার পাত্র হইবার ইচ্ছা নাই। যদি কোন উপায়ে তোমার হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করিয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে সেই উপায় অবলম্বন করিতাম। কিন্তু সে সাধ্য কাহার আছে? আমার এ পর্য্যন্ত সাধ্য নাই যে, কোনরূপ অনুনয় করিয়া তোমার প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করি। মনে যাহাই করি, তোমাকে বলিবার মুখ নাই। তুমি কোথায় থাকিবে, কেমন থাকিবে, জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই। কালে তোমার চিত্তে আবার পরিবর্ত্তন ঘটিবে কি না, তুমি স্বয়ং না জানিলে আমি জানিতে পারিব না। কল্পনার অন্ধকার কক্ষ তুমি আলোকিত করিয়া যাইতেছ, এই জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছ, ইহাতেও অক্ষমা প্রকাশ পাইতেছে না। আমাকে দেখিয়া তোমার যে ভ্রম হইয়াছিল, সেই ভ্রম অপনীত হইল। এই অপরাধীকে ত্যাগ করিয়া তুমি যাইবে—যাও, আমি কেমন করিয়া নিষেধ করিব? মিলনে রক্ষিত হইলাম, কিন্তু বিরহ আমারই রহিল। দিগ্দোহন আলোকময়ী প্রতিভা তুমি আমাকে দিয়া যাইতেছ—আমি অপমর্শ, এ ঋণের শোধ কখন করিতে পারিব না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

অপরাধ-তত্ত্ব।

অপরাধ এবং অপরাধী সকল সমাজেই আছে। জীবধর্ম্মবশেই মানুষ স্বার্থপর, অসংখ্য প্রয়োজনের দাস, অনেকগুলি রিপুর শাসনাধীন। এতদ্ব্যতীত কর্ম্ম ও অবস্থাধীনও অনেক কুপ্রবৃত্তি লোকে উপার্জ্জন করে। ইহাদের উত্তেজনা ও তাড়নার বশে, আত্ম-সংযমন মনুষ্যের পক্ষে অনেক সময়ে অসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং সকল সমাজেই অপরাধ ও অপরাধী আছে।

সমাজভুক্ত লোকের অপরাধ-প্রবণতার উপর সমাজের শুভাশুভ, সুখ শান্তি, সুতরাং উন্নতি অবনতি, অনেকটা নির্ভর করে। সেই জন্য দুষ্টের দমন রাজনীতির একটি প্রধান অঙ্গ। প্রধান অঙ্গ—কেবল সামাজিক অনিষ্ট ও অশান্তিজনক বলিয়া নহে, সামাজিক অর্থের অপচয় বলিয়াও বটে। অপরাধের দমনের জন্য সমাজকে কত অর্থ ব্যয় করিতে হয়, তাহা নিবিষ্টচিত্তে প্রণিধান করিলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। অপরাধীকে ধরিবার জন্য, অপরাধের বিচারের জন্য, অপরাধীর দণ্ডের জন্য, শিশু অপরাধীর সংশোধনের জন্য, বহুব্যয়সাধ্য কত বন্দোবস্ত সমাজকে রাখিতে হয়। এই ব্যয়ে কত সামাজিক সদনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইতে পারিত, কত সদনুষ্ঠান, যাহা এখন স্বপ্নরাজ্যের কথা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, আয়ত্তাধীন হইতে পারিত। সামাজিক অপরাধ আছে বলিয়া সমাজ অনেক সুখে বঞ্চিত, অনেক সুখোদ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনায় অসমর্থ। সুতরাং অপরাধ-তত্ত্বের আলোচনা কখনই নিষ্প্রয়োজনীয় হইতে পারে না—তবে, নিষ্ফল অবশ্যই হইতে পারে; হইয়াও থাকে। ভারতবর্ষের মতন বিদেশীর দেশে হইবারই কথা।

অপরাধের অস্তিত্ব সমাজ-সুখের প্রধান অন্তরায়। অপরাধের দমন সেই জন্য সমাজের এবং রাজনীতির প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু কারণের নির্দ্দেশ না হইলে কার্য্যের নিরোধ হইতে পারে না; সুতরাং অপরাধের কারণনিচয় অবশ্যই পর্য্যালোচনীয়। সেই জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ইউরোপীয়েরা আজ কাল সকল বিষয়েই তত্ত্বজিজ্ঞাসু। সেই জন্যই তাহাদের এত উন্নতি। ফ্রান্স, জর্ম্মনি, ইতালি, ইংলণ্ড, প্রভৃতি দেশে অপরাধতত্ত্বের বিশিষ্ট আলোচনা হইয়াছে, এবং হইতেছে। আলোচনকারীরা যে

আত্মসংযমন-শক্তি দুর্ব্বলা, সুতরাং অপরাধ-প্রবণতা সহজেই অধিক হয়। ইউরোপ খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দেশের নরহত্যা অপরাধের যে সকল তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, লোকসংখ্যার অনুপাতে এই শ্রেণীর অপরাধের সংখ্যা ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও হলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। ফ্রান্স, আয়রলণ্ড ও জর্ম্মনিতে তদপেক্ষা অধিক। অষ্ট্রিয়া এবং বেলজিয়মে আরও অধিক। ইতালি, স্পেন এবং হঙ্গারিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই সকল এবং অন্যান্য তালিকা দেখিয়া, অপরাধ-তত্ত্বানুসন্ধায়ীরা সিদ্ধান্ত করেন যে, দেশের শৈত্যাতপের উপর অপরাধের অল্পাধিক্য অনেকটা নির্ভর করে।

তবে তাপাধিক্যের এই কুফল অনিবার্য্য নহে। সমাজসংগঠনের গুণে ইহা নিবারিত হইতে পারে। হইতে যে পারে, তাহার সুন্দর প্রমাণ ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। উপরে বলা গিয়াছে যে, ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও হলণ্ড দেশে নরহত্যা অপরাধের সংখ্যা লোকসংখ্যানুপাতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। এই ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষের তাপ-পরিমাণ মোটের উপর ৩০ ডিগ্রি অধিক, অথচ লোকসংখ্যানুপাতে ভারতবর্ষে নরহত্যার সংখ্যা, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের অর্দ্ধেক বৈ নহে। ইহার অর্থ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আরও দুই একটি কথা বিবেচনা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ হিন্দু মুসলমানের দেশ। হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের প্রকৃতি যে অধিকতর অপরাধ-প্রবণ, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ভারতবর্ষে যত নরহত্যা ঘটে, তাহার অধিকাংশই যে মুসলমানের কৃত, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এতদ্ব্যতীত হিন্দুর দ্বারা যে সকল নরহত্যা ঘটে, তাহারও অনেক স্থলে দেখা যায় যে, তাহা স্ত্রীলোকের ব্যভিচারমূলক। এ সকল স্থলে হত্যাপরাধের নৈতিক অপকর্ষ বুঝায় না। আমার বিবেচনায়, কোনও কোনও হিসাবে ইহা নৈতিক উৎকর্ষেরই পরিচায়ক। ব্যভিচারস্থলে নরহত্যা যে এত বড় গুরুতর অপরাধ, সে ইংরেজের আইনানুসারে, হিন্দুর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানানুসারে নহে। এরূপ স্থলে নরহত্যার জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হিন্দুর চক্ষে সঙ্গত ব্যবস্থা বলিয়া প্রতিভাত হয় না। এই সকল বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, ইত্যাদি অপরাধের প্রবৃত্তি হিন্দু সমাজে অতি আশ্চর্য্যরূপে অপকৃত হইয়াছে। একেবারে লোপ হয় নাই বটে, কিন্তু এ বিষয়ে হিন্দু সমাজের স্থান পৃথিবীর সমস্ত সভ্য সমাজের উপরে। ইহা কেবল আমার কথা নহে; ইউরোপীয় অপরাধতত্ত্বাধ্যায়ীরা ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

ইহার কারণ কি? যদি ইহা সত্য হয় যে, তাপপ্রধান দেশের অধিবাসীরা শোণিতসম্বন্ধীয় অপরাধ অধিক করে,—ইউরোপখণ্ডস্থ দেশ সকলের সম্বন্ধে যে ইহা সত্য, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে—তাহা হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় তাপপ্রধান দেশবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর অপরাধের এত বিরলতার কারণ কি? কিসের বলে হিন্দুজাতি তাপাধিক্যের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে?

কেহ কেহ বলেন, হিন্দুদিগের আহারপদ্ধতিই ইহার কারণ। তাঁহারা বলেন, সর্ব্বদা মাংসাহারে পাশব প্রবৃত্তি সকল প্রবল হয়, রিপু সকল উত্তেজিত হয়, উগ্রতার বৃদ্ধি হয়, আত্ম-সংযমনের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যায়, সুতরাং অপরাধের আধিক্য ঘটে। হিন্দুরা প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জোপজীবী, সুতরাং ইহাদের মধ্যে শোণিতসম্বন্ধীয় অপরাধের এত অল্পতা।

খাদ্যের প্রকৃতি অনুসারে খাদকের প্রকৃতি যে কিয়ৎপরিমাণে গঠিত হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কারণের পার্থক্য থাকিলে ফলের পার্থক্য অবশ্যই ঘটিবে; কিন্তু ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের প্রকৃতিতে খাদ্যের ভাব আরও সহস্র কারণের ফল বিদ্যমান থাকে। হিন্দুদিগের মধ্যে অপরাধের এই অল্পতার সহিত তাহাদের খাদ্যের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু খাদ্যই যে একমাত্র বা মুখ্য কারণ, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় না। খাদ্য যদি মুখ্য বা প্রবল কারণ হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় ইতালিতেও অপরাধের অল্পতা পরিলক্ষিত হইত; কেন না, ইতালীয়দিগের আহার্য্য প্রধানতঃ আমাদেরই অনুরূপ। আমাদের ন্যায় তাহারাও প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জসেবী। অথচ দেখা যায় যে, শোণিতাত্মক অপরাধ ইতালীতে যত ঘটে, তত আর কোনও সভ্য দেশে ঘটে না। সুতরাং আহার্য্যকে অপরাধপ্রবণতা-হ্রাসের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, অসঙ্গত নির্দ্দেশ করা হয়।

কেহ কেহ বলেন, হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা এবং জাতি-শাসন-পদ্ধতি নিবন্ধন এই সুফল ফলিয়াছে। সার্ উইলিয়ম হণ্টর এবং উইলিয়ম ডগ্লস্ মর্বিসন এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, অপরাধনিবারণকল্পে রাজশাসন অপেক্ষা সমাজ-শাসন অধিকতর কার্য্যকর। দ্বিতীয়তঃ, রাজশক্তির চক্ষে ধূলা দেওয়া যত সহজ, সমাজের চক্ষে ধূলা দেওয়া তত সহজ নহে। অপরাধ যেমনই কেন হউক না, সমাজের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে প্রায় পারে না। সেই জন্য যে স্থলে অপরাধীর দণ্ডবিধানের ভার

সমাজ গ্রহণ করে, সে স্থলে অপরাধের অল্পতা হইবার কথা বটে। কিন্তু শোণিতসম্বন্ধীয় অপরাধে হিন্দু জাতি যেরূপ নির্লিপ্ত, সেরূপ নির্লিপ্ততা কখনই দণ্ডভয়ে হয় না—তা সে দণ্ড, রাজদণ্ডই হউক, আর সামাজিক দণ্ডই হউক। নরহত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ত অনেক দেশেই আছে, এবং প্রাণদণ্ডের ন্যায় গুরুতর দণ্ড ত আর নাই। এত বড় দণ্ডের বিধান সত্ত্বেও ত লোকে নরহত্যা করিয়া থাকে ও করিতেছে। সেই জন্যই বলিতে হয় যে, হিন্দুদিগের হত্যাদি অপরাধবিষয়ে যে রূপ নির্লিপ্ততা ঘটিয়াছে, সেরূপ সুফল কেবল দণ্ডভয় হইতে কখনই ফলে না। চিত্তশোধন ব্যতীত এরূপ নির্লিপ্ততা ঘটে না। হিন্দুদিগের এই অপরাধনির্লিপ্ততা, তাহাদের বহুযুগব্যাপী শিক্ষা ও সংযমের ফল বলিয়াই আমাদের প্রতীতি হয়। সে শিক্ষা ও সংযমাভ্যাস আজকাল লোপ হইতে বসিয়াছে বটে, কিন্তু আজিও আমরা বংশগুণে সেই শিক্ষা ও সংযমসম্ভব প্রকৃতির অধিকারী। বহু যুগের শিক্ষা ও সাধনা যাহা সংস্কার, এক যুগের বিপরীত শিক্ষায় তিরোহিত হয় না।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ।

এস বৎস। আমি দ্রোণ। দ্রুপদসভাতে
অনেকের গুরু আমি। অস্ত্র শিখা লাগি
আসিয়াছ মোর কাছে, ক্ষত্রিয়কুমার,
বিমুখে না যাবে শূন্য হস্তে: কৌশলে পুরিবা
দিব হস্ত, দিব স্মৃতি মন্ত্রাহুতি করি,
দেহে দিব বল শক্তি ছাড়িতে বধিতে
নব অস্ত্র। রাজপুত্র, তুমি, সুলক্ষণ,
শুনিয়াছ কত রাজচক্রবর্ত্তী-কথা,—
কেমনে দোর্দ্দণ্ড বলে অবনী লুণ্ঠিয়া
সঞ্চিত সুবর্ণরাশি দিলা আক্রাতরে
অর্থিগণে। ব্রাহ্মণের প্রনিন্দ্য এ রীতি
আশ্রিতে করিবে রক্ষা, করিবে বিবাহ
প্রেমার্থিনী রমণীরে, তুষিবে যাচকে।
ব্রাহ্মণেও জানে দান পুণ্য, অস্ত্র সম।
ব্রাহ্মণের নহে বৎস, ভিক্ষা ব্যবসায়,
রাজদ্বারে স্তুতিপাঠ, জীবিকা অর্জ্জন
বিদ্যা পরিচয়ে। দেখ, যেই দেহ-বলে
রক্ষিব করিছে রক্ষা নিত্য প্রজাকুল,
এই বল-স্রোতঃমূল কোথায় সঞ্চিত,
দেখ বৎস। এই বল ব্রাহ্মণের মনে।
যত ধর্ম্ম কর্ম্ম বিধি আচার ব্যভার
কে করে নির্দ্দেশ? যদি বর্ণচতুষ্টয়

একত্র মিশিয়া রচে নর শ্রান্তি-হেয়
তাহার মস্তক, চক্ষু চিন্তা বাক্য সহ,
বিপ্রকল্পে স্থিত। কহে মিতান্ত কল্পনা
সেই পৌরাণিকী কথা, ব্রহ্মার আননে
ব্রাহ্মণের জন্ম,—তা'র গূঢ় অর্থ আছে।
বিজন কাননে গিয়া ধ্যানে অধ্যয়নে
কাটে কাল যাহাদের, সেই শান্তিপ্রিয়
মুনি যত, তাহারাও করে প্রতিদিন
মানবের তরে ধনার্জ্জন, বহু কষ্টে,—
চিন্তাধন বিশ্বজয়ী—অনশ্বর জ্যোতিঃ
চরিত্র প্রভাব, যা'র সরশে পরশে
মৃত হ'তে ম্লান-চিত্ত হয় সমুজ্জ্বল।
ইহারা সকল করে ভোগ সুখ ত্যজি
সেই তপ্ত জ্ঞানরাশি, তাহি ক্ষুদ্র কণা
লভি, সাধারণ জন চরিতেছে পথ।
আমি দ্রোণ, নতশির শীর্ণ ম্লান স্থির
জ্ঞানদৈন্য ভরা ঘোর, আমার যা আছে
অস্ত্রজ্ঞান, দিই আমি ব্রাহ্মণের মত,
পাই যদি উপযুক্ত পাত্র। এইখানে
ক্ষত্র ব্রাহ্মণের বিধিবে পার্থক্য তুমি।
ক্ষত্র ধন দেয় দর্পভরে, ফেলে ফেলে,
যেন তা'র কোন মূল্য নাই কারো কাছে;
সে ধন যে কম নয় উপযুক্ত কি না
নাহি দেখে। ব্রাহ্মণের কষ্টার্জ্জিত ধন
নহে অবহেলাযোগ্য; যে চাহে লইতে,
লইতে হইবে তারে আগ্রহে, আয়াসে;
তেঁই গুরু নানা ছলে করেন পরীক্ষা
শিক্ষার্থির জ্ঞানক্ষুধা, ধৈর্য্য ধৈর্য্য তার,
চাহেন জানিতে প্রথমেই, এ ক্ষুধার
সমাপ্তি কোথায়। তুমি দ্রুপদতনয়
ধৃষ্টদ্যুম্ন, সুবিশাল পঞ্চাল রাজ্যের
চির-কলঙ্কিনী আশা। অর্দ্ধেক আমার
যে রাজ্যের, যার অন্ত প্রভু বজ্রসেন
আমার শৈশব-সখা, সে রাজ্যের তুমি
হ'বে একেশ্বর বৎস। যতনে তোমারে
শিখাইব বিদ্যা যম। সখা-পুত্র তুমি
আমার তনয় তুল্য। সখার সে মুখ
স্নেহোজ্জ্বল, তেজঃপূর্ণ, দম্ভলেশহীন—
সেই কৈশোরের মুখ আনিয়াছ তুমি
বৃদ্ধের সম্মুখে আজ। যাহা চাও দিব
তোমারে, শিখা'ব যত্নে জানি যাহা কিছু।
আগ্রহ অভ্যাস যত্ন, এ সকল তব
পরীক্ষার নাহি কাজ। তোমার সাধনা
জানা আছে। পিতৃবধে জ্বলিছে অনিশ
যেই প্রতিহিংসা বহ্নি, তাই মূর্ত্তি ধরি
অবতীর্ণ তোমা মাঝে। দ্রোণের নিধনে
তোমার জীবন-ব্রত হবে উদ্‌যাপিত।
ধন, মান, সুখ, স্বর্গ জীবন হইতে
প্রিয়তর শ্রেষ্ঠতর সত্য,—পুত্রের
বাক্য রক্ষা। ভরদ্বাজ করেছে পালন
স্বপ্রতিজ্ঞা, বিপ্রোচিত, হ'য়েছে সময়
কৃপদের, তুমি পিতৃতপস্যার বলে
এসেছ যুদ্ধার্থ মম। আজ শিষ্য তুমি,
আমি গুরু। মুক্তচিত্ত সুব্রাহ্মণ কভু
করে না কলহ অস্ত্র নিবর্ত্তির সাথে।
জীবনের মূল্য শুধু শ্বাসের প্রশ্বাস
সুদীর্ঘ আয়ুতে নহে। বিস্মিত হইছ
কেন বৎস? এই তুমি ভেবেছিলে মনে,
গোপনে বক্ষিয়া পিতৃ-মন্ত্র, শিক্ষা লভি
দিবে যাবে, দিয়ে শেষে দক্ষিণাস্বরূপ
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব—কুলক্রমাগত
ধর্ম্মিকতা? তাই ভাল সাজে ভারদ্বাজে।
কেন সাজে, আপনারে করেছ জিজ্ঞাসা
কোন দিন? গুরু ভার তা'রে শোভা পায়
সকল সবল যেই, চলে অকাতরে,
উন্নত মস্তকে, যেন দর্প ভরে, যেন
নিজ বলবীর্য্য লভি হর্ষ-মত্ত,—অই
সৈন্যধি ভূধর তব, শিক্ষিত সুন্দর

তেমনি ক'রে এস বৎস কোলেতে লইয়া
বক্ষঃগ্রীব—অশ্রুপূর্ণ সকল শরীর।
মুখের নয়নের কি গভীর সুখ!
পরমাণুর একতার রাজ্যভার হ'তে
দুঃসহ দুর্বহতর, যদি স্নেহাকর্ষণে
ব্রাহ্মণেরা চলে আগে, শুরু পুরোহিত
বলি তাই পূজা লভে মানব সমাজে;
তাই ঈশ্বরের লোকে ভূদেবতা বলে।
কিন্তু বৎস, অন্তরের আর ভক্তি শুদ্ধ,
দেহ আত্ম বলে, মন অবসন্ন ভবে,
লহ বলে, সুখের বল, কোন লক্ষ
তীক্ষ্ণ পরীক্ষায় আমি—বিশেষতঃ যদি
ধর্মধারী দারিদ্র্যের পরম ধর্মধাত্রী
স্নেহ এসে মিলে। পুত্র, বৈশ্য বা ব্রাহ্মণ
সেই হোন্, তবুও সে ক্ষত্রিয়ের কাজ
ন। এখানে, গৃহস্থ সে হইবার আগে
ভাবে যেন কি উপায়ে করিবে পোষণ
আপন কলত্র পুত্র স্বাধীন গৌরবে।
সে কাহিনী শুনেছ কি তুমি? পিতা তব
রোদিলা অরণ্যান্তরে, নত ধনঞ্জয়ে,
স্নেহের আলিঙ্গন তলে—"দরিদ্র এ
নীরবাসী, অর্থাহারে জীর্ণ; ভিক্ষা চাহে,
ভিক্ষা দিব, সখা বলি, সাতুলের মত
কেমন আপনারে ছদ্ম হাস্যালয় করে?"—
পূর্ণ বিস্ফোটিত গাম্ভীর্যে ডুবিয়া ব্রাহ্মণে।
ভিক্ষা চেয়েছিনু সত্য, কিন্তু সে কিসের
ভিক্ষা? আগে মুহূর্তের কাছে সৌহার্দ্যের।
বীতা-সহচর কাছে সোদর মমতা,
মহাদেব কাছে যোগ, অরীত বিদ্যার
সমাদর, ঐক্যের কাছে সব শ্রদ্ধা
যবে পাব, তবে তুচ্ছ, ঈষাদের ছায়া,
আসিবে পশ্চাতে, ভেবেছিনু। আজ তুমি
রাজপুত্র, মোর কাছে বিনীত বচনে,
আনত মস্তকে, আমি সেই হীন স্রোত
সেই মানী স্রোত, সেই সুস্থিরপ্রতিজ্ঞ
লোক। সেই দিন তুমি শিশু, মুগ্ধ, মনে
যে সংকল্প করেছিনু, পূর্ণ হইয়াছে।
মোর স্মৃতি সুমধুর বাল্য স্মৃতি সম?
কোন স্নেহ শ্রীফলের দিবাভাগে হেন
মনে পড়ে, যবে শুভ্র গিরির শিখর
মনে পড়ে বৈত্র-বন দুর্গীবলে বেড়ি?
আমাদের শিশুকাল আছিল সুন্দর
বসন্তের প্রভাতের মত। রামাসনে
সমাসীন, শৈশবের সুখ সর্বস্ব সব
ভুলে গিয়ে, বাহু-পর্শে ঠেলিলা চরণে
সমাগত দ্বিজস্নেহ, দুর্লভ ধন।
সেই ক্ষণে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিনু,
বন্ধু আমি বন্ধুকৃত্য করিব সাধন.
শিখাইল বজ্রসেনে কত মূল্যবান্
স্নেহ-স্নেহ, কোন ছার বন্ধুসিংহাসন
অধিক বান্ধব, আর কত যে সহস্র
বিত্তলাভ বাক্য বশা হ'তে। বালকের
দিয়াছি এ শিক্ষা, এক বালকের হাতে
উপাড়ি ফেলেছি মূলে উদ্যত মুকুট,
রাজ-গর্ব করিয়াছি। শেষে অনুরোধে
দিয়াছি অর্ধেক রাজ্য, রেখেছি অর্ধেক।
এ অর্ধেক সমগ্রক শত অশ্ব সহ
তোমারে অর্পিব পুত্র। আমার আত্মজ
অশ্বত্থামা দ্বিজবন্ধী, তার প্রয়োজন
কিম্বা লোভ নাই রাজ্য লাভে। এতদিন,
যবে দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল, প্রয়োজন
ছিল বিন্দু দুগ্ধে তার; কল্পনা তখনে
মনে পড়ে গেল, আছে সুহৃৎ আমার
সুবিশাল পঞ্চালের বিস্তীর্ণ ভূপতি.
সেই দেখে গেলে মোর যবে না অভাব।
হে কল্যাণ, আমি সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
তবন যে মান ছিল, আজে নাই তাহা
রাজ্যার্ধের বোঝে,—আছে সততা সমান.
তখন যে ক্রোধ ছিল তাই সিঞ্চিয়াছে,
তখন যৌবন ছিল, আজ তাহা নাই।
আজ হেরি মুখ তব জাগিয়া উঠেছে
সেই পূর্ব স্নেহ, লভি বহু বয়সের
সঞ্চিত জীবন। এস, এস, বৎস, লহ
যাহা আছে, নবে শুধু সংগ্রামকৌশল।
ধরিবার আগে পারি যেন রেখে যেতে
তোমারে বিস্তীর্ণ এই পঞ্চাল রাজ্যের
যোগ্যতর প্রভু। আপনি বিনীতা
ধরি যেন যোগ্য হস্তে, সমুদ্র ভূধরে।

পড়িয়া নিমজ্জিত হইয়াছে, সে কষ্টসহিষ্ণুতা আলস্য ও শ্রমবিমুখতার সহিত সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, সে পরনির্ভরতা ও নিঃস্বার্থভাবের স্থলে বিকট স্বার্থপরতার কঠোরপীড়নে আশ্রয়প্রার্থী আর্ত্তজন কাতরভাবে হাহাকার করিতেছে। এই অধঃপতন ও অধোগতির কালে, এই দুঃখ ও দুর্গতির শোচনীয় সময়ে, আমাদের মধ্যে আবার একটি অপূর্ব্ব দৃশ্যের বিকাশ হইয়াছিল, আবার এই পরনিগৃহীত পরপদদলিত পরাবজ্ঞাত জাতির মধ্যে একটি মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, সেই পূর্ব্বতন স্বর্গীয় ভাব—সেই মহিমান্বিত আর্য্যসমাজের মহত্তর কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন। ভীষণ মহামরুতে সুচ্ছায় বৃক্ষ বা সুপেয়জলপূর্ণ সরোবর পাইলে, মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত ও আতপতাপে ক্লান্ত পান্থ যেমন শান্তিলাভ করে, সেই মহাপুরুষকে পাইয়া, রোগজীর্ণ ও সাংসারিক আশা যন্ত্রণায় অবসন্ন লোকেও সেইরূপ শান্তিলাভ করিয়াছিল। "বীরপুরুষ রণস্থলে বিজয়িনী শক্তির পরিচয় দিয়া বীরেন্দ্রবর্গের বরণীয় হইতে পারেন, প্রতিভাশালী প্রতিভা দেখাইয়া সর্ব্বত্র প্রশংসালাভ করিতে পারেন; গবেষণা-কুশল পণ্ডিত অভিনব তত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়া, সহৃদয়দিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে পারেন," কিন্তু ভোগাভিলাষশূন্যতায়—পরহিতৈষিতায়, সর্ব্বোপরি সর্ব্বার্থত্যাগের মহিমায় তিনি চিরকাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বসম্মানিত ও সর্ব্বজনের আদরণীয় হইয়া, ককণার পবিত্র ... দ্বারে পবিত্র প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইবেন। আমরা আজ যাঁহার গুণোৎকীর্ত্তন ... সমবেত হইয়াছি, সেই স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই উক্ত অলোকসামান্য মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, এবং সেই বিদ্যাসাগরই বাল্যে শ্রমশীলতার সহিত অপরিসীম কষ্টসহিষ্ণুতা, যৌবনে বিদ্যাসবিবেচনের সহিত অপূর্ব্ব তেজস্বিতা, ও বার্দ্ধক্যে লোকহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের সহিত অসামান্য দানশীলতার পরিচয় দিয়া, তেজস্বিতাভিমানী ও সভ্যতাস্পর্দ্ধী ইউরোপীয়দের সমক্ষে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সমৃদ্ধিপূর্ণ সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নাই; সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত হয়েন নাই, বা সমৃদ্ধিসুলভ বিষয়ভোগেও সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠেন নাই। গগনবিদারী বাদ্যধ্বনিতে তাঁহার জন্মগ্রহণঘটনা সূচিত হয় নাই, গায়ককুলের কলকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতরবের মধ্যেও তাঁহার উদ্দেশে মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই, দূরবর্ত্তী জনপদবাসীরাও তাঁহার জন্মগ্রহণ জন্য সমবেত হইয়া, বিবিধ উৎসবে উল্লাস প্রকাশ করে নাই। তিনি বাঙ্গালার একটি সামান্য পল্লীতে সঙ্কীর্ণ পর্ণকুটীরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ সাংসারিক

বিষয়ে একপ্রকার উদাসীন ছিলেন। তাঁহার পিতা এক এক দিন অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই অতিকষ্টে সংসার চালাইতেন। এইরূপ দরিদ্র পিতা এবং দরিদ্রতার প্রতিমূর্ত্তি পিতামহী ও জননী, বিদ্যাসাগরের অবলম্ব ছিলেন। পিতা অমুবর্ত্তী হাট হইতে জিনিস পত্র লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে পিতামহ তাঁহাকে কহিলেন, "আজ আমাদের একটা এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।" বিদ্যাসাগরের জন্মগ্রহণসংবাদ এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। এইরূপ দরিদ্রতাময় সংসারে—এইরূপ দরিদ্র ভাবের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তিনি এই চির-পবিত্র দরিদ্রভাব কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহার জীবন দারিদ্র্যসহচর ব্রহ্মচারীর ন্যায় পরার্থপরতাময় ছিল। তিনি প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়াও দরিদ্রভাবে যে কঠোর ব্রতপালন করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্রতচর্য্যাই তাঁহাকে অলোকসামান্য মহাপুরুষের মহিমান্বিত সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছে। তিনি দরিদ্রের জন্য দরিদ্রের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, চিরজীবন দরিদ্রভাবে দারিদ্র্যপালন করিয়াই অনন্তপদে বিলীন হইয়াছেন। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যে পবিত্র বহ্নিশিখার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার প্রখরদীপ্তি বিশ্বজয়ী রাজাধিরাজকেও হীনপ্রভ করিয়াছে।

বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মহৎকার্য্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর তাঁহাদের অপেক্ষাও মহত্তর। তিনি প্রতিভাশালী পণ্ডিত অপেক্ষা মহত্তর, যে হেতু তিনি প্রতিভার সহিত অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তেজস্বী মহাপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর, যে হেতু তিনি তেজস্বিতার সহিত স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি দানশীল ব্যক্তিগণ অপেক্ষা মহত্তর, যে হেতু তিনি দানশীলতা প্রকাশের সহিত বিষয়বাসনা ও আত্মগৌরববোধনার ইচ্ছা সংযত রাখিয়াছেন। তাঁহাকে অনেক ভাব সহিয়া, অনেক বাধার অতিক্রম করিয়া, অনেক কষ্টভোগ করিয়া, বিদ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছিল। ইহাতে তিনি একদিনের জন্যও অবসন্ন হয়েন নাই। যখন তিনি লেখাপড়া শিখিবার জন্য কলিকাতায় উপনীত হয়েন, তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর। তাঁহার বাসগ্রাম কলিকাতা হইতে প্রায় ২৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। তখন রেলওয়ে ছিল না—ষ্টীমার ছিল না। তখন পদব্রজে দুর্গম পথ অতিবাহন করিয়া, কলিকাতায় আসিতে হইত। পথ যেরূপ দুর্গম, দস্যুতস্করের উপদ্রবে সেইরূপ বিপদসঙ্কুল ছিল। অষ্টমবর্ষীয় বালককে

এই দুর্গম ও বিপত্তিপূর্ণ পথের অধিকাংশ পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। রাজ্যচ্যুতাড়িত ও নিরতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হুমায়ুন যখন মরুভূমধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র অমরকোটে বীর তনয়ের জন্মগ্রহণের সংবাদ পাইয়া, অন্য সম্পত্তির অভাবে একটি সামান্য কস্তুরীর খণ্ড বন্ধুদিগের মধ্যে বিতরণ করেন, তখন তিনি বোধ হয় কখনও ভাবেন নাই যে, নবপ্রসূত বালক এক সময়ে সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবে। দরিদ্র ঠাকুরদাস যখন অষ্টমবর্ষীয় পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় তাঁহার প্রতিপালকের গৃহে পদার্পণ করেন, তখন তিনিও বোধ হয় ভাবেন নাই যে, কালে এই বালক সমগ্র মহৎ ব্যক্তির গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিবে। সময়ের পরিবর্ত্তনে বালকদ্বয়ের অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। মরুপ্রান্তরবর্ত্তী সামান্য নগরে—দুঃখ দারিদ্র্যে নিষ্পীড়িতা জননীর রোদনধ্বনির মধ্যেও যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—শৈশবকালে যাঁহাকে নানা কষ্ট সহিয়া দুরূহ কার্য্য সাধন করিতে হইয়াছিল, সেই আকবর এক সময়ে দিল্লীর রত্নসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, এক সময়ে তাঁহারই উদ্দেশে শত সহস্র কণ্ঠ হইতে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বাক্য নির্গত হইয়াছিল। আর সামান্য পর্ণকুটীর যাঁহার আশ্রয়স্থল ছিল—বৎসামান্য আহারীয় যাঁহার রসনাতৃপ্তি ও উদরপূর্ত্তির একমাত্র সম্বল ছিল, যিনি মলিনবসনে—পথ শ্রান্তিতে অবসন্ন হৃদয়ে এবং নিরতিশয় দীনভাবে এই মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এক সময়ে তিনিই জগদ্বিখ্যাত সম্রাটের সিংহাসন অপেক্ষাও উচ্চাসনে সমাসীন হইয়াছিলেন। অসামান্য অধ্যবসায়ে, অনন্যসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতায় বিদ্যাসাগর এইরূপ উন্নতির চরমসীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতকলেজে সংস্কৃতবিদ্যার অনুশীলনে তৎসমকালে তাঁহার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, স্মৃতি সকল বিষয়েই তিনি অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষাগুরু তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও পাঠানুরাগ দেখিয়া, আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন; সতীর্থগণ তাঁহার উদারভাব ও সারল্যময় সদাচারে সন্তুষ্ট থাকিতেন, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁহার বিদ্যাপারদর্শিতার জন্য তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিতেন। অধ্যয়নসময়ে তিনি স্বহস্তে পাক করিতেন, অনেক সময়ে স্বয়ং বাজার করিতে যাইতেন, কনিষ্ঠ সহোদরদিগকে আহার করাইয়া স্বয়ং বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতেন, এবং বিদ্যালয় হইতে বাসগৃহে প্রত্যাগত হইয়া, আহারের পর প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপ আত্মসংযম, এইরূপ নিষ্ঠা,

এইরূপ স্বাবলম্বন, এবং এইরূপ সহিষ্ণুতার সহিত তিনি অমৃতময়ী সারস্বতী শক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন। এই শক্তির প্রসাদে তিনি সর্ব্বস্থলে সর্ব্বকাল অনন্যনীয় ও অপরাজেয় থাকিতেন। বিদ্যালয় হইতে তিনি যে "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, শেষে সেই উপাধিই তাঁহার একমাত্র পরিচয়স্থল হইয়া উঠে। বিদ্যার প্রাণরূপিণী বাণী যেন সেই বিদ্যার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রেরই পরিচয় দিবার জন্য লোকের 'রসনায় লীলা' করিতে থাকেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্মেণ্টের চাকরী গ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার প্রতিভার সহিত অসামান্য সৎকার্য্যশীলতা পরিস্ফুট হইতে থাকে। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিসাধন তাঁহার একটি প্রধান কার্য্য। বিদ্যাসাগর যদি আর কিছু না করিতেন, তাহা হইলেও কেবল এই কার্য্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইত। দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ দশ আড়া মাত্র ধানে পরিতুষ্ট হইয়া যে কাব্য প্রণয়ন করেন, সেই কাব্যের প্রসাদেই তিনি বাঙ্গালার কবিকুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর আর কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলেও তাঁহার অমৃতময়ী লেখনীবিনিঃসৃত গ্রন্থাবলী চিরকাল তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠস্থানে স্থাপিত রাখিত। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের পিতা না হইলেও স্নেহময়ী মাতার ন্যায় উহার পুষ্টিকর্ত্তা ও সৌন্দর্য্যবিধাতা। তাঁহার যত্নে এ-সাহিত্যের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও সৌন্দর্য্য সাধিত হয়। দশভুজা দুর্গার প্রতিমার খড়বাঁশ ও দড়ির উপর সামান্য মাটির সাজ হইয়াছিল, তিনি ঐ মাটি যথাস্থানে বিন্যস্ত করেন, এবং মৃত্তিকাময়ী মূর্ত্তি নানাবর্ণে সুরঞ্জিত ও বিচিত্র বেশে সজ্জিত করিয়া, দেবমণ্ডপ শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালায় গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করেন, তাঁহার গদ্যরচনায় যুক্তিবিন্যাসনৈপুণ্য ও তেজস্বিতাদি গুণ থাকিলেও, উহা তাদৃশ মাধুর্য্যসম্পন্ন হয় নাই। এক সময়ে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে "পুরুষপরীক্ষা" ও "প্রবোধচন্দ্রিকার" অধ্যাপনা হইত; কিন্তু উৎকট শব্দাবলীর জন্য উহাও তাদৃশ প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠে নাই। উহার "মলয়াচলানিল উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে", এইরূপ রিতীবিকাময়ী ভাষায় বোধ হয়, পাঠার্থীদিগকে শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও "বিদ্বান্‌রঞ্জক্রম" নাম দিয়া, ইংরাজী ও বাঙ্গালায় অনেক গ্রন্থ প্রচার করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালায় গদ্যরচনার উৎকর্ষসাধক। তাঁহার

মহাভারত ও বেতালপঞ্চবিংশতিতে যেরূপ ওজস্বিতা ও শব্দপ্রয়োগবৈচিত্র্য দেখা যায়,—তাঁহার সীতার বনবাসে ও শকুন্তলায় সেইরূপ ললিতপদবিন্যাসের সহিত অসামান্য মাধুর্য্যগুণের উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। সীতার বনবাস ও শকুন্তলা, গদ্যরচনায় তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপ। তিনি বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন; প্রতি গ্রন্থই তাঁহার অসাধারণ রচনাচাতুরী ও শব্দমাধুরীর জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে।—তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষা তদীয় অদ্বিতীয় সম্পত্তি। উহা প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর জলপ্রবাহের ন্যায় নিয়তই জীবনতোষিণী। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই; স্বয়ায়াসে ও সুপ্রণালীক্রমে ভাষাশিক্ষারও সদুপায় করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার বিস্তারে তিনি আজীবন যত্নশীল ছিলেন। এ অংশে বালক বালিকা প্রৌঢ় কেহই তাঁহার নিকটে উপেক্ষণীয় ছিল না। তাঁহার বন্দোবস্তের গুণে এই মহানগরীর বীটন বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রথমে সুনিয়মে সম্পন্ন হয়—তাঁহার যত্নাতিশয়ে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়—তাঁহার প্রস্তাবক্রমে নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। বালিকাদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থ না থাকাতে তিনি বর্ণপরিচয় প্রভৃতি পুস্তক প্রচার করেন। সংস্কৃতশিক্ষার্থীরা ব্যাকরণ ও অমরকোষ অভিধান পড়িয়া, কাব্যপাঠে প্রবৃত্ত হইত। এক ব্যাকরণপাঠেই তাহাদের অনেক সময় যাইত। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় উপক্রমণিকা প্রভৃতি প্রণয়ন ও ঋজুপাঠ প্রভৃতি প্রচার করিয়া, সংস্কৃতশিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন। এইরূপে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার অসামান্য যত্নের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কার্য্যে তিনি প্রভূত অর্থব্যয়েও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন—জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় জাতীয় পরিচ্ছদ ও জাতীয় ভাবের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হইতে উচ্চ শ্রেণীর রাজপুরুষগণের সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ছিল। সকলেই তাঁহার আদর করিতেন, সকলেই তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতেন, সকলেই কোনও রূপ জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁহার পরামর্শগ্রহণে উদ্যত হইতেন। তিনি এই প্রধান রাজপুরুষগণের নিকট ধুতি চাদর ভিন্ন অন্য পরিচ্ছদে যাইতেন না। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। ইংরেজী গ্রন্থ পাঠে তিনি আমোদিত

হইতেন। স্বয়ং সামান্য বেশে থাকিয়া, তিনি মূল্যবান্ ইংরেজী গ্রন্থগুলিকেই বিচিত্র বেশে সজ্জিত করিয়া যত্নসহকারে স্বীয় পুস্তকালয়ে রাখিয়া দিতেন। কিন্তু তিনি ইংরেজী রীতির অনুবর্ত্তী হয়েন নাই, ইংরেজী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন নাই, ইংরেজী প্রথার অনুকরণে আপনাদের জাতীয় প্রথায় বিসর্জ্জন দেন নাই। তাঁহার আবাসগৃহের বৈঠকখানায় ফরাসের পরিবর্ত্তে চেয়ার টেবিল প্রভৃতি ছিল বটে, কিন্তু উহা তাঁহার ইংরেজী ভাবানুরাগের পরিচয় না দিয়া, তদীয় অসামান্য শ্রমশীলতা ও কার্য্যক্ষমতারই পরিচয় দিত। এখন আমাদের এমনই বিলাসিতা ও শ্রমবিরাগ ঘটিয়াছে যে, আমরা প্রায় সকল সময়েই ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া, আপনাদিগকে মধ্যেমধ্যে পবিত্র করিতে যত্নশীল হই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ বিলাসী ও শ্রমবিমুখ ছিলেন না। তিনি সমভাগে চেয়ারের উপর বসিয়া সর্ব্বদা কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিতেন। এইজন্যই বলিতেছি যে, চেয়ার প্রভৃতি তাঁহার শ্রমশীলতা ও কার্য্যক্ষমতারই পরিচয়স্থল ছিল। বস্তুতঃ তিনি জাতীয় ভাবের মর্য্যাদা-রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষা হইলে বা রাজদ্বারে কিয়দংশে প্রতিপত্তি ঘটিলে, এখন আমাদের মধ্যে অনেকে জাতীয় ভাবে বিসর্জ্জন দিয়া বিজাতীয় ভাবেরই পরিপোষক হইয়া উঠেন। জাতীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকে না—জাতি পরিচ্ছদের সম্মানরক্ষা করিতেও তাঁহাদের সাহস হয় না। তাঁহারা আপনাদের অহঙ্কারে আপনারাই স্ফীত হইয়া, আপনাদের কার্য্যে আপনাদিগকেই গৌরবান্বিত মনে করিয়া, সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হিতৈষিতা থাকিতে পারে, তুয়োদর্শন থাকিতে পারে, কার্য্যপটুতা থাকিতে পারে, কিন্তু একমাত্র বৈষম্য বুদ্ধির বিপত্তিপূর্ণ তরঙ্গাঘাতে তৎসমুদয়ই বিজাতীয় ভাবের অতল সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাদের—এই পরমুখপ্রেক্ষী, পরানুগ্রহপ্রার্থী, শিক্ষিত পুরুষগণেরও শিক্ষার স্থল। তিনি ধুতি চাদর পরিয়া পূর্ব্বতন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হালিডে সাহেব, বীডন সাহেব প্রভৃতির সহিত দেখা করিতে যাইতেন। কথিত আছে, বীডন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধুতি চাদর দেখিয়া, সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতেন। একদা গ্রীষ্মকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখেন যে, বীডন সাহেব গ্রীষ্মাতিশয্যে চিলে পাজামা ও পাতলা কামিজ পরিয়া রহিয়াছেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এখন ইচ্ছা হয়,

হৃদয়নিহিত যাতনার অবসান হইত না। তিনি যতক্ষণ দুঃখীর দুঃখমোচন করিতে না পারিতেন, ততক্ষণ স্থির থাকিতে পারিতেন না। এইরূপ দয়াশীল পুরুষের কোমল হৃদয়, অনাথা বালবিধবা ও পতিবিচ্ছেদবিধুরা কুলকামিনীদিগের দুর্দ্দশায় সহজেই বিচলিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অভাগিনীদিগের দুঃখমোচনে যত্নপরিকর হইলেও, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করেন নাই। তিনি এ বিষয়ে শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং স্বয়ং যে ভাবে শাস্ত্র বুঝিয়াছিলেন, সেই ভাবেই সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সরলতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বিধবাবিবাহবিষয়ক ও বহুবিবাহসম্বন্ধীয় পুস্তক, তদীয় অসামান্য গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও বিচারনৈপুণ্যের অক্ষিতীয় দৃষ্টান্তস্বরূপ। এই দুই গ্রন্থ লিখিবার সময়ে তাঁহাকে বিস্তর হস্তলিখিত পুঁথির আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে হইয়াছিল। বিধবাবিবাহবিষয়ক গ্রন্থের রচনাসময়ে তিনি যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সংস্কৃত পুঁথির পাঠোদ্ধার ও উহার অর্থসঙ্গতি করিতে তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে বসিয়া, শাস্ত্রের বচন সংগ্রহ ও উহার অর্থ লিখিতেন। কথিত আছে, এক দিন অনেক ভাবিয়াও কোন বচনের অর্থপরিগ্রহ করিতে পারিলেন না। এদিকে সন্ধ্যা অতীত হইল। পুস্তকাদি লেখায় নিরস্ত হইয়া, ভাবিতে ভাবিতে বাসগৃহে চলিলেন। কিয়দ্দূর গেলে সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল। অন্ধকারময় স্থানে পরিভ্রমণসময়ে পথিক সহসা সূর্য্যের আলোক পাইলে যেরূপ প্রফুল্ল হয়, তিনিও পূর্ব্বোক্ত বচনের অর্থপরিগ্রহ করিয়া, সেইরূপ প্রফুল্ল হইলেন। আর তাঁহার বাসায় যাওয়া হইল না। তিনি পুনর্ব্বার প্রফুল্লভাবে কলেজের পুস্তকালয়ে যাইয়া লিখিতে বসিলেন। লিখিতে লিখিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুবিধবার দুঃখদগ্ধ হৃদয়ে শান্তিসলিল প্রক্ষেপের জন্য এইরূপ অধ্যবসায়ের সহিত শাস্ত্র-সিন্ধুমন্থনে উদ্যত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার আয় সামান্য ছিল। তথাপি তিনি এজন্য অবিকারচিত্তে দুর্ব্বহ ঋণভার বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সর্ব্বাংশে সফল ও তাঁহার মত সমাজের সর্ব্বত্র পরিগৃহীত না হইলেও, কেহই তাঁহার অধ্যবসায়, দয়াশীলতা ও স্বার্থত্যাগের প্রশংসাবাদে বিমুখ হইবেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি পরমারাধ্য পিতা ও স্নেহময়ী মাতার অনু-

মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতা পিতা তাঁহার নিকটে প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপ ছিলেন। পিতার অমতে বা মাতার বিনা-সম্মতিতে তিনি কখনও কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মাতা পিতার প্রতি তাঁহার এইরূপ অসাধারণ ভক্তি ছিল। কথিত আছে, কোনও বালিকার বৈধব্য দেখিয়া, তাঁহার মাতা সজল-নয়নে তাঁহাকে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না, বিচার করিতে বলেন। পিতা নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনিও এ বিষয়ের অনুমোদন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বিধবাবিবাহের বিচার প্রবৃত্ত হইলে, শাস্ত্র কখনও উহার বিরোধী হইবে না। কিন্তু চিরন্তন অনুশাসন ও চির-প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে, পাছে ভক্তিভাজন জনক জননী মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন, এই জন্য তিনি উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই; শেষে মাতা পিতার সম্মতিদর্শনে তাঁহার আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের সঞ্চার হয়। তিনি বিধবার বৈধব্য দুঃখ দূর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠেন। তিনি এই প্রসঙ্গে এক দিন দৃঢ়তার সহিত কহিয়াছিলেন, "মাতা পিতার অনুমতি না পাইলে, আমি কখনও এই কার্য্যে উদ্যত হইতাম না; অন্ততঃ তাঁহারা যতদিন জীবিত থাকিতেন, ততদিন এ বিষয়ে নিরস্ত থাকিতাম।" পরমাত্মনিষ্ঠ সাধক যেমন আপনার সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য ভক্তিভাজন দেবতার অনুমতি ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, তিনিও সেইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে পরমদেবতাস্বরূপ মাতা পিতার সম্মতির প্রতীক্ষায় থাকিতেন। এখন আমাদের সমাজে যাঁহাদের শিক্ষাভিমান জন্মিয়াছে, প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধবাদী হইয়া যাঁহারা অনল-গম্ভীর স্বরে "সংস্কার, সংস্কার" বলিয়া চারি দিক কম্পিত করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে জনক জননীর মুখের দিকে দৃক্‌পাত করিতে দেখা যায় না। কঠোর কর্ত্তব্যপালনের দোহাই দিয়া, তাঁহারা অবলীলাক্রমে অসঙ্কুচিতচিত্তে মাতা পিতার বুকে শেল হানিয়া থাকেন। পিতা একান্তে বসিয়া নয়নজলে পরিপ্লাবিত করিতেছেন, মাতা দুঃসহ দুঃখে অভিভূতা হইয়াছেন—নিদারুণ শোকাগ্নি ভূধামলের ন্যায় অলক্ষ্যভাবে তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতি স্তরে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রসারিত হইতেছে, শিক্ষিতাভিমানী পুত্র কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্যপালনে কিছুতেই নিরস্ত নহেন। পুত্রের এই কঠোর কর্ত্তব্য-পালনপ্রতিজ্ঞায় এখন অনেক স্থলে পিতা শোকশল্যের প্রতিঘাতে মর্ম্মাহত হইতেছেন—মাতা প্রীতির অবলম্ব, স্নেহের পুত্তলী তনয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিতেছেন। কিন্তু মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহোদয়

পিতৃভক্তিতে পবিত্র হইতে পবিত্রতর—মাতৃসেবায় মহৎ হইতে মহত্তর ছিলেন। তিনি অবলীলাক্রমে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু সুখপ্রদ—যাহা কিছু মনোমদ—যাহা কিছু প্রীতিপ্রদ, তৎসমুদয়েই উপেক্ষা দেখাইতে পারিতেন, রাজাধিরাজের নানারত্নসমাকীর্ণ দেববাঞ্ছনীয় সিংহাসনেও পদাঘাত করিতে পারিতেন, কিন্তু মা[illegible] পিতাকে দুঃখাভিভূত করিতে পারিতেন না। মাতার নয়নজলের [illegible] সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। একবার তিনি আপনার ও পোষ্যব[illegible] জীবনরক্ষার অদ্বিতীয় অবলম্বনস্বরূপ চাকরি পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছি[illegible]খাপি মাতাকে দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিতে সম্মত হয়েন নাই। বহুব[illegible]নি মাতা পিতার উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের দেহ[illegible]য়[illegible]ন অনেক সময়ে সেই প্রতিকৃতির সম্মুখে বসিয়া অশ্রুপা[illegible] পরমভক্ত পুরুষসিংহ, এইরূপে সেই পরম গুরু জনক, সেই ধর্ম্মার্থ[illegible]র অনুপম স্নেহ ও মহীয়সী প্রীতির ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন, এবং[illegible]াকাশ্রুতে তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার সন্তর্পণ করিতেন[illegible]শ্লাঘাভিমানে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছেন, মহাপুরুষের মাতা[illegible]তি এইরূপ ভক্তি তাঁহাদের উপোহ্যার বিষয় নহে। বিদ্যাসাগর মহা[illegible]ক বিষয়ে মাতা পিতার প্রতি যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদের মতাবলম্বী হইয়া চলিতেন, সেইরূপ সামাজিক প্রথার সংস্কার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে শাস্ত্রীয় বিধির বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, সমাজহিতৈষী সংস্কারকগণ যখন অভিনব সহবাস-সম্মতির বিধানে আলোড়নে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করেন নাই। এ সকল বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের অর্থ যেরূপ বুঝিতেন, তদনুসারেই চলিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দীন দুঃখী ও অনাথদিগের অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি দয়ার সাগর, দান তাঁহার চিরন্তন ধর্ম্ম ও চিরপবিত্র কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলী কৃতী পুত্রের ন্যায় তাঁহাকে প্রচুর অর্থ আনিয়া দিত; তিনি উহার অধিকাংশ পরপোষণে ও পরদুঃখমোচনে ব্যয় করিতেন। গরীব দুঃখীরা কেবল প্রত্যহ তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া দান গ্রহণ করিত না। অনেকে তাঁহার নিকট মাসে মাসে আপনাদের ভরণপোষণের জন্য অর্থ পাইত। তিনি প্রাত্যহিক মাসিক নৈমিত্তিক দানে হৃদয়নিহিত দয়ার তৃপ্তি সাধন করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিকটে জাতিভেদ ছিল না, শ্রেণীভেদ ছিল

না, সম্প্রদায়ভেদ ছিল না। তিনি সকলেরই স্নেহময়ী ধাত্রী, প্রীতিভাজন পরিজন ও বিশ্বপ্রেমময়ী জননীস্বরূপ ছিলেন। যেখানে উপায়হীন রোগার্ত্ত ব্যক্তি দুরন্ত রোগের দুঃসহ যাতনায় কাতরতা প্রকাশ করিত, সেইখানেই তিনি তাহার রোগশান্তির জন্য অগ্রসর হইতেন; যেখানে নিঃস্ব ও নিঃসম্বল লোকে গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে [illegible] একশেষ ভোগ করিত, এবং এই রোগশোক-দুঃখময় সংসারে শো[illegible] দারিদ্র্যভারে আপনাদের অনন্ত যাতনার পরিচয় দিত, সেইখানেই তিনি [illegible] দুঃখমোচনে উদ্যত হইতেন; যেখানে অভাগিনী অনাথা শোকে[illegible] স্থিরস্বরূপ নির্জ্জন পর্ণকুটীরে নীরবে বসিয়া থাকিত, এবং হৃদয়ের প্রচণ্ড [illegible] নিবাইবার জন্যই যেন নিরন্তর নয়নসলিলে আপনার বক্ষোদেশ [illegible] ত, সেইখানেই তিনি তাহার কষ্ট দূর করিবার জন্য যত্নের পরাকাষ্ঠা দেখা[illegible] ব্রাহ্মণ হইতে অরণ্যবিহারী অসভ্য সাওঁতাল পর্য্যন্ত সকলেই [illegible] অসীম করুণায় শান্তিলাভ করিত। যে পাপপঙ্কে ডুবিয়া [illegible] হইয়াছে, সমাজের অত্যাচারেই হউক, পরের প্রলোভনে [illegible] যমনের অভাবেই হউক, যে সহায়শূন্য হইয়া দুস্তর দুঃখসাগরে [illegible] ড়াইতেছে, তিনি তাঁহার প্রতিও করুণাপ্রকাশে সঙ্কুচিত হইতেন [illegible] লাকে উদাসীন ভাবে যাহার কষ্ট চাহিয়া দেখিয়াছে,—যাহার কাত[illegible] নিমীলিতনয়নে নিশ্চেষ্ট ভাবের পরিচয় দিয়াছে, যাহার মলিনভাব দে[illegible] ঘৃণায় মুখ বিকৃত ও নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া, অন্য দিক দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তিনি পবিত্র ভাবে তাহাদিগকে পবিত্র পদার্থের ন্যায় তুলিয়া, শান্তির অমৃতময় ক্রোড়ে স্থাপিত করিতেন। সম্রাট্ সাহ আলম যখন সিংহাসন হইতে অপসারিত হয়েন, বৃদ্ধ, অন্ধ ও অধঃপতনের চরমসীমায় পতিত হইয়া, পরপ্রদত্ত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন, তখন তিনি করুণরসপূর্ণ কবিতায় এই বলিয়া আপনার চিত্ত বিনোদন করিতেন, "দুর্দ্দশার প্রবল ঝটিকা আমাকে পরাভূত করিয়াছে। উহা আমার সমস্ত-সৌরব অনন্তবায়ুরাশির মধ্যে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে, এবং আমার রত্নসিংহাসনও দূরে ফেলিয়া দিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইলেও এখন আমি দরিদ্রভাবে পবিত্র ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের দয়ায় উজ্জ্বল হইয়া, এই কষ্টময়, এই অন্ধকারময় স্থান হইতে উঠিতে পারিব।" দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরও ঐ সকল নিরুপায় দুঃখীদিগকে দরিদ্রভাবে পবিত্র বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। কথিত আছে, একদা তিনি প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতে করিতে এই নগরের প্রান্তভাগ অতিক্রম

করিয়া কিয়দ্দূর গিয়াছেন, সহসা দেখিলেন, একটি বৃদ্ধা অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া, পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে; দেখিয়াই তিনি ঐ মললিপ্ত বৃদ্ধাকে পরম যত্নে ক্রোড়ে করিয়া আনিলেন, এবং তাহার যথোচিত চিকিৎসা করাইলেন। দরিদ্রা বৃদ্ধা তাঁহার যত্নে আরোগ্য লাভ করিল। যতদিন সে জীবিত ছিল, তত দিন তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিমাসে অর্থ দিয়া তাহার সাহায্য করিতেন। * বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, তাঁহার অসামান্য দয়ার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি "সৈনিক" পত্রে প্রকাশ করেন;—"এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত কর্ম্মচারীকে বলিলেন, দেখ, কলুটোলার অমুক গলির অমুক নম্বর বাড়ীতে এই নামে এক জন মাদ্রাজবাসী আছেন। জানিয়াছি, তিনি অর্থাভাবে সাতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। অতএব তুমি তথায় গিয়া সবিশেষ সংবাদ লইয়া আইস।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশে কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া, প্রথমে গৃহস্বামীর দেখা পাইলেন। তাঁহার নিকট উক্ত মাদ্রাজবাসীর নামোল্লেখ করাতে তিনি বলিলেন, "হাঁ! আমার এই বাটীর নিম্নতলস্থ গৃহে তিনি সপরিবারে বাস করেন। আমি তাঁহার নিকট ছয় মাসের ভাড়া ৩০৲ টাকা পাইব। তিনি উহা দিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে ভাড়া পরিশোধ করিয়া উঠিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছি। কি করি, তিনি অর্থাভাবে প্রযুক্ত আজ দুই তিন দিন সপরিবারে অনাহারে রহিয়াছেন।" কর্ম্মচারী গৃহস্বামীর এই কথা শুনিয়া, উক্ত মাদ্রাজবাসীর নিকট যাইয়া দেখিলেন যে, তিনি একটি সঙ্কীর্ণ গৃহে পাঁচটি কন্যা ও দুইটি অল্পবয়স্ক পুত্র লইয়া সামান্য মাদুরের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। পুত্রকন্যাগণ ক্ষুধায় অনাহারে শীর্ণ। কর্ম্মচারী এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত মাদ্রাজবাসীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি কহিলেন, "আমি এই কলিকাতা সহরে অনেক বড় লোকের নিকট আমার কষ্ট জানাইয়াছিলাম। কিন্তু কেহই আমার দুরবস্থায় দয়ার্দ্র হইয়া একটি কপর্দ্দক দিয়াও আমার সাহায্য করেন নাই। অবশেষে একটি বাবুর নিকট ভিক্ষার্থ উপস্থিত হই। তিনি ভিক্ষা না দিয়া, একখানি পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিয়া, আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'এই সহরে এক পরম দয়ালু বিদ্যাসাগর আছেন। আমি তোমারই

---

* এইরূপ গল্পগুলি সঞ্জীবনী, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

নামে তোমার দুরবস্থার বিষয় লিখিয়া দিলাম। পত্রখানি ডাকঘরে দিয়া আইস।' আমি তদনুসারে উক্ত পত্র ডাকঘরে দিয়াছি। এখন আমার অদৃষ্ট।" কর্ম্মচারী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, তাঁহাকে এই সকল বিবরণ জানাইলেন। শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অবিরলধারায় অশ্রুপাত করিতে করিতে ঐ কর্ম্মচারী মহাশয়ের হস্তে মাদ্রাজবাসীর বাড়ী ভাড়ার দেনা ৩০৲ গোরাকী ১০৲ টাকা এবং তাহাদের জন্য নয় খানি কাপড় দিয়া বলিলেন, "যদি তাহারা বাড়ী যায়, তাহা হইলে কত হইলে চলিতে পারে, জানিয়া আসিবে। আর এখানে থাকিলে আমি প্রতি মাসে ১৫৲ টাকা দিব।" কর্ম্মচারী যথাস্থানে উপনীত হইয়া, উক্ত মাদ্রাজবাসীকে টাকা ও কাপড় দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা জানাইলেন। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের অসীম দয়ার কথা শুনী মাদ্রাজবাসী স্ত্রীপুত্রের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, "এক শত টাকা হইলে আমরা সকলে স্বদেশে যাইতে পারি।" ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মচারীর হস্তে উক্ত টাকা দেন। কর্ম্মচারীও তাহাদিগকে টীমারে রাখিয়া আইসেন।

বিদ্যাসাগর এইরূপ দয়ার সাগর ছিলেন। তাঁহার অপার করুণা এক সময়ে এইরূপেই দীন হীনদিগের দুঃখসন্তপ্ত হৃদয় শান্তিসলিলে শীতল করিয়াছিল। যাহাদের কাতরতায় কে কাতর ভাব প্রকাশ করে নাই; যাহাদের কষ্টে কাহারও হৃদয়ে সমবেদনার বিকার দেখা যায় নাই, যাহাদের উদ্ধারে কাহারও হস্ত প্রসারিত হয় নাই; তিনি এইরূপেই তাহাদিগকে অনন্ত যাতনা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থ এইরূপে কেবল দরিদ্রপালনের জন্যই ব্যয়িত হইত। এই কার্য্যে তাঁহার আড়ম্বর ছিল না—সংবাদপত্রের দিগন্তব্যাপী প্রশংসাধ্বনির প্রত্যাশায় বা রাজকীয় গেজেটে যশোবাদপ্রাপ্তির কামনায়, তিনি এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন না। তাঁহার কার্য্য নীরবে সম্পন্ন হইত। ধনী পূর্ব্বসঞ্চিত ধনরাশির মধ্যে অবস্থিতি করিয়া অর্থ দান করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার দান, এই দানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যিনি চিরজীবন বিলাসসুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—দুঃখ দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইয়া, যিনি শেষে প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি আত্মভোগে উপেক্ষা দেখাইয়া, ভবিষ্যতের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, অপরের প্রশংসা বা নিন্দা তুচ্ছ ভাবিয়া, কেবল যথার্থ কৃপাপাত্রদিগের জন্য যে ব্রত পালন করিতেন, সে ব্রত চিরপবিত্র—চিরন্তন ধর্ম্মের মহিমায় মহিমান্বিত—

চিরস্থায়ী গৌরবে গৌরবযুক্ত। বঙ্গের মহাকবি এই চিরপবিত্র ব্রতের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া, এক দিন গম্ভীর স্বরে গাইয়াছিলেন,—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি। সেই জানে মনে
দীন যে, দীনের বন্ধু।"

সমগ্র ভারতও একদিন বিমুগ্ধ হইয়া গাইবে;—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি।"

ফলতঃ নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারসাধনে—নিঃস্বার্থভাবে পরপ্রয়োজনের জন্য উপার্জ্জিত অর্থরাশির দানে মহাত্মা বিদ্যাসাগরের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। এখন সেই দানবীর চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছেন। কোমলতাময়ী করুণা এখন আশ্রয়ের অভাবে দুর্দ্দশাপন্ন—দুঃখদারিদ্র্যময় জনপদ এখন অধিকতর দারিদ্র্যভারে নিপীড়িত—নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল ও নিরন্ন জীবগণ এখন কাতরকণ্ঠে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। প্রলয়পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে যেন এই হতভাগ্য দেশের পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। মরুভূবাহিনী স্নিগ্ধ সলিলরেখা চিরবিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—শান্তিবিধায়িনী স্নেহময়ী জননী চিরকালের জন্য অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন; কিন্তু যে সলিলের স্নিগ্ধতায় তাপদগ্ধ লোকে শান্তি লাভ করিয়াছিল—যে জননীর করুণায় দরিদ্র সন্তানগণ দারিদ্র্যযাতনা ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহার অপার্থিব পবিত্র ভাব চিরকাল এই অনন্তযন্ত্রণাগ্রস্ত জাতির গৌরবের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ দয়াশীল, সেইরূপ তেজস্বী ও মহানুভাব ছিলেন। দয়ায় তাঁহার হৃদয় যেরূপ কোমল ছিল, তেজস্বিতা ও মহানুভাবতায় তাঁহার হৃদয় সেইরূপ অটল হইয়া উঠিয়াছিল। চিরদরিদ্র অনাথের নিকট তিনি যেরূপ স্নিগ্ধসুধাকরের ন্যায় প্রশান্ত ভাব প্রকাশ করিতেন, ধনগর্ব্বিত বা ক্ষমতাগর্ব্বিত ব্যক্তির নিকট তিনি সেইরূপ প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন তপনের ন্যায় অপূর্ব্ব তেজোমহিমার পরিচয় দিতেন। অভিমানসহকৃত তেজস্বিতা তাঁহাকে সর্ব্বদা উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিত। শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ ইয়ং সাহেবের সহিত অনৈক্য হওয়াতে, তিনি অবলীলাক্রমে পাঁচ শত টাকা বেতনের চাকরি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আত্মীয়বর্গের পরামর্শ তাঁহার গ্রাহ্য হয় নাই, লোকের কথায় তাঁহার মতপরিবর্ত্তন ঘটে নাই, বা ভবি-

ভবিষ্যতের ভাবনায় তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই। লোকে তখন বলিয়াছিল, ব্রাহ্মণ এবার নিজের অহমুখতায় নিজেই মারা পড়িল। আত্মীয়-গণ তখন ভাবিয়াছিলেন, এবার বিদ্যাসাগরের অন্নাভাব ঘটিল। কিন্তু অভিমানসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি পরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পরের মনস্তুষ্টির জন্য আত্ম-সম্মানে বিসর্জ্জন দেন নাই; তিনি পরের কার্য্যসম্পাদনে নিয়োজিত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু পরের নিকট আত্মবিক্রয় করেন নাই; তিনি পরের আদেশ-পালনে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু পরের অনুচিত আদেশানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইয়া আত্মাভিমানের মর্য্যাদা নাশ করেন নাই। তাঁহার হৃদয় এই-রূপ অটল ও এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ছিল। বহু অনুরোধে, বহু অনুনয়েও তাঁহার অভিমান অন্তর্হিত—তেজস্বিতা বিচলিত, বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি অবনত হইত না। সিবারের রাজপুতগণ অনেকবার আপনাদের ভূসম্পত্তি হইতে খলিত হইয়া-ছেন; অনেকবার অনেক বিষয়ে স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন; তথাপি আপনাদের তেজস্বিতা বা অভিমানে জলাঞ্জলি দেন নাই। সহৃদয় টড্ এই অসামান্য গুণদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, সিবারের রাজপুতকে তেজস্বিগণের বরণীয় প্রাচীন গ্রীকদিগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যদি এক জন টডের আবির্ভাব হয়, এক জন টড্ যদি বাঙ্গালীর সুকীর্ত্তি বা অপ-কীর্ত্তির বর্ণনায় ব্যাপৃত হয়েন, তাহা হইলে তিনি এই অধঃপতিত ভূখণ্ডে এই চিরাবনত জাতির মধ্যে মহাত্মা বিদ্যাসাগরে এমন প্রভাব দেখিতে পাইবেন, যাহার অচিন্তনীয় মহিমায় তাঁহার অপরিসীম বিস্ময়ের আবির্ভাব হইবে; তিনি সেই মহাপুরুষকে সৌরবান্বিত গ্রীকদিগের পার্শ্বে বসাইয়া, মুক্তকণ্ঠে ও ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে তাঁহার স্তুতিবাদ করিবেন।

এইরূপ তেজস্বী, এইরূপ অভিমানসম্পন্ন বিদ্যাসাগর, জনসাধারণের সমক্ষে কখনও অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, হীনতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার তেজস্বিতা যেরূপ অতুল্য, তাঁহার মহত্ত্ব সেইরূপ অপরিমেয় ছিল। দরিদ্র প্রচুর অর্থের অধিকারী হইলে আত্মগর্ব্বে অধীর হইয়া, আত্মগৌরববিস্তারে উদ্যত হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশস্ত হৃদয় এরূপ হীনভাবে কলুষিত ছিল না। যখন তাঁহার প্রভূত পরিমাণে অর্থাগম হয়, সমাজে অসাধারণ প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হয়, দিগন্তব্যাপিনী মহীয়সী কীর্ত্তির কথা লোকের মুখে মুখে পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকে, তখনও তিনি আপনাকে সামান্য দরিদ্র বলিয়াই

পরিচিত করিতেন। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ—সমাজের ধনসম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, সর্ব্বদা যাঁহার সন্ধান করিতেন, যাঁহাকে দেখিলে অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইতেন; অনেক সময়ে তিনিই সামান্য মুদীর দোকানে বসিয়া, মুদীর সহিত আলাপ করিতেন, এবং দীন দুঃখীদিগকে আত্মীয় স্বজন বলিয়া আপনার কাছে বসাইতেন। একদা তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত কোনও বাগানবাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক জন দ্বারবান্ ঘর্ম্মাক্তকলেবরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে একখানি পত্র দিল। এরূপ স্থলে অনেকে হয় ত সামান্য দ্বারবানের দিকে দৃক্‌পাত করেন না। কিন্তু দ্বারবান সাগর পত্রবাহকরূপে পরিশ্রান্ত ও প্রখর আতপতাপে অবসন্ন দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি শ্রান্তিবিনোদন জন্য পত্রবাহককে সেই গৃহে বসাইলেন। তদীয় বন্ধুগণ ইহাতে সাতিশয় বিরক্তিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ বিরক্তিতেও তাঁহার হৃদয়ে অনুদার ভাব বা অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল না। একদা তিনি উপস্থিত প্রবন্ধলেখককে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমি এক দিন ইডেন সাহেবের (ইডেন সাহেব তখন গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি বা অন্য কোনও উচ্চ পদে নিযোজিত ছিলেন) সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম—এমন সময়ে অন্য এক ব্যক্তি সাহেবের দর্শনার্থী হইয়া, আপনার নাম লিখিয়া পাঠাইলেন। সাহেব চাপরাসীকে বলিলেন—'বাবুকে বল, এখন সুবসুখ নাই।' ইডেন সাহেবের কথা শুনিয়া, আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, তখনই সাহেবকে বলিলাম, 'তুমি আমার সহিত বসিয়া, বাজে কথায় সময়ক্ষেপ করিতেছ। ইহাতে তোমার সুবসুখ আছে। আর এ ব্যক্তি অবশ্য কোনও প্রয়োজনের অনুরোধে তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। উহাতে তোমার করসুখ নাই। আমি সামান্য গরীব মানুষ; পাখীভাড়া করিয়া আসিয়াছি। এ ব্যক্তি যদি গরীব হয়, তাহা হইলে বেচারীর গাড়ীভাড়া দণ্ড হইবে—আর এক দিন আসিলে আবার গাড়ীভাড়া দিতে হইবে।' ইডেন সাহেব তখন ঈষৎ হাসিয়া দর্শনার্থী ভদ্রলোকটিকে আসিতে বলিলেন।" মহাপুরুষের এইরূপ উদারতা, এইরূপ সমদর্শিতা ও এইরূপ অহঙ্কারশূন্যতা ছিল। একদা একটি ভদ্রসন্তান তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে বলিলেন—"বড় দায়গ্রস্ত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। দশ হাজার টাকা না হইলে উপস্থিত দায় হইতে মুক্ত হইতে পারি না। আমি উক্ত টাকা পরে ফিরাইয়া দিব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট তখন বেশী টাকা ছিল না। তথাপি তিনি

ভদ্রসন্তানের কাতরতাদর্শনে ব্যথিত হইয়া, অন্য স্থান হইতে টাকা আনিয়া দিয়া কহিলেন, "এই টাকা অন্যের নিকট হইতে আনিয়া দিলাম—তোমার সুবিধামত দিয়া যাইও।" ভদ্রলোকটি টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই টাকার জন্য তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলে তিনি কহিয়াছিলেন—"আমি দান গ্রহণ করিয়াছি। টাকা যে ফিরাইয়া দিতে হইবে, তাহা ভাবি নাই।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার এই কথা শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"লোকটা আমাকে ঠকাইল, দেখিতেছি।" আর তিনি টাকার জন্য তাঁহার নিকট লোক পাঠান নাই; স্বয়ংও তাঁহার নিকট কখনও টাকা চাহেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ত্বের সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা আছে। এই সকল মহত্ত্ব কাহিনী মহাপুরুষের লোকোত্তর চরিত স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকশিক্ষার জন্য যথোচিত পরিশ্রম স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারে ও শিক্ষার গৌরববিস্তারে তাঁহার কখনও অমনোযোগ বা ঔদাস্য দেখা যায় নাই। লোকে যাহাতে সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিত ও কার্য্যক্ষম হয়, তৎপ্রতি তাঁহার সাতিশয় যত্ন ছিল। তিনি এই বিদ্যানুরাগের উন্নতির জন্য এক সময়ে হাজার টাকা দান করিতেও কাতর হয়েন নাই। সংস্কৃতের ন্যায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতিও তাঁহার এইরূপ অনুরাগ ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার আলোচনার জন্য যত্ন করিয়াছেন; সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ভাষানুশীলনেরও উপায় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ অংশে মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসন তাঁহার অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। তিনি এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়া, উহার উন্নতির জন্য যত্ন, পরিশ্রম, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের একশেষ দেখাইয়াছেন। স্বয়ং রোগশয্যায় থাকিয়াও বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বহু যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, বিদ্যালয়ের জন্য যে প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা রাজকীয় প্রেসিডেন্সি কলেজের সুবিস্তৃত অট্টালিকারও গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়াছে। বিদ্যালয়ের উপর তাঁহার এমনই যত্ন ছিল যে, পূর্ব্বে যে বাড়ীতে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইত, সেই বাড়ী যখন বিক্রীত হইয়া যায়, তখন তিনি নিজের বাড়ী ভাঙ্গিয়া ঐ স্থানে ও উহার সন্নিকটবর্ত্তী ভূমিতে বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে এই নগরের কতিপয় স্থানে মেট্রোপলিটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের কয়েকটি শাখা বিদ্যালয়

স্থাপিত হইয়াছে। তিনি সমান যত্নের সহিত সকল বিদ্যালয়েরই তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার যত্নাতিশয়ে—তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীর গুণে, মেট্রোপলিটনের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, তাঁহাকে শতগুণে আহ্লাদিত করিয়া তুলিয়াছে। স্বহস্তরোপিত ও যত্নসহকারে বর্দ্ধিত বৃক্ষ সুস্বাদু ফলভারে অবনত হইলে লোকের যেরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হয়, তিনিও সেইরূপ মেট্রোপলিটনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কি কারণে এরূপ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছেন, কি কারণে এরূপ অতুলনীয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়া, সকলের নিকেট "হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি" পাইতেছেন? মণ্ডলাধিপতি সম্রাট্ অসামান্য ক্ষমতা ও অপরিমিত অর্থের বলে যে সম্মান লাভ করিতে পারেন না; একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান কি গুণে সেই সম্মানের পাত্র হইয়াছেন? ইহার একমাত্র কারণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মস্তিষ্কের অসাধারণ ক্ষমতার সহিত হৃদয়ের অতুল্যশক্তির সামঞ্জস্য। যিনি হৃদয়ের শক্তিতে উপেক্ষা করিয়া, মস্তিষ্কের শক্তিতে মহৎ হইতে চাহেন, তিনি মহত্ত্বের অধিকারী হইতে পারেন না। উদারতা, হিতৈষিতা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণ সকল তাঁহা হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করে। তিনি কেবল আত্মস্বার্থেই পরিতুষ্ট থাকেন, পরার্থে তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। গৃধ্রকুল যেমন সুদূর গগনতলে উড্ডীয়মান হইলেও ভূতলস্থ গলিত শবের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে, তিনিও সেইরূপ বুদ্ধিবৈভবে উন্নত হইলেও হৃদয়ের শক্তির অভাবে নিকৃষ্টতর কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া, ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে অবনত হইতে থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সহিত হৃদয়ের অপূর্ব্ব শক্তি ছিল। তিনি এক দিকে জ্ঞানগৌরবে ও বুদ্ধিবৈভবে যেরূপ মহিমান্বিত, অপর দিকে হৃদয়ের মহৎগুণে সেইরূপ গৌরবান্বিত। তাঁহার অভিমান ও তেজস্বিতা যেরূপ অতুল্য, তাঁহার কোমলতা ও দয়াশীলতাও সেইরূপ অসামান্য। আত্মাভিমান, আত্মাদর ও আত্মনির্ভরের বলে তিনি কোনও বিষয়ে পরের নিকট অবনত বা কোনও বিষয়ে পরমুখপ্রেক্ষী হইতেন না। ইহা তাঁহার হৃদয়ের শক্তির নিদর্শন। লোকের শিক্ষাবিধান হেতু তিনি স্নেহময় পিতা, এবং লোকের পালন ও শান্তিবিধান হেতু তিনি করুণাময়ী মাতা ছিলেন। এইরূপে তাঁহাতে প্রতিভার সহিত লোকশিক্ষাবিধায়িনী

শত উত্তেজনাতেও আত্মদোষে জলাঞ্জলি দেয় না, সেই জাতি স্বার্থপরতার মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ না হইয়া, পরানুগত্য পরমুখপ্রেক্ষিতায় আপনাদের হীনভাব না দেখাইয়া, এবং সর্ব্ববিষয়ে "নির্জ্জীব নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়" না হইয়া, বিশ্বজয়ী পুরুষসিংহের পথানুসরণে বিশ্বসংসারে প্রসিদ্ধিলাভ করিবে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

পেসিমিজমের প্রবাহ. এ যুগে যেন কিছু প্রখর হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহা হয় ত অতিরিক্ত চিন্তাশীলতা ও সভ্যতার সহবাসে উৎপন্ন। ইহা বৈজ্ঞানিক বিরক্তির অভিব্যক্তি, সন্দেহ বৈরাগ্যের নিদর্শন, ইহা সর্ব্বথা মানসিক দুর্ব্বলতাব্যঞ্জক।

পেসিমিজমের প্রবাহ।

য়ুরোপীয়দের মধ্যেও ইদানীং এ দুর্ব্বলতা বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে। সংপ্রতি লণ্ডন রয়াল ইনিষ্টিটিউসনে,—"কাব্যগত পেসিমিজম" সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে, মিঃ অ্যালফ্রেড অষ্টিনের উক্তিতে প্রকাশ,—

During the last few years, a wave of doubt disillusion and despondency had passed over the world. One by one all the fondly-cherished theories of life, society and empire had been abandoned. we no longer seemed to know wither we were marching and many appeared to think, that we were marching to perdition. This pessimistic spirit pervaded all society and all thought, &c.

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যেই দুঃখ ঘন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—পৃথিবী-বক্ষে সন্দেহের ও অবসাদের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে। এক একটি করিয়া, সমাজের, সাম্রাজ্যের ও জীবনের চিরপ্রিয়, চিরপোষিত শিওরীগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে, যেন লোকে আর জানেই না যে, তাহারা কোন দিকে, কিসের অভিমুখে চলিয়াছে। অনেকেই মনে করিতেছেন, জনসমাজ—জীবন-যাত্রা অধঃপাতের অভিমুখেই অগ্রসর হইতেছে। সর্ব্ব চিন্তায়, সমগ্র সমাজে পেসিমিসটিক্ মত প্রবেশ করিয়াছে।

মিঃ অ্যালফ্রেড অষ্টিন বলেন, কবির কাব্যেও পেসিমিজম প্রতিবিম্বিত। লর্ড টেনিসনের

---

* গত ১৩ই শ্রাবণ, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ, 'বিদ্যাসাগর পুস্তকালয় ও মাণিকতলার পাঠাগারের" সভ্যগণের যত্নে, বিজ্ঞানসভাগৃহে যে সভা হয়, এই প্রবন্ধ তথায় পঠিত হইয়াছিল।

"Locksley Hall" নামক কাব্য ৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়, তাহার "Locksley Hall sixty years after" মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, উহার ৪০ বৎসর ব্যাপী পেসিমিজম। পরে। প্রথমোক্ত কাব্যে কবি 'অপ্টিমিষ্ট', শেষোক্তে তিনি 'পেসিমিষ্ট।'

ইহার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত কাব্য যৌবনকালে লিখিত হয়, তখন সমাজের সুর ছিল অপ্টিমিসটিক, অর্থাৎ আলোকময়, কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রন্থের প্রণয়নকালে সে সুর ফিরিয়া গিয়াছিল, আলোক তখন অন্ধকারে পরিণত, সুতরাং কবির কাব্যেও অন্ধকারের ভাব।

মিঃ অ্যালক্রেড অষ্টিনের বিবেচনায়, ফরাসী বিপ্লবের পরবর্ত্তী কাল হইতেই পেসিমিজমের আরম্ভ। উদ্দাম আশা ও অসীম অসহিষ্ণুতা ফরাসী বিপ্লবের কারণ ও লক্ষণ; শেলির কবি-প্রতিভা তাহারই আত্মা হইতে উদ্ভূত। নিরাশা অসহিষ্ণুতার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বায়রনের অমর কাব্য "চাইল্ড হেরল্ড" উৎপন্ন করে। এবং সেই নিরাশা ও অসহিষ্ণুতা পরে ব্যঙ্গবিদ্রূপে পরিণত হইয়া প্রসব করিয়াছিল "ডন জুয়ান।" কবি কিট্‌স, অত্যন্ত আলোক বা অতিশয় অন্ধকার, কোনও দিকেই টলেন নাই; তাঁহার সময়ই তদনুরূপ ছিল না। কিট্‌সের কাব্য ক্লাসিক ধরণের। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ধর্ম্মপরায়ণতা তাঁহাকে পেসিমিষ্ট হইতে দেয় নাই। ম্যাথু আর্ণল্ডের কাব্যেও প্রবল পেসিমিজিম আছে। এ সময়ের কবিসম্প্রদায়ের সঙ্গীতের সাধারণ সুর,—"জীবন যাতনাময়।" ফরাসী কবি হাইনে ও লিওপার্ডি পেসিমিজমের প্রকাণ্ড অবতার। কিন্তু প্রাচীন কবি চসার, স্পেন্সার, সেক্সপিয়র, মিল্টন প্রভৃতি পেসিমিজমের ঘোর বিরোধী। তাঁহারা সদাপ্রফুল্ল, সর্ব্বদাই সুপ্রসন্নচিত্ত। অ্যালক্রেড অষ্টিনের বিবেচনায়, এখনকার এই কাব্যগত পেসিমিজম,—প্রধানতঃ নৈরাশ্যের আত্মপ্রকাশ—Disappointed egotism। আধুনিক কবিকুলের যুবক যুবতীরা কখনও গভীর দুঃখের মুখ দেখেন নাই, তাহাতেই বোধ হয়, তাঁহাদের তরুণ হৃদয়ের সন্তাপ এত তীব্র।

এ সব ত হইল বিলাতের কথা। কিন্তু বিলাতের ঐ কথা বাঙ্গালীতেও অংশতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে। বঙ্গীয় কাব্যকুঞ্জের নবীন কোকিল কোকিলাদিগের গানে প্রায়ই পেসিমিষ্টিক সুর,—সে গানে অন্ধকারাবসাদ থাকিলেও, তাহাতে সর্ব্বথা কোকিলকণ্ঠেরই কোমলতা। কোমল,—কিন্তু হতাশ।

নবীন কবিতার অন্ধকার ভাব।

"শুনিবারে দীপকণ্ঠে, নিরাশের দুরন্ত তান,
কে বুঝিবে হায়?
কি গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাসে, কি গভীর হাহাকারে
বুক তব ভেঙ্গে নিতি যায়।

পুনশ্চ আমাদের অপর কবি কহিতেছেন,—

একে একে একে যেতেছে ভাসিয়া
প্রাণের বাসনা যত,
জীবনের গ্রন্থি খুলিয়া পড়িছে
হইয়া তরঙ্গাহত।

ধীরে ধীরে ধীরে যায় দিন চলি
জীবন ফুরায়ে আসে।

তৃতীয় কবি অবশ্য তীব্র বেদনাতেই বলিতেছেন,—

ভাঙিয়া গেছে খেলা,
বহিয়া গেছে বেলা,
এখন তামসী রাত গো।
এ ঘোর আঁধারে
নয়ন আঁধারে
কেবলই আসিছে লোর গো।
কপাল-কনক-রেখা,
আর না দেখে দেখা,
আর ত হবে না ভোর গো!

এ বিষাদের প্রবল কারণ থাকিলেও ইহা সেন্টিমেন্টালিজম। সেন্টিমেন্টালিজমের প্রবাহ প্রকৃতই প্রবল বহিয়াছে। পুরাতন এক সন্ধ্যা সাহিত্যে তিন জন ভিন্ন লেখিকার তিনটি কবিতা হইতে উদ্ধৃতাংশ গৃহীত। রবীন্দ্র বাবুর অনেক গীতি,—

অলক্ষ্যেতে শোণিতের বহ্নি বহে যায়
যায় রে সেথায়,
খুঁড়িয়া বালুকারাশি অস্থিখণ্ড দিয়া
শোণিত উঠিবে উথলিয়া।

এই ছন্দে গ্রথিত। বড়াল মহাশয়ও বিলক্ষণ বিষাদের কবি,—

জগত-অবশ্য মাঝে কি ফুলে ঢাকিতে পারে
এ ভাঙা সমাধি।
সবাদের বিপ্রহরে হৃদয়ের মরুভূমে
কোথায় তটিনী?
হৃদয়ে চাপিয়া কর রেখা যাও—মরীচিকা
মৃত্যুর সঙ্গিনী।

আলো ও ছায়ার কবিও আক্ষেপময়। তাঁহার কাব্যেও অন্ধকারই প্রতিফলিত দেখা যায়।

আঁধারের কীটাণু আমরা,
মুহূর্ত আঁধারে কবি খেলা,
অন্ধকারে ভেঙ্গে যায় হাট,
জীবন ও মরণের মেলা।

* * *

বৃথা চেষ্টা আলোকের মাঝে

আঁধারে মগন বহু প্রাণ।

* * *

আঁধার বাজিছে চারি ভিতে,
বোঝা বোঝা আঁধারেই বহি।

ইহারা সকলেই এ সমবের প্রতিভাসম্পন্ন কবি। কিন্তু অল্পাধিক পরিমাণে পেসিমিষ্ট। আমাদের এই প্রকৃতির কবিদিগকেই সাধনে সম্বোধন করিয়া, সাহিত্যের সখাপ্রভুর মেন কবি লিখিয়াছিলেন,—

নিবাও নিবাও দীপ, এত কি আমোদ?
ঘুমিছে সাঁঝের দীপ হয়ে কুতূহলী।
দেখিছ না? এখনো যে এক হাত রোদ;
উচিত এ উদ্বোধন আইলে গোধূলি।
দুপুরে কি বাজে সখি বিরহীর সুপুর?
তুমি কি ভেবেছ ওই বৈকালী যূথিকা
ফুটিয়াছে? হায় হায় ভ্রম পিপীলিকা
কুসুমের মর্ম্মে পশি করেছে আতুর!
কল্পনায় শিল্পশালা নিবালায় বসি,
মধ্যাহ্নে ধরেছ কেন পূরবী রাগিণী?
থাম থাম, চিত্রপটি পড়ে খসি খসি।
রঙে রঙে মেশামিশি আপনা আপনি।
কোথায় চিত্রিব আমি অমরমোহিনী,
হায়রে দেখ, চিত্রিবারি শক্তি-গরবী!

পেসিমিষ্টের প্রতি অপ্টিমিষ্টের এই সাধন সম্বোধন এমন সুন্দর ও এ স্থলের এত উপযোগী যে, পাঠকের বিনা অনুমতিতেই আমরা উহা পুনঃপ্রকাশিত করিতে সাহসী হইলাম।

কিন্তু ইহা কবির কল্পনাপ্রসূত। পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্ত্তেই যে সকল পেসিমিজম—প্রকৃত বিপদ বিড়ম্বনা ঘটিতেছে, সে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। ভূন বাসের বিলাসী বিবিই উহাটন করিয়াই এ প্রকৃতির প্রকৃত বিপদ বিস্ফোটের বিবরণ দর্শন করিতে হইল। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, প্রজানৈতিক প্রহেলিকা, সমাজনৈতিক সমস্যা,—আমেরিকার বৌপ্যবিড়ম্বনা, অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্কবিভ্রাট; এত উন্নতির পর অষ্ট্রেলিয়া বা এখন অধঃপাতে যায়। আমাদের জাতিতেও অনেক রকমের আপদ বিপদ। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই একটা না একটা বিষম সঙ্কট। সর্ব্বোপরি বিনিময়-বিভ্রাটে ব্যবসায় বাণিজ্যের অবনতি, পণ্য দ্রব্যের দুর্গতি; কৃষি ও কৃষকের দুরবস্থা; শ্রমজীবীর জীবনসমস্যা। কিন্তু, এ সকল নীরস রাজনীতি ও অর্থনীতিঘটিত ব্যাপার। ইহার অভ্যন্তর হইতে নিখুঁত টন্না বিজড়াইয়া বাহির করা অসাধ্য। অতএব এবার সে সব কথা অনুক্তই রহিল। কেন না, সহযোগী সাহিত্যের পাঠক ও সমালোচকদিগের সহানুভূতি আমাদের সর্ব্বতোভাবেই প্রার্থনীয়।

পাঠক পাঠিকা এখন তবে কাব্যকুঞ্জ হইতে নবেলের বিষুক্তে চলুন। জুন সংখ্যা নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরীতে আজ কালকার লোকের অতিরিক্ত বকম নবেল অধ্যয়নাসক্তির নিন্দা আছে।

নবেলের নেশা।

অনবরত নবেল পড়িয়া পড়িয়া লোকে ক্রমাগত কল্পনার রাজ্যেই ঘুরে। পৃথিবীর প্রকৃত ব্যাপার বুঝিবার শক্তি হারাইয়া বসে। "বারমিংহাম ফ্রি লাইব্রেরী" নিচয়ে ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৬ খণ্ড পুস্তকের মধ্যে ৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৫ শত ৯৫ খানা নবেল। অবশিষ্ট ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত এক খানা পুস্তক এগার শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, শাস্ত্র ও ধর্ম্ম, ইতিহাস, জীবনচরিত, ভ্রমণ ও ভ্রমেজ, আইন, অর্থনীতি ও রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রাণীতত্ত্ব, এবং কাব্য ও নাটক; ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব বুঝুন, অপরাপর পুস্তকের তুলনায় নবেলের সংখ্যা কত অধিক, এবং লোকের নবেলপাঠের নেশাই বা কি। সাধারণ পুস্তকালয় মাত্রেরই প্রায় এই অবস্থা, প্রত্যেক এক শত পুস্তকে ৭৫ খানা করিয়া নবেল রাখিতে হয়। শতকরা অবশিষ্ট ২৫ খানা পুস্তক খুব কষ্টে চলা কেবা করে; কোনও কোনও পাঠক এ সকল পুস্তক কালে ভদ্রে গ্রহণ করিলেও, কেবলমাত্র তাহাদের কোনও কোনও স্থলও পাঠ করে, কেবলমাত্র বেকারেরই জন্য ব্যবহার করে। কিন্তু নবেল প্রায়ই আদ্য অক্ষর হইতে অন্ত্য অক্ষর পর্য্যন্ত অতি আগ্রহের সহিত অধীত হয়। মদ্যপানের ন্যায় লোকের নবেলপাঠের নেশা কেন,—নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরির লেখক বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, এ প্রবন্ধ কতকটা পেসিমিষ্ট ভাবে লিখিত, কিন্তু আমাদের তাহা বোধ হয় না। ইহার লেখক স্যর হেন্‌রি স্যাম্প্‌সনের M. P. উপাধিসহ সংখ্যা ঘটনাইটলি রিবিউতে শ্রীমতী আউদা লোনও ফরাসী নবেলের সমালোচনা প্রসঙ্গে নবেল নিন্দার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নবেল গ্রন্থের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। আউদার কথা পরে আলোচ্য। অগ্রে স্যর হেন্‌রির প্রবন্ধের সার গ্রহণ করা যাউক। স্যর হেন্‌রি বলেন, লোকের নবেলপাঠের এই নেশা কৃত্রিম, অস্বাভাবিক; কারণ মনুষ্যপ্রকৃতি স্বভাবতঃই সত্য কথা শুনিতে ভাল বাসে, বালককে কোনও গল্প বলিলে, সে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করে, "তাহা সত্য কি না?" সত্য হইলে সে তাহাতে অধিকতর আকৃষ্ট হয়, শ্রদ্ধাবান অধিকতর প্রীত ও বিস্মিত হয়। মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সত্যের দিকে, অথচ লোকের অসত্য উপাখ্যান শুনিবার জন্য এত অধিক আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা অভ্যাসজনিত নেশার মত্ততা হইতেই উদ্ভূত,—মনুষ্যের স্বভাব হইতে নহে।

ইতিহাস ও উপন্যাস।

স্যর হেন্‌রি সত্য ইতিহাসের সহিত অসত্য উপন্যাসের তুলনা করিয়া বুঝাইয়াছেন, লোকে ইতিহাস অপেক্ষা উপন্যাস ভালবাসে কেন। সুবর্ণলিপ্ত কিঞ্চিৎ বলিতেন, 'ইতিহাসে কেবল নাম ও সন তারিখই সত্য, কিন্তু উপন্যাসে নাম ও সন তারিখ ব্যতীত আর সবই সত্য।' ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, উপন্যাসিক মানব প্রকৃতির প্রকৃত পট অঙ্কিত করেন, এবং সেই পট পাঠকের কল্পনার বলে কলে প্রতিবিম্বিত করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, ঐতিহাসিক কেবল আপন ঘটনামাত্র ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে,—ঐতিহাসিক মানব মানবীদিগকে যথেচ্ছ পরিচালিত করিতে বাধ্য হন। উপন্যাসিক চরিত্রচিত্র অসম্পূর্ণ হইলেও

লীবিত, আর ঐতিহাসিক চরিত্র লীবিত হইয়াও যেন মৃতবৎ, কারণ, ঐতিহাসিক সম্পূর্ণরূপে ঘটনার অধীন, উপন্যাসিক ঘোল আনা স্বাধীন। ঐতিহাসিকের কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, ঔপন্যাসিকের উহা অসীম। একজন সংঘটিত ঘটনার গণ্ডির বাহির হইতে পারেন না, অপরের কল্পনা অনন্ত গগন বিচরণ করিতে পারে। ঐতিহাসিকের হস্তে ঘটনানুরূপ চরিত্রবিকাশ, ঔপন্যাসিক চরিত্রের চারি চৌহদ্দির চরম বিকাশার্থে ইচ্ছা ও আবশ্যকের অনুরূপ অসংখ্য ঘটনা মিত্রে নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারেন। যেরূপ বিজ্ঞান ও শিল্পের স্বতন্ত্রতা, সেইরূপ ইতিহাস ও উপন্যাসের বিভিন্নতা। ইতিহাস বিজ্ঞান, উপন্যাস শিল্প, উপন্যাস বর্ণচিত্র,—ইতিহাস বর্ণবিহীন ফটোগ্রাফ। ঐতিহাসিক তাঁহার বাস্তব বর্ণনার বর্ণবিন্যাস করিতে পারেন না, তাহার সত্যতা সাব্যস্তের জন্য শত শত সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করেন; তদ্ধারা সর্ব্বদা ভারাক্রান্ত হয়। ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য উপন্যাসিকের ন্যায় মনোরঞ্জন করা নহে,—বৈজ্ঞানিকের ন্যায় বিজ্ঞাপন করা। সুতরাং ঐতিহাসিক, ফটোগ্রাফারের ন্যায় ঘটনাবলী ও কার্য্যপ্রবাহের যথাযথ ফটোগ্রাফ্ মাত্র গ্রহণ করেন,—চিত্রের তুলনায় ফটোগ্রাফের আদর কোথায়? ঔপন্যাসিক ফটোগ্রাফার নহেন, চিত্রকর। তাঁহার চিত্রফলক বিবিধ বর্ণের অত্যুজ্জ্বল প্রভায় পরিপূর্ণ, সুদৃশ্য অক্ষনকারী চিত্রকর যেমন দৃশ্যের সৌন্দর্য্যসংবর্দ্ধনার্থে দৃশ্যস্থিত দ্রব্যবিচয়ের কোনটি বর্জ্জন, কোনটি পরিবর্ত্তন এবং দৃশ্যের কোনও স্থান সঙ্কুচিত বা স্বভাবানুরূপ করিয়া, নূতন ও সুন্দর দ্রব্যের সংযোজন করিতে অবহিত, নিপুণ মনোবিদ্গণও তেমনি, পাঠকের চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জনার্থে নিজের ইচ্ছানুসারে রস বিসর্জিত করেন, গুরুকে লঘু ও লঘুকে গুরু করেন, কাহিনীর কোনও স্থানে সন্তর্পণে আবরণ আচ্ছাদন দেন, কোনও স্থান বা পরতে পরতে উদ্ঘাটন করেন। পুণ্যের জ্যোতিঃ সহিত যুগপৎ কলঙ্ককালিমা ও পাপসন্তাপের তীব্রতা তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তুলেন। ঔপন্যাসিক, সুদক্ষ শিল্পীর ন্যায়, বাছিয়া চাকিয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া, মাপিয়া জুখিয়া যথোপযুক্ত আঁকেন। সাধারণ লোকে সে চিত্র দেখিয়া সবিস্ময়ে বলে,—"মরি কি চমৎকার! যেন জীবন্ত।" কিন্তু অপক্ষপাতী ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক তাহা ঔপন্যাসের যথার্থতার সম্পূর্ণ অনুরূপই দেখেন; কেন না, তাহাতে স্বভাবের সরল ও সমধানুরূপ কার্য্যাবলীর পরিবর্ত্তে, শিল্পের দীর্ঘসূত্রতাই সবিশেষ সমাকীর্ণ। সাধারণ লোকে সত্য কিনা বুঝিয়াই, সত্যবোধে অসত্য উপন্যাসে আকৃষ্ট ও আসক্ত হয়।

কিন্তু ইদানীন্তন অধিকাংশ পাঠকদিগের মানসিক বৃত্তির ভাব বুঝিয়া উঠা ভার। তাহারা যাহা বিশ্বাস করে না, তাহাতেই বেশী আসক্ত হয়। ইহাকে কালেই বলিতে হয়, নেশার ঘোর। উপন্যাস, অধ্যয়নের একটা অতিরিক্ত আসক্তির একটা অতি স্পষ্ট কারণ এই যে, লোকে আপন আপন অবস্থা ও অবস্থিতিতে সন্তুষ্ট নহে, সুখী নহে, সুতরাং তদতিরিক্ত সুখ শান্তির আশয়ে কাল্পনিক কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে। কিন্তু উহা প্রায় (আমরা এমনও বলিতে পারি) সুরাপায়ীর পানোন্মত্ততার আত্মবিস্মৃতি ও সুখোপভোগের মত। নেশাটুকু থাকা পর্য্যন্তই সবাবী, নেশা ভাঙ্গিলেই তত্রানব অসহ্য, আবার নেশা করিবার আবশ্যকতা।

নবেলী নেশার পৌরাণি।

অক্সফোর্ড নগরীর গৃহস্থের বড় মানুষ বন্ধুর বাড়ীতে যাওয়ার মত। বড় মানুষ বন্ধুর বাড়ীতে "অযথে সময়ে" যাওয়া মন্দ নয়, কিন্তু অষ্টপ্রহর যাওয়া অনিষ্টকর। বড় মানুষের বাড়ীতে সবই সাজান গোছান, সুন্দর সুশৃঙ্খল, কোমল, উজ্জ্বল ও মনোজ্ঞ। লক্ষ্মী তথায় বিরাজমান; সবই সুপ্রতুল। বড় মানুষ বন্ধুর স্ত্রী পুত্র পরিবার আমোদ আহ্লাদে প্রফুল্ল;—তোমাকে আপ্যায়িত ও আমোদিত করিবার জন্য সবস্থ, চাকর বাকর, তোমার সেবায় শশব্যস্ত। তুমি বড় মানুষ বন্ধুর বাড়ী হইতে আপন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেছ, তথায় অভাব অপ্রতুল, আঁধার মুখ, বিবিধ বিশৃঙ্খলতা, গৃহিণী গলদ্ঘর্মকলেবরা,—উনুনে মুঁ পাড়িতে পাড়িতে হয় ত গালিও পাড়িতেছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন বল দেখি, বড় মানুষ বন্ধুর বাড়ীর সে ব্যবস্থা দেখিয়া আসিয়াই আপন বাড়ীর এ অবস্থা দেখিলে, মনটা কেমন হয়? বিষাদ, বিরক্তি, আক্ষেপ, অভিমান হয় কি না?

কাল্পনিক কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া যাঁহারা জনসমাজে স্বপ্নরাজ্যের সুখ শোভাতি বিতরণ করেন, তাঁহারা অবশ্যই বক্তব্যের পাত্র। সময়ে সময়ে স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করাও ভাল। কিন্তু তাই বলিয়া অধিক ক্ষণ তথায় বসিয়া থাকা উচিত নয়। তাহাতে মহা অনিষ্টই উৎপন্ন হয়। তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি বিকৃত হয়। প্রকৃত পৃথিবীর কার্য্যকারিণী শক্তি ক্রমে কমিয়া যায়। নবেলের প্রধান ও প্রথম লক্ষণ প্রেম,—পরে পরিণয়। নবেলের শিক্ষাও ঐ প্রেম এবং পরিণয়। প্রেমবিহীন জীবনই বৃথা। প্রেমের পর পরিণয় হইলেই নবেল সমাপ্ত। কিন্তু, তাহার পর যে জীবনসংগ্রাম,—সে শিক্ষাও ত নবেল ছাড়িয়া অন্বেষণ করিতে হইবে। স্যর ওয়াল্টার স্কটের ওবেরালী নবেল পাঠ করা উত্তম, কিন্তু, তাহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম লেক্‌হার্ট কৃত স্যর ওয়াল্টার স্কটের জীবনী পাঠ করা। অবশ্য নবন্যাসের প্রেমের গল্প পড়িয়া লোকে সময় অতিবাহিত করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য। অমর শিল্পী মাইকেল এঞ্জিলো ও বেভেনেটো সেলেনির জীবনী তাহারা পাঠ করে না। এই দুই মহাপুরুষের প্রকৃত জীবনে যত ও যেরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, অনেক কাল্পনিক উপন্যাসেও তাহা নাই। স্যর জন লবক বলেন, বিজ্ঞানে এমন সকল বিস্ময়কর বিষয় আছে, যাহা উপন্যাস হইতেও বিস্ময়কর।

স্যর জন লবক।

কিন্তু নবেল পাঠ সম্বন্ধে স্যর জন লবকের মত, স্যর হার্বার্ট স্যাক্রোলের মতের অনুরূপ নহে। তাঁহার বিবেচনায়, ইংলণ্ডের লোক নবেল পাঠ সম্বন্ধে মিতাচারী। তাহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস নবেল ও সেক্সপীয়রের নাটক হইতে যতটা শিখিয়াছে,—ইতিহাস গ্রন্থ হইতে ততটা শিক্ষা করে নাই। তিনি নবেলের নিন্দা করেন না। উপন্যাসের অতি আবাঢ়ে কথাও পড়িতে আবাল্যবাবক।

* He himself should be sorry to undervalue novels. Even nonsense was refreshing, and he thought the English people had learnt more of their history from novels and from Shakespeare's plays than from books of history.

শ্রীমতী আউধা, কিন্তু, স্যর জন লবকের এ উক্তিতে অসন্তুষ্টা। "আউধা" সুলেখিকা, কিন্তু

মবেলিষ্ট,—জুন সংখ্যা কর্টনাইটলীতে, তাহার মবেলবিষয়ক প্রবন্ধের প্রথমেই শুর জনকে বেশ একটু আক্রমণ করিয়াছেন; বিদ্রূপও করিয়াছেন বিলক্ষণ। আউরা শ্রীমতী আউরা। বলেন, শুর জনের মুকস্সিমিরি ধরণে মবেলের সমর্থন, তাহল্যেরই পরিচায়ক। শুর জন লবক নিজে এবং ইংরেজ জাতি বুঝেন না, কখনও বুঝিতে সমর্থও হইবেন না, মবেল প্রকৃত প্রস্তাবে কি বস্তু। তাঁহাদের সাহিত্যশিল্পানুভবশক্তি এমনই অপরূপ যে, মবেলপাঠের উপকারিতা ও আমোদকে ক্রমো-লিখোগ্রাফী প্রভৃতির উপকার ও ষ্টীমবাষ্পীয় আমোদের সামিল বলিয়া মনে করেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং। শুর জন লবক মুকস্সিআনা ভাবে মবেলের প্রতি বৃথাকটাক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় অবশ্য পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার ইতিবৃত্ত, মানবপ্রকৃতি ও মনুষ্যের মনোবৃত্তির কাব্যালেখ্য অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ, উপকারী ও উপাদেয়। আউরা বলিতেছেন,—"হি হি হি, শুর জন লবকের ধারণাতেই ইহা আসে নাই যে, একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস গ্রন্থ আমার উপভোগ্য অতুচ্ছ উপাদেয় পদার্থ,—উহাতে সৃজন শিল্পের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত। তাটিকালের তাম্রধ্বজ ও খুকিজির চিত্র যেমন চোখ খুলিলেই দেখা হয় না, একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস গ্রন্থও তেমনি এক দৌড়ে পাঠ করা হয় না। অনেক প্রাকৃত লোকে এরূপ করে বটে, কিন্তু তাহাতে করিয়া পাপহস্তে পবিত্রতা স্পর্শ করা হয় মাত্র, তাহাতে কেবল শ্রদ্ধাস্পদ পদার্থের সম্ভ্রম হানি করা হয়।"

"সুতরাং শুর জন বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, একখানি উত্তম উপন্যাস গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে কি পরিমাণে ও কত প্রকারের শক্তি প্রয়োজন হয়। কেবল কল্পনা নহে, রসিকতা; কেবল রসিকতা নহে, পাণ্ডিত্য,—কেবল পাণ্ডিত্য নহে রুচি,—কেবল রুচি নহে, সুবিচার-শক্তি, সূক্ষ্মদর্শন ও সুবদর্শন, মানব প্রকৃতিতে গভীর জ্ঞান,—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী প্রবৃত্তির প্রতি সমান সহানুভূতি,—ভাস্কর যেমন প্রস্তরে অবয়ব নির্ম্মাণ করেন, নবেলিষ্ট তেমনি শূন্য হইতে চরিত্র সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টি-শক্তি কি সামান্য? আর এই শক্তি যাহা সৃষ্ট পদার্থকে সজীব, সমুজ্জ্বল ও মনোহারিণী করিতে তাহার উপর কতই না সূক্ষ্ম ও অসীম অধিকারের আবশ্যক। এতগুলি বিভিন্ন শক্তি ও এতাধিক পরিমাণে প্রতিভা একাধারে একত্রিত হইলেই তবে একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস উৎপন্ন হয়। অতএব মার্জ্জিতবুদ্ধি লোকের সম্যক শ্রদ্ধা সহকারেই উহা অধ্যয়নীয় ও অনুশীলনীয়।"

উপন্যাসিকের কিরূপ শক্তি থাকা চাই।

সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক মিঃ ষ্ট্যানলে বক্ষ্যমাণ সংখ্যা কর্টনাইটলীতে, তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত কয়েকটি আফ্রিকার উপকথা প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা একটির একটু আফ্রিকার উপকথা। সারসংগ্রহ দিতেছি। পাঠক দেখিবেন, আফ্রিকানদের সৃষ্টিপ্রক্রিয়াটি "পিওরি" কি অপরূপ।

"আদিকালে,—অতি আদিকালে,—আর কিছুই ছিল না, সমস্ত দুনিয়াটা মিঠাপানিতে পূর্ণ ছিল। এক একটু করিয়া জল শুকাইয়া জমি হইল, জমির উপর ঘাস গজাইল; ঘাস [illegible] ঘাস খাইয়া [illegible] ঘাস খাইয়া [illegible] জানোয়ারই হইল।

জল, মহী মালা জলে বিলুপ্ত হইয়া গেল। পৃথিবীতে তখন প্রাণীমাত্র ছিল না, ছিল কেবল এক প্রকাণ্ড কোলাবেঙ্গ। বেঙ্গ কতকাল হইতে ছিল, কেমন করিয়া জন্মিয়াছিল, বা কোথা হইতে আসিয়াছিল, কেহ জানে না। জলের গুণে বেঙ্গ জন্মিয়াছিল—লোকে বলে। জলে ছিল সেই কোলাবেঙ্গ, আর আকাশে ছিল চাঁদ, কোথাও কেহ আর তখন ছিল না। চাঁদে, বেঙ্গে প্রায়ই কথাবার্ত্তা, আলাপচারি চলিত। একদিন আকাশ হইতে চাঁদ বলিয়া উঠিলেন, 'বেঙ্গ বেঙ্গ, আমার একটা "আইডিয়া" আছে। আমি এমনতর এক যোড়া জীব বানাইতে চাই, যাহারা দুইকোঁড়া ঐ সকল ফলমূল ভোগ করিবে। ঐ সব খাসা খাসা খাবার জিনিস তাদেরই যোগ্য। আমি যে জানোয়ার জোড়াটা বানাইব, তাদের নাম দিতে চাই মানুষ আর মানুষী। কি বল, তুমি বেঙ্গ, আমার এ প্রস্তাবে?"

কোলাবেঙ্গ ও কৌমুদীকান্ত।

বেঙ্গ বলিল,—"না, তুমি পারিবে না; আমি মানুষ আর মানুষী তৈয়ার করিব। আমি বানাইলেই ভাল হইবে; তোমার, যারা তেমনটি হইবে না। তুমি আকাশে থাক, পৃথিবীর খবর আর বাপ কি যে, পৃথিবীর জীব প্রস্তুত কোর্ত্তে পারবে?"

চাঁদ বলিলেন—"তা বটে; তোমার অল্প একটু সৃষ্টিশক্তি না আছে, এমন নয়, কিন্তু তোমার সৃষ্টি অসম্পূর্ণ ও অল্পস্থায়ী হইবে; তোমার নিজেরই স্বভাব তাহাতে ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু, আমার সৃষ্টি কতক কতক আমার নিজের স্বভাবেরই মত হইয়া সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও সুচিস্থায়ী হইবে। তাই বলি বেঙ্গ! তুমি ক্ষান্ত হও, বিফলাদ্যম স্বল্পস্থায়ী সৃষ্টি করা তোমার উচিত হয় না। সৃষ্টিকার্য্যটা আমারই হাতে থাক।"

বেঙ্গ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল,—"ওহে চাঁদ! চালাকি রাখ; তোমার চতুরতা আমি বুঝেছি। তোমার মত আমারও সৃষ্টিক্ষমতা আছে, তাই তুমি হিংসা করিতেছ। সৃষ্টির অতি বড় প্রকাণ্ড 'আইডিয়া' আমার মস্তিষ্কের ভিতর খুঁজিতেছে। আমি বিশিষ্ট বিচার বিবেচনা করিয়া সব ঠিক ঠাক করিয়াছি। আমি আমার নিজের মতলব মত মানুষ মানুষী সৃষ্টি করিব। তুমি তফাৎ হও।"

চাঁদ রুষ্ট হইলেন। বলিলেন,—"আচ্ছা বেঙ্গ! তোমার যা খুসি, তুমি কর; কিন্তু স্মরণ থাকে যেন যে, আমি তোমাকে শুদ্ধ তোমার সৃষ্টি নাশ করিব।" এই বলিয়া চন্দ্র আকাশের উর্দ্ধ হইতে আরও উর্দ্ধে উঠিলেন। এবং তথা হইতে সমগ্র পৃথিবীর উপর শুভ্র কিরণজাল বিকীর্ণ করিলেন।

বেঙ্গ উত্তরে বলিল,—"এখন চটিয়াছ তুমি চাঁদ! তা বেশ! আমি তোমার ধার ধরি না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পৃথিবীর জীবের আমিই জন্ম দিব। তুমি যাইয়া তোমার আকাশের কার্য্য দেখ।"

বেঙ্গ সৃষ্টি-ভাবে তোরপুর; অহঙ্কারে ফুলিতে লাগিল। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া পরিপাক করিল। বেঙ্গভাব হইতে এক বলবান মানুষ মানুষী উৎপন্ন হইল। ইহারাই এ পৃথিবীর আদি নরনারী।

শশধর সন্তোষে বেঙ্গশাসনার্থে আকাশ হইতে নামিলেন। বেঙ্গ যে তোরাম ছিল, তাহার তীরে আসিয়া সন্তোষে কিরণ বিকীর্ণ করিয়া কহিলেন,—"কতাপা! তুই এ কি

করিয়াছিস।" নিষ্টীক ভেক উত্তর করিল,—"সহিষ্ণু হও, শশাঙ্ক। আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছি, চক্ষু চাহিয়া ঐ দেখ। এই সপ্তপদি আমার অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। সৃষ্টিকার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে।"

চন্দ্র বেঙ্গকে অনেক গালিগালাজ দিলেন, তাহার পর আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আহা। তুই কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিস; তোর উৎপাদিত জীব কতক্ষণ বাঁচিবে। আমার একবার শাস্ত্রাঘাতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ও যে ইহারা বাঁচিবে না। এদের বুদ্ধি বিক্রমও যে হবে, তোর বুদ্ধি সাধ্যি অপেক্ষা অধিক চমৎকার। ইহাদিগকে দেখিয়া দুঃখে যে আমার বুক ফাটে। তা দেখি, গড়িয়া পিটিয়া যদি এদের কিছু উন্নতি করিতে পারি। কিন্তু, তুই পাপাত্মা এখনি পাপ দেহ পরিত্যাগ কর।" এই বলিয়া চন্দ্রমা ভেকের উপর অমৃত জ্যোৎস্না ছুটাইয়া দিলেন। ভেক তৎক্ষণাৎ পুড়িয়া মরিল। চন্দ্র তখনও রাগে গরগর করিতেছিলেন। ঠাণ্ডা হইবার জন্য সেই ভোবার জল দিয়া স্নান করিলেন। তাঁদের ক্রোধানলে জল তখনক গরম হইয়া উঠিল, টগবগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল।

স্নানান্তে চাঁদ কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইয়া ভেকনির্ম্মিত নরনারীকে কাছে ডাকিলেন।—ভেক-সৃষ্টি ত অনেক আছই। চাঁদ, চাঁদের চিকণ হাসি হাসিয়া তাহাদিগকে ভরসা দিলেন। তাহারা কাছে আসিল। চন্দ্রদেব তাহাদিগকে পিটিয়া পাটিয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া যথাসম্ভব অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদন করিলেন। সেই সংস্কৃত শরীরে ও মেরামতি মস্তিকে যতটা ধারণ করা সম্ভবে, কিঞ্চিৎ জ্ঞান-বুদ্ধিও তাহাদিগকে দিলেন। তাহাদিগকে সোজা-কথা খাওয়া দাওয়া শিখাইয়া দিলেন; খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া দিলেন। ইতস্ত সূর্য্য উঠ হইল। অন্যান্য জীব জানোয়ার পশু-পক্ষী কীট পতঙ্গ জন্মিল। চন্দ্র তৎপোষিত পোষ্য পুত্র ও পুত্রীকে ডাকিয়া দিলেন, তাহাদের কে কিরূপ; কে খাদ্য, কে অখাদ্য, কে শত্রু, কে মিত্র। তাহারা সকলেই সেলাম করিয়া নরনারীর প্রাণাস্ত স্বীকার করিল। চাঁদ শিষ্য শিষ্যাকে শিখাইয়া দিলেন, সূর্য্যোদয়ে উঠিতে হয়; সূর্য্যাস্তে শুইতে হয়। সন্তানপালনের নিয়ম শিখাইয়া দিলেন; সূতিকাগৃহের কার্য্যা কার্য্য কহিয়া দিলেন। বলকারক খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন; ঔষধ পথ্যের বিধান বলিয়া দিলেন। সংসারনির্ব্বাহের সব শিখাইয়া দিয়া পরে এই বলিয়া চলিয়া গেলেন যে, "যখনি তোদের দরকার হবে, আর মাপদ বিপদ পড়ে, দরকার মত আমাকে ডাকিলেই আমি আসিয়া তোদের সব করিয়া কর্ম্মিয়া দিয়া যাইব। তোরা যতকাল থাকিবি, ততকালই আসিব, আমি আসিয়া তোদিকে লইয়া যাইব। তার পর আর আসিব না।"

সেই আদি জনক-জননী সেই নরনারীর পুত্র পৌত্র, প্রপৌত্র কন্যা দৌহিত্র প্রদৌহিত্রাদি হইল, পোষ্য বাড়িল, পৃথিবী জনস্রোতে পুরিল। চাঁদ আসিয়া বৃদ্ধ, বৃদ্ধা আদি মানব মানবীকে আকাশে লইয়া গেলেন। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে, তদবধি তিনি আর কখনও পৃথিবীতে পা দেন নাই।

হতভাগা ভেকই মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে, অসম্পূর্ণ ও সদর করিয়া গিয়াছে। মহিমা চন্দ্রহস্তে মনুষ্যজাতি অতি সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইত, অমর না হইলেও, অনেককাল যে বাঁচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভেক কর্ত্তৃক প্রথমতঃ নির্ম্মিত হওয়াতে, শশাঙ্কের শোষন

সত্ত্বেও, মনুষ্যে অস্বাভাবিক জেকতাব বহিয়া গিয়াছে। অতএব বিজ্ঞের কথা না শুনিলেই বিপদ ঘটে; বিজ্ঞাট হয়। জ্ঞানবান ও শক্তিশালীর পরামর্শ সর্ব্বথা পালনীয়।" ইতি।

কলিকাতা চৈতন্য লাইব্রেরির ত্রৈমাসিক পত্র, উক্ত লাইব্রেরির উন্নত অবস্থার পরিচায়ক। কেবল 'সাহিত্যিক' নয়, আর্থিক উন্নতিও ঘটে। শনিবার দুই কোয়ার্টারে, আমরা এই পত্রের দুই সংখ্যা সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি,—পাঠ্য বিষয় ইহাতে প্রচুর। চৈতন্য লাইব্রেরি, কেবল লাইব্রেরি বা পুস্তকাগার নহে, ইহার সহিত এক "লিটারারী ক্লব" সংযুক্ত আছে। সুতরাং ক্লবের সাময়িক অধিবেশনে বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ ও তদানুষঙ্গিক বিশিষ্ট বিষয়ে বিতর্ক ও বাদানুবাদ হইয়া থাকে। লাইব্রেরীসংশ্লিষ্ট ক্লবে বহু লোকে ও বিদ্বান লোকে বক্তৃতা করিয়া থাকেন,—স্থানীয় পণ্ডিত লোক ও "স্পেশিয়ালিষ্ট" দিগের লিখিত প্রবন্ধও পঠিত হইয়া থাকে। এই সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত ও তদ্দ্বারা রক্ষিত হওয়া উচিত;—তদর্থেই প্রধানতঃ লাইব্রেরির এই পত্র। "চৈতন্য লাইব্রেরি" বা বিদ্বজ্জন ক্লোবার লিটারারী ক্লব, তাঁহাদের এই ত্রৈমাসিক "জর্নাল" সৃষ্টি করিয়া উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। বিশিষ্ট ক্লব মাত্রেরই এক একটি "জর্নাল" থাকা প্রয়োজন।

নূতন ইংরাজী "ত্রৈমাসিক"।

এই ত্রৈমাসিক পত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে, "চৈতন্য লাইব্রেরি জর্নাল"। এ নাম আমাদের বিবেচনায় উত্তম বা উপযুক্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে, "চৈতন্য লাইব্রেরি" ইংরেজী কথাটির সংযোগও সবিশেষ সুরুচিকর বলিয়া বোধ হয় না, চৈতন্য নামের সহিত লাইব্রেরী শব্দের যতদূর দেশীয় অর্থ সংযুক্ত হইলেই যেন স্বাভাবিক, স্থিতিমধুর ও সমন্বয়জ্ঞাপক হইত বলিয়া বিবেচনা হয়। "চৈতন্য লাইব্রেরি", "সাহিত্য লাইব্রেরি", "শনিবার এসোসিয়েশন", ইত্যাদিরূপ ইমিটেশনস, বা কিরণ-শশী ক্লব, এবম্বিধ কথাগুলি কাহারও কর্ণে ভাল শুনায় না। সর্ব্বোপরি, দেশী বিলাতি মিশ্রিত এ প্রকার শব্দের অর্থে ভাবার বিকার ঘটে। বিদেশীয় পদ "পরিত্যাজ্য" শোধন বা স্বদেশী-করণ করিয়া স্বদেশীয় ভাবার গ্রহণ করা উত্তম; কিন্তু স্বজাতীয় বাঙ্গালাতে বিজাতীয় বিভক্তি মিশাইয়া, ভাবার একটা বিকট বিপ্লব উপস্থিত করিয়া, কথার কৌলীন্য নষ্ট করা, বোধ হয়, বিধেয় নহে। "বিলাতি পাখি" "ডাক্তার-বাবু" "মাষ্টার মহাশয়" "স্কুল-ঘর" প্রভৃতি শব্দ অজ্ঞাতে ও অসাবধানে উৎপন্ন হইলেও,—ভারত-মাতার, গঙ্গা-worship, বঙ্গীয় ক্যাট, কৃষি-গেজেট, শনিবার-রিবিউ, গৌরাঙ্গ-glory, চৈতন্য-Library, অমাবস্যার-night, বা আকাশের moon প্রভৃতি শব্দ ভাবিয়া চিন্তিয়া খোলাই করা উচিত নয়।

সমালোচ্য সাময়িকখানি সুন্দর, সুশ্রী, সুখপাঠ্য। ইহা আয়তনে নয়,—প্রবন্ধের প্রসন্ন-গাম্ভীর্য্যে ভরা। ইহার সম্পাদক রেবারেণ্ড মিঃ আলেকজেণ্ডার টমসী। সহকারী সম্পাদক দুই জন, যথা বারিষ্টার এ. চৌধুরী ও মিঃ জে. ওয়াট। তিন জন সম্পাদকই এম-এ। পত্রের আদ্যোপান্ত ইংরেজী। কিন্তু বিদ্বজ্জন ক্লোবার ক্লবে ইংরেজীর ন্যায় বাঙ্গালা বক্তৃতা ও প্রবন্ধও পঠিত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের কোনও কোনওটি সুচিন্তিত ও সারবানও যে না হয়, এমন নহে। অতএব ক্লবের কার্য্যে ইংরেজীর ন্যায় বাঙ্গালা প্রবন্ধাদিও প্রকটিত হওয়া,

অবশ্যই সাবেই, প্রয়োজন। আশা করা যায়, পত্রের পরিচালকগণ, এ পক্ষে উদাসীন না কবিলেও পারেন।

ক্লবে পঠিত প্রবন্ধাদি ব্যতীত, ক্লবের মুখপত্র ত্রৈমাসিক কাগজে, সম্পাদকীয় মূল প্রবন্ধ ও অনুবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা উত্তম। তবে, ত্রৈমাসিক পত্রে, সংবাদপত্রের অনুরূপ প্যারা প্রকাশিত হওয়া, অন্ততঃ মুদ্রণতঃও যেন কেমন বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। ক্লবের সংবাদ ও সম্পাদকীয় সাময়িক মন্তব্য যদি অন্য সংবাদপত্রে দিলে ভাল হয়।

প্রধান সম্পাদক মিঃ টনরী,—শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত; সুতরাং তদ্লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসমালোচনায় পর্য্যবসিত। অপর সম্পাদকদ্বয়ের মধ্যে, কেবল মিঃ ওয়াট, প্রথম সংখ্যায় কয়েকটি নোট লিখিয়াছেন।

দ্বিতীয়, অর্থাৎ বিগত জুন সংখ্যা জর্নালে, হাওড়ার বারিষ্টর মিঃ জি. এ. গ্রিয়ারসন কর্ত্তৃক পঠিত, দেশীয় সাহিত্যের উৎপত্তিবিষয়ক প্রবন্ধই প্রধান। মিঃ গ্রিয়ারসন স্বভাবতই গবেষণাশীল ব্যক্তি। তিনি সুপণ্ডিত, প্রত্নতত্ত্বানুরাগী ও এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের আন্তরিক উপাসক। এ দেশীয় সাহিত্যে তাঁহার সহানুভূতি ও অনুরাগ, কেবল সাহেব লোকের নহে,—অনেক এ দেশীয় লোকেরও আদর্শস্থল হওয়া উচিত। গ্রিয়ারসন মহোদয় হিন্দী সাহিত্যের উন্নতিকল্পে, অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারই যত্নে, প্রয়াগে ও পরে, বিহারের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্থানীয় হিন্দী-ভাষা সংগৃহীত, বর্ণানুক্রম শৃঙ্খলা-সম্পন্ন ও প্রণালীবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ গ্রিয়ারসন মৈথিলী ভাষার সর্ব্বপ্রধান ব্যাখ্যানকার। এ সম্বন্ধে তিনি যেন মার্শম্যানের তুল্য-পদস্থ। সেই স্মরণীয় মিসনারী মহাশয়রা বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, মিঃ গ্রিয়ারসন হিন্দী ও মৈথিলী ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থে তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন, ও করিতেছেন। কিন্তু এক ব্যক্তির দ্বারা,—তিনি যতই পরিশ্রমী ও প্রতিভাশালী হউন না,—এরূপ কার্য্য সংসাধিত হওয়া সুকঠিন,—সম্পূর্ণ অসম্ভব। হিন্দী সাহিত্যের সংস্কার ও তাহাতে নূতন সৃষ্টি সংসাধনার্থে, মিঃ গ্রিয়ারসন অনেকানেক সুযোগ্য সহযোগী প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং হিন্দী সাহিত্যে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিও দেখা দিতেছে। মৈথিলীভাষার সে সুযোগ ঘটে নাই। মৈথিলী সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মিঃ গ্রিয়ারসনের সহায়তা করিতে এক জন যোগ্য লোকও অগ্রসর হয়েন নাই। মৈথিল মহারাজা ভর লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর বিদেশে বিদ্বেষ বাহাদুরী আদায় করিতেছেন; স্বদেশেও তাঁর বন্ধুবান্ধবের অভাব নাই, উপস্থিত আলোচ্য চৈতন্য লাইব্রেরিরও তিনি এক জন "পেট্রন"। ইহা অতি উত্তম। কিন্তু কেবল "নামকা ওয়াস্তে" অজ্ঞাত অসংখ্য বিষয়ে প্রেসিডেন্সি ও পেট্রনী করার মত, যদি নেক নামের জন্যও নিজের পিতৃভাষাকে কিঞ্চিন্মাত্রও "পেট্রনাইজ" করিতেন, ও মাতৃ-সাহিত্যের প্রেসিডেন্ট হইতেন, তাহা হইলে, বোধ করি, তাঁহার বিপুল অর্থের বড় বেশী অপব্যয় হইত না। মৈথিলী ভাষা যে অতীব মিষ্ট ও একান্ত কাব্যোপযোগিনী, তাহা এক বিদ্যাপতির

মিঃ গ্রিয়ারসন।

হিন্দী ও মৈথিলী ভাষা।

মৈথিল মহারাজা ও তাঁর মাতৃভাষা।

পদাবলীতেই প্রকাশ। মৈথিলী ভাষা মিষ্ট; কিন্তু অদ্যাপি মাতৃগর্ভে, বিদ্যাপতি ঠাকুরের পর, আর তাহা এক বিন্দুও অগ্রসর হয় নাই। তা এমনই দুর্ভাগ্য যে, মিথিলার মুখোজ্জ্বলকারী অমর কবি বিদ্যাপতির একটা বিশুদ্ধ সংস্করণ আজও প্রকাশিত হইল না। মিঃ গ্রিয়ার্সন্ বিদ্যাপতির কতকগুলি কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ; বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির কয়েকটি সংস্করণ আছে, তাহা অবিশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। বিদ্যাপতির সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ গ্রন্থ, মিথিলাতেই এক স্থানে একত্রে পাওয়া যায় না; যাহা পাওয়া যায়, তাহাও হস্তলিখিত পুথির আকারে, অথবা গ্রাম্য লোকের গীতে। মিথিলার বিদ্যাপতির মুদ্রিত পুস্তক বিরল। ইহা মৈথিল রাজা মহারাজাদের শৈক্ষাভিমান সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্য ও দুর্ব্যাতির পরিচায়ক নহে। মৈথিল অপেক্ষা বরং বাঙ্গালী বিদ্যাপতির কীর্ত্তিকীর্ত্তনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে, এবং করিতেছে। বিদ্যাপতির বঙ্গদেশীয় সংস্করণ মৈথিলরা অবিশুদ্ধ বলিয়া মাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, কিন্তু, তাই এ পর্য্যন্ত ত মিথিলাতেও বিদ্যাপতির গ্রন্থের একটি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইল না। মিথিলার গীত ও তথাকার কোথাও কোথাও হস্তাক্ষরে রক্ষিত বিদ্যাপতির পদাবলী-সংগ্রহ করিতে পারিলে উহা অংশতঃ সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সম্ভবে কি না, বলা যায় না, কারণ, অযত্নে ও অবহেলে এক দিকে বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী বিনষ্ট হইয়াছে, অপর দিকে বহু প্রকার আবৃত্তিতে তাহাদের বিশুদ্ধতাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে মিঃ গ্রিয়ার্সনও তাঁহার বক্তব্যটার বড় ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন,—

Unfortunately, though he must have been a prolific poet, we have but few remains which are certainly his handiwork, and those few that have come down, having long been preserved by oral tradition, are certainly not in the form in which they were originally composed.

মিঃ গ্রিয়ার্সন্ বিবেচনা করেন যে, বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক হিন্দী অপেক্ষা বাঙ্গালা সাহিত্য অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছে। ইহা সত্য। কিন্তু ইহার কারণ কি? আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিপ্রবণতা ও বাঙ্গালীর সুতীক্ষ্ণ সাহিত্যাকাঙ্ক্ষাই ইহার কারণ। মিঃ গ্রিয়ার্সনের অভিমত যাহাই হউক, তিনি ইহা নিশ্চয় জানিতেন যে, যে কারণে, অদ্যকার ইয়ুরোপীয় প্রভাব একত্র অনুপ্রাণিত হইয়াও, বাঙ্গালা সাহিত্যের তুলনায় হিন্দী সাহিত্য বহু দূরে পশ্চাতে পড়িয়া আছে,—প্রধানতঃ সেই কারণেই হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালীর ন্যায় বিদ্যাপতিকে বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং আরও অপেক্ষা বরং অনাদরই করিয়াছে; সাহিত্যানুভূতির সূক্ষ্মশক্তির অভাবে তাঁহার অনুকরণ করিতে সমর্থই হয় নাই। বিদ্যাপতির সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বঙ্গদেশীয় মহাজন কবিদিগকে মিঃ গ্রিয়ার্সন্ তাঁহার এই বক্তৃতায়, ইঙ্গিতে একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এ কটাক্ষ সমীচীন সমালোচনার পরিচায়ক নহে। স্পষ্টাক্ষরে কোনও কথা না কহিলেও, বিদ্যাপতির অনুগামী বলিতে, মিঃ গ্রিয়ার্সন পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থের গীতরচয়িতা বৈষ্ণব কবিদিগকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁহাদের অনেকেই বিদ্যাপতির অনুকারক নহেন। যদিই বা কাহারও কোনও কোনও স্থলে

তদীয় অনুকরণের কিছু আভাস পাকে, সে অনুকরণ অসার ও প্রতিভাবিবর্জ্জিত নহে। মিঃ গ্রিয়ার্সন চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের কাহারও নাম করেন নাই, কবিবার সবিশেষ আবশ্যকতা হয় নাই, কারণ, বাঙ্গালা সাহিত্যের ঈষৎ ইঙ্গিত ব্যতীত তাহার কোনও কথাই এ বক্তৃতায় নাই। হিন্দুস্থানের সাহিত্য বলিতে তিনি হিন্দীকেই বেশী রকম বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছেন। হিন্দুস্থান বলিতে অনেক দূর বুঝায়। মিঃ গ্রিয়ার্সন তাঁহার বক্তৃতায় সমগ্র হিন্দুস্থান গ্রহণ করেন নাই। স্পষ্ট ভাষায় বাঙ্গলার পরিত্যাগ করিয়াছেন, আভাসে বরদেশ বর্জ্জন করিয়াছেন। মাদ্রাজ, মারহাট্টা, বোম্বাই, জয়পুট প্রদেশের মধ্যেই গ্রহণ করেন নাই। বলতঃ সমগ্র হিন্দুস্থানের ভাষা ও সাহিত্যের অসীম সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করা কাহারই পক্ষে সম্ভবে না, তা তিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন না। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে, মিঃ গ্রিয়ার্সন তদীয় বক্তৃতায় নামকরণে (The origins of the Vernacular Literature of Hindustan) তাদৃশ সৌভাগ্যবান হয়েন নাই। বিবিধ ধর্ম্ম মতের বিকাশ ও বিবর্ত্তন, এ দেশীয় সাহিত্যমাত্রেরই সৃষ্টি ও বিস্তারের মূল কারণ সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া স্বীকার করিলেও, যখন এ দেশীয় অসংখ্য সাহিত্যের সবিশেষ বৃত্তান্ত মিঃ গ্রিয়ার্সন অবগত নহেন, (অবগত যে নহেন, তাহা তাঁহার বক্তৃতাতেই প্রকাশ) তখন কেবল এক সংস্কৃত ও হিন্দী সাহিত্যের উল্লেখ করিতে যাইয়া, সমগ্র হিন্দুস্থানের নাম লওয়া ততটা সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু মহাজন কবিদিগের কথা বলা হইতেছিল। বিদ্যাপতির মত বিশিষ্ট বৈষ্ণব কবি আর কেহ জন্মেন নাই, এ কথা বলা যায় না। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকক্ষ, কবিত্বে কোনও কোনও স্থলে তাঁহার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহা উভয় কবিকে পরীক্ষা করিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। হিন্দী সাহিত্যের কবি তুলসীদাস। তুলসীদাসকে মিঃ গ্রিয়ার্সন প্রকৃত সাহিত্যানুরাগীর সম্মোহিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে অত্যুচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। এমন কি, কালিদাসের সহিত তাঁহাকে তুলিত করিতেও তাঁত হয়েন নাই। ইহা বোল আনা ভাষানুমোদিত না হইলেও প্রীতিকর। মিঃ গ্রিয়ার্সন তুলসীদাসের গুণে মুগ্ধ,—মুগ্ধ কে নয়? অতি মূঢ়ও তুলসীদাসের পরমার্থরসে বিগলিত হয়। তুলসী অতুলনীয়। অতুলনীয়,—কবিত্বে এবং পরমার্থে,—কবিত্ব অপেক্ষা পরমার্থে। মিঃ গ্রিয়ার্সন হিন্দী সাহিত্যের সবিশেষ আলোচনা করিয়া, তুলসীদাসকে চিনিয়াছেন,—হিন্দী সাহিত্যে তুলসীদাসই প্রাণ-সর্ব্ব, মিঃ গ্রিয়ার্সন, হিন্দী সাহিত্যের অনুরূপ বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিলে, তুলসীদাস অতুলনীয় হইলেও, বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অন্ততঃ কবিত্বে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি প্রাপ্ত না হইবেন, এমন নহে।

অতঃপর মিঃ গ্রিয়ার্সনের বক্তৃতার অতি সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম প্রদান করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে।

মিঃ গ্রিয়ার্সন বলেন, হিন্দুস্থানের ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম মতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ইতিহাস,—ধর্ম্মমতের বিবর্ত্তন ও বিকাশ, উত্থান, পতন ও পুনরুত্থানেরই ইতিহাস। এই ইতিহাস এ দেশে আদিকাল হইতে পুনঃ পুনঃ উক্ত ও পুনরুক্ত হইতেছে। ধর্ম্ম ও সাহিত্য। এই ইতিহাস হইতেই এ দেশীয় সাহিত্য উৎপন্ন, ও ইহাতেই তাহা অনুপ্রাণিত। বেদ, উপনিষৎ, বেদান্ত, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ধর্ম্মের উত্থান, অনধিষ্ঠি ও পতনের মধ্য হইতে, তাহা-

তীব ভাষা ও সাহিত্য উৎপন্ন হইয়াছে, শোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে,—তাহাদের কতক আছে, অবস্থা গতিকে কতক বা বিলুপ্ত হইয়াছে।

মিঃ গ্রিয়ার্সন বেদকে বিশিষ্টতা না দিয়াছেন এমন নয়,—কিন্তু "কৃষকের গান" বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। মিঃ গ্রিয়ার্সন অবশ্যই জানেন যে, এই "কৃষকের গান" বিশ্ববিদ্যার প্রথম প্রচারক প্রফেসর ম্যাক্সমূলর সংপ্রতি এ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বাভিমত পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বেদকে "কৃষি-গাথা" বলিয়া আদর বা উপেক্ষা করা, বুদ্ধিমানের পক্ষে বস্তুতই আদৌ উচিত নহে। এ সম্বন্ধে যাঁহাদিগের অধিক দূর যাইবার অধিকার বা অবকাশ নাই, তাঁহারা বেদ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে, অন্ততঃ এই পত্রে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বটব্যাল মহাশয়ের বৈদিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করুন, অনেক কুসংস্কার দূর হইবে। মিঃ গ্রিয়ার্সনকে বটব্যাল মহাশয়ের বৈদিক প্রবন্ধ পাঠ করিতে, সনির্ব্বন্ধে অনুরোধ করি।

বেদ।

মিঃ গ্রিয়ার্সন বলিতেছেন, (বক্তৃতার মর্ম্ম মাত্র)—বৈদিক ধর্ম্ম মতের সহিত জগতের উন্নতি এক স্থানে বসিয়া থাকিতে পারে না। বৈদিক মত, শাস্ত্র সাহিত্য ও দর্শন উপনিষৎ ও বেদান্ত ক্রমে যখন অল্পসংখ্যক পণ্ডিতের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল,—বৈদিক ভাষা জনসাধারণের দুর্ব্বোধ্য ও বৈদিক ধর্ম্ম অনুদারীর হইল, তখন প্রকৃতির নিয়মানুসারে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল। কালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের হ্রাস; এবং প্রাকৃত ও পালী ভাষার বিকাশ। কিন্তু সংস্কৃত অক্ষুণ্ণ। মিঃ গ্রিয়ার্সন বলিতেছেন,—

বৈদিক ধর্ম্মমত। প্রাকৃত ভাষা ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

But the Sanskrit remained based on document of sanctity for surpassing those of the oldest Buddhist and Jain scriptures; guarded with all the power which the instinct of self-preservation can give; commanding the services of the greatest intellects, of the most complete poets, which India has seen; it held its own.

পালী ও প্রাকৃত মরিল, কিন্তু সংস্কৃত জীবিত রহিল। কারণ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম শাস্ত্র অপেক্ষা সংস্কৃত হিন্দুশাস্ত্র অধিকতর পবিত্র,—সংস্কৃত আত্মরক্ষার যাবতীয় শক্তিসম্পন্ন, সংস্কৃত উচ্চতম বুদ্ধি-শক্তি ও কবি-প্রতিভা কর্ত্তৃক পূজিত; সুতরাং সংস্কৃত জীবিত থাকিতে, আত্মসত্ত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। শঙ্করাচার্য্য সংস্কৃতে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন। কিন্তু, বস্তুতঃ বিবেচনায়, অদ্বৈতবাদ পণ্ডিতেরই ধর্ম্ম, অপণ্ডিতের নহে। সুতরাং তদ্দ্বারা জনসাধারণের ধর্ম্মক্ষুধা মিটিল না। রাম ও কৃষ্ণ-উপাসক বিবিধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল। রামানুজ, রামানন্দ, নানক, কবির, বিল্বমঙ্গল, মিরাবাই, বল্লভাচার্য্য, সুরদাস ও তুলসীদাস প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্ম-প্রমুখ কবিগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন। মিঃ গ্রিয়ার্সনের বিবেচনায়, রামাবেৎ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাতেই এদেশীয় সাহিত্য প্রভাবিত। কবির, মিরাবাই, সুরদাস ও সর্ব্বোপরি তুলসীদাসের কবিত্ব সমালোচনা করিয়া, মিঃ গ্রিয়ার্সন্ তাঁহার বক্তৃতা সমাপন করিয়াছেন। মিঃ গ্রিয়ার্সন্ তাঁহার বক্তৃতার আরম্ভে নিজেই লিখিয়াছেন যে, তাঁহার আলোচনায় মৌলিকতা বা নূতন কথা কিছুই নাই। তা যা থাকুক, তিনি অল্পের মধ্যে অনেক কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় বহুবিস্তৃত। তাঁহার উক্তি উপলক্ষে আরও অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু স্থানাভাব।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়। এবারকার ভারতীর প্রথম প্রবন্ধ "সাত বৎসরে সখিসমিতি।" আমরা সাগ্রহে সমিতির বিবরণ পড়িলাম, কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। 'সখিসমিতির এক উদ্দেশ্য, সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের সম্মিলন ও সদ্ভাববর্দ্ধন। লেখিকার মতে তাহা অনেক অংশে সুসিদ্ধ হইতেছে।' 'সমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠা দিনে, ১২৯৩ সালের এক বৈশাখী অপরাহ্নে সাত জন মহিলা মাত্র উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে দেশ-হিতকর ব্রতপালনে সঙ্কল্পী হইয়া পরস্পর সখ্যভাববন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।' আজ সখিসিদের সংখ্যা পঞ্চাশেরও অধিক। "সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কি—যা, কোন সদ্গতিহীনা বিধবা বা কুমারীকে তাহার অভিভাবক সখি-সমিতির উদ্দেশ্যানুমোদিত সদনুষ্ঠানে ব্রতী করিতে ইচ্ছুক হইলে সমিতি তাহাকে ভরণপোষণ ও শিক্ষা প্রদান করিবে, অন্ততঃ অন্যথাধিককে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিবে। যদিও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি আশা ও ইচ্ছানুরূপ সফলতা লাভ করে নাই, তথাপি এই কয় বৎসরে সমিতি এই কার্য্যে দেশের যতটুকু উপকার সাধিত করিয়াছে, তাহা এই সমিতির পক্ষে সামান্য কার্য্য নহে।' সখিসমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য,—'সমিতির পালিতাগণ সুশিক্ষিতা হইলে তাহাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছায় সমিতি সাত বৎসর ধরিয়া কয়েক জন বালিকাকে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যখন এক জন শিক্ষিত হইয়া এ কার্য্যের উপযুক্ত হইল, তখন উপযুক্ত অর্থাভাবে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা গেল না। কিন্তু নূতন বৎসরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের বহুদিনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।—সখিসমিতির শিক্ষিতা বালিকা নহে, সমিতির এক জন হিতৈষিণী সখী নিজে এই পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন।' সমিতির দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইলে, দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে। এদেশে বালিকাদের শিক্ষাবিষয়ের পর্য্যাপ্ত উপায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমিতির সঙ্গে যদি কলিকাতার ও মফস্বলের স্থানে স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়,—এবং যথোচিত অবিলম্বে ভাবে বালিকাদের শিক্ষা দেওয়া হয়,—তাহা হইলে দেশের একটা গুরুতর অভাবের মোচন হইতে পারে। বিশেষজ্ঞদের গুরুতর কাছে বাঙ্গালীর মেয়েরা খৃষ্টানী বাঙ্গালা যথেষ্ট শিখিয়াছে,—এবং এই উপলক্ষে বিদ্যাটও বড় কম হইতেছে না। যদি এই অবসরে সমিতি বালিকাদের শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা একটু বিস্তারিত ভাবে আরম্ভ করেন, বোধ করি, তাহাতে সুফল ফলিতে পারে। বিদ্যালয়ের কতক ব্যয় বালিকাদের গর্ভ দেখনে,—কতক স্থানীয় চাঁদায়,—এবং যদি তাহার পরও আবশ্যক হয়,—সমিতির সাহায্যে চলিতে পারে। আমাদের বোধ হয়, সমিতির সখীদের কেহ কেহ মফস্বলেও বাস করিতেছেন। তাঁহারা তথাকার স্থানীয় অবস্থা অবগত আছেন। যদি সকলে মিলিয়া চেষ্টা করেন,—তাহা হইলে সফলতালাভ নিতান্ত দুরূহ হইবে না। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা সমিতির হিতার্থিনী,—তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া, সুবিধা ও উপযোগিতা অনুসারে, প্রস্তাবিত বালিকাবিদ্যালয়ের পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও মুখ্য বিশেষে অধ্যাপন, বা শেলাই প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানি করেন, তাহাতে পরস্পর সদ্ভাবস্থাপনের অপেক্ষা অধিক সুফল ফলিতে পারে। আমরা সবিনয়ে অনুরোধ করি, সমিতি এ বিষয়ে একটু ভাবিয়া দেখিবেন। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "দেব-প্রয়াগে" মৌলিক ভ্রমণবৃত্তান্ত,—বিলক্ষণ কৌতূহলজনক ও মনোরম হইয়াছে। এই সংখ্যায় "আপেল আস্রাণে" সমাপ্ত হইল। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল ও রচনাপ্রণালী সরল। তিনি "আপেল আস্রাণের" অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকার করিলেন। শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়ের "শিক্ষা সঙ্কট" এখনও শেষ হয় নাই। "কুমন্ত্রণা" নামক কবিতাটি

কেন মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। ফুট নোটে প্রকাশ, "গত বৈশাখ মাসের ভারতীতে 'সবস বসন্তে হরষে গাঁশিরে' এই মুখপাতে যে গান বাহির হইয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তরে।" প্রত্যুত্তরটা কি নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল? কবিতা লেখার বস্তু,—তাহা লইয়া পাঁচালীওয়ালাদের মত ছড়া কাটাকাটি না করিলেও চলে। "কস্যচিৎ মুক্ত-ভোগিনঃ," এই সহি করিয়া, এক জন বিনামা লেখক "ভালবাসা না চক্ষুলজ্জা?" লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। "মুক্তভোগীর" অ্যাঠামি পড়িয়া আমরা বিরক্ত হইয়াছি,—তিনি যে মাশাবুণ্ড কি লিখিয়াছেন,—আমরা তাহার সারগ্রহ করিতে পারিলাম না। আর একটি কথা বলিতে ক্ষতি নাই যে, খেয়ালে যাহা হাজীর হয়, তাহাই বর্ণবদ্ধ করিবার ও "ভারতীতে" ছাপাইতে পাঠাইবার আগে, একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। যিনি "চক্ষুলজ্জার" বিশ্লেষণ করিতে বসিয়াছেন,—পাঠকদের কাছে তাঁহারও একটু চক্ষুলজ্জা রাখা কর্ত্তব্য। এ সংসারে চক্ষুলজ্জার অনুগ্রহকার না হইলে তাঁহার লেখাটুকু হয় ত সূর্য্যের আলোক দেখিতে পাইত না। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "একটি পল্লীকাহিনী" মন্দ হয় নাই। শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল, 'মুসলমী সমালোচনার' প্রতিবাদ করিতেছেন। প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ বা ক্রমশঃ প্রকাশ্য, বুঝা গেল না। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্রের "ব্যাঘ্রপূজা" খুব জাঁকাল প্রবন্ধ,—সামাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে ও ফুটনোটে পূর্ণ। কিন্তু প্রবন্ধটি অতিবিস্তৃত, এবং রচনা কৌশলহীন বলিয়া ততটা প্রীতিকর হয় নাই।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। আনন্দের বিষয় যে, এই সংখ্যায় "মার্শেরেস" সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীযুত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম-এ, এই সংখ্যায় "কৃষিকার্য্যের উন্নতি" ইতি-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। নিত্য বাবু কৃষিশাস্ত্রে ও কৃষিবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, এবং এতদ্দেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞ। তাঁহার প্রবন্ধেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ বিশেষজ্ঞ লেখকের লিখিত প্রবন্ধপাঠে বথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। আর এক জন উপযুক্ত লেখক, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্-এ, "পল্লিকাব্রিয়াট" লিখিতেছেন। পল্লিকা-সংস্কার প্রকৃতই নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যোগেশ বাবুর মত শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিকে এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। প্রবন্ধটিও সুলিখিত ও যুক্তিপূর্ণ হইয়াছে। "A new begining for [illegible]লোত্তমা" এখনও চলিতেছে। স্বর্গীয় মাই-কেল মধুসূদন দত্তের রচনা আদর ও গৌরবের সামগ্রী বটে, কিন্তু প্রতিবারে দুই চারি পংক্তি করিয়া প্রকাশ করিবার অর্থ কি, বলিতে পারি না। অত অল্প পড়িয়া তৃপ্তি পাওয়া যায় না। ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধের তালিকায় "নব্যভারত" পীড়িত হইয়া উঠিয়াছে। চৈতন্য চরিত ৫০ বার, "ইয়ুরোপে দর্শন ও ধর্ম্মপ্রচার" ৮ বার প্রকাশিত হইয়াছে; এখনও কত বাকী, কে জানে? মাসিকপত্র সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে একটু অবহিত হইলে ভাল হয়। "দুঃসময়ের" কটি সনেট শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের অনুকরণে রচিত বলিয়া বোধ হইল—কিন্তু তাহাতে দেবেন্দ্র বাবুর কল্পনা, ও ধীশার ঝঙ্কার নাই।

"কি সুখের কিশোরীর কঠিন ঘতার,
নিদারুণ বিধাতের বেয়াপাতি ভাব।"

কেবল অক্ষম অনুকরণের দৃষ্টান্ত নহে, হাস্যাস্পদও বটে।

সাধনা। আষাঢ়। "প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ" কষ্টকল্পিত রহস্য, আরম্ভ ভাল রহস্য ভাল, কিন্তু শেষটা নিতান্তই টানিয়া বোনা হইয়াছে। ইহাকে কোনও মাসিকের প্রথম স্থান অধিকার করিতে দেওয়া সঙ্গত হয় না। "অসম্ভব গল্প" একটি উপকথা, ইহার উপ-ক্রমণিকা টুকু অতি সুন্দর, বাল্য স্মৃতির মধুর সৌরভে আমোদিত হইয়া আছে। সমগ্র গল্পটির বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণীর "কন্যাদায়" পড়িয়া তৃপ্ত হওয়া যায়। লেখিকা "কন্যাদায়ের" বড় চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন। মাতৃকুলের স্নেহদৃষ্টি ও সমা-লোচকের সূক্ষ্ম দর্শনের সমাবেশে, সমগ্র রচনাটি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের "উত্তরচরিত" সন্নিবেশ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের 'সাংখ্যদর্শন' সাধনার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক মৌলিক প্রবন্ধ বাঙ্গলা সাহিত্যে সচরাচর দেখা যায় না। 'সাংখ্যদর্শনের' জটিলতত্ত্ব এমন প্রাঞ্জল ভাষায় ও সরল ভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এপ্রবন্ধের সাধনার আর একটি মহামূল্য অলঙ্কার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোণার তরী'। আমরা বহুদিন এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিভাসম্পন্ন কবিত্বময় কবিতা পড়ি নাই। আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না,—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা ব'সে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খর পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত বেলা।
এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।
বেয়ে' যেন মনে হয় চিনি উহারে।
তরা-পালে চলে যায়,
কোন দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙ্গে দু'ধারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে।
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেথা যেথা যেতে চাও,
যারে খুসি তারে দাও
শুধু তুমি দিয়ে যাও
খানিক হেসে
আমার সোণার ধান কূলেতে এসে।

যত চাও তত লও তরণী পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে'।
এতকাল নদীকূলে
যাহা ল'য়ে ছিনু ভুলে'
সকলি দিলাম তুলে'
থরে বিথরে
এখন আমারে লহ করুণা করে'।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। ছোট সে তরী
আমারি সোণার ধানে গিয়েছে ভরি'।
শ্রাবণ গগনে ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোণার তরী।

ইহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত, তাহা কেবল হৃদয় দিয়া অনুভব করা যায়, ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। রবীন্দ্র বাবু বহু দিন এমন কবিতা লেখেন নাই, "প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ" নীরীহ ও নিরপরাধ পাঠকদের ঘাড়ে না চাপাইয়া, তিনি 'সোণার তরী'র মত কবিতা লিখুন, তাঁহার 'সোণার' লেখনী অমর হইয়া থাকিবে।

বৈদিক প্রবন্ধ।

সুদাস।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী সুদাসের নামোল্লেখ করিয়াছি। উক্ত হইয়াছে, সুদাসের রাজত্বকালে অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে, ঋগ্বেদসংহিতার অধিকাংশ রচিত হইয়াছিল। এক্ষণে হয় ত আমাদের পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিবেন—সুদাস রাজা কে?—তাঁহার নাম ত মহাভারত রামায়ণে বা পুরাণে প্রসিদ্ধ নহে?—স্কুল কলেজের সচরাচর পাঠ্য ইতিহাসেও ত তাঁহার নাম শুনি নাই? ইহা কিরূপে ঘটিল যে, আমাদের দেশের এত বড় এক জন রাজার নাম আমরা একবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি।

বাস্তবিক ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে যে, আমরা রাজা সুদাসের বৃত্তান্তবিষয়ে এতই অজ্ঞ। বেদবিদ্যার অ[illegible]ই ইহার একমাত্র কারণ।

সুদাস গল্পের রাজা নহেন। তিনি প্রকৃত ঐতিহাসিক রাজা। তাহা অপেক্ষাও কিছু বেশী। অন্যান্য রাজাদের জীবনবৃত্তান্ত অন্য লোকে লিখিয়া রাখিয়া যায়; সুদাসের জীবনের কোনও কোনও কথাও অন্যে লিখিয়া গিয়াছে; কিন্তু সুদাস নিজে আপনার কথা আপনি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের মধ্যে সুদাসের রচিত একটি সূক্ত আজিও বিদ্যমান। তাঁহার আত্মা আজিও আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহে। এতাদৃশ রাজার রাজত্বের বিবরণ কিছুমাত্র না জানা, আমাদের পক্ষে বড় লজ্জার কথা।

সুদাসের স্বচরিত সূক্তে এবং তাঁহার সমকালীন বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋষির বচনায়, আমরা সুদাস রাজা এবং তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা জানিতে পারি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ও প্রমাণ দিয়াছি যে, পুরুনিক ভোজপুর নামক মণ্ডলের পশ্চিম প্রদেশে বিশ্বামিত্রের বাসস্থান ছিল। এ দিকে রাজা সুদাসের রাজধানী সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্রের সীমান্তে মৎস্যদেশে অবস্থিত ছিল। সুদাস এক জন বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ও সেনানায়ক ছিলেন। তিনি নানা দেশ

পরাজয় করিয়া এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্রের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বিশ্বামিত্রের অনুচরেরা ক্ষত্রিয়বংশীয় ছিলেন; তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের নামে, তাঁহারা বেদে "কুশিকাস" বলিয়া বিখ্যাত। কুশিকেরা সুদাসের অশ্বমেধের অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত হয়েন। এবং গুণগ্রাহী রাজা সুদাস, বিশ্বামিত্র জাতিতে ব্রাহ্মণ না হইলেও, তাঁহার ঋক্‌রচনা-শক্তিতে প্রীত হইয়া, ব্রাহ্মণজাতীয় ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠের সহিত তাঁহাকে স্বীয় যজ্ঞে ঋত্বিকের পদে বরণ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিশ্বামিত্র বলিতেছেন;—

"মহা ঋষির্দেবজা দেবশ্রুতোঽতত্ত্বাং সিন্ধুমবর্বর মুচৎকাঃ।
বিশ্বামিত্রো যদবহৎ সুদাসম্ প্রিয়ায়ত কুশিকেভিরিন্দ্রঃ।" ৩—৫৩—১

ইহার শেষার্দ্ধের তাৎপর্য্য এই যে, যখন বিশ্বামিত্র সুদাসের যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন,—তখন ইন্দ্র কুশিকদিগের সহিত অতিশয় প্রিয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। যজ্ঞে ক্ষত্রিয় ঋত্বিকের কার্য্য করায়, ইন্দ্র কষ্ট না হইয়া প্রীতই হইয়াছিলেন। কিরূপে প্রীত হইয়াছিলেন, তাহা ঋকে বড় স্পষ্ট নাই। পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত শে[illegible] র মিলন করিলে, এবং সুদাসের জীবনের সুপরিজ্ঞাত ঘটনাবলীর কথা স্ম[illegible] করিলে, অনুমান হয় যে, কোনও সংগ্রামে সুদাসের শত্রুরা নদীর কূল ভেদ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করে; কিন্তু সুদাস অবশেষে সৈন্যগণকে সেই জলসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া শুষ্ক স্থানে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়েন। পরে বসিষ্ঠের এক ঋকে আমরা এই কথার আভাস দেখিব। এখানে বিশ্বামিত্র এই সঙ্কট হইতে সুদাসকে যেন আপনার অতিবলে রক্ষা করিয়াছিলেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন। মূল কথা,—বিশ্বামিত্র বলিতেছেন, "আমি বিশ্বামিত্র মহর্ষি, আমার স্তবে তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র সিন্ধু জলকে স্তম্ভিত করিয়া সুদাসকে বাঁচাইয়াছেন।" ইহাই বোধ হয়, কুশিকদের প্রতি ইন্দ্রের প্রিয়ব্যবহার।

বিশ্বামিত্র স্বীয় অনুচরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।—

"উপ প্রেত কুশিকশ্চেতয়ধ্বমস্মিন্ রাজন্ প্রযুজতা সুদাসঃ।
রাজা কৃণ্বন্ নবনীরাম্নাপাংসি সখায়মতি বরুতাত্রিং॥" ৩—৫৩—১১

অর্থাৎ, "হে কুশিকগণ! উঠে আইস, সতর্ক হও, সুদাসের যজ্ঞীয় তুরঙ্গ মুক্ত কর। সুদাস রাজা পূর্ব্ব দিকে পশ্চিম দিকে ও উত্তর দিকে, সমুদায় শত্রু বিনাশ করিয়াছেন। এক্ষণে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছেন।"

ইহাতে সুদাস রাজার দিগ্বিজয় এবং দিগ্বিজয়ান্তে অশ্বমেধানুষ্ঠানের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

বসিষ্ঠ ঋষি সুদাস রাজার যজ্ঞে বহুমূল্য দক্ষিণা পাইয়া বলিতেছেন ও আশীর্ব্বাদ করিতেছেন ;—

"যে নঃ পূর্ব্বেষবতঃ শতে গোর্যা রথা বধূমন্তো সুদাসঃ।
অর্হন্ দদো। পৈজবনস্য দানং হোত্রেব সদ্ম পর্য্যেমি রেভন্।
চত্বারো মা পৈজবনস্য দানাঃ শ্রদ্ধিতবঃ কৃশনিনো নিরেকে।
ঋজ্রাসো মা পৃথিষ্ঠাঃ সুদাসস্তোকং তোকায় শ্রবসে বহন্তি।
যস্য শ্রবো রোদসী অন্তরুর্বী শীর্ষে শীর্ষে বিবতাতা বিভক্তা।
সপ্তেদিন্দ্রং ন শ্রবতো হরাতি মি যুধ্যামধিবশিশাস্তীকে।
ইমং নরো মরুতঃ সশ্চতানু দিবোদাসং ন পিতরং সুদাসঃ।
অধিষ্টনা পৈজবনস্য কেতং দূণাশং ক্ষত্রমজরং দুবোয়ু।" ৭—১৮—২১—২৫

অর্থাৎ—"হে অগ্নি! দেবযান রাজার পৌত্র, পিজবনের পুত্র, সুদাসের দুই শত গো এবং দুই খানি বধূসংযুক্ত রথ আমি ইন্দ্রকে স্তব করিয়া দান পাইবার পাত্র হইয়াছি। এক্ষণে হোতার ন্যায় গৃহে প্রতিগমন করিতেছি। শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সমাদরের সহিত প্রদত্ত, স্বর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট, দুর্গম পথেও ঋজুগামী ও পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত - পিজবনপুত্র সুদাসের প্রদত্ত চারিটি অশ্ব পুত্রবৎ পালনীয় বসিষ্ঠকে পুত্রের অভাবে বহন করিতেছে। যে সুদাসের যশঃ বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবী মধ্যে অবস্থিত, যে দাতা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ধনদান করেন, সপ্ত সিন্ধু যেমন ইন্দ্রকে স্তব করে, তদ্রূপ সেই সুদাসকে সপ্তলোক স্তব করে। তিনি যুদ্ধে যুধ্যামধি নামক শত্রুকে বিনাশ করিয়াছেন। হে নেতা মরুদ্গণ! এই সুদাস রাজার পিতা দিবোদাসের ন্যায়, তোমরা ইহাকেও সেবা কর। দেবতার পরিচারণাকাঙ্ক্ষী পিজবনপুত্রের গৃহ রক্ষা কর। ইহাঁর বল বিনাশরহিত এবং অশিথিল হউক।"

এই প্রশস্তিতে অবগত হওয়া যায় যে, সুদাসের পিতার নাম পিজবন বা দিবোদাস; তাঁহার পিতামহের নাম দেবযান। তাঁহার পিতা ও পিতামহ, উভয়েই রাজা ছিলেন। তিনি রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু সুদাসের পৈতৃক রাজ্য অতি সঙ্কীর্ণ ছিল বলিয়া বোধ হয়; কেন না, বসিষ্ঠ এক স্থানে বলিতেছেন ; –

---

* পর্বাৎ, পাস্ত শিষ্ট, পিছ পাড় করে না।

"আত্রেণ চিৎ তদ্ উ এনং চকার সিংহং চিৎ সোদরেভিঃ ষষাদান্।
অব প্রতীর্কেণ্ডাবৃক্ষমিন্দ্রঃ প্রাবদ্বহ্ বিথা জোষমা সুদাসে।" ৭—১৮—১৭

অর্থাৎ, "ইন্দ্র অতি হীনবল সুদাসের দ্বারা বহুসংখ্যক রাজাকে পরাজয়রূপ সেই যে এক অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কেমন—যেমন এক ছাগের দ্বারা সিংহকে হত্যা করা—যেমন ছুঁচের দ্বারা কঠিন যূপকাষ্ঠের কোণ * কর্ত্তন করা। সুদাস যেরূপ হীনবল, তিনি দৈববলে বলীয়ান না হইলে, এই অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন না।"

মহাভারতে নহুষের পুত্র যযাতি রাজার যদু, তুর্ব্বশ, দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে পাঁচ পুত্রের কথা সকলেই পাঠ করিয়াছেন। বসিষ্ঠের ঋক্‌পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যদুবংশীয়, তুর্বশবংশীয়, দ্রুহ্যবংশীয়, অনুবংশীয় ও পুরুবংশীয় রাজন্যগণের সঙ্গে সুদাসের বিস্তর যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল। বসিষ্ঠ বলিতেছেন,—

"পুরোলা ইৎ তুর্বশো যদুশ্চাসীৎ রাজে মৎস্যাসো নিশিতা অপীব।
শ্রুষ্টিং চক্রুর্ভৃগবো দ্রুহ্যবশ্চ সখা সখায়মতরদ্ বিষূচোঃ।" ৭—১৮—৬

অর্থাৎ, "তুর্ব্বশ নামে এক বাজিক রাজা অগ্রসূচক হইয়া ধনলাভের জন্য (অর্থাৎ লুণ্ঠনের জন্য) মৎস্য নামক জনপদ সকল আক্রমণ করেন। ভৃগুবংশীয় এবং দ্রুহ্যবংশীয় যোদ্ধারা তুর্ব্বশের সহায়তা করেন। তৎকালীন ইতস্ততঃ ধাবমান তুর্ব্বশ এবং সুদাসের মধ্যে যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহাতে সখা ইন্দ্র সখা সুদাসকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।" † ইহাতে অনুমান হয় যে, কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী মৎস্য নামক জনপদ সকল সুদাসের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; এবং দ্রুহ্য এবং ভৃগুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সহিত মিলিত হইয়া, তুর্বশরাজ সুদাসকে আক্রমণ করেন। সুদাস প্রবল শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, বিক্রমের সহিত আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেন, এবং অবশেষে জয়ী হইয়াছিলেন।

বসিষ্ঠ আবার বলিতেছেন;—

'অবশ্চক্রং করবং বৃদ্ধসপ্তয়ে দ্রুহ্যং মিত্রযুং যদুবাহঃ।" ৭—১৮—১২

অর্থাৎ, "শ্রুত—করব—বৃদ্ধ—ও—দ্রুহ্য নামক চারি জন রাজা সুদাসের সহিত যুদ্ধে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। আবার বলিতেছেন;—

---

* যূপের কোণ কাটিতে কঠিন ও তীক্ষ্ণধার বাণীর প্রয়োজন।

† ভাষ্যকার সায়ন বলেন, এই যুদ্ধে তুর্বশ সুদাস কর্ত্তৃক নিহত হন।

যি সদ্যো বিশা দৃংহিতানি প্রযান্ ইন্দ্রঃ পুরঃ সহসা সপ্ত দর্ষৎ।
যি আনবস্য তৃৎসবে গয়ং ভাগ্দ্রেষ্ব পুরু বিষ্বে মুন্নযাচং।" ৭—১৮—১৩

তাৎপর্য্য যে, "ইন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রিয়পাত্র সুদাস এই কবষাদি শত্রুপক্ষীয় রাজাদের সপ্তপ্রাকারবেষ্টিত দুর্গ সকল আপন বলে বিদীর্ণ করিয়াছেন। অনু-বংশীয়দের গৃহ তৃৎসুদের হস্তে পতিত হইয়াছে। (বসিষ্ঠ বলিতেছেন) আমরা ভরসা করি, শীঘ্রই পুরু রাজাকে আমরা যুদ্ধে পরাজিত করিব।"

এ স্থলে যে তৃৎসুগণের উল্লেখ দেখা যায়, তাহাদের রাজা একদা সুদাসের মিত্র ছিলেন। তুর্বশ, অনু, দ্রুহ্য ও পুরুবংশীয়দের সহিত সংগ্রামে তৃৎসুরাজ সুদাসের স্বপক্ষ ছিলেন। বসিষ্ঠ প্রথমে এই তৃৎসুদেরই পুরোহিত, অর্থাৎ প্রধান ব্রাহ্মণ সচিব ছিলেন।

তিনি এক স্থানে বলিতেছেন;—

"যদা ইযের্ গো অজমাস আসন্ পবিচ্ছিন্না ভরতা অর্ভকাসঃ।
অতর্কা পুরএতা বসিষ্ঠ আদিৎ তৃৎসূনাং বিশো অভ্রযন্ত।" ৭—৩৩—৬

অর্থাৎ, "গরুর রাখালেরা যে পাঁচন দণ্ডের দ্বারা গো তাড়না করে, ভরত-বংশীয় তৃৎসুরা এক সময়ে তদ্রূপ অকিঞ্চন ও অল্পসংখ্যক ছিল; পরে বসিষ্ঠ যখন তাঁহাদের সচিব (পুরএত) হইলেন, তখন তৃৎসুগণের প্রজা বিস্তার হইল। তৃৎসুরাজ এবং সুদাস, উভয়েই একদা হীনবল ও শত্রুপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পরস্পর মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু রাজাদের মধ্যে মিত্রতা ও শত্রুতা উভয়ই স্বার্থমূলক। আজ যে দুই রাজায় মিত্র, কল্য আবার তাঁহারা পরম শত্রু। সুদাস এবং তৃৎসুরাজের ইতিহাসও তদ্রূপ। এই দুই মিত্র রাজা অবশেষে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েন, এবং সেই যুদ্ধে তৃৎসু-রাজ পরাজিত ও পলায়মান হয়েন।" বসিষ্ঠ বলিতেছেন;—

"ইন্দ্রেষিতে তৃৎসবো বেবিষাণা আপো ন স্রষ্টা অবরন্ত নীচীঃ।
দুর্মিত্রাসঃ প্রকলবিন্ মিমানা অহর্নিশমি তোজনা যযাসে।" ৭—১৮—১৫

অর্থাৎ, "এই দুইমিত্র তৃৎসুগণ অজ্ঞানবশতঃ ইন্দ্রের সহিত অর্থাৎ ইন্দ্রের অনুগৃহীত সুদাসের সহিত যুদ্ধে সংগত হইয়া, সুদাসের বাহুবলে জল যেমন নিম্নদেশের অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ পলায়নপর হইয়াছিল; তাহাদের শিবিরে যে নানাবিধ ধনরত্ন ছিল, তৎসমুদায় সুদাসের হস্তে ফেলিয়া তাহারা পলাইল।"

বোধ হয়, তৃৎসুদের এই দুর্গতির পরেই বসিষ্ঠ সুদাসের আশ্রয়লাভ

করেন—ফলতঃ ইহা অনুমান। যখন তিনি তৃৎসুদের সচিব, তখনও সুদাসের সহিত তাঁহার পরিচয়ের সুবিধা ছিল; সেই পরিচয়েই, পরে তিনি সুদাসের যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পাইয়া থাকিবেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত বসিষ্ঠের মুখে যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়দের উল্লেখ, দেখি নাই। কিন্তু তাহারাও সুদাসের শত্রু ছিল। কেন না, বসিষ্ঠ আবার স্থানান্তরে বলিতেছেন;—

"প্রিয়াস ইৎ তে মঘবন্ অভিষ্টৌ নরো মদেম শরণে সখায়ঃ।
যি তুর্বশং যি যাদ্বং শিশীহি অতিথিগ্বায় শয্যং করিষ্যন্।" ৭—১৯—৮

অর্থাৎ, "হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞে তোমার আগমন হইলে আমরা তোমার প্রিয় ও মিত্র হইয়া নিজ নিজ গৃহে আনন্দিত হইব। সুদাস রাজাকে সকলের পূজনীয় করিবার জন্য তুমি তুর্বশ রাজাকে এবং যদু রাজাকে তাঁহার বশতাপন্ন কর।"

ইহাতে দেখা যায় যে, সুদাসের সময়ে যযাতিবংশীয় রাজন্যচক্র পাঁচ বিভিন্ন কুলে বিভক্ত ছিল; সেই পাঁচ কুলের নাম যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্য, অনু ও পুরু। সেই পঞ্চকুলের রাজারা সুদাসের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া, অবশেষে সুদাসের বাহুবলে একে একে পরাজিত হয়েন, এবং সুদাস তাহার পরে অধিতীয় যোদ্ধা বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তে বিখ্যাত হয়েন।

ইহা ভিন্ন বসিষ্ঠের গ্রন্থে সুদাসের আরো অনেক শত্রুর উল্লেখ দেখা যায়। পরুষ্ণী নদীর তীরে চয়মানের পুত্র কবি নামক নৃপতির সহিত তাঁহার এক বিখ্যাত যুদ্ধের বর্ণনা দেখা যায়। যখন একদা সুদাস পরুষ্ণীতীরে আপন সেনা ও অনুচর সহ শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, এবং বন্যার জলে পরুষ্ণী স্ফীততোয়া হইয়াছিল—তখন কবি হঠাৎ উক্ত নদীর কূলভেদ করিয়া দিয়া সসৈন্য সুদাসকে বন্যার জলে ডুবাইয়া মারিবার উদ্যোগ করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বসিষ্ঠ বলিতেছেন;—

"দুর্যোধো অধিতিং প্রেষয়ন্তো অভেতসো বিজনুষে পরুষ্ণীং।
মহাবিধ্যন্ পৃথিবীং পত্যমানঃ পক্তবিষপয়ৎ চায়মানঃ।" ৭—১৮—৮

অর্থাৎ—"দুর্বুদ্ধি, মন্দমতি সুদাসের শত্রুগণ গভীরতোয়া পরুষ্ণীর কূলভেদ করিল। তখন সুদাস আপনার মহিমা দ্বারা পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিলে, জলে আর তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। চয়মানের পুত্র কবি তখন পলায়নপর হইল, কিন্তু বন্যে পশুর ন্যায় সুদাসের ঘাসা হত হইয়া পৃথিবীতে শয়ন করিল।"

সুদাস মহিমা দ্বারা পৃথিবীকে কিরূপে ব্যাপ্ত করিলেন, যদি ঋষি একটুকু খুলিয়া বলিতেন, আমরা বড়ই প্রীত হইতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঋষির চক্ষে মনুষ্যের বিক্রম ও বুদ্ধি অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। সুদাস যে সমুদায় মহৎ কার্য্য সাধন করেন, ঋষির চক্ষে তাহা ইন্দ্রেরই কীর্ত্তি। স্থানান্তরে এই ঘটনাকেই অবলম্বন করিয়া বসিষ্ঠ বলিতেছেন;—

"অর্ণাংসি চিৎ পপ্রথানাসঃ সুদাসঃ ইন্দ্রো গাধানি কৃণুতে সুপারা।"

অর্থাৎ, "শত্রুবিদারিত পক্ষ্ণীর জল যখন চারি দিক নিমগ্ন করিয়া আসিতে লাগিল, তখন ইন্দ্র সেই জল অগভীর ও সুপার করিয়া দিলেন।" ইহাতে বোধ হয় যে, জল বেশি বৃদ্ধি না হইতে হইতেই সুদাস স্বীয় অসীম উদ্যমের সহিত জলসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া, অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে আপন সৈন্য সহ উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন, এবং শত্রুপক্ষের চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনার পর, সুদাস আবার, শত্রুপক্ষীয়েরা পক্ষ্ণীর কূলের যে যে স্থান ভেদ করিয়া দিয়াছিল, তাহা বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন।

বসিষ্ঠ বলিতেছেন;—

"ঈযুর্বরং ন ভর্ষা পক্ষ্ণীম্ আশুক্ষেমেভিষিঞ্চা মরুদ্ভিঃ।
সুদাস ইন্দ্রঃ সুযুজা অধিক্ষাম্ অবর্ত্তয়ন্ন মানুষে বয়িষ্টাঃ।" ৭—১৮—৯

অর্থাৎ, "অনন্তর ইন্দ্র (অর্থাৎ ইন্দ্রানুগৃহীত সুদাস) পক্ষ্ণী নদীর বিভিন্ন পর্ব্ব সকল বাঁধিয়া দিলেন। তখন পক্ষ্ণীর জল পূর্ব্বের ন্যায় প্রবর্ত্ত দেশেই চলিতে লাগিল। সুদাস রাজার অশ্ব তখন গন্তব্য দেশে গমন করিল। সমুদ্র শত্রুগণকে তখন ইন্দ্র সুদাসের বশে আনয়ন করিলেন।" বোধ হয়, এই ঘটনাকেই বিশ্বামিত্র "অস্তভ্নাৎ সিন্ধুম্ অর্ণবং" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র এই বিপদের সময়ে নদীর বিভিন্ন কূলের বন্ধনকার্য্যে সুদাসের বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বসিষ্ঠ বলিতেছেন—"ইন্দ্র সুদাসের হইয়া কূল বাঁধিয়া দিলেন;" কিন্তু বিশ্বামিত্র সদর্পে ও শ্লাঘার সহিত বলিতেছেন—"ইন্দ্রের অনুগ্রহ থাকায় আমি কূল বাঁধাইয়া দিলাম।"

ইংলণ্ডের সিংহসনী রাজা প্রথম রিচার্ডের ন্যায়, সুদাস রাজার দেহে অসুরের বল ছিল, বোধ হয়। কেন না, বসিষ্ঠ এক স্থানে বলিয়াছেন (৭—১৮—১১) যে পক্ষ্ণী নদীতীরে বৈকর্ণ নামে যে জনপদদ্বয় আছে, তথাকার যুদ্ধে সুদাস রাজা প্রাপন হস্তে একবিংশতিসংখ্যক যোদ্ধাকে নিহত করেন।

বসিষ্ঠ আর এক স্থানে বলিয়াছেন (৭—১৮—১০) যে, একদা অনুবাহু এবং দ্রুহ্যবাহু মিলিত হইয়া, বহুসংখ্যক সৈন্য সহ সুদাসকে আক্রমণ করেন, এবং যুদ্ধে তাঁহাদের যে অনুচর বীরগণ ধরাশায়ী হয়, তাহাদের সংখ্যা ছয়সট্টি হাজার ছয়সট্টি! এই সংখ্যায় কিয়ৎপরিমাণে অত্যুক্তি থাকার সম্ভব, কিন্তু ইহাতে দেখা যায় যে, সুদাসের সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত সামান্য ছিল না। প্রায় সার্দ্ধ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধযাত্রায় সুদাসের অনুগমন করিত—বলিলে, বোধ হয়, অসঙ্গত হয় না।

তৃৎসুগণের রাজ্য যমুনাতীরে কোনও স্থানে ছিল। এই প্রদেশে ভেদ নামক একজন পরাক্রমশালী নাস্তিক রাজাও সুদাসের সহিত সমরে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, শুনা যায় (৭—১৮—১৯)। সুদাস ভেদকে বধ করেন, এবং তৃৎসুগণকে বশে আনয়ন করেন। তখন যমুনার তীরবর্ত্তী জনপদ সকল তাঁহার করদ হইল। অজ, সিগ্রু ও যক্ষু নামক জনপদ সকল, সাময়িক অশ্ব উপঢৌকন দিয়া, তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিল।

সিন্ধু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে এইরূপে একেশ্বর হইয়া, সুদাস রাজা অবশেষে পূর্ব্বরাজ্য জয় করিতে সসৈন্যে প্রস্থান করেন। এই যুদ্ধযাত্রাকালে বসিষ্ঠ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। এবং এই সময়েই সপ্তম মণ্ডলের যত সূক্ত রচিত হইয়াছিল, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইন্দ্র ও বরুণকে সম্বোধন করিয়া বসিষ্ঠ এই সূক্তে বলিতেছেন;—

"হে অধিনায়ক দেবতাদ্বয়! তোমাদের উভয়ের বন্ধুতার উপর নির্ভর করিয়া, বলিষ্ঠকায় যোদ্ধারা পূর্ব্বাভিমুখে দিগ্বিজয়কামনায় অগ্রসর হইয়াছেন। এই বীরগণের কি দাসজাতীয়, কি আর্য্যজাতীয়, সকল শত্রুকে তোমরা বিনাশ কর। হে ইন্দ্র ও বরুণ! সুদাস রাজাকে তোমরা রক্ষা কর। যে সময়ে মনুষ্যগণ ধ্বজা উত্তোলন করিয়া পরস্পরে সম্মুখীন হয়, যাহাতে কিছুই অনুকূল হয় না; সকলই দুষ্কর হয়, যে যুদ্ধে সকল প্রাণী ভীত হয়, এবং বীরগণ বর্ম্মের ঘাব উন্মুক্ত দেখে, সেই যুদ্ধে তোমরা আমাদের সহায় হও। পৃথিবীর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত যেন সৈনিকদল কর্ত্তৃক ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়াছে দেখিতেছি; সেনাগণের কোলাহলে আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে শত্রুপক্ষীয় সৈন্য আমার নিকট উপস্থিত; হে আহ্বানশ্রবণকারী দেবতাদ্বয়! এই বিষম বিপাকে আমাকে রক্ষা কর।" ইত্যাদি।

ফলতঃ, এই অপূর্ব্ব দিগ্বিজয়যাত্রার আর অধিক বর্ণনা নাই। কিন্তু যে

পর্য্যন্ত আছে, তাহাতে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, বহু সহস্র সেনাদলে পরিবৃত হইয়া, সুদাস রাজা পূর্ব্বরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। কোন পথে গিয়াছিলেন, কোন কোন দেশে কোন কোন রাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা নাই; তাহা অনুমানের চেষ্টা করা বৃথা। এই সূক্তে কথিত আছে, একদা দশ জন রাজা একত্র হইয়া সুদাসের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু বিক্রান্ত সুদাস সর্ব্বত্রই জয়ী হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের বাক্যে "রাজা বৃত্রং যযনৎ প্রাক্ অপাক্ উদক্"—পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দিকের সমুদায় আর্য্য ও অনার্য্য রাজগণকে হত বা পরাজিত করিয়া, অবশেষে পিতৃবনপুত্র সুদাস আর্য্যাবর্ত্তের রাজচক্রবর্ত্তীপদে অধিষ্ঠিত হয়েন, এবং আপন দিগ্বিজয়খ্যাপনের জন্য অবশেষে এক প্রকাণ্ড অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই নূতন সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানকালেই ঋগ্বেদের অধিকাংশ রচিত হইয়াছিল।

সুদাস যেমন এক জন রাজা, তেমনি এক জন ঋষি ছিলেন। বসিষ্ঠাদি যেমন ব্রহ্মর্ষির মধ্যে পরিগণিত, সুদাস তেমনি রাজর্ষির মধ্যে পরিগণিত। এই দিগ্বিজয়ী রাজর্ষির রচিত ঋক্ সূক্ত আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। এ স্থলে এই কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছা করি যে, বিদ্বানের নিকটেই বিদ্বানের, কবির নিকটেই কবির, এবং ঋষির নিকটেই ঋষির মর্য্যাদা। সুদাসের ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তী যে কালে স্বয়ং ঋক্‌সূক্ত রচনা করিয়া প্রাচ্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—সে কালে যে ঋক্ রচনার উৎকর্ষ লক্ষিত হইবে, সেই কালে যে বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের ন্যায় ঋক্‌রচনাকারী ঋষির আবির্ভাব হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি?—ভরসা করি, অতঃপর আমাদের পাঠকেরা আর ঋগ্বেদকে কৃষকের গীত বলিয়া মনে স্থান দিবেন না। ফলতঃ, যিনি যত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বেদের অনুশীলন করিবেন, বেদার্থের গাম্ভীর্য্য ততই তাঁহার নিকট অভিব্যক্ত হইতে থাকিবে। বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং তাঁহাদের যজমান সুদাস, কেহই কৃষক ছিলেন না। সকলেই গভীরচিন্তাশীল—অদ্ভুত প্রতিভাশালী, কৃতবিদ্য, ঈশ্বরপরায়ণ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহারা সংসারের সনাতন উপদেষ্টা সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য। তাঁহাদের সমক্ষে অতি বিনীতভাবে উপস্থিত হইতে হয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

শব্দ ও অর্থ।

যখন মাতৃগর্ভে শিশুর সঞ্চার হয়, তখন তাহাকে দেখিয়া কেহ বলিতে পারে না, সে মনুষ্য পশু পক্ষী কীট বা পতঙ্গ, কোন্ জাতীয় জীব হইবে। অতি বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক তীক্ষ্ণ অণুবীক্ষণ সহকারে তাহার ভবিষ্যৎ রূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হন। যখন বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, তখন সে অঙ্কুর দেখিয়া কোন্ জাতীয় বৃক্ষ হইবে বলিতে পারিলেও, কোন্ শ্রেণীর বৃক্ষ হইবে, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

জীব বা উদ্ভিদ সকলেই ব্যাবৃত্তিসাপেক্ষ, ক্রমবিকাশপরিবর্দ্ধিত। ধীরে ধীরে উন্নতি হয়, ধীরে ধীরে আবার কার্য্যগতিকে অধোগতি হয়। পত্র হইতে পুষ্প, পুষ্প হইতে ফল হয়। আবার পত্র কোথাও শাখায়, পল্লব কোথায়ও পত্রে পরিণত হয়। পত্রের শ্রীবৃদ্ধি ব্যাহত হইলে পত্র পুষ্পে পরিবর্দ্ধিত হয়। পত্রের রূপান্তর বা জরা মৃত্যু সকলেই বিদিত আছেন।

জীব বা উদ্ভিদের ন্যায় শব্দ সকলও পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ। পূর্ব্বে মনুষ্যও পশু পক্ষীর ন্যায় এক প্রকার অর্থশূন্য চীৎকার করিত। ক্রমে পশু পক্ষীর ন্যায় তাহারও স্বরবিশেষের অর্থবিশেষ বুঝা গিয়াছিল। ক্রমে এক একটি শব্দের এক একটি অর্থ নির্ণীত হয়। পৃথিবীর যাবতীয় আবিষ্কারের মধ্যে শব্দের অর্থাবিষ্কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যতদিন একজন অন্যকে মনোভাব কোনও প্রকারে বুঝাইতে পারে নাই, ততদিন মনুষ্য আত্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধ থাকিলেও, প্রকৃত সহানুভূতি বা একতা, মনুষ্যের মধ্যে স্থাপিত হয় নাই। তখন মনুষ্য পশু পক্ষীর ন্যায় দলবদ্ধ হইলেও স্বতন্ত্র ছিল। যখন ইঙ্গিত দ্বারা মনুষ্য পরস্পরের নিকট কথঞ্চিৎ মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিত, তখনও মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জন্মে নাই। যখন একজন অন্যের নিকট সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, তখনই পূর্ণ সহানুভূতি ও একতা জন্মে। এক জনের অভিজ্ঞানে অন্য জন উপকৃত হয়, তখন আত্মরক্ষা সহজ হইয়া পড়ে, শিক্ষার সুবিধা হয়, সমাজে শৃঙ্খলা জন্মে, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব আরম্ভ হয়।

শব্দ সকল প্রথমে একাক্ষরবিশিষ্ট কি বহুঅক্ষরবিশিষ্ট একটি বাক্যের মত থাকে, এখনও মীমাংসা হয় নাই। প্রথম নির্ণীত অর্থবিশিষ্ট শব্দ মৌলিক শব্দ বা ধাতুরূপে ভবিষ্যৎকালে পরিগণিত হয়। মৌলিক শব্দে প্রত্যয়াদি সমাবিষ্ট

হইলে, উহা কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন অর্থদ্যোতক হইয়া পড়ে। কোনও ভাষার মৌলিক শব্দের সংখ্যা অধিক নহে। কিন্তু চলিত শব্দ লক্ষাধিক পরিমাণে কোনও কোনও অসভ্য ভাষায় দেখা গিয়াছে।

বয়স, শিক্ষা, স্থান বা ব্যবহার ভেদে, একই শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ বিভিন্ন হইয়া থাকে। ইতালীয় ও ফরাসী জাতি অক্ষরবিশেষ উচ্চারণ করিতে পারে না। আমাদের একজন শিক্ষক স্কটলাণ্ডদেশীয় ছিলেন। তিনি ড উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। "শি হাদ এ বিয়ার্ড" (She had a beard) বলিয়া তিনি একদিন সকলকে হাসাইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকের দাড়ীর কথা শুনিয়া আমরা হাসিয়াছিলাম, তাঁহার বিকৃত উচ্চারণে যে আমাদের হাসি আসিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

যন্ত্র সকল বিদ্যমানে ও পরিচালনায় অভাবে কোন কোন বর্ণে ব্যাবৃত্তি জন্মে না। এই জন্য অশিক্ষিত লোকেও কোন কোন অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারে না। বর্গের চতুর্থ বর্ণকে অনেকে তৃতীয় বর্ণে পরিণত করে, এবং 'ড়'কে 'র' বলিয়া উচ্চারণ করে। স্থানবিশেষে কোন কোন শিক্ষিত লোকও 'ড়' স্থানে 'র' লিখিয়া থাকেন। এই সকল দেশ বা জাতিগত প্রভেদ। বাগ্‌যন্ত্রের ব্যাবৃত্তিভিন্নতা হেতু এক এক জাতির ভাষার বর্ণমালা অন্য জাতির বর্ণমালা হইতে ভিন্ন। যে জাতির বর্ণমালা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সে জাতীয় লোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে। কিন্তু জিহ্বার ব্যাবৃত্তির ইতর বিশেষে বা উচ্চারণের প্রক্রিয়াভেদে একই শব্দ একই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে এত বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হয় যে, প্রথম শুনিলে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক নূতন শব্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাহেবের মুখে বাঙ্গালা কথা, উচ্চারণ-দোষে অনেকে বুঝিতে পারেন না। সাঁওতালেরা যে বাঙ্গালা গান করে, অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীও তাহা সাঁওতালী গান বলিয়া ভ্রম করেন। অশিক্ষিত মুখে ইংরাজী কথা অনেক ইংরাজ আর্শীশ বলিয়া বুঝিয়াছেন। গানের ন্যায় বেদের উচ্চারণেও তান মান নির্দ্দিষ্ট আছে। সে তান মান রাখিতে পারিলেই উচ্চারণ-বিপর্য্যয় ঘটে; তান মান ভঙ্গে শব্দ ও বাক্যের অর্থ ভিন্ন হয়। এইরূপ উচ্চারণে, শব্দের বা অর্থের বিপর্য্যয় ঘটিবার আশঙ্কা করিয়া, বৈদিক ব্যাকরণ শব্দের তান মান স্বরের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। অনেক অশিক্ষিত বাঙ্গালী স্ত্রীকে ছিবি বলিয়া, বৃন্দাবনকে বিরিন্দাবন বলিয়া উল্লেখ করে। কিন্তু কোনও বেদজ্ঞ বৈদিক শব্দের অপভ্রংশ করিতে পারিবেন না।

যুক্তাক্ষরবিহীন শব্দের উচ্চারণে বিপর্য্যয় বড় বেশী হয়, কিন্তু স্থান বা প্রদেশভেদে অযুক্তাক্ষর শব্দেরও উচ্চারণভেদ সামান্য নহে। একই বাঙ্গালা দেশে আমাদের ও অন্য স্থানের লোকের উচ্চারণে কেমন প্রভেদ হয়, এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইবে।

লবণ	নুণ	নুন	সন্ধ্যা	সন্ধে	সাঁজ	আস্তে	আস্তাই
লেবু	লেবু	লেবু	সলিতা	সল্‌তে	পল্‌তে	দোলন	দুলন
আম	আম	আঁব	চেরা	চেলা	চেঁড়া	চুল	চুল
বাসিলাম	বাসলুম	বাস্‌লিম	বিকাল	বৈকেল	বেলাগী	চীন	চিন
খাইলাম	খেলুম	খেনু	অনেক	আনেক	উনম	উন্মোচ	উন্মুক
বসিলাম	বৈলাম	বৈনু	বৃদ্ধ	কদর			

কঠিন	কটকিমা	অঙ্কন	আঁকন	অগ্রহায়ণ	অঘাণ
অকট	আকেট	অক্ষি	আঁখি	করিল	কৈল
কার্য্য	কাজ	অমোঘ	আঘবাট	অক্ষৌহিণী	অক্ষৌল, আঁকড়া
লক্ষ্য	লাক্ষ	গঙ্গা	গাঙ	অক্ষয়বট	অক্ষোপা
অকাল	আকাল	অন্ন	অন্না	অক্ষর	অচুর
বান্ধব	বাঁধব	অন্তর	অন্যোর, অন্যের	বর্ত্তুল	বাটুল
অন্যের	আনারা	অগ্নি	আগুন	আলি	আলি, আড়

অযুক্তবর্ণ শব্দের উচ্চারণ কিছু সহজে, অল্প পরিশ্রমে সাধিত হয়। শব্দের শ রূপপরিবর্ত্তনে আলস্য সামান্য সহায় নহে। পাখরের বাসিন সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া ঘষিতে মাজিতে তাহার কর্কশভাব যেমন হ্রাস হয়, সর্ব্বদা উচ্চারণ করিলে সংযুক্তবর্ণ শব্দের কর্কশতার তেমনি হ্রাস হয়। এইরূপে কালক্রমে কোনও শব্দের যুক্তবর্ণ বিসংযুক্ত, কোনও বর্ণের লোপ, কোনও বর্ণের বা রূপান্তর হয়। "রলয়োরভেদঃ" ব্যাকরণের সূত্র। কিন্তু কেবল র স্থানে ল ও ল স্থানে র হয়, এরূপ নহে। জার্ম্মান বৈয়াকরণেরা নিরূপণ করিয়াছেন— ম, ন, র, ল চারিটি বর্ণের স্থানবিশেষে পরস্পরের রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন বর্ণ একত্র উচ্চারণ করিতে কেমন রূপান্তর হয়, ব্যাকরণের সন্ধিসূত্রে তাহার অনেক পাওয়া গিয়াছে। কাহারও বিশ্বাস আছে, শিশুমুখনিঃসৃত প্রথম শব্দ মা; বস্তুতঃ বা শব্দ মা-এর পূর্ব্বে উচ্চারিত হয়, এবং কাকা শব্দ সকলের পূর্ব্বে শুনা যায়। এজন্য বর্ণমালায় ক বর্ণের আসন সর্ব্বপ্রথমে। যে বর্ণের ব্যাকৃতিতে যে বর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহার সম্যক্ নির্ণয় করিয়া, বর্ণীয় বর্ণমালা রচিত হইয়াছে। এবং তদনুসারে, একের পর অন্যের আসনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ক শিশুমুখ-উচ্চারিত প্রথম বর্ণ। ক এর হ্রস্ব খ, কিন্তু দীর্ঘ গ। গ এর হ্রস্ব ঘ, এইরূপ চ এর হ্রস্ব ছ, দীর্ঘ জ। জ এর হ্রস্ব ঝ।

সংযুক্ত বর্ণ কত নূতন রূপ ধারণ করিতে পারে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বীরভূমে জল তুলিবার কাঠ বা বংশনির্ম্মিত যন্ত্রকে ছুনী বলে। বিহারের কোনও কোনও জেলায় ইহাকে দোল বলে। দোলা শব্দ ইহার অপভ্রংশ। অনেক চেষ্টা করিয়া প্রথমে বুঝিতে পারি নাই যে, ছুনী শব্দ স্রোণ শব্দের অপভ্রংশ। স্রু ধাতুর অর্থ গমন করা। যাহার দ্বারা গমন করা যায়, এই অর্থে স্রোণ শব্দের অর্থ—ডিঙ্গা, গামলা, কলসী। গামলার তৈলে ডুবাইয়া বাধিবার জন্য আচার্য্যের নাম স্রোণ হইয়াছিল। বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার লোকে পার্ব্বতীয় নদীতে জল আসিলে, গামলার সাহায্যে উত্তীর্ণ হয়। সেখানে গামলা ডিঙ্গার কার্য্য করে। সর্ব্বদা ব্যবহারে শব্দের কেমন রূপান্তর হয়, এখানে তাহার কয়েকটি দেখান গেল।

গ্রন্থ	পাহুড়	বৈবাহিক	বেহাই	পিপ্পল	পিপুল
বাতাম্র	বাদাম	বিচিকিৎসা	বিচিকিচ্ছি	প্রাঙ্গন	পাঁচন
বাতুল	বাউল	আতীব	আহীব	প্রসারী	পশারী, পসারী
ছিলযোটি	হেলকা, হিকা	অর্গল	আগোড়	আদর্শী	আর্শী
হবিষ্যা	হবুষ্য	অলাবু	লাউ	অস্তব	আঁতব
হিক্কা	হেচকি	লোমশ	লুই	উন্মল	উজোর
সিক্ত	সেঁতান	সঙ্গ	সাঙ্গ	স্কন্ধে	কাদরে, কাঁধে
সেচনি	সেউতি	ময়	ম্যাটো	স্নেহ	নেহা
শুণ্ঠী	শুঁঠ	ধন্য	ধাঁধা	দুর্লভ	দুলহ
স্থির	থির	দণ্ড	ডাঁড	সকলি	সগরি
শ্বেত	সাদা	উথল	উঠান	পিপড়	পিঁয়ড়
সত্য	সাঁচা	যূথিকা	যুঁই	সপত্নী	সৌতিনী
সংজ্ঞেয়	সাঁকো	যন্ত্র	যাঁতা	বিস্তার	বিথার, বিথীর
সন্দংশ	সাঁড়াসী	মান্দার	মাদার	কাচন	কাঁচর
সন্ধ্যা	সাঁজোয়া	মর্দ্দল	মাদল	চিত্রপুত্তলি	চিতপুতলি
স্থবলা	বোলতা	মযার	মযাই	মনোরীত	মারত

বাঙ্গালা দেশে ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যখন অনার্য্য জাতি এদেশে বাস করিত, তখন অনার্য্য ভাষা প্রচলিত ছিল। হিন্দুরা আর্য্য ভাষা আনয়ন করেন, তাহার অপভ্রংশ হইয়া ও অনার্য্য ভাষা মিশ্রিত হইয়া, মাগধী ভাষার উৎপত্তি হয়। "স মাগধী মূলভাষা নরেয় আদি কল্পিক" মাগধী

ভাষা হইতে হিন্দী ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। পালবংশের অধীনে বাঙ্গালায় রাজধানী বিহারে ছিল, তখন মৈথিলী ভাষার চলন হয়। লক্ষ্মণ সেন মিথিলা জয় করিয়া নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিলে, আবার বাঙ্গালার প্রাদুর্ভাব বাড়ে। গত কয়েক শতাব্দীতে পারসী, আরবী, মগ, পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজের ভাষার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালা আর্য্য সংস্কৃতমূলক হইলেও, প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় বার আনা শব্দ, অনার্য্য ও অন্য ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

অন্য ভাষা হইতে যে যে শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে, এখানে তাহার কয়েকটি দেখান গেল।

চীন	গ্রীক		
চা	হোরা	বাক্স	আস্তাবল
পর্ত্তুগীজ	ইউনানী	চেয়ার	পুলিশ
মাস্কারাস	বরফ	টেবিল	কমেটস্ল
পিস্তল	বীমার	বোতল	পাসী
সাঁওতাল	ইংরাজী	ভাড়ার	পন্টন
মাঝি	ডেস্ক	বুরুষ	পলস্তারা

মুসলমান শব্দ।

খাটক	হুশারিস	মাজির	মালিক	বন্দুক	মজীর
লস্কর	সিন্দুক	যকৃসিস	মালুম	কম্বোবস্ত	মকল
মুলুম	সিকি	যদ	নাওল	কৌম	মোক্ত
হাওয়া	সাবাস	বহুমাস	মায়কৎ	কৌজদার	মোবাৎ
হাওয়া	সাবাস	বহুলাস	মামুলী	কিরিচী	মেলা
হাকিম	মৌজা	যবখাস্ত	মহাকেজ	কিরিস্তী	মেবাস
হাজামা	পরগণা	যবক	মহল	কী	মেওয়াল
হাজার	মসজিদ্	বহর	মুলুক	করিয়াদী	মেওয়াস
হাসি	মোকাম	বাশিচা	মহকুমা	কর্ম্ম	দম
হাজির	সবাই	বাবা	মলম	পোস্তা	দফ্তরী
হাবেশী	সরকারী	বাকি	মহরা	পোষাক	দফা
হালুয়া	সবলোক	বাকিশ	মবধান	পেয়ালা	দবধার
হালুকর	সেকাব	বোঝ	মজলিস্	পেশ	দবওয়াজা
হাসিল	মুন্সিল	পোড়খাব	মহৎ	পেশকরাজ	দসপেশ

কিস্তু	নওয়া	ঘোষা	মহলাব	পেশা	পত্তন
হুবেক	সওদাগর	কমাল	মজুর	পিলখানা	তোবক
হুক্ম	মাস্তল	হুদ	মজবুৎ	পিয়াজ	তহবী
কপ্তা	পিসি	হুক্ক	মেকাব	পালোয়ান	তোপ
টমায়	সবব	রকম	মুসিবাব	পাপোস	তামাসা
হিম্মা	লোচকা	বওয়াসা	বাহাব	খোরকত্তা	তসবিব
হকুম	বেয়াবব	মোহব	বীহিয়ানা	পাইকত্তা	আবেদার
হসিয়াব	বেইমান	মুসলমান	বাজ	পাইমানা	তাম
হোস	বেবম	মুস্কিল	বাজাব	পাঁজা	তাজ
হেটস	বাহাদুব	মুক্তী	বাঙ্গী	পশম	তাজী
হজ	আমির	তক্তাস	বাতিল	পলক	তবলা
সাহেব	ওমবা	মুবশী	বয়মাব	পর্দা	তকমাব
সেলাম	খানসাহ	মুচ্ছুদী	বখাব	হিসাব	আবদীন
পাঠান	সখাব	মাহা	বখশীস	শিকাশ	আহীর
মেম	হাবোগা	বাহিনা	বয়াৎ	পয়জাম	চাবর
সেভাব	বক্সী	শিরাজ	বখাবর	মজর	পাল্কী

ক্রমবিকাশে যেমন উন্নতি হয়, তেমনি অবনতি হয়। শব্দের অর্থসম্বন্ধেও এ নিয়মের যৌক্তিকতা দেখা যায়। একই শব্দ একই জাতীয় মনুষ্যের মধ্যে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। শারীরিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অবনতির উপর শব্দার্থের বিভিন্নতা নির্ভর করে। কিরূপে অর্থের ভিন্নতা হয়, যথাক্রমে নিরূপণ করিতে পারিলে জাতীয় ইতিহাসের উদ্ধারণ করা যাইতে পারে।

ঘোষ শব্দের অর্থ প্রকাশ করা, জানাইয়া দেওয়া। শৃগালের নাম গ্রাম-ঘোষ, কারণ সে রাত্রির প্রহর ঘোষণা করে। এজন্য ঘোষণা শব্দের অর্থ—বিজ্ঞাপন বা জানান দেওয়া। চিহ্ন দ্বারা জানান দেওয়া যায়, এজন্য ঘোষণার এক অর্থ চিহ্ন। এইরূপে নিম্নলিখিত পদ্যে ঘোষণা, কলঙ্ক-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ;—

দিন যাবে রবে না,
দীনের দিন যাইবে হরি,
রবে কেবল ঘোষণা।

কেমন ভিন্ন অর্থে শব্দের ব্যবহার হয়, এখানে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল ;—

বিমোহিত—রহিলাম বীরগণের মত কুণ্ঠ দেহ ও দেহস্থ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিমো—
হি. হইতেছে।—কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত।

বিস্ময়—আমি কামিনীগণের ক্রন্দন কোলাহল ও বালকগণের গর্জ্জন শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি।—ঐ

অকপট—হে ভাস্কো তুমিই মুমুক্ষুদিগের গতি। তুমি লোক সকল ধারণ, প্রকাশ, পবিত্র ও অকপটে প্রতিপালন করিতেছ।

অকাল— বীরচূড়ামণি বীরবাহু চলি যবে
গেলা যমপুরে অকালে,—মেঘনাদ।
পাগলে কি না বলে, অকালে কি না ধায়।

অক্ষুণ্ণ— জ্ঞান মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।—চারুপাঠ।
চরমে শোকস্থায়ী, করুণ রস অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া—কাব্যনির্ণয়।
যদি ঈশ্বরপ্রসাদে আমাদের শরীর অক্ষুণ্ণ থাকে।

অজ— সে শশাঙ্ক সকলঙ্ক এ যে মম অজহীন।

কোথাও লক্ষ্য করি, লক্ষ্য করিবার জন্য দাগ বা নিশান দেওয়া, আর কোথাও নিশান শব্দে পতাকা আর অঙ্ক গণিত ও চক্রে সম সমুজ্জ্বল?

পরিধান শুভ্রশুক্ল হরি কুশতীর,
মৃগাঙ্ক অঙ্কিত যেন শশীর শরীর,—নিবাতকবচ।
অঙ্কী কলানিধি, যে বাক্যে জলধি
পাইল পটুত্ব লোক।—কাশীরাম দাস।

যাহাতে রক্ত হয়, তাহার নাম রাগ; ক্রোধে মনুষ্য রক্তবর্ণ হয়, এজন্য ক্রোধকে রাগ বলে। চন্দনাদির ন্যায়ও রাগ। রাগে বিকৃতি জন্মে, এজন্য আসক্তির নাম রাগ।

অনুরাগ বাগ রোগে বুঝহ রহিয়া।

অসতী— যাহা থাকে না, যাহা স্থির থাকে না, ব্যভিচারী।

অঙ্গীকার— শরীরভূত করা, প্রতিজ্ঞা করা।

চমকি— আশ্চর্য্য হইয়া, সম্ভ্রম, ভয় পাইয়া।

বাঁইক আসবন হেরি, চতুর যুতী তুহিতে সম্বাদল কাণ,
শুনাইতে চমকি উঠিল চমৎকার বৈহব পাওল পরাণ।
পদ দুই চারি চললি সখী বেল
ঘস ঘস অন্তরে বাঢ়স ভেল
ক্ষণে ক্ষণে চমকি পাদ পালটাব

সৌরভ— ভাব, গুরুত্ব মান উজ্জ্বলা
ওকমল সৌরভ সুবহি ভাবল্ পঙ্কজ প্রেমরস লাগি।

সনে— সহিত, নিকট, হইতে।

'আজ গগন হেরি তোহারি ভবন ভরে বিহি সঁকে মাথয়ে গাব।'

'দূর সঞে সাগর বাই যবন হেরি চমকি হেরি ডেল ভীত।'

'কপট নেহ করি রাইক পাশ

আন বসনী সঞে করহ বিলাস।'

প্রবন্ধ— 'নিশিপতি কাঁতি মলিন অমহেরিয়ে টুটল সব পরবন্ধ।'

'অবধিরহে তুঁহ মো পরবন্ধ কানুক নৈছে হয় নিরবন্ধ।'

করজ—খত— 'লেখি লহ করজ রাস করি সুন্দরী।'

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় ময়মী ও দয়ধী, এই দুইটি সুন্দর শব্দের ব্যবহার কোনও গ্রন্থে দেখা যায় না। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অদ্যাপিও দয়ধী শব্দ সাধারণ লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু ময়মী শব্দের ব্যবহার কোথাও নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় আর কোনও শব্দ নাই, যাহারা এত সহজে এত গভীর ভাব প্রকাশ করিতে পারে।

'যদি না কহ লোকের লাজে ময়মী জবাব মরমে বাজে।'

মহৎ—মান— 'হঠ নাহি করহ বহুত রাগ মো।

[illegible] মি উদাসী হতে চায়

ডাক নাহি হাঁক নাহি আ[illegible]নে আপনে চলে যায়।'

'রোষে সঙ্গে করে লয়ে যাবো [illegible]রধি যদি পায়'

'এমো দয়ধি এমন নিদয় কথা ও[illegible]নিজ না হেলায়'

'আউলকা এক রূপ দেখেছি গো দ[illegible]ধি

রূপ সাগরের ঘাটে আউল[illegible]কা।'

পরিহার— 'এ ধনি এ ধন বহু পরিহার

নিজ জন জানি না কর বেভার।'

আরতি শব্দের অর্থ কি? অভিধানে বিরাম ও ঘৃণা, এই দুইটি অর্থ লেখা হইয়াছে; কিন্তু নিম্নলিখিত পদগুলিতে নানা অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

'থল কমল দল চরণ সঞার

নব অনুরাগে কত আরতি বিহার'

'মধু এত বচনে তোহারি নাহি আরতি হিত কহিতে কহ আন

রাকল দক্ষিণ পবন বহ পরশিব তবহি দুরন্ত মান'

'গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক'
বয়ানে বয়ানে রহ আবৃতি অনেক'
'মধু এত আবৃতি সো অনি আধ
ইথে লাগি ঝুরা পায় সঁপিলু পরাণ'
'উলটি পালটি চাব না সোধাব পাব
কত বা আবৃতি হিয়ার মাঝে'
'নবীন কিশোর প্রেম লক্ষ বাণ যেন হেন
আবৃতি পিরিতি রস পান'
'নব কুলবতী চিত্তের আবৃতি
বিধি বিড়ম্বিত কাজে'
'একে দেখি অতি চিত্তের আরতি
পহিলে না ছিল এত'
'পীন পয়োধর জঘন ভরভর
ভাবে গতি অতি মন্দ,
আরতি অন্তর পহুঁ দূরতর
বিহিক বিরচন দিন।'

আরতির [illegible] নিহনি শব্দ [illegible] নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিবাহের 'নিহনি ডালা' ও নির্ম্মল [illegible]ন শব্দ হইতে অনেকে [illegible] অর্থ [illegible] করেন।

"কাহার বাহনি লই [illegible] নিহনি আছা যাই প্রাণে মরে।"

কিন্তু নিম্নে [illegible]খিত পদগুলিতে অর্থান্তর দৃষ্ট হয়।

নবীন জলদ বাবা প্রেমানন্দে ভাসে তারা
তা [illegible]ার নিহনি জিহুরন'
'যে দেখি যে [illegible]নি চিত্তে অনুমানি নিহনি দিয়ে পরাণে'

অর্থ হইতে অর্থান্তরে [illegible]রের ক্রমবিকাশ অনুসরণে হৃদয় পুলকিত হয়। আমরা বারান্তরে এইরূপ অ[illegible] কতগুলি উদাহরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

কথা ইংরাজি শিখিয়া কেহ কেমন করিয়া বলিবে! বেদ অত্যন্ত প্রাচীন হইলেও চারি অথবা পাঁচ সহস্র বৎসর বয়স্ক মাত্র। যদি আমরা জোর করিয়া বলি, বেদের বয়স দশ সহস্র বৎসর, তাহা হইলেও বেদ অনাদি হয় না, এবং সে কথা অপ্রামাণ্যও বটে। যাঁহারা বলেন, বেদ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত অথবা গীত হইয়াছিল, তাঁহারা বিস্তর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কাজেই আমরা নাচার হইয়াছি।

চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদ—সরস্বতীতীরে ঊর্দ্ধমুখ মহাতপা ঋষিগণের সেই প্রাতর্বন্দনা, চতুর্দ্দিকে ঐশী শক্তির বিকাশ দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় এবং পুলকের উদ্রেক আমরা কল্পনা করি। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদ—তাহার পূর্ব্বে কি? মনুষ্যের উৎপত্তি কি চারি সহস্র বৎসর মাত্র হইয়াছে? যাঁহারা বেদ গান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই কি পৃথিবীতে প্রথম মনুষ্য? তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব—এমন কথা বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সে বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে।

চারি সহস্র বৎসরের সুদূর সীমা হইতে বেদবাক্য অদ্যাবধি ইহলোকে শ্রুত হইতেছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কি ছিল—মানবজাতি কি অবস্থায় ছিল—তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। কি গভীর নিস্তব্ধতা সেই, কি বিশাল প্রান্তর! জীবনের দীর্ঘ ছায়া তাহার নিকটে মিশাইয়া গিয়াছে, জীবনের পদচিহ্ন তাহার নিকটে গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে, জীবনের ধ্বনি প্রতিধ্বনি তাহার নিকটে গিয়া নীরব হইয়া গিয়াছে! মানুষ তখন কি করিত, কি ভাবিত, কাহার উপাসনা করিত! তখন কি কোনও মহাবাক্য কথিত হয় নাই! মানুষ যে তখন ছিল, তাহার সাক্ষী কে? সাক্ষী কেবল চন্দ্র সূর্য্য, সাক্ষী কেবল জীবন মৃত্যু, সাক্ষী কেবল সেই সর্ব্বকালদর্শী সর্ব্বযামী।

পৃথিবীর দীর্ঘ জীবনে, মনুষ্যজাতির দীর্ঘ জীবনে, চারি সহস্র বৎসর কতটুকু সময়? চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদ ছিল না, বেদের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কি মানুষ ছিল না? এই কি অমরত্ব, এই কি মৃত্যুকে পরাভব করা? চারি হাজার বৎসর—তার পূর্ব্বের কোনও নিদর্শন আছে? কোনও মহাত্মার নাম আছে? কোনও মহাবাক্য মানবলোকে প্রচলিত আছে? এই টুকু সময় বাচাইয়া এত গৌরব, এই কয় হাজার বৎসরের মধ্যেই বেদ ঈশ্বরবাক্য হইয়া গেল, মানুষ অমর হইয়া গেল? অতীতের যে বিশাল প্রশান্ত দুর্লক্ষ্য সমুদ্র, তাহার তীরে উপস্থিত হইয়াই আমরা থমকিয়া দাঁড়াই। চারি হাজার বৎসর সমুদ্রের

তীর নহে ত কি। চারি সহস্র বৎসরের, দুই সহস্র বৎসরের, পাঁচশত বৎসরের কীর্ত্তি, আমাদের ক্ষুদ্র চক্ষে সবই অমর। বেদের পূর্ব্বে কি মানুষ ছিল না, বেদের পূর্ব্বে কি কোনও মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন নাই, সমাজ সংগঠিত হয় নাই, মানুষের পথপ্রদর্শক কোনও দিব্য পুরুষ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন নাই? কি অহঙ্কারের কথা! চারি সহস্র বৎসর—এই কয়টি বৎসরের মধ্যে মানুষকে বাঁধিয়া রাখিব, ইহারি মধ্যে মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস বদ্ধ রহিবে? মিসরের অপূর্ব্ব পিরামিডের পূর্ব্বে কি কিছু ছিল না? পৃথিবী কত কাল, আর পৃথিবীতে মানুষ কত কাল? চারি সহস্র বৎসর হইতে মানুষ অমর, মানুষের কীর্ত্তি অমর, তাহার পূর্ব্বে অমরত্বের বর কেহ লাভ করিতে পারে নাই? হায় কয় দিনের অমর আমরা!

যে দিকে চাহিয়া দেখি, মৃত্যুর দীর্ঘ অন্ধকার ছায়া দেখিতে পাই। এত বড় বলবান কে! জীবন অবিশ্রাম মৃত্যুর রাজ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাহার রাজ্য হরণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, বিফলপ্রযত্ন হইয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। চারিদিকে মৃত্যুর প্রাচীর, সেই প্রাচীরের মধ্যে জীবন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কখন হুঙ্কার রবে কোনও তেজস্বী জীবন্ত পুরুষ সেই প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, আবার দেখিতে দেখিতে তদ্গাংশ নির্ম্মিত হইতেছে। মহাসমুদ্র মৃত্যু, তাহার বক্ষে জীবনতরণী ভাসিতেছে, তরঙ্গে আরোহণ করিয়া দুলিতেছে, বাতাসের তরে হেলিতেছে, অবশেষে সেই সমুদ্রগর্ভে ডুবিতেছে। ক্ষীণকণ্ঠে আমরা ডাকি, জীবনের জয়! সে শব্দ ডুবাইয়া, গম্ভীর নির্ঘোষে সর্ব্বকাল পরিপূরিত করিয়া, উত্তর আসে, মরণের জয়!

জীবন শব্দ, মৃত্যু নিস্তব্ধতা; জীবন তটিনী, মৃত্যু সমুদ্র; জীবন দুর্ব্বল, মৃত্যু মহাবলবান; জীবন চঞ্চল, মৃত্যু স্থির; জীবন দাম্ভিক, মৃত্যু গম্ভীর; জীবন ক্ষুদ্র, মৃত্যু মহাকায়; জীবন মুহূর্ত্ত, মৃত্যু অনন্তকাল; জীবন সঙ্কীর্ণ, মৃত্যু প্রশস্ত; জীবন তরঙ্গময়, মৃত্যু নিস্তরঙ্গ; জীবন বায়ুতাড়িত, মৃত্যু নির্ব্বাত।

সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যজাতি মৃতদেহসৎকারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিধি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। এতদিন পরে জগতের সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইতেছে যে, শবদাহই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। আত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, এই মৃণ্ময় দেহ যত শীঘ্র ভস্মাবশিষ্ট হয়, ততই ভাল। কিন্তু সমাধিস্থান দেখিলে যত কথা মনে আসে, শ্মশান দেখিলে তত কথা মনে আসে না। যত্নরক্ষিত, কুসুমমাল্যসজ্জিত গোরস্থান দেখিয়া মনে অনেক ভাবের উদয় হয় না। মানুষকে আরও

দুর্বল বোধ হয়—মনে হয়, যে স্থানে জীবনের কোন অধিকার নাই, সেখানেও মানুষের দুর্ব্বল চিত্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। আত্মীয় যে ছিল, সে ত আর নাই, তাহার দেহ ভস্ম মাটীতে মিশাইতেছে, সেই ভস্মের সহিত জীবনের সম্বন্ধ রাখিবার চেষ্টা করিয়া কি হইবে? আমি আর এক রকম সমাধিস্থলের কথা বলিতেছি। আমি দেখিয়াছি, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ সমাধিভবন ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ রক্ষক নাই, কেহ জানে না—কত কাল ধরিয়া সেখানে শব দেহ প্রোথিত হইতেছে। এখন আর সেখানে মৃতদেহ প্রোথিত করে না। মৃতের মধ্যেও নূতন পুরাতন আছে। কেহ সে পথে চলে না, কেহ সেস্থান অধিকার করিতে যায় না, যেন সেই ভূমিখণ্ড মৃত্যুর রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে। জীবন সেস্থান হইতে সরিয়া গিয়া অন্যত্র তাহার বাসস্থান রচনা করিয়াছে। যে দিকে চাহিয়া দেখি, কেবলই সমাধিভবন, ইট খসিয়া গিয়াছে, গাঁথনি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোনও ব্যক্তি ধনী ছিল, তাহার গোরের উপর শ্বেতপ্রস্তর রহিয়াছে, খানিকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোনটা একেবারে সমভূমি হইয়া গিয়াছে, কোনটা অর্দ্ধভগ্ন, কোনটা ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। স্থানে স্থানে বাটাগাছ দেখা দিয়াছে। সেখানে পাখীও বড় একটা আসে না। কিসের লোভে আসি?

এমন স্থানে দাঁড়াইয়া, অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া, কত কথা মনে আসে। যাহাদের দেহ সেইখানে পড়িয়া মাটীতে মিশাইতেছে, তাহারাই হয় ত কত সময় সেইখানে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিয়াছিল। ইহাদের ইতিহাস কে লিখিয়া রাখিয়াছে, কে বলিবে—জীবিতাবস্থায় ইহারা কে ছিল, কি ছিল! মহাপাতকীর দেহাবশিষ্ট হয় ত মহাপুণ্যবানের দেহের সহিত মিশিতেছে। কত সুখ, কত ভোগ, কত শোক, কত সন্তাপ এইখানে আসিয়া স্থির হইয়াছে। কোথায় জীবন—মৃত্যু যে সর্ব্বগ্রাসী। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কে কবে জিনিয়াছে। মরণের চিরকাল জয়!

মানুষ যে কেবল মৃত্যুকে ভয় করে, তাহা নয়। মরিতে ভয় না করিলেও অনেক সময় হয়। মৃত্যু আমাদের মহত্ত্বের লাঘব করে, আমাদের মানের হানি করে। আমাদের জীবনের রাজপথে মরণ একটা প্রকাণ্ড বাধা, সে বাধা আমরা কখন দূর করিতে পারি না। অনন্ত জীবনকে মৃত্যু সান্ত করে, অখণ্ড অবিভাজ্য জীবনকে বিভক্ত করে। মৃত্যুর পরে কি, আমরা কিছু জানিতে পাই না কেন? যদি কিছু জানিবার না থাকে তাহাই বা জানিতে পাই না কেন?

আমরা এত বিঘ্ন বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, মৃত্যুর প্রাচীর কখন অতিক্রান্ত করিতে পারিলাম না কেন? প্রাচীরের বাহিরে কি আছে, কখন দেখিতে পাইলাম না কেন?

জীবনের সরল সূত্রে মৃত্যু গ্রন্থি বদ্ধ করে। আমাদের যাহা কিছু আছে, সকলেরই সীমা মৃত্যু। অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপ যেমন, মৃত্যুর মধ্যে জীবন তেমন—যেটুকু সময় জ্বলে সেইটুকু আলো, যেটুকু স্থান দীপরশ্মি অধিকার করে, সেইটুকু স্থানের অন্ধকার বিনষ্ট হয়; প্রদীপ নিভিলেই আবার সব অন্ধকার; যেমন নৌকা ডুবিলে তাহার উপর জলরাশি মিশিয়া আবার পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করে, সেইরূপ জীবন ফুরাইলে আবার মৃত্যুর স্রোত চারিদিক হইতে আসিয়া সেইখানে মেশে, আবার সব স্থির হয়, মৃত্যুর কল্লোল কোলাহলশূন্য গভীর স্রোতস্বিনী পূর্ব্বের মত বহিতে থাকে।

জীবনে যাহা কিছু আছে, তাহাতেই ব্যগ্রতার ভাব, চাঞ্চল্যের ভাব, ভয়ের ভাব দেখিতে পাই। সম্মুখে পশ্চাতে চতুর্দ্দিকে একটা এমন কিছু দেখিতে পাই, যাহা দেখিতে ইচ্ছা করে না, যাহা দেখিলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিজের মনোমত ভাব কল্পনা করিতে ইচ্ছা করে। মানুষ নাকি অমর নয়, তাই কেবল বলিতে ইচ্ছা করে যে, মানুষ অমর, দীর্ঘজীবী বলিলে তৃপ্তি হয় না, মনের ভয় ঘুচে না। পরাধীন হইলেই যেমন স্বাধীনতার ইচ্ছা হয়, নশ্বর হইলেই সেইরূপ অবিনশ্বর হইবার ইচ্ছা হয়। অতীতের প্রতি যখন চাহিয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই যে, অতীতের যাহা কিছু নিদর্শন আছে, তাহা জীবনের অবশিষ্ট মাত্র। জীবন মৃত্যুর সহিত চিরকাল যুদ্ধ করিতেছে, মৃত্যু যাহা শীঘ্র অধিকৃত করিতে পারে না, তাহাই দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। মৃত্যুকে যে একেবারে পরাভূত করিবে, কখন তাহার কবলে পতিত হইবে না, জীবনে এমন কিছু নাই।

অমরত্ব যে যথার্থ মানুষের প্রাপ্য নয়, একথা সকলেই চিরকাল বুঝিতে পারে। অমানুষ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষেরা অমর হইতেন। অমর দেবতাগণের কল্পনা এইরূপে প্রথমে মানুষের মনে উদিত হয়। স্বর্গের ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ অমর, অথচ পৃথিবীর সঙ্গে চিরকালই তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে। পৃথিবীর সঙ্গে ইন্দ্রের এত ঘনিষ্ঠতা যে, তিনি এতদ্দেশীয় সম্রাটদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, সময়ে সময়ে অসুরবধার্থ তাঁহাদের সাহায্যও প্রার্থনা করিতেন। রোম এবং গ্রীস ও প্রাচীন মিসর

দেশেও এইরূপ দেব-দেবীর কল্পনা ছিল। যুদ্ধে দেবগণ তাঁহাদের ভক্তবৃন্দের সহায়তা করিতেন, মানুষ ও দেবতা মিলিয়া উভয় পক্ষে সংগ্রাম হইত।

দেবতা ও মনুষ্যে এই রকম সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কল্পনা করিলে আর একটা উদ্দেশ্য সফল হয়। মানুষ জীবনের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ, দেবগণ সে গণ্ডীর বাহিরে। এ দুইয়ে সম্বন্ধ থাকিলে জীবন ও মৃত্যুতে বড় প্রভেদ থাকে না, মৃত্যুর অপর পার হইতে ইহজীবনে বার্ত্তা আসিতে থাকে। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর, তাহা যেন ভাঙ্গিয়া যায়। এই নর-লোকের সঙ্গে অমর-লোকের এমন সম্বন্ধ থাকিলে তব ভাবনার কারণ দূর হইয়া যায়। আধিব্যাধিশূন্য জন্মমৃত্যুভয়রহিত দেবতাগণ পৃথিবীবাসীর সুখ দুঃখে বিবাদ কলহে উদাসীন নহেন ভাবিলেই অনেক সান্ত্বনালাভ করা যায়। কেবল সান্ত্বনা নহে, এরূপ মনে করিলে কিছু গৌরবও হয়। মানুষ যে শুধু অমর তাহা নয়, অমরগণের সঙ্গে আবার মানুষের আলাপ পরিচয়ও আছে। পৃথিবীতে তপস্যা করিতে বসিলে ইন্দ্রের ইন্দ্রাসন টলে, সে কি সহজ কথা। ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লওয়াও মানুষের অসাধ্য নয়। ইন্দ্রপদলাভের আশায় কেহ তপস্যা করিলে ইন্দ্র ভয়ে অস্থির হইতেন, তপস্বীর তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে অপ্সরা পাঠাইতেন।

সাধারণ লোকে ভূত প্রেতেই বা বিশ্বাস করে কেন? মরিয়া ভূত হয়, এ কথার অর্থই বা কি? এ রকম যে কোনও বিশ্বাস দেখি, সকলের মূলেই সেই এক কারণ। মানুষ যা কিছু কল্পনা করে, সব এই পৃথিবীকে লইয়া। যে মরিয়া গেল, সে কোথায় গেল? আমাদের যে এত ভালবাসিত, আমাদিগকে কি একেবারে ছাড়িয়া গেল? বোধ হয় পৃথিবীর বাহিরে যায় নাই, যে বাড়ীতে ছিল, বোধ হয় সেই বাড়ীর মধ্যেই কোথাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সে শরীর ত আর নাই, এখন সে কি অশরীরী, না অন্য কোন আকার ধারণ করিয়াছে? নিরাকার আত্মা কি, আমরা বুঝিয়াই উঠিতে পারি না। সুতরাং কল্পনার সহায়তা খুঁজিতে হয়। তাহার পর ভূত দেখিতে আর বড় বিলম্ব হয় না। কেহ সাদা, কেহ পিঙ্গল বর্ণ, কেহ অন্য রংএর ভূত দেখে, কেহ ব্রাহ্মাকৃতি, কেহ ধূমময় দেখে, কেহ অন্ধকারে দেখে, কেহ বা দিনের বেলায় দেখিয়া ফেলে।

ভূতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, এমন অনেক শুনা গিয়াছে। কিন্তু ভূতের সঙ্গে কথা কহিয়াও কখন কিছু নূতন শিখিলাম না। সেই স্বর্গ নরক, সেই

যন্ত্রণা, সেই সুখ। মৃত্যু দেখিলে সাধারণ লোকে ভয় পায় কেন? যে আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সে মরিয়া গিয়াছে, তাহাকে আবার দেখিবার ইচ্ছা করে; মনে হয় যেন সে আমাদের একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই। তবু সেই প্রিয় জনের ভৌতিক মূর্ত্তি দেখিলে মনে [illegible]? সে অজ্ঞানিত বলিয়া। তাহাকে জানি, অথচ জানি না, তাই তাহা[illegible] হয়, সে মৃত্যুর অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আমাদের জীবনের আলোকের [illegible] ক করে, তাই ভয় হয়। তাহাকে ত আমরা চিনিতাম না, তাহার অবয়ব মাত্র চিনিতাম। তাহার সে অবয়ব নাই, তাই তাহাকে দেখিলে ভয় পাই। তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয় সত্য, কিন্তু জীবিতাবস্থায় তাহাকে যেমন দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়, অন্যরূপ দেখিলে ভয় হয়। জীবনের বাহিরে আমাদের কল্পনার গতি নাই, সেই জন্য মৃত্যুর সঙ্গেও জীবনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। যে গেল, সে যে একেবারেই গেল মনে করিতে কষ্ট হয়, মনে করা যায় না। স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ধনসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া একেবারে চলিয়া গেল, আমাদের মন তাহাকে দেখিবার জ[illegible]কল হয়, তাহার কি কখন সেরূপ ব্যাকুলতা হয় না?

মৃত্যুকে আমরা কত ভয় করি, মৃতর[illegible]। বেশ বুঝা যায়। যাহাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি, [illegible]র মৃতদেহ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয় না, ভয় হয়। মৃত্যু [illegible]বায়ু তাহার দেহ পরিত্যাগ করে নাই—তাহার মুখের উপর [illegible]পত করে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলাম। আর এক মুহূর্ত্ত [illegible]ড়াইলাম কেন? মৃতদেহ লইয়া এক ঘরে যদি একা নিশাযাপন করিতে [illegible]; তবে অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়িতে হয়। অভ্যাসগুণে মৃতদেহের নিকটে থাকিতে কিছু ভয় হয় না, কিন্তু যাহা অভ্যাসসিদ্ধ, তাহা স্বাভাবিক নহে। শবাসনে বসিয়া যোগাভ্যাস করাও ত অভ্যাসের ফল। কিন্তু এ সব স্বভাবকে পরাজয় করিবার মন্ত্র। মৃতের নিকট জীবিতের থাকা স্বাভাবিক নিয়ম নহে। মৃতদেহ দেখিলে, মৃতদেহ নিকটে থাকিলে জীবিতের ভয় হইবে, ইহাই নিয়ম। বাড়ীতে যখন কেহ মরে, তখন দেখিতে পাইবে যে, আর সকলে একস্থানে জড় হয়, সকলে যেন ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া পরস্পরের মুখ চাহিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করে। সম্মুখে কোন হিংস্র জন্তু দেখিলে মেষপাল যেমন ভয়ে ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়ায়, মৃত্যুর আগমনে মনুষ্যের সেই অবস্থা হয়।

সাংখ্য স্বরলিপি।

সপ্তকের ভিন্নরূপ লিখন-প্রণা[illegible] সপ্তকের সুর পরে পরে থাকিলে সেই সপ্তকের চিহ্ন সকল [illegible] একটি সুরের উপরে মাত্র স্থাপন করিয়া, সেই চিহ্ন হইতে অন্ত[illegible] খুটকি অথবা অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা টানিয়া দেওয়ও চলিবে। যথা,

২ ২ ২ ২·· ২———
সা রে গা — সা রে গা অথবা সা রে গা;
সা রে গা মা পা ধা নি — সা রে গা মা পা ধা নি
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩···
অথবা সা রে গা মা পা ধা নি।

সংক্ষেপ।

আবৃত্তি — মা — ।

গানের কোন অংশ এ আ অথবা আরো সংক্ষেপ ৫ । যাহা কিঞ্চিৎ উপর দিকে অথবা কিঞ্চিৎ নিম্নের দিকে [illegible] তাহার অর্থ :—

এ অর্থাৎ এই [illegible] করার আবৃত্তি করিতে হইবে।

এখন, তাহা হই[illegible] ত্তি — এ আ আ অথবা এ ২আ অথবা ৫ ।।। এটা তিনব[illegible] আ আ অথবা এ ৩আ অথবা ৫ ।।।।

একবার আবৃ[illegible] ৫ । লিখিবার তেমন আবশ্যক নাই। ইচ্ছা করিলে লিখিতে[illegible] তেও পারি। যেহেতু এ আ অথবা ৫ । না লিখিলেও [illegible] হইবে।

এক বিষয়টী অ[illegible] । অচিহ্নিত হইলেও চিহ্নিতরূপে বিরাজ করে।

এটা পুনরাবৃ[illegible] আ — এ আ আ — এ ২আ — ৫ ।।।

গানের কোন অংশ পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে বলিলে তাহার অর্থই এই যে, সেই অংশটী সর্ব্বশুদ্ধ দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে।

(রাধিকার প্রতি সখীর উক্তি)

যমুনায়।

যুলতানী——ঠুংরী।

বাঁশী বাজে শুনি ওই যমুনার তীরে;
মধুর শুনিতে সই মলয় সমীরে।
ফুটিছে মুকুল কলি, বহে মৃদু ফুলবাস
মৃদু গুঞ্জরে অলি আসিয়াছে মধুমাস,
বাঁশী বাজে শুনি ওই মনমোহিনীরে।

পুলকিত তনু মন মুকুল ৭ সঞ্চয় ভাব
ভাব কানু-আগমন হইয়াছে যমুনায়
অমিছে সেথায় সবে পুলক-অধীরে।
বাসুদেব বিলম্ব নাই
এত ভয় হয় কেন
তুমি বাঁশরীর বোলে পক্ষ দেখিয়া ভয়
ওই দেখ আসে সই মাধব সুখ.

প্রতি কটা

তালি। ২ ১। ৩। ০। ১। তালি। ১। ২।

বাজা। ২ । ২। ২। ২। তালি। ১। ২।

(হা)। পো পা । পূর্মি —ধূর্মি । পা পা ।
(হা)। বো শী । বা — । রে — ।

। মা পা । রে —সা । সা সা । মূর্গা — মা — ।
। শু নি । ও —ই । য মু । না —

পা — মা । পা পা । পা পা । পূমা মা । মূর্গা
—ব্ ভী । রে —না । — — । ম ধু । ব

পা । পূমা পা । পা মা । পা পূমি । মি নি ।
শু । নি তে । স ই । ম ল । ব স ।

২
। সা সা । সা সা । পূমি, মি । পা পা । মা
। বী — । রে — । বা — । রে — । ও

পা । রে —সা । সা সা । মূর্গা — মা — পা । মা ।
মি । ও ই । য মু । না — —ব্ ভী ।

। পা পা । পা পা । পূমি — ধূমি । পা পা । মা
। বে — । বা শী । বা — । কে — । ও

পা । রে সা । সা সা । মূর্গা — মা — পা
মি । ও ই । য মু । না — —ব্

মা । পা পা । পা পা । (ড প্র) । পূমা মূর্গা । পা
ভী । রে — । — — । (ড প্র) । মু লী । রে

পা । পূমা —পা । পা মা । পা মি । মি মি ।
মু । খ —ন্ । ক লি । য রে । ম ধু ।

২ ২
। সা সা । সা সা । নূসূরে রে । পূমা মা ।
। মু ল । বা —ন্ । ও — । ল রে ।

২
। সা সা । সা মি । সা — রে — পা । পূরে রে ।
অ লি । মু হু । ও — —ন্ । ল রে ।

২
। সা সা । সা সা । সা নি । সা সূরে । মূসা নি ।
। অ লি । — — । আ সি । রা কে । ম ধ ।

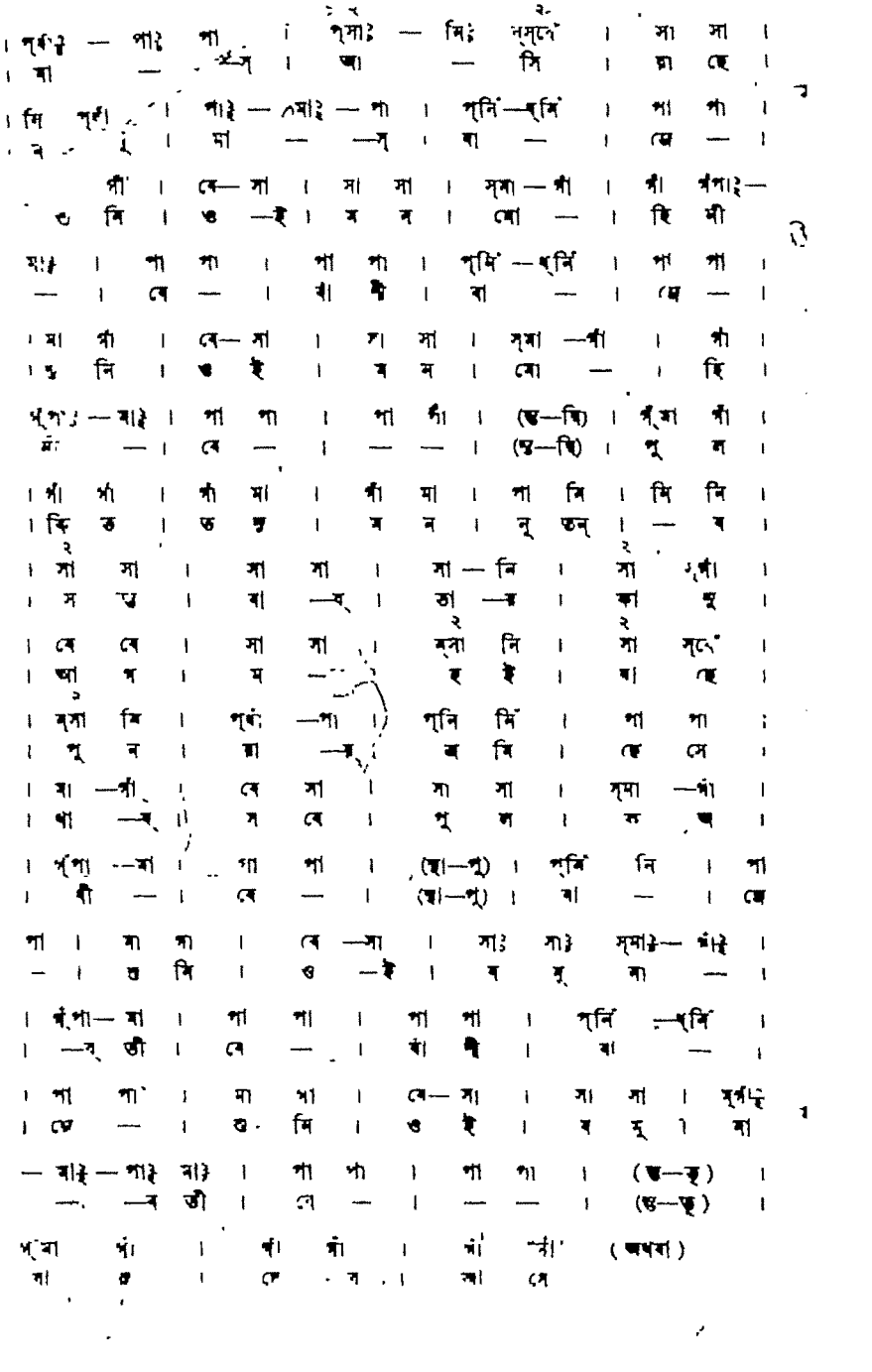

| | | |

কালের সামাজিক অবস্থা, রাজনীতি, যুদ্ধপ্রণালী ও শত্রুর সহিত ব্যবহার করিবার রীতি কিরূপ ছিল, তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তৎকালে সমাজে নৈতিকজ্ঞানের অত্যন্ত অভাব ছিল। স্বার্থের নিমিত্ত পক্ষপরিবর্ত্তন, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে কোনও প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন ও বিজিত শত্রুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার, তৎকালে দোষের মধ্যে পরিগণিত হইত না। বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতার দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না। সমাজের এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার চরিত্র যে সম্পূর্ণ দোষশূন্য হইবে, তাহা কখনও আশা করা যাইতে পারে না। তাঁহার চরিত্রের দুই এক স্থলে যে কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রধান কারণ, তৎকালের সামাজিক শিক্ষার দোষ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গার্হস্থ্য শিক্ষাই মনুষ্যের চরিত্রগঠনের প্রধান উপাদান। গৃহই মনুষ্যের প্রথম শিক্ষাস্থল, এবং জননী ইহার শিক্ষয়িত্রী। তিনি যেরূপ শিখাইবেন, বালক সেইরূপ শিখিবে। এবং তিনি নিজে যেরূপ হইবেন, সন্তান ঠিক সেইরূপই হইবে। তাই Napoleon Bonaparte সর্ব্বদাই বলিতেন, "My opinion is, that the future good or bad conduct of a child entirely depends upon its mother." অর্থাৎ জননীর চরিত্রের উপর সন্তানের ভবিষ্যৎ চরিত্র সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। জীজাবাই অত্যন্ত তেজস্বিনী, সত্যপ্রিয়া ও সাংসারিক কার্য্যে নিপুণা ছিলেন। তাঁহার এই গুণগুলি শিবাজীর পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছিল। শিবাজীর হৃদয়ে যে সদ্‌গুণগুলি বীজরূপে নিহিত ছিল, জীজাবাইর যত্নে সেগুলি অঙ্কুরিত হইল। জীজাবাইর যত্নে যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, শিবাজীর দ্বিতীয় শিক্ষক রাজগুরু দাদোজী কোণ্ডদেবের উপদেশে তাহা পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইল। দাদোজী কোণ্ডদেবের তত্ত্বাবধানে না থাকিলে, শিবাজী রাজকার্য্যে ও শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহারে নিপুণতা লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। দাদোজীর উপদেশের ফলেই আমরা শিবাজীর চরিত্রে অনেকগুলি দেবভাবের পরিচয় পাই।

দাদোজী কোণ্ডদেব অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ন্যায়-পরায়ণ, সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি তৎকালে মহারাষ্ট্র দেশে অতি বিরল ছিল। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প মহারাষ্ট্র দেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে যে গুলি বিশ্বাসযোগ্য ও ঐতিহাসিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার দুই একটি এস্থলে

উল্লেখ করিতেছি। একবার তিনি অজ্ঞাতসারে কোনও অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তৎপরে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে সেই দোষটি দেখাইয়া দেন। দাদোজী তৎক্ষণাৎ তাঁহার জামার একটি হাত (আস্তিন) কাটিয়া ছোট করিয়া ফেলিলেন। তিনি সেই দিন অবধি তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেইরূপ এক হাত খর্ব্ব—জামা পরিধান করিতেন। এইরূপে যে হস্তে অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই হস্তটিকে আজীবন অর্দ্ধেক অনাবৃত রাখিয়া আত্ম-সংশোধন করিলেন।

দাদোজী কোণ্ডদেবের পর আর এক জন মহাপুরুষের উল্লেখ করিব। ইনি শিবাজীকে ঐহিক ও পারলৌকিক উভয় বিষয়েই উপদেশ দিতেন। ইঁহার মস্তকে জটাভার, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, পদে কাষ্ঠপাদুকা, কটিদেশে কৌপীন মেখলা, হস্তে জপমালা ও পরিধানে গৈরিক বসন। ইঁহার নাম "মহা সমর্থ রামদাস স্বামী।" রামদাস আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছিলেন। তিনি লোকালয়ে থাকিতে ভাল বাসিতেন না। নিজে সংসার-বাসনা-শূন্য যোগী হইলেও, তিনি অপরকে তৎপথাবলম্বী হইতে উপদেশ দিতেন না। অনাসক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পরমার্থ সাধন করা, তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম ছিল। রামদাস স্বামী হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার, জন্য ও হিন্দু রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজ্যসংস্থাপনকার্য্যে তিনি শিবাজীকে বিশেষ-রূপে সাহায্য করেন। তাঁহার পরামর্শ না লইয়া, শিবাজী প্রায় কোনও কার্য্য করিতেন না। তাঁহারই উপদেশ শিবাজীকে অনেক সময় অসৎ কার্য্য হইতে নিরস্ত রাখিত। তাঁহাকে শিবাজীর নৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের পথ-প্রদর্শক নক্ষত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাষ্ট্রস্বাধীনতাসংস্থাপনের ইতিহাসের এক ষষ্ঠাংশ রামদাস স্বামীর কার্য্যকলাপে পরিপূর্ণ। দুঃখের বিষয়, মহারাষ্ট্র-দেশের ইতিহাসলেখক গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব, এই মহাপুরুষের বিষয় কিছুই লিখেন নাই।

শিবাজী পুণায় আগমন করিলে পর, দাদোজী কোণ্ডদেবের অধীনে থাকিয়া রীতিমত ব্যায়াম ও অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় মহারাষ্ট্রবাসিগণ লেখা পড়া শিক্ষা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহারা বিদ্যা-শিক্ষার উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক বীরপুরুষোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত হইতে চেষ্টা করিতেন। এই নিমিত্ত শিবাজী কখনই লেখা পড়ায় নিপুণতা লাভ করিতে পারেন নাই। এমন কি, কথিত আছে যে, তিনি স্বীয় নাম পর্য্যন্ত স্বাক্ষর

করিতে পারিতেন না। (১) কিন্তু ধনুর্বিদ্যা, বল্লম-সঞ্চালন, তরবারিপ্রয়োগ ও অশ্বারোহণ প্রভৃতি ব্যায়াম কার্য্যে বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এ বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি অশ্ব-চালনায় ও ধনুর্বিদ্যায় স্বদেশীয় বারগীর অর্থাৎ অশ্বচালনাদক্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তদীয় কার্ম্মুকবিনিঃসৃত শর কখনও অলক্ষ্যে পতিত হয় নাই। দাদোজী কোণ্ডদেবের [illegible] থাকিয়া, শিবাজী রাজকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

৬। হিন্দুরাজ্যসংস্থাপনেচ্ছা ও চেষ্টা।

এই সময় মহারাষ্ট্রদেশে একনাথ, তুকারাম, রামদাস, রঙ্গনাথ ও কেশব স্বামী প্রভৃতি সাধুপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, মহারাষ্ট্রদেশ পবিত্র করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই কথকতা, সংকীর্ত্তন, কবিতা ও উপদেশের দ্বারা মহারাষ্ট্রবাসীগণের স্বধর্ম্মাভিমান ও স্বরাজ্যস্থাপনেচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। আমাদের বিবেচনায় ইঁহারাই প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্রবাসীগণকে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কিরূপে তাহা বলিতেছি। খৃঃ ১৪শ শতাব্দী হইতে খৃঃ ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রবাসীগণ অত্যন্ত হীন অবস্থায় ছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম মহারাষ্ট্রদেশ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তৎপরে ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে, একনাথ স্বামী ও খৃঃ ১৭শ শতাব্দীতে তুকারাম প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কথকতার দ্বারায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাভাবে মৃতপ্রায় মহারাষ্ট্রবাসিগণ দুই শত বৎসর পরে আবার ধর্ম্মামৃত পান করিয়া সবল হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মভাব ও মুসলমানদিগের প্রতি ঘৃণা জাগরিত হইল, বিশেষতঃ সাধুপুরুষগণের মুখে অনবরত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদি পুরাণের বীরত্বভাবপূর্ণ আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া বিবাদপ্রিয়, উগ্রস্বভাব মহারাষ্ট্রীয়গণের বীরত্বভাব ও স্বরাজ্যস্থাপনাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তাহার উপর আবার রামদাস স্বামীর উপদেশ। তিনি স্বদেশবাসিগণকে অত্যাচারী যবনের হস্ত হইতে জন্ম [illegible] উদ্ধার করিবার জন্য প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্টভাবে উপদেশ প্রদান ও উত্তেজিত করিতেন। তুকারামের ন্যায় অতি নিরীহ

(১) মোগলচূড়ামণি আকবর সাহের সম্বন্ধেও এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। লাহারীবের কথায় বিশ্বাস করিলে বীকার করিতে হয় যে, আকবর লিখিতে পড়িতে জানিতেন না।—জন্মভূমি, ফাল্গুন ১২৯৯ সাল, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

ভক্তের কবিতাতেও আমরা মুসলমানগণের উচ্ছেদ সাধনজন্য তাঁহার স্বদেশীয়গণের প্রতি অনুরোধপূর্ণ প্রার্থনা দেখিতে পাই। এইরূপে নানা কারণে স্বদেশানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া, এক দল মহারাষ্ট্রীয় প্রকাশ্য ভাবে মুসলমানদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য, মহাত্মা শিবাজী এই দলের অধিনেতা।

শিবাজী অতি বাল্যকাল হইতেই কথকতা শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কথকতায় তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে, যে স্থানে কথকতা হইত, নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইতেন। শিবাজী স্বভাবতঃই স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের বীরত্বপূর্ণ কথায় অতি বাল্যকালেই তাঁহার তেজস্বিতা, সাহস, হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি ও মুসলমানদিগের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই জন্যই তিনি বিজাপুরের সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রস্তাব হইলে বলিয়াছিলেন, "যবনের সহিত সাক্ষাৎ করা নীচতার কার্য্য।" তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমি মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া স্বাধীন রাজা হইব।" তৎপরে দাদোজী কোণ্ডদেবের উপদেশে, তিনি পবিত্র হিন্দুধর্ম্মানুগত কার্য্যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হইয়া উঠিলেন, এবং হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

যে উদ্দেশ্যে শাহাজী শিবাজীকে পুণায় প্রেরণ করেন, তাহা সফল হইল না। পুণায় আসিয়া শিবাজী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইল। দাদোজী কোণ্ডদেব তাঁহাকে নীতি শিক্ষা দিবার জন্য, আলাউদ্দিন, মহম্মদ ঘোরি ও তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি মুসলমান নৃপতিগণের ক্রূরতা, কপটতা ও অবিবেচকতা, এবং আকবর ও ফিরোজ সাহা প্রভৃতির সৌজন্য ও উদারতা, এবং শাহাজীর সহিত মোগলদিগের যুদ্ধ ও মাওরলী জাতির হীনাবস্থার বিবরণসমূহ, গল্পচ্ছলে তাঁহাকে শুনাইতেন। এই সকল গল্প শুনিয়া শিবাজীর মুসলমানবিদ্বেষ ও হিন্দুরাজ্যস্থাপনাকাঙ্ক্ষা অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া জন্মভূমির ও হিন্দুধর্ম্মের শোচনীয় অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না। অবশেষে তিনি হৃদয়ের ভাব আর গোপন রাখিতে না পারিয়া, একদিন দাদোজী কোণ্ডদেবের নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। ত্রয়োদশবর্ষীয় বালকের মুখে স্বদেশ উদ্ধারের প্রস্তাব শুনিয়া দাদোজী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং উক্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকার

উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার সঙ্কল্প সাধু হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সুসিদ্ধ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। কারণ এরূপ কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইলে, কতকগুলি সুদৃঢ় গিরিদুর্গ, বিপুল অর্থরাশি, বহুসংখ্যক সৈন্য, অন্যান্য হিন্দু নৃপতিগণের সাহায্য, ঈশ্বরের অনুগ্রহ, সিদ্ধপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ইহার মধ্যে তোমার একটিরও অনুকূলতা দেখিতেছি না। তুমি এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। নতুবা পিতোপার্জ্জিত ধনসম্পত্তি হারাইয়া অপযশের ভাগী হইতে হইবে।" কিন্তু শিবাজী কিছুতেই তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। বরং সঙ্কল্পসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিতে যত্নশীল হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে শিবাজী দাদোজী কোণ্ডদেবের মুখে মাওয়লী জাতির কষ্টসহিষ্ণুতা, সাহস, অধ্যবসায় ও অকৃত্রিম প্রভুভক্তির প্রশংসা শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগকে স্বীয় সঙ্কল্পসাধনে সহায়তা করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী বিবেচনা করিয়া, তিনি তাহাদের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। শিবাজী তাহাদিগকে লইয়া জঙ্গলে শিকার করিতে যাইতেন, এবং বনে বনে, সহ্যাদ্রির শিখরে শিখরে তাহাদিগকে লইয়া ভ্রমণ করিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে স্বদেশের সমস্ত দুর্গম পার্ব্বত্য পথ গুলি তাঁহার পরিচিত হইয়া উঠিল। এই সময় শিবাজীর বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। মাওয়লীদিগের মধ্যে তানাজীমালুসরে, এসাজী কঙ্ক ও বাজীপ্রভুদেশকর, এই তিন জনের সহিত শিবাজীর অত্যন্ত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ইহারাই তাঁহার সেই সময়ের বাল্য-সহচর। ইহারা শিবাজীর মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, স্বদেশের হিতকর কার্য্যে মন ও প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল।

শিবাজী যে মহদুদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাহাতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অর্থ না হইলে কোনও কার্য্যই সিদ্ধ হইবার উপায় নাই, অথচ তাঁহার অর্থাগমের কোনও উপায়ই ছিল না। সুতরাং অর্থের জন্য তাঁহাকে ষোড়শ বৎসর বয়সে দস্যুদলে মিলিত হইয়া লুণ্ঠনবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। এই কার্য্যের জন্য অনেকেই শিবাজীর চরিত্রে দোষার্পণ করেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, এ কার্য্যে শিবাজীর চরিত্রে কিছু মাত্র দোষ স্পর্শে নাই। শিবাজী যদি স্বার্থবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে দোষ দিতে পারিতাম। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র স্বার্থ দেখা যায় না। কারণ তিনি রাজার পুত্র, তাঁহার নিজের কিছুরই অভাব ছিল না। জীজাবাই ও দাদোজী কোণ্ডদেবের সদুপদেশে ও শিক্ষায় যাহার

চরিত্র গঠিত হইয়াছে, তাহার চরিত্রে এরূপ কলঙ্ক কখনও আশা করা যায় না। দস্যুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, তাহা তাঁহার লুণ্ঠন-সংক্রান্ত নিয়মাবলী পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়।

শিবাজী দেখিলেন, দেশের উদ্ধার করিতে হইলে প্রথমে সৈন্যসংগ্রহ আবশ্যক। কিন্তু বিপুল অর্থ না হইলে তাহা সুসিদ্ধ হয় না। শাহাজীর বিপুল অর্থ ছিল, কিন্তু তিনি এ কার্য্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। দাদোজী কোণ্ডদেবেরও ইহাতে বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। সুতরাং রাজকোষ হইতে অর্থপ্রাপ্তির আশা তাঁহার একবারেই ছিল না। এরূপ অবস্থায়, লুণ্ঠনবৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন অর্থ ও সৈন্যসংগ্রহের অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, ষোড়শবর্ষীয় শিবাজী দস্যুদলে মিলিত হইলেন। এতদ্ভিন্ন দস্যুদলে মিলিত হইবার, তাঁহার অন্য কোনও কারণ বা উদ্দেশ্য ছিল না।

স্বদেশের হিতসাধনই শিবাজীর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই নিমিত্ত তিনি দস্যুদলে প্রবিষ্ট হইয়াই প্রথমে লুণ্ঠনপ্রণালীর সংস্কার করিলেন। যাহারা দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র লুটপাট করিয়া জনসাধারণের অত্যন্ত অনিষ্ট করিত, তিনি তাহাদিগের মধ্যে সুনিয়ম সংস্থাপিত করিলেন। বলা বাহুল্য, অতি অল্প দিনের মধ্যেই শিবাজী দস্যুদলের অধিনেতা হইয়া পড়িলেন। তিনি মুসলমানদিগকে অত্যন্ত অত্যাচারী বলিয়া জানিতেন। এই জন্য দস্যুদলের অধিনায়ক হইয়াই তিনি মুসলমানদিগকে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া লুণ্ঠনের তালিকা প্রস্তুত করিয়া আনিত। ধনী মুসলমানগণের ও মুসলমান-হিতেচ্ছু অত্যাচারী স্বদেশীয়গণের নাম এই তালিকাভুক্ত হইত। শিবাজীর নিকট তালিকা উপস্থিত হইলে, তিনি লুণ্ঠন করিবার জন্য অধীনস্থ দস্যুদিগকে নিরূপিত স্থানে প্রেরণ করিতেন; তালিকানুসারে লুণ্ঠন কার্য্য সমাধা হইত।

শিবাজী প্রথমে প্রায়ই লুণ্ঠনস্থলে উপস্থিত থাকিতেন না। গো, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে দস্যুগণের প্রতি শিবাজীর বিশেষ নিষেধ ছিল। কিন্তু তাঁহার এই নিষেধবাক্য সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত না হওয়াতে, পরে তিনি স্বয়ং লুণ্ঠনস্থলে উপস্থিত থাকিতে লাগিলেন। লুণ্ঠনসময়ে গো, ব্রাহ্মণ, অনাথ, ফকীর, কৃষক, বালক ও স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যাহাতে কোনও রূপ অত্যাচার না হয়, তজ্জন্য লুণ্ঠনস্থলে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহার বিশেষ

বন্দোবস্ত করিতেন। তৎপরান্তে শিবাজীর লুণ্ঠনপ্রণালী আলোচনা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, তিনি কোনও দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারায় পরিচালিত হইয়া লুণ্ঠন-বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। স্বদেশের দুঃখমোচন করাই তাঁহার দস্যুবৃত্তি অবলম্বনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তৎকালে তাঁহার পক্ষে ইহা ভিন্ন স্বদেশের দুঃখমোচনের কোন প্রকৃষ্ট উপায় ছিল কি না, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আইসে না। তাঁহার স্বদেশীয়গণ ক্রমে শিবাজীর মহদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার স্বদেশীয়গণের সাহায্যে, তিনি মহারাষ্ট্ররাজ্যসংস্থাপনের সূত্রপাত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিরূপে তাঁহার এই চেষ্টা সর্ব্বাংশে ফলবতী হইয়াছিল, এ স্থলে তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। শিবাজীর বাল্যজীবনের সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদানই আমাদের উদ্দেশ্য।

শিবাজীর মহত্ত্ব।

শিবাজীর জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তাঁহার চরিত্রের অধিকাংশই দেবভাবে পরিপূর্ণ। সমাজের অতি শোচনীয় অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া, তরুণ বয়সে শিবাজী যে উদারতা, মহত্ত্ব ও সৌজন্য দেখাইয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানকালে সমাজের অতি সুসভ্য অবস্থাতেও আমরা তাহা সচরাচর দেখিতে পাই না। মুসলমানগণ কোনও হিন্দুনগর লুণ্ঠন বা অধিকার করিলে তত্রত্য অধিবাসীগণের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিত, এবং পবিত্র দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তিসমূহ ভগ্ন করিয়া, নানা প্রকারে হিন্দু ধর্ম্মের অবমাননা করিত। এই জন্য শিবাজী তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, এবং তাহাদের অত্যাচার হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিবার জন্যই তিনি তাহাদের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজী নীচপ্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার হৃদয় অতি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি মুসলমানদিগের নগরী লুণ্ঠন ও অধিকার করিতেন, কিন্তু প্রাণই কখন নগরবাসীর প্রতি অকারণে অত্যাচার বা তাহাদের মসজিদের বা ধর্ম্মের কোনও প্রকার অবমাননা করিতেন না।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্যার জন মালকম্ সাহেব এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। শিবাজীর জীবনীলেখক কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ (ইনি শিবাজীর অনেক কর্ম্মচারী ছিলেন) বলেন যে, শিবাজী রাজা হইলে পর, মুসলমানদিগের পীর ও মস্‌জিদের জন্য প্রাত্যহিক প্রদীপ ও নৈবেদ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শিবাজী ঘোর ধর্ম্মান্ধতার যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও সকল ধর্ম্মের প্রতি সমভাব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

নিম্নলিখিত ঘটনাটি পাঠ করিলে নৈতিকজ্ঞানশূন্য দস্যুদলপতি (?) শিবাজীর মহত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইবে।—

১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে কল্যাণ প্রদেশের "মুলানা" নামক জনৈক মুসলমান সুবাদার রাজস্ব লইয়া সসৈন্যে বিজাপুরে গমন করিতেছিলেন। শিবাজীর সৈন্য বা অধীনস্থ দস্যুগণ পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিয়া, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল। অনেকেই বন্দীভূত হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে সুবাদার মুলানার একটি পরমসুন্দরী পুত্রবধূ লুণ্ঠন সময়ে ধৃত হইলেন। বলা বাহুল্য, মহাত্মা শিবাজী লুণ্ঠনস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি উপস্থিত থাকিলে কখনই এরূপ গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত না। যাহা হউক, মুলানার যুবতী পুত্রবধূর অনুপম রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে শিবাজীর উপযুক্তা বিবেচনা করিয়া, দস্যুগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া শিবাজীর নিকট উপস্থাপিত করিল। শিবাজী তাঁহার রূপরাশি দেখিয়া প্রীত হইলেন। এই সময়ে শিবাজীর বয়ঃক্রম ত্রয়োবিংশতি বৎসর মাত্র। শিবাজী তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সস্মিতমুখে কহিলেন, "মা! তুমি যদি আমার জননী হইতে, তাহা হইলে আমিও তোমারই মত দেখিতে সুন্দর হইতাম।" এই বলিয়া শিবাজী তাঁহাকে যথোচিত সম্মান সহকারে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিয়া, তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর নিকট বিজাপুরে পাঠাইয়া দিলেন। +

শিবাজীর চরিত্র এইরূপ দেবভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু এইখানেই শিবাজীর মহত্ত্বের শেষ হয় নাই। যাহারা বন্দী হইয়া আসিয়াছিল, শিবাজী তাহাদিগকে অক্ষতশরীরে বিদায় করিলেন। শিবাজীর জীবনে এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

+ গ্রাণ্ট ডফ বলেন,—"Moolanah Ahmod, made prisoner by Abajee sonedoo, was treated by Shivajee with the utmost respect, and being honourably dismissed, he returned to court." Grant duff. vol. I. pp. 119

শিবাজীর চরিত্রের মহত্ত্ব এই যে, তিনি বিজিত শত্রুর প্রতি কখনও অন্যায় ব্যবহার করিতেন না। বরং তাহাদিগের প্রতি যথোচিত সৌজন্য প্রকাশ করিতেন। আহত বন্দিগণ কখনও তাঁহার দয়ায় বঞ্চিত হয় নাই। তিনি আহত বন্দিগণের যথোচিত শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন, এবং তাহারা আরোগ্য হইলে তাহাদিগকে সম্মানের সহিত বিদায় করিতেন। স্যর্ জন মালকম্ সাহেব বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালীন মহারাষ্ট্রীয়গণ অর্থাৎ শিবাজী ও তদধীনস্থগণ, শত্রুর প্রতি ও শত্রুপক্ষীয় স্ত্রীলোকগণের প্রতি কখনও অত্যাচার করিতেন না। এইরূপে যে সময়ে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিগণ বহুসংখ্যক (এমন কি কেহ কেহ ২। ৩ শত বিবাহ করিতেন) দারপরিগ্রহ পাপে লিপ্ত থাকিয়াও পবত্রীহরণে ক্ষান্ত থাকিতেন না, সেই সময় মহাত্মা শিবাজী পরস্ত্রীকে, বিশেষতঃ শত্রুপক্ষীয় স্ত্রীলোককে জননী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এবং তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করিয়া সম্মানের সহিত তাহাদিগকে তাহাদের আত্মীয় স্বজনগণের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। যে সময়ে বিজিত শত্রুর চক্ষুরুৎপাটন বা গাত্রের চর্ম্মোত্তোলন করিয়া তাহাকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করা হইত, সেই সময়ে মহাত্মা শিবাজী বিজিত শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া, স্বীয় মহত্ত্বের ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন।

শিবাজীর পুত্র সাম্ভাজী অত্যন্ত অসচ্চরিত্র ছিলেন। এই নিমিত্ত শিবাজী তাঁহাকে "পানালা" দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।* সাম্ভাজী সুযোগ পাইয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া দিলের খাঁর সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। দিলের খাঁ সাম্ভাজীকে সঙ্গে লইয়া ভূপালগড়† আক্রমণ করিলেন। এই সময় চাকণ দুর্গের হাবিলদার ফিরঙ্গোজী এই দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ভীরুপ্রকৃতির লোক ছিলেন না। কিন্তু সুচতুর দিলের খাঁ সাম্ভাজীকে স্বীয় সৈন্যদলের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রভুপুত্রের উপর গোলা বর্ষণ করিতে ফিরঙ্গোজী সাহসী হইলেন না। সুতরাং বিনাযুদ্ধে ভূপালগড় যবনের হস্তে সমর্পণ করিয়া, তিনি শিবাজীর নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। পুত্রের এইরূপ ব্যবহারে শিবাজী অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। শিবাজী প্রকৃত স্বদেশভক্ত ছিলেন। স্বদেশের জন্য নিজের স্বার্থ বলি দিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত

* সাম্ভাজী জনৈক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সতীত্বনাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত মহাত্মা শিবাজী তাঁহাকে বিশেষ শাস্তি দেন ও কারারুদ্ধ করেন।

† গড = 'গিরিদুর্গ' গড়ঃ স্মৃতঃ"।—শব্দরত্নসমন্বয়কোষ।

হইতেন না। তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যে কুলাঙ্গার স্বদেশের বিরুদ্ধে—মারাঠা জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আমার পুত্র নহে; যে স্বদেশের শত্রু, সে আমারও শত্রু।" এই বলিয়া শিবাজী দুর্গোপবিষ্ঠিত সমস্ত হাবিলদারকে পুত্রের উপর গোলা বর্ষণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। শিবাজীর আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। ভীরুস্বভাব সাম্ভাজী পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।*

প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী শিবাজীর চরিত্র এইরূপ উচ্চভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তাই তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাহাদের ভক্তি অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। এইরূপে শিবাজীর চরিত্র যতই আলোচনা করি, ততই দেখিতে পাই যে, তিনি সমাজের নিকৃষ্টতম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বীয় জীবনে উৎকৃষ্টতম গুণসমূহের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিষম পরিতাপের বিষয় এই যে, শত্রুপক্ষীয় ইতিহাস-লেখকগণের হস্তে পড়িয়া, শিবাজীর দেবভাবাপন্ন চরিত্র যে অযথারূপে কলঙ্কিত হইয়াছে, তাহা না বিবেচনা করিয়া, অনেকেই তাঁহাকে নৈতিকজ্ঞানশূন্য দস্যু ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ঘৃণা করেন। শিবাজীর চরিত্র যে অধিকাংশ স্থলেই সেরূপ দোষে দুষ্ট নহে, এই প্রবন্ধে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিতে চেষ্টা করিয়াছি। চন্দ্র রাও মোরে ও অফজুল খাঁর হত্যাবিষয়ে শিবাজীর নির্দোষিতা আমরা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা এমন বলি না যে, শিবাজীর চরিত্র সম্পূর্ণ দোষশূন্য ছিল। সামাজিক শিক্ষার দোষে শিবাজীর চরিত্রে যে দুই একটি কলঙ্ক দৃষ্ট হয়, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। তবে দোষের অপেক্ষা তাঁহার চরিত্রে গুণের ভাগ যে সহস্র গুণ অধিক ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

---

* সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের অধ্যাপক বাজারাম বামকৃষ্ণ ভাগবত প্রণীত "শিব ছত্রপতি চরিত্র" হইতে সঙ্কলিত।

কবিতাকুঞ্জ।

বিরাগীর আক্ষেপ।

১

প্রভাতে আইলি কেন নৌকা তোরা বাহিয়া?
সারি সারি চাঁপা গাছ, ঐ সে অশোক গাছ,
সে কাহিনী আছে আজো মর্ম্মে মোর বিঁধিয়া।
এমনি তামসী নিশি, তারাশূন্য দশ দিশি।
যামিনী শিহরি উঠে নিজ বক্ষে চাহিয়া।
এ গ্রামের দিকে কেন নৌকা এলি বাহিয়া?

২

চক্ষে হাসি, ওষ্ঠে হাসি, মূর্ত্তিমতী হাসিরাশি
আমার আনন্দময়ী নিত্য হেথা আসিত।
হেলিয়া আমার কাঁধে, কতই মনের সাধে,
পা দুখানি ছড়াইয়া, মালাগুলি গাঁথিত।

৩

পৃথিবীর বহু দূরে, স্বপ্নময় সুরপুরে,
প্রেমের মদিরা পানে ছিনু মোরা তোর ভোর।
স্বাচপাত্র চুমায়, দুবায় তলানি সায়,
আজও ছোটেনি তবু সে নেশার ঘোর মো।

৪

তোরা কি বুঝিবি তারে কত ভাল বাসিতাম।
নিত্য কণ্ঠহার করি, রাখিতাম বুকে ধরি,
তবুও অবোধ মনে দুরাশারে আসিতাম।
তোরা কি বুঝিবি তারে কত ভালবাসিতাম।

৫

আমি জানি ভাল করে', দেবতাও হিংসা করে,
আমাদের এত সুখ প্রাণে নাহি সহিল।
নিশিযোগে আসি হায়, করাল ডমরু প্রায়,
আমার সর্ব্বস্ব ধনে অনায়াসে হরিল।
বুকেতে বাজিল শেল পরাণ ভাঙিয়া গেল,
কাঙালে নাঙ্গাল করি বিধি বাঁচা রাখিল।

৬

আমা বই অন্য কোন লোক সে চিনিত না;
হাসি বই অন্য কোন কাজ সে বুঝিত না;
অভিমেও শত হাসি, দেখা দিল ওষ্ঠে আসি;
হাসি-উপহার বিনা কভু সে ভুলিত না।

৭

সেই হাসি মর্ম্মে মর্ম্মে আছে মোর বিঁধিয়া।
এ গ্রামের দিকে কেন নৌকা এলি বাহিয়া?
এমনি তামসী নিশি, বনমোর দশ দিশি।
আমার সে হাসিরাশি গেল হায় উপিয়া।

৮

আমার এ শূন্য কোলে মাথাটি রাখিয়া রে,
শবদেহ চক্ষু মেলি রহিল চাহিয়া রে।
দুরার সে অবশেষ, আগ্রহে করিনু শেষ,
প্রাণশূন্য সে অধরে চুমিয়া চুমিয়া রে।
আমার সে কাণ্ড হেরি, শিহরিল নিশাচরী,
যামিনী আতঙ্ক ভরে উঠিল কাঁপিয়া রে।

৯

নশার্কের শেষ কলা নীল অঙ্কে ডুবিয়া,
গেল, গেল, চিরতরে কোন্ ভাকিনীর বেশে?
কোন্ ভ্রমে এলি তোরা নৌকা হেথা বাহিয়া?
সারি সারি চাঁপা গাছ, ঐ সে অশোক গাছ,
কহিছে আহ্বান যেন মোর পানে চাহিয়া।

১০

শব-দেহ কোলে করে, আইলাম ধীরে ধীরে,
এই চম্পকের কুঞ্জে, অশোকেরে বেড়িয়া,
পোড়াইনু স্বর্ণকান্তি চিতানল জ্বালিয়া।
সুখ-সাধ শেষ হয়ে উৎসব ফুরায়ে গেল,
যে যামিনী না ফুরায় আমার সে বিভাবরী।

১১

চিতার সে বজ্রস্পর্শে মেদিনী কাঁপিয়া হবে।
অশোক চম্পকে আর ফুলরাশি ধরে না।
গ্রামবাসী কুতূহলী, করে সবে বলাবলি,
'অন্য স্থানে এত চাঁপা, অশোক ত ফোটে না।"

১২

ফুলময়ী, ফুল ছিলি, ফুল সঙ্গে খেলা খেলি,
ফুলময় ঘরে মেলি, ফুলময় বিজনে,
তাই তোর দেহখানু ফুলেতে মিশাবে দিনু,
অশোক চম্পক তলে, ফুলময় কাননে।

১৩

সেই সে চিতার তব সর্পদেহে রাখিনু।
যৌবনের আধি অঙ্গে যোগী-বেশে সাজিনু।
গহন অরণ্য খুঁজি, শ্মশানে শ্মশানে ফিরি,
পৃথিবি! তোমার দিকে আর নাহি চাহিনু।

১৪

কে স্মৃতি, বাহিয়া কেন আইলি এ তরণী?
সারি সারি চাঁপা গাছ, ওই সে অশোক গাছ,
লেখা আছে পাতে পাতে, প্রাণমর্ম্মদাহিনী,
জীবনের সার কথা, সে নিশার কাহিনী।
এখনি তামসী নিশি, তারাপুঞ্জ প্রকাশিবি।
শিহরি চমকি উঠে শ্মশানবাসিনী।
তোর ছায়াময়ী কেবে, হায় এ গ্রামের ধারে,
আসিয়া দাঁড়ালি এ তরণী?

তুমি ই-কোণে,
লে তুমি,
, মুদ্রিত নয়নে,
ঢ় যানে যাবে চলি?
কবি, সে মূল কথা গিয়াছ কি ভুলে?
সোমরস শুধু হয় বনফুলে।

২

তুমি কি ভেবেছ, মন কবিলে হরণ,
ভাঙা ছাড়া আধা আধা হবে?
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে, সঘনে মরম
রূপালসে চলে চলে পড়ে।
মরম কহিবে কথা তবে সে শশিতা,
মরমে ভঙ্গিমী ভরা, রমিতা, কবিতা।

৩

শুদ্ধ চিত্তে, কায় মনে, কবিতা রচিবে
দুর কবি চিত্তহারা পেয়—
কবি প্রাণ-বন্ধুকেতে জ্যা-নির্ঘোষ হবে,
তবে গিয়া হবে লক্ষ্যভেদ।
ছুটিবে শব্দের তীর, ভেদি তমোজাল,
ভৈরবী পশিবে ব্রহ্মে হাস্ত খরখাল।

৪

তোমার চিত্রশালায় থাকে যদি কবি।
দেব-ভক্ত প্রতিভা-তুলিকা,
হও কবি, ক্ষতি নাই; চন্দ্র, তারা, রবি,
ফল, ফুল, জল ও লতিকা,
সব ী-সব এই বিশ্ব বসুভূমি,
আঁকিতে, সাজিতে পার, কামরূপী তুমি।

৫

তা ি নাহি থাকে, কিম্বোদিনী ছন্দে
গাও যদি মিলনের গীত,
কালের সহিত তবে মিহামিহি ছন্দে,
কেন তব মরম বাধিত।
জান না? যে পাখিজাত শোনে দেব-বলে,
আবোহি দৈত্যের গলে বসী হয়ে দোলে।

৬

তব সুখে সুখী হবে, তব দুখে দুখী,
সংসার বলিবে বারম্বার—
"হাসালে, কাঁদালে; এ যে বিচিত্র কুহকী।
দেবদুল্য মূরতি ইহার।"
সবে পুষ্প রাশি রাশি, হে কবি, তখন আসি,
কাল দৌবারিক, চুমি চরণ তোমার,
খুলিবে তোমার লাগি অমরত্বের দ্বার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ঘুম।

পড়েছে ঘুমের ছায়া ঘুমন্ত আননে,
ঘুমের আলসে হের শিথিলিত কায়,
মুখর মুখর ওরে চরণে ঘুমায়,
ঘুমায় বসন কাঞ্চী কটি আলিঙ্গনে,
অধরে ফুটিছে হাসি সুখের স্বপনে,
অসতর্কে পবনেতে অঞ্চল লুটায়,
পূর্ণ পীন পয়োধর জড়িত মালায়,
আঁখিপাতা ঢাকিয়াছে কমল নয়নে,
খসেছে কটির বাস, মুক্ত কেশভার,
কোমল চিকন বাহু ঘুমের শিথান,
ললিত কোমল কর বুকের মাঝার
নিশ্বাসের সাথে সাথে পতন উত্থান,
নড়ি নড়ি খসখসি ঘুমন্ত এখন,
লাগিলে বুকের মাঝে কে করে গ্রহণ।

জাগরণ।

ঘুমায়েছে সুখস্বপ্ন, উঠেছে জাগিয়া,
আলসে মেলিছে আঁখি ঘুমের মুদ্রণ
পদ্মা 'পরে বসিয়াছে নিদ্রা পরিহরি,
ঘুম-ঘোর নয়নেতে রয়েছে লাগিয়া,
ললাটে অলক গুচ্ছ গেছে জড়াইয়া,
বুকেতে ফুলের মালা রহিয়াছে মরি',
পুলিনে পিঠের পরে দুলিছে কবরী,
কোলেতে যুগল কর রয়েছে পড়িয়া;
উঠে না অঙ্গুলি গুলি তুলিতে অঞ্চল,
হেলিয়ে পড়েছে মাথা পালঙ্কের পাশে,
ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে পড়ে নয়ন তরল
আলসে ভরিয়ে আসে মধুর বাতাসে,
ঘুম চাহে তরুণীরে লয় নিজ কোলে,
জাগরণ কাছে আসি টেনে লয় বলে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

অলস প্রেম।

ঘুমছি পড়িছে প্রাণ অলস স্বপনে,
কি যেন ঘুমন্ত রাগ অনুরাগ ভরে
শিথিল এলায়ে বীণে পড়িতেছে ঝরে'
কি মধু উন্মাদ স্রোত উছলে নয়নে।
কে গো সে সুদূর হতে আকুল যে
বাঁধিতেছে মায়া-ডোরে নিজ [illegible]
প্রেমালসে মুগ্ধ হাস পড়ে মুখানিতে।
আর কি গো সাধ যায় ভাসিতে উজানে?
কি কোমল ও হৃদয় কি সুখেতে হায়
মাথা খুয়ে ভাবি পরে ঘুমেতে মগনা,
অলস বকুল ফুল ঝরিছে মাথায়,
ছেয়ে আছে আঁখি যেন আকাশ নয়না।
আমার এ আত্মহারা পরাণের ছায়
বল দেখি আজ সখি কি লাগে বাসনা?

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কার?

ওই তরঙ্গিনী তীরে কার বীণা বাজে ধীরে,
বালিকা বালার সুরে ও কে সখি গান গায়?
গভীর গভীর স্বর ছুটে ছুটে চরাচর
কাতর সঙ্গীতে ঢাকি খুঁজিয়া বেড়ায় কায়?
স্তম্ভিত পাষাণফুল, স্পন্দিত লতিকা কুল,
[illegible] চায়।
ওই [illegible] ছুটে,
[illegible]
শুনি ও মধুর তান
হের অন্তর্গিরি হ'তে
অধীরা প্রকৃতি রাণী [illegible]
আকুল ও মুখ পানে করুণ [illegible]
প্রবাহ উথলি উঠে আকুল চরণে লুটে,
ও মধু অধীর চোকে আকাশের পানে চায়!
করুণ মধুর সুর কেন সখি তরপুর
বিষাদ গভীর তানে, কারে ডাকে আর আর?

কোন্ নয়নের মণি কোন্ প্রণয়ের ধনি
হারায়ে গিয়েছে ওর ওই গগনের গায়?
কে কোথায় দূরবাসে ও তার মিলন আশে
বিরহ ব্যথিত প্রাণে সদা করে "হায় হায়!"
দিবস আঁধারে লীন প্রদোষেতে প্রতিদিন
করুণ ম্লান হাসি গগনে ভাসিয়া যায়।
এমন আকুল তানে উচ্ছ্বাস অধীন প্রাণে
তরঙ্গিনী কূলে সখি ও কেন গো গান গায়?

শ্রীপ্রমীলা নাগ।

নদী।

সিক্ত করি শুষ্ক ভূমি করুণ ধারায়,
বহিছে ও সুধাময়ী প্রেমস্রোত কার?
উর্ব্বর করিতে মরু মধুর মায়ায়,
এসেছে দ্রবিত হ'য়ে পরাণ কাহার?
তরঙ্গিত, বিদারিত অব্যক্ত ব্যথায়,
ধূলিধূসরিত, তপ্ত, মাটীর হৃদয়,
যত্নে সমতল করি, ফুটাইতে তায়,
শান্তির শ্যামল কান্তি স্নিগ্ধ ছায়াময়।
নিশি দিন সৈকতের চরণ ধুইয়া,
গাহিছে প্রশান্ত এক আনন্দের গান
জোয়ারেতে পূর্ণ কভু পড়ে উথলিয়া,
ভাঁটায় সরিয়া কভু করে অভিমান।
কার হৃদয়ের এই অশ্রান্ত বাহিনী,
অনন্ত, অমৃতময়ী প্রেম মন্দাকিনী?

শ্রীবিনয়কুমারী বসু।

দূরস্থ সিন্ধুর প্রতি।

কার দূর তান, আকুল আহ্বান,
দিবানিশি পশে পরাণে।
বুঝিতে পারি না কে করে ছলনা,
মোহন গম্ভীর স্বনে,
দলে অবহেলে, এই ক্ষুদ্র বলে
সুকঠিন শিলারাশি,
এ দূর তানে আকুল আহ্বানে
হেথায় পৌঁছেছি আসি।
(এখন) কোন পথে যাব, কাহারে শুধাব
কে দেখাবে পথ, হায়।
বুঝিতে পারি না কার এ ছলনা
নয়ন ভাসিয়া যায়।
খুঁজি বিশ্বময়, কোথা নিরদয়—
দেখা যদি পাই নয়নে,
(তবে) সব বাধা ঠেলি, এ পরাণ ঢালি,
লুটায়ে পড়িব চরণে।
নিশি দিন শুনি, আয় আয় ধ্বনি
কে ও ডাকে মোহমন্ত্র,
বুঝিতে পারি না কার এ ছলনা,
নয়ন ভাসিয়া যায়।

কুমারী লজ্জাবতী বসু।

হায়নের অনুকরণে।

মন্দাকিনী-বারি-স্নাত বৈজয়ন্তী কথা
নিশির স্বপন সম মোর হৃদে ভায়,
তোমার নয়ন কোণে,
স্বরগের দ্যুতি ঝলে,
বেশে মন্দারগন্ধ লুটাইয়া যায়;
পুলকিত কবিদের কল্পনার গাথা।
দেবতার কাহিনীতে কে করে প্রত্যয়?
যা কিছু সত্যের রেখা,
তোমার অন্তরে লেখা,
তোমার বাতুল পদে আছে গো অভয়।
নরকের ছবি আঁকি কাদাইতে চাও?
বৃথা আকিঞ্চন তব হে সুরসুন্দরি!
হৃদয়ের কোন খানে,
নয়নের কোন কোণে,
কত শেল আছে চাপা,—গেছ গো বিস্মরি।

মলয়ের আক্ষেপ।

বহু দূর হ'তে এসেছে মলয়,
আজিকে প্রবাস থেকে।
কত নিশি জেগে, বেঁধেছে বুকিয়া
পাতায় পাতায় রেখে,

মলয় পরশে নয়ন মেলিয়া,
দেখে আজি প্রিয় জন ;
আবেশে শিহরি, কাঁপে থরথরি,
সুরভে পূরিল মন ,—
অবশ বিহ্বল শুষ্ক সুখ ভরে,
মুরছি পড়িল ঢলে ,—
এত সুখ হৃদে ধরে নাক তার,
বাচে ফুল আজি ম'লে।
মলয় সম্ভাষে, নাহি মুখে বাণী,
কে আর কহিবে কথা,—
প্রিয় দরশনে, অচেতন বালা,
সুখে ছিল এত ব্যথা !
পাপড়ি অধরে চুমিতে সুধীরে
জুঁই ধীরে ঝ'রে গেল।
বেঁচেছিল শুধু আশাপথ চেয়ে—
"কৈ গো মলয় এল ?"
মলয়-পরশ, স্বরগের সুখ,
সহিল না হৃদে হায়।
ফিরিছে মলয়, কেঁদে কেঁদে বনে,
মুখে শুধু হায় ! হায় !

তবু কাঁদে স্বার্থপর দুর্ব্বল হৃদয়।

কোথায় মরণ ?—তব অমর জীবন।
শত মৃত্যু পারিবে না স্পর্শিতে তোমায়।
নিশি দিন জেগে আছ পাষাণ ধরায়
জগতের কার্য্যে কবি তোমা দরশন।
এ পারে আঁধার, অতি বড় কোলাহল,
বড়ই নিঠুর ধরা, কেবল ক্রন্দন,
এত কি সহিতে পারে হৃদয় কোমল,
তাই বুঝি পর পারে করেছ গমন।

প্রতি অশ্রু বিভাসিত তোমার সন্তায়,
হৃদয়ে তোমার সেই সৌম্যছবিখানি,—
প্রাণ কাঁদে তবু,—কোথা দরশন হায়।
কোথা সেই দেবতার আশ্বাসের বাণী।
হৃদয়ে অমর তুমি জানি মৃত্যুঞ্জয়।
তবু কাঁদে, স্বার্থপর দুর্ব্বল হৃদয়।

১৪ই শ্রাবণ, বুধ।
১২৯৮ সাল।

জীবন ও ধর্ম্ম।

তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ নির্ণয় ও সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসের নাম আমার জীবন। এবং যে প্রণালীতে সেই সম্বন্ধ স্থাপন ও সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রয়াস সফলতা লাভ করে, তাহার নাম ধর্ম্ম। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক, সামঞ্জস্যের পূর্ণতা কখন ঘটে না, তবে পূর্ণতার দিকে গতি, সেই মুখে চেষ্টা, সেই মুখে যত্ন, শ্রম, প্রয়াস। সেই প্রয়াসের ধারাবাহিক ইতিহাস জীবনের কাহিনী। ইতিহাস সর্ব্বত্র এক কথা বলে না। বিভিন্ন স্থলে জীবন-কাহিনীর বিভিন্ন রূপ। চেষ্টা পূর্ণ সামঞ্জস্যের দিকে, চেষ্টার সফলতায় ধর্ম্মের পরিমাণ। সুতরাং জীবনের সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ বন্ধন।

তুমি ও আমি উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ, এবং তুমি ও আমি এই উভয় লইয়া জগৎ। এ হিসাবে জগতে তৃতীয়ের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং, 'তুমি' ও 'আমি' কথা দুইটার অর্থ একটু পরিষ্কার বুঝা আবশ্যক। স্থানান্তরে* এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এ স্থলেও পুনরায় সংক্ষেপে আবৃত্তি করিয়া লই।

'আমি' শব্দের অর্থ আমি মাত্র, অর্থাৎ যে ভাল, যে সুখী, যে দুঃখী, যাহার জন্য তুমি ও জগৎ, অর্থাৎ, যে তোমার ও সেই সঙ্গে জগতের নির্ম্মাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা। 'তুমি' শব্দের অর্থ,—আমার বাহিরে যা কিছু আছে, তাহা, আমি-ছাড়া-আর-সবই, অর্থাৎ যাহা কিছু আমার গোচর, আমার প্রত্যক্ষ বিষয়, আমার ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনা, কামনা। এই আমি-ছাড়া সমগ্র জগৎকে 'তুমি' শব্দে নির্দ্দেশ করিলাম। কেন না, আসলে তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, আমার প্রত্যক্ষগোচর বা কল্পনাগোচর বা অনুমানগোচর বা স্বপ্নগোচর, আর সকলেরই সহিত আমার এক হিসাবে সেই সম্বন্ধ। এক হিসাবে আমি ছাড়া সবটাই আমার ভিতরে, আমার অংশভূত। সবটাই আমার অনুভূতি বা আমার কল্পনা, আমার নিজেরই লীলা বা খেলা বা কারিগরি। যুক্তি প্রয়োগ করিয়া আমি ছাড়া আমার বাহিরে আর কিছুরই অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি না। সুতরাং, সমগ্র বাহ্যজগৎটা আমারই ভিতর, আমারই এক অংশ। অংশ বলিলে হয় ত ভুল হয়; কেন না আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অনুমানের যে ভাগটাকে বাহ্যজগৎ আখ্যা দিই, সেটা বাদ দিলে আমার নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর থাকে কি না সন্দেহ। আমি কতকগুলা সহবর্ত্তী ও ধারাবাহিক সুখময়, দুঃখময় ও না-সুখ-না-দুঃখময় অনুভূতির সমবায় মাত্র। অনুভূতি ছাড়া আরও কতকগুলা পদার্থ আমাতে বর্ত্তমান আছে, যেমন স্মৃতি, ও কল্পনা, ও চিন্তা, ও কামনা, ও ইচ্ছা। কিন্তু সেই অনুভূতিগুলার সহিত ইহারা এরূপে জড়িত যে, অনুভূতির অস্তিত্ব না থাকিলে, ইহাদেরও অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ। তাহাদের অস্তিত্বে ইহাদের অস্তিত্ব, তাহাদিগকে লইয়া ইহারা। অনুভূতিগুলাকে সামান্যতঃ তিন ভাগে ফেলিতে পারা যায়। কতকগুলার নাম অতীত; কতকগুলার নাম বর্ত্তমান; কতকগুলা ভবিষ্যৎ। তিনের মধ্যে বিভেদ, আবার তিনে মেশামেশি। অতীত বর্ত্তমানকে জড়াইয়া আছে; বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে টানিয়া সম্মুখে আনিতেছে। শুধু বর্ত্তমান লইয়া কারবার থাকিলে, অতীত ও ভবিষ্যৎ যদি বর্ত্তমানের সহিত এককালে বিচ্ছিন্ন থাকিত,

* সাধনা—আষাঢ়, ১৩০০ পৃঃ।

আছে, সেই উত্তর—প্রকৃতি। আমি আছি কেন?—প্রকৃতি বিধাতা। আমি এমন কেন?—প্রকৃতি জানেন। আমি এরূপে এ পথে চলি কেন?—প্রকৃতি প্রবল। প্রকৃতির বলে আমি আছি, প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট পথে আমি চলি। না চলিয়া আমার চলে না। আমি চলি, এবং [illegible]র বিরোধেও আমি-ছাড়া অপরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া চলি। প্রকৃতির উপদেশে। প্রকৃতির নিয়োগে। প্রকৃতির বিধানে। কেন না, প্রকৃতি প্রভু। কেন না, প্রকৃতির প্রভুত্ব বিনা আমার অস্তিত্ব বজায় থাকে না।

তাই প্রকৃতির নিয়োগে তোমার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমিও যেমন সুখদুঃখভাগী একটা কিছু, তুমিও সেইরূপ একটা কিছু। অথচ তুমি আমার কল্পিত, তুমি আমার সৃষ্ট, তুমি আমার অন্তর্গত। আমি যেন দর্পণ, তুমি তাহাতে প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব দর্পণ ছাড়া আর কিছু নহে; দর্পণের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই; দর্পণেরই একটা গুণ বা ধর্ম্ম। বুঝি প্রতিবিম্ব বলিলে ভুল হয়; কেন না, প্রতিবিম্ব বলিলে দর্পণের বাহিরে এমন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ আসিয়া পড়ে, প্রতিবিম্বটা যাহার দর্পণপৃষ্ঠে প্রতিফলিত মূর্ত্তি মাত্র। তেমনি তুমি আমার ভিতরে একটা প্রতিবিম্ব বা ছায়াস্বরূপ মনে করিলে, আমার বাহিরে স্বতন্ত্র একটা কিছু চলিয়া আইসে, যাহা হইতে আমার মধ্যে তোমার উৎপত্তি। সে যাই হউক, বাহিরে কিছু থাক বা নাই থাক, প্রকৃতির নিয়োগে আমি তোমাতে বিশ্বাস করি। আমি ছাড়া আর এক জন আছে, মানিয়া লই। আমাতে আমার যেমন বিশ্বাস, তোমাতেও আমার তেমনি বিশ্বাস। আমি আছি, এবং আমি ছাড়া তুমিও আছ। আমা হইতে তুমি বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন, পৃথক্।

তুমি আছ, সুতরাং উনি, তিনি, সে, ইহারা, তাঁহারা সকলেই আছেন। মৎস্য, কুম্ভীর, কচ্ছপ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নদী, পর্ব্বত, গহ্বর সকলেই আছেন। কেন না, সকলেই কোন না কোন সময়ে তুমি-স্থলীয়। তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, সকলেরই সহিত আমার সেই সম্বন্ধ। সকলেই আমার প্রত্যক্ষ বিষয়, অনুভূতির সামগ্রী, সমানভাবে তুমিত্বের দাওয়া করেন। সুতরাং যেটাকে আমি ছাড়া বাহ্য জগৎ বলি, সেটা এই হিসাবে আমা হইতে স্বতন্ত্ররূপে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান। এই অর্থে বাহ্য জগৎটাই তুমি। অন্ততঃ এই অর্থে 'তুমি' শব্দের ব্যবহার করিয়াছি।

আমি ও তুমি কথা দুইটার অর্থ এক রকম বুঝা গেল। 'আমি' অর্থে

আমি ; আর 'তুমি' অর্থে এ স্থলে আমি ছাড়া আর সব। কিন্তু মূলে বিরোধ। আমাতে তুমি ও তোমা লইয়া আমি ; এই অর্থে উভয়ে ভেদ নাই ! আবার— আমা ছাড়া তুমি স্বতন্ত্র ; তোমার অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া, এই অর্থে উভয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ। এই বিরোধ লইয়া জীবনের উৎপত্তি ; এই বিরোধেই জীবনের সমাপ্তি। ইহারই নাম প্রকৃতির খেলা। প্রকৃতির উদ্দেশ্য বুঝিবার প্রয়াস পাইও না ; প্রকৃতির খেলা দেখিয়া স্থির থাক।

মূলের এই বিরোধ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিদ্যমান। যেখানেই যাই, যেখানেই থাকি, এই বিরোধ কোনও না কোনও মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান। আমায় তোমায় এক, অথচ আমায় তোমায় ভিন্ন। তোমার স্বার্থে আমার স্বার্থ ; অথচ তোমার সংহারে আমার পূর্ত্তি। খেলা নয় ত কি বলিব ?

আর একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমার এই ভৌতিক শরীরটা, প্রত্যক্ষতঃ যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমি রহিয়াছি ; ইহা এই হিসাবে আমার অংশ নহে ; ইহা আমার কল্পিত, সৃষ্ট, অনুভূতিগত, প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতেরই অংশীভূত। আর সবই যেমন আমার প্রত্যক্ষ, আমার বাহির ; ইহা ত তেমনি আমার প্রত্যক্ষ, আমার বাহির।

আধুনিক জীববিদ্যা এ কথা অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। শরীরের সহিত হাত পায়ের যেরূপ সম্বন্ধ, গাছের সহিত তাহার শাখা পত্র ফুলের যে সম্বন্ধ, পিতামাতার সহিত সন্তানের সেই সম্বন্ধ। শাখা যেমন গাছের অবয়ব, পত্র, পুষ্প যেমন গাছের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বীজ ও তজ্জাত বৃক্ষ আপাততঃ স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত হইলেও, সেই একই সম্বন্ধে পিতৃ-বৃক্ষের অংশীভূত। আবার এক প্রোটোপ্লাজম্ বা জীবাণু হইতে যখন জীবমাত্রের উদ্ভব স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং প্রাণিমাত্রেই এক এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের শাখা প্রশাখা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। আমার, তোমার, তাঁহার সকলেরই শরীর সেই এক পিতৃশরীর হইতে উদ্ভূত ও অভিব্যক্ত। আবার জড়জগৎ ও জীবজগতের মাঝখানে একটা রেখা টানিয়া দুইটাকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিলে, জাগতিক ব্যাপারকে সমস্যার উপর সমস্যা করিয়া তোলা হয়, এবং জ্ঞানের চোখে আঙ্গুল দিয়া বিকৃতদৃষ্টি উৎপাদনের পাতক অর্শে। সুতরাং সমগ্র বাহ্যজগৎ, জীব জড় উভয় লইয়া জ্ঞানের বিষয়ীভূত সমগ্র বাহ্যজগৎটা এক মাত্র। এই হিসাবে আমিও সেই বাহ্যজগতের অন্তর্ভুক্ত ও তাহার সহিত এক।

অর্থাৎ, সমগ্র জগৎটারই আমার সহিত সম্পর্ক বড়ই ঘনিষ্ঠ। জগৎটাকে

খণ্ড খণ্ড করিয়া ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের সহিত যদি আমার মুখ্যভাবে ও গৌণভাবে সম্বন্ধ আলোচনা করা যায়, তবে এইরূপ দাঁড়ায়। আমার সহিত মুখ্য সম্বন্ধ প্রথমে আমার শরীরের; পরে আমার পুত্রপৌত্রাদির, পরে আমার পত্নী বন্ধু আত্মীয়বর্গের। এইরূপে ক্রমশঃ মুখ্য গৌণপরম্পরায় জ্ঞাতি, গোষ্ঠী, গোত্র, কুল, বর্গ, বর্ণ,—এইরূপে চলিয়া শেষে মানবজাতি, জীবকুল ও জড়জগতে গিয়া শেষ হয়। শেষ হয়—ঠিক বলা যায় না; কেন না, প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎ ছাড়িয়া আর একটা এমন প্রকাণ্ডতর জগৎ রহিয়াছে, যাহা আমার কল্পনার সামগ্রী, সুখ দুঃখের উপাদান, আমার চিন্তার বিষয় ও আমার আশার লক্ষ্যস্থল। প্রত্যক্ষ জগতের সহিত দৈনন্দিন নিত্য আবশ্যক রুটিন্ অনুযায়ী কারবার সমাপ্ত করিয়া একটু অবকাশ পাইলেই, আমি যে জগতে আশ্রয় লইয়া স্বচ্ছন্দ ভাবে, গা খুলিয়া বিহার করিয়া বেড়াই ও হাওয়া খাই।

সম্বন্ধ অবশ্য সেইখানে মুখ্যতর, যেখানে ঘনিষ্ঠতা অধিক, সেখানে কারবার, নিত্য আদান প্রদান বেশী। সুতরাং আমি-ছাড়া সমগ্র জগতের মধ্যে, অর্থাৎ সমগ্র তোমার মধ্যে প্রথমে দাঁড়ায় আমি, পরে পুত্র পরিবার লইয়া মানবজাতি, পরে জীবসমূহ লইয়া জড়জগৎ, ও সর্ব্বশেষে আমার, সর্ব্বতোভাবে আমার রচিত ও কল্পিত মানসরাজ্য।

এই ভাবে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধনির্ণয়ে আমার জীবন। এই সম্বন্ধনির্ণয় হইতে ধর্ম্মের ব্যবস্থা। সুতরাং ধর্ম্মের সহিত জীবনের বন্ধন।

কিন্তু ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে অদ্যাপি। অথবা মানব সমাজের আদি হইতে আজি পর্য্যন্ত। কেন না, তোমাতে আমাতে এক, অভিন্ন, অথচ তোমা হইতে আমি স্বতন্ত্র। মূলে বিরোধ। উপরে বলিয়াছি প্রকৃতির খেলা। বিরোধ বড় যেমন তেমন নহে! তুমি আমার, অথচ তুমি আমার নহ। তোমায় আমায় অভেদ; অতএব তোমার উৎকর্ষে আমার উৎকর্ষ, তোমার ভালয় আমার ভাল; আমার অভিব্যক্তিতে তোমার অভিব্যক্তি। অথচ অন্য দিকে দেখিলে, তোমার স্বার্থে আমার অনর্থ; তোমার অমঙ্গলে আমার মঙ্গল; তুমিই আমার একমাত্র শত্রু। মিথ্যা কথা নহে; মানব-জীবনে এইটা প্রকাণ্ড সত্য।

অধিক কথা বলিতে হইবে না। মাতার শোণিত শোষণ করিয়া সন্তানের দেহের পুষ্টি। তোমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিতে গেলে আমার দেহ রহে না। আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া না লইলে তোমার চলে না, তাই তুমি

আমার ছিদ্র অন্বেষণে নিরত। আমি পরম শত্রু তোমা হইতে আত্মরক্ষণে সর্ব্বদা নিরত। সমগ্র জীবসমষ্টি আমাকে উদরসাৎ করিবার জন্য লোল জিহ্বা বাহির করিয়া আছে, সমগ্র জড় জগৎ আমার আমিত্বকে শূন্যত্বে লীন করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। পদস্খলন আর মৃত্যু। ইহার নাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন; ইহা হইতে অভিব্যক্তি। ইহার নাম ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, কপটতা, ক্রোধ, হিংসা, রক্তপাত। কিন্তু ইহা হইতেই স্নেহ, মায়া, বাৎসল্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম। ইহার নাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, ইহার নাম প্রকৃতির লীলা। ইহার উপরে তোমার আমার হাত নাই।

তুমি আমার মিত্র ও তুমি আমার ঘোর শত্রু। তোমাকে লইয়া আমি। তোমাকে ছাড়িলে আমার কিছু থাকে না; অথচ তোমা হইতে স্বতন্ত্র ভাবেই আমার অস্তিত্ব; তোমার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়াই আমার জীবনের ব্রত। এরূপ ক্ষেত্রে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধনির্ণয়ই সমস্যা; তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্যনির্ণয়ই আমার জীবন। সেই সম্বন্ধনির্ণয় ও কর্ত্তব্যনির্ণয়ের অপর নাম ধর্ম্মব্যবস্থা।

তোমার প্রতি কর্ত্তব্য,—ইহার অর্থ আমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য; আমার জ্ঞাতি, জ্ঞাতি, বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য; মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য; জীব ও জড়ের উপর কর্ত্তব্য, ও আমার আশা ভয় স্বপ্ন কল্পনার প্রতি কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের সমষ্টি ধর্ম্ম। মূলে বিরোধ; সামঞ্জস্যের অভাব। ধর্ম্ম সামঞ্জস্য-স্থাপনের উপায়। ধর্ম্মের গতি সামঞ্জস্যের পূর্ণতার অভিমুখে। নেত্রী প্রকৃতি। শাসনদণ্ড প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। পথ দুর্গম, পিচ্ছিল। পাঁচটা পথ পাঁচ দিক হইতে আসিয়া মহা বিভ্রাট বাধায়। মনুষ্য কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,—কোন পথে যাই?

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

শিকারী।

রূপক।

কোনও উপত্যকায় এক শিকারী ছিল। সে প্রতি দিন অরণ্যে বন্যপক্ষী শিকার করিতে যাইত। ঘটনাক্রমে এক দিন সে একটি বড় হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়াছিল। সে ঘাসের উপর দাঁড়াইয়া পাখীদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে তাহার উপর একটা ছায়া পড়িল, এবং সে জলে কিসের একটি প্রতি-

বিম্ব দেখিতে পাইল। সে আকাশের দিকে চাহিল, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। তাহার পর আর এক বার জলে সেই প্রতিবিম্ব দেখিবার জন্য তাহার হৃদয়ে প্রবল বাসনা জন্মিল। সে সমস্ত দিন (সাগ্রহে) প্রতীক্ষায় রহিল। রাত্রি দেখা দিল, কিন্তু ছায়া আর ফিরিল না। তখন বিষণ্ণ শিকারী শূন্য থলী লইয়া নীরবে গৃহে গেল। তাহার সঙ্গীরা কারণ জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিন্তু সে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিল না। একাকী চিন্তিত হৃদয়ে বসিয়া রহিল। শেষে তাহার এক বন্ধু আসিলে, শিকারী কথা কহিল।

সে বলিল, "আমি আগে আর যাহা দেখি নাই, আজ তাহা দেখিয়াছি — এক বিরাট শুভ্রপক্ষী রজতপক্ষ বিস্তার করিয়া অনন্ত নীলিমায় ভাসিয়া যাইতেছে। এখনও আমার বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছে। উহা জলে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব—একটা উজ্জ্বল বিভা, একটা দ্যুতি মাত্র। আমি তাহাকে ধরিতে চাই, পৃথিবীতে আমার আর কোনও ইচ্ছা নাই।"

শিকারীর বন্ধু হাসিল। বলিল, "উহা হয় তোমারই মস্তকের ছায়া, নয় কোনও কিরণ জলে খেলিতেছিল। কাল তুমি তাহার কথা ভুলিয়া যাইবে।"

কিন্তু কত কাল কাটিয়া গেল, শিকারী একাকী ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্ষুদ্র বনানী ও গহন অরণ্যে, হ্রদের ধারে এবং তৃণভূমির মধ্যে অন্বেষণ করে, কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পায় না। সে আর পাখী মারিত না। পাখী লইয়া সে আর কি করিবে? তাহার সহচরেরা বলাবলি করিত, "উহার কি কষ্ট?"

এক জন বলিল, "ও পাগল!" আর এক জন কহিল, "না, হে পাগল নয়—ও পাগলের বাড়া; আমারা যাহা কখনও দেখি নাই, ও তাহা দেখিতে চায়, এবং আপনাকে একটা আশ্চর্য্য করিয়া তুলিবার ইচ্ছা করে।"

সকলে কহিল, "এস আমরা উহার সংসর্গ ত্যাগ করি।"

সুতরাং শিকারী একাকী বেড়াইতে লাগিল।

একদা রাত্রিকালে সে ব্যথিতহৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময়ে এক বৃদ্ধ আসিয়া তাহার সম্মুখে দাড়াইলেন। তিনি দেখিতে সাধারণ মানবসন্তানের অপেক্ষা দীর্ঘায়ত ও মহান্।

শিকারী জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

প্রাচীন উত্তর করিল, "আমি বিবেক। কেহ কেহ আমাকে জ্ঞান বলে। এই উপত্যকায় আমি চিরজীবন অতিবাহিত করিতেছি। কিন্তু খুব দুঃখ না পাইলে, আমায় কেহ দেখিতে পায় না। যে নয়ন অশ্রুজলে বিধৌত হইয়াছে,

তাহাই আমায় দেখিতে পায়, এবং যে অনেক যাতনা সহিয়াছে, আমি তাহার সহিত কথা কহি।"

শিকারী চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি এতদিন এখানে বাস করিতেছ, আমায় বল, কি সেই বিরাট বিহঙ্গম—আমি যাহা নীলিমায় উড়িতে দেখিয়াছি? সকলে আমায় বিশ্বাস করিতে বলে যে, উহা স্বপ্ন,—আমার নিজের মাথার ছায়া।"

বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিলেন।

"তাহার নাম সত্য। যে একবার তাহাকে দেখিতে পায়, সে আর কখনও স্থির হইতে পারে না। মরণ পর্য্যন্ত সে সত্যের কামনা করে।" শিকারী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওগো বল, কোথায় আমি তাহার দেখা পাইব?"

"তুমি এখনও তত সহ্য কর নাই।" এই বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন।

তখন সে হৃদয় হইতে কল্পনার "মাকু" বাহির করিয়া, তাহাতে বাসনার সুতা জড়াইল। এবং সমস্ত রাত্রি বসিয়া জাল বুনিতে লাগিল।

প্রভাতে সেই কনকময় জাল ভূতলে পাতিয়া রাখিল, এবং তাহাতে কতিপয় বিশ্বাসপ্রবণতার শস্য ছড়াইয়া দিল। এই শস্য সে তাহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিল। এবং তদবধি বুকের পকেটে রক্ষা করিত। শস্যগুলি ছত্রাককোরকের মত শুভ্র, এবং কেহ দলিত করিলে তাহা হইতে পিঙ্গলবর্ণ রেণু বাহির হইত। তাহার পর শিকারী কি ঘটে দেখিবার জন্য বসিয়া রহিল। প্রথমে একটি তুষারধবল বিহগ জালে পড়িল; তাহার চক্ষু বনকপোতের ন্যায়—সে একটি সুন্দর গান গাহিতেছিল—

"মানব-দেবতা! মানব-দেবতা! মানব-দেবতা!"

দ্বিতীয় বার যে পক্ষী আসিল, সে অসিতবর্ণ ও রহস্যময়; তাহার শ্যাম ও সুন্দর চক্ষু আত্মার গভীর অন্তঃপ্রদেশও দেখিতেছিল; সে কেবল গাহিতেছিল—"অমরতা!"

শিকারী তাহাদের তুলিয়া লইল; বলিল, "ইহারা নিশ্চয়ই সত্যের মহনীয় পরিবারের অন্তর্গত।"

তাহার পর হরিত ও কনকরঞ্জিত আর একটি পক্ষী আসিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে গাহিতে লাগিল, "মৃত্যুর পর পুরস্কার! মৃত্যুর পর পুরস্কার!"

শিকারী বলিল, "তুমি তত সুন্দর নও, কিন্তু তবুও তুমি সুন্দর।" এই বলিয়া সে তাহাকেও গ্রহণ করিল।

তৎক্ষণ সকল শস্য নিঃশেষিত না হইল, ততক্ষণ আরও অনেক বিচিত্রবর্ণ আসিয়াছিল, এবং মনোরম গান গাহিয়াছিল।

শিকারী সকল পাখীগুলি একত্রিত করিল, এবং একটি সুদৃঢ় লৌহপিঞ্জর গড়িল; তাহার নাম—"নূতন ধর্ম্মবিশ্বাস।" সকল পাখীগুলি সেই পিঞ্জরে রাখিয়া দিল।

তখন লোকসমূহ নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে তথায় আসিল; তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "সুখী শিকারী! কি অদ্ভুত লোক! আহা কি সুন্দর পাখীগুলি! কি চমৎকার গান!"

কেহ জিজ্ঞাসা করিল না কোথাকার পাখী, বা কেমন করিয়া তাহারা ধৃত হইল। কেবল সকলে পাখীগুলির সম্মুখে নাচিতে গাহিতে লাগিল। শিকারীও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। সে বলিল, "নিশ্চয় ইহাদের ভিতর সত্য আছে। নিশ্চয়ই সে পক্ষ পরিবর্ত্তন করিবে, এবং আমি তাহার তুহিনধবল রূপ দেখিতে পাইব।"

দিন যায়, লোকে তেমনি নাচে গায়; কিন্তু শিকারীর হৃদয় ভার হইয়া আসিতে লাগিল। সে বুড়ার মত হইয়া চলিত, এবং কাঁদিতে বসিত। পুনরায় সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। একদিন সে একাকী বসিয়া কাঁদিতেছে, এমন সময় বিবেক আসিয়া দেখা দিলেন। সে যাহা যাহা করিয়াছিল, বৃদ্ধকে তাহা বলিল।

বিবেক বিষণ্ণভাবে একটু হাসিলেন; কহিলেন, "অনেক লোক সত্যকে ধরিবার জন্য ঐরূপ জাল পাতিয়াছে, কিন্তু কখনও সত্যের সন্ধান পায় নাই। বিশ্বাসপ্রবণতার শস্য সত্যের আহার্য্য নহে, ইচ্ছার জালেও তাহার চরণে ফাঁদ পরান যায় না; এই সকল উপত্যকার বায়ুতে সত্য নিশ্বাস গ্রহণ করেন না। তুমি যে সকল বিহঙ্গ ধরিয়াছ, তাহারা মিথ্যার সন্তান। মনোরম, সুন্দর,—তবুও মিথ্যা বই আর কিছুই নহে। সত্য ইহাদের জানেনও না।"

শুনিয়া শিকারী দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, "তবে কি নিশ্চয়ই আমায় নিশ্চল বসিয়া থাকিতে হইবে, এবং এই জলন্ত আগুন আমায় পুড়াইয়া গ্রাস করিবে?"

প্রাচীন বলিলেন, "শোন, তুমি অনেক সহিয়াছ, অনেক কাঁদিয়াছ; আমি যাহা জানি, তোমায় বলিব। যে সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাকে চিরকালের জন্য এই কুসংস্কারের উপত্যকা পরিত্যাগ করিতে হইবে, এখান-

কার কিছুই সঙ্গে থাকিলে চলিবে না। তাহাকে একাকী নিরবচ্ছিন্ন নাস্তিত্ব ও অস্বীকারের দেশে যাইতে হইবে, তথায় বাস করিতে হইবে। সে [illegible] ভবনে বাধা দিবে। যখন আলোক প্রকাশিত হইবে, তখন সে উঠিবে, এবং সেই আলোর অনুসরণ করিয়া নীরস সূর্য্যকিরণের দেশে যাত্রা করিবে। তাহার সম্মুখে কঠোর বাস্তবের পর্ব্বতমালা আবির্ভূত হইবে, সত্যের অন্বেষীকে সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হইবে, তাহাদের পরপারে সত্যের অধিষ্ঠান।"

শিকারী বলিয়া উঠিল, "এবং সে তাহাকে ধরিবে, স্বহস্তে তাহাকে ধরিবে।"

বিবেক মাথা নাড়িলেন। "সে তাহাকে কখনও দেখিতে পাইবে না, কখনও ধরিতে পারিবে না। তখনও সে সময় নহে।"

শিকারী চীৎকার করিয়া বলিল, "তবে আর আশা নাই?"

বিবেক বলিলেন, "কতকগুলি লোক ঐ সকল পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিল, এবং অনাবৃত শিলারাশির পর শিলারাশি অতিক্রম করিতে করিতে সেই উচ্চ প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ, সত্যের পক্ষবিচ্যুত একটি শুভ্র কপোত পালক ঘটনাক্রমে কুড়াইয়া পাইয়াছিল। এক সময়ে—" ভবিষ্যদ্বক্তার মত আপনাকে উন্নমিত করিয়া, এবং আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এক সময়ে এইরূপ পর্য্যাপ্ত রজত-পক্ষ মানবের হস্তে সংগৃহীত হইয়া একটি রজ্জুরূপে পরিণত হইবে, এবং সেই রজ্জু দিয়া একটি জাল রচিত হইবে। তখন সেই জালে সত্যকে ধরা যাইতে পারে। সত্য ভিন্ন আর কিছুই সত্যকে ধরিতে পারে না।"

শিকারী গাত্রোত্থান করিল; কহিল, "আমি যাইব।" কিন্তু বিবেক বাধা দিল; "ভাল করিয়া লক্ষ্য কর—যে একবার এই উপত্যকা ত্যাগ করে, সে আর কখন ফেরে না। যদি সে সীমায় আসিয়া সাত দিন সাত রাত্রি শোণিত-সম অশ্রু বিসর্জ্জন করে, তবুও এই উপত্যকার আর পদক্ষেপ করিতে পায় না। তুমি যে পথে ভ্রমণ করিবে, সেখানে কোনও পুরস্কার নাই। যে যায়, তাহার হৃদয়ে যে মহৎ প্রেম থাকে, সেই প্রেমের জন্যই সে স্বাধীন ভাবে চলিয়া যায়। কার্য্যই তাহার পুরস্কার।"

শিকারী বলিল, "আমি চলিলাম, কিন্তু পর্ব্বতের উপর কোন্ পথ অবলম্বন করিব, বল?"

প্রাচীন কহিলেন, "আমি বহুযুগসঞ্চিত জ্ঞানের সন্তান। বহুলোক যে পথে চলিয়াছে, আমি কেবল সেই পথেই ভ্রমণ করিতে পারি। বেশী লোক ঐ পর্ব্বতে চলে নাই। প্রত্যেকেই নিজের পথ নিজে করিয়া লইয়াছে, সকলেই নিজের দায়িত্বে নিজে যায়; আমার স্বর সে আর শুনিতে পায় না। আমি যাত্রীর অনুসরণ করিতে পারি, কিন্তু তাহার অগ্রে গমন করিতে পারি না।"

এই বলিয়া বিবেক অন্তর্হিত হইলেন।

শিকারী ফিরিল, সেই পিঞ্জরের কাছে গেল, হাত দিয়া পিঞ্জরের শলাকা ভাঙ্গিয়া দিল; বন্ধুর লৌহে তাহার হাতের মাংস ছিঁড়িয়া গেল। কখনও কখনও ভাঙ্গার চেয়ে গড়া সহজ।

একে একে সে চিত্র বিচিত্র পক্ষীগুলি ধরিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিল। যখন সে সেই অসিতপক্ষ পক্ষীর কাছে গেল, এবং তাহাকে ধরিয়া উহার সুন্দর চক্ষু দেখিতে লাগিল, এবং পাখীটি মৃদু গভীর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল—"অমরতা!"—তখন সে তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি ইহাকে ছাড়িতে পারি না, এ পাখীটি তত ভারি নহে, কিছু খায়ও না, আমি ইহাকে বুকে লুকাইয়া রাখিব, ইহাকে আমি সঙ্গে লইব।" সে পাখীটি বুকে রাখিয়া ও নিজের পরিচ্ছদ দিয়া ঢাকিয়া লইল।

কিন্তু সেই প্রচ্ছন্ন পদার্থ ক্রমে ভারি হইতে লাগিল, ভারি—আরও ভারি, ক্রমে তাহার বুকে সিসের মত গুরুভার বোধ হইতে লাগিল। সে উহা লইয়া আর নড়িতে পারে না। উহাকে লইয়া সে এই উপত্যকা ছাড়িয়া যাইতে পারে না। তখন সে আবার পাখীটি বাহির করিল ও দেখিতে লাগিল।

"হে সুন্দর! হে আমার হৃদয়ের আপনার! আমি কি তোমায় বাধিব না?"

সে বিষণ্ণচিত্তে আপনার হাত মুক্ত করিল। বলিল, "যাও; হইতে পারে, সত্যের একটি গানের সুর হয় ত তোমার মত; কিন্তু আমি আর কখনও শুনিতে পাইব না।"

অত্যন্ত দুঃখে সে নিজের হস্ত উন্মুক্ত করিল, এবং পাখীটি চিরকালের মত তাহার কাছ হইতে উড়িয়া গেল।

তাহার পর, সে কল্পনার মাকু হইতে বাসনার সুতা খুলিয়া লইয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল, এবং শূন্য মাকুটি নিজের বুকে রাখিয়া দিল; কারণ, সূত্র এই উপত্যকায় প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু মাকুটি কে জানে কোন অজানা দেশের সামগ্রী। সে যাইবার জন্য ফিরিল, সেই সময় লোকসমূহ তর্জ্জন করিতে করিতে

তাহার নিকট আসিয়া পড়িল। তাহারা গর্জ্জন করিতে লাগিল, "মূর্খ, কুকুর, বদ্ধ পাগল! কোন্ সাহসে তুই পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পাখীগুলি উড়াইয়া দিলি?"

শিকারী বলিল, কিন্তু তাহারা শুনিতে চাহিল না; বলিতে লাগিল, "সত্য! কে সে? তুমি তাহাকে ভোজন পান করিতে পার? কেহ কখনও তাহাকে দেখিয়াছে? তোমার পাখীগুলি বাস্তব পদার্থ ছিল, সকলে তাহাদের গান শুনিতে পাইত! আঃ মূর্খ! ক্রুর সর্প! নাস্তিক! তুমি বায়ু দূষিত করিতেছ।"

কেহ কেহ বলিল, "এস! আমরা উহাকে পাথর ছুড়িয়া মারি।"

আর জন কতক বলিল, "আমাদের দরকার কি? হতভাগ্য মূর্খটাকে যাইতে দাও।" এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। অবশিষ্ট সকলে পাথর ও কাদা কুড়াইয়া তাহাকে ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। অবশেষে শিকারী আহত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া অতি কষ্টে বনে প্রবেশ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে; অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। সে তখন সেই দেশের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল,—যেখানে চিরকালই নিশীথিনী; সে তথায় প্রবেশ করিল। তথায় আলোক ছিল না, সে অন্ধকারে হাঁতড়াইতে লাগিল। সে যেমন ধরিতেছিল, অমনি বৃক্ষের শাখাগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, ভস্মাবৃত ভূতলে পদক্ষেপ করিবা মাত্র তাহার চরণ ডুবিয়া যাইতেছিল, এবং অদৃশ্য সূক্ষ্ম ভস্মের মেঘ উড়িয়া আসিয়া তাহার মুখে লাগিতেছিল। সুতরাং, সে উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া এক খণ্ড পাষাণের উপর বসিয়া রহিল। সেই নাস্তিবাদ ও অস্বীকারের দেশে, পূর্ব্বকথিত আলোকের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল—তাহার হৃদয়েও।

তাহার বাম ও দক্ষিণের জলা হইতে শীতল কুয়াসা উঠিয়া, তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারে অননুভবনীয় সূক্ষ্ম বৃষ্টিধারা পতিত হইতেছিল, বড় বড় জলকণাসমূহ তাহার কেশে ও বসনে জমিতেছিল। তাহার হৃদয় ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছিল, একটা অবশভাব অতর্কিত ভাবে তাহার অবয়বে প্রবেশ করিতেছিল। উপরে চাহিতেই—দুটি আনন্দময় আলোক নাচিতে নাচিতে আসিতেছিল; সে আলো দেখিতে মাথা তুলিল, কাছে,—কাছে আলো আসিতেছিল, কেমন উষ্ণ, কেমন উজ্জ্বল,—আলো দুটি অগ্নিময় নক্ষত্রের মত নাচিতেছিল। অবশেষে তাহারা শিকারীর সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। তন্মধ্যে একটির জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বল জ্বালার মধ্যবিন্দু হইতে একটি রমণীর সস্মিতমুখ চাহিয়াছিল—হাসিতে গালে টোল পড়িয়াছে—মস্তকে কন-

কপীত কেশভাবের প্রবাহ। অপর আলোকের কেন্দ্রস্থলে আনন্দময় হাসির ক্ষুদ্র তটিনী—যেন সুরাপূর্ণ পানপাত্রের উপর মধুর বুদ্‌বুদ্‌ ধ্বনি। তাহারা শিকারীর সম্মুখে নাচিতেছিল।

শিকারী জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমরা? কে এই অন্ধকারে এই বিজনে দুজনে আমার কাছে আসিয়াছ?"

তাহারা বলিল, "আমরা দুই জন যমজ ভগিনী লালসা; মানব স্বভাব আমাদের পিতা, অতিশয়তা আমাদের মাতা। যেমন এই পর্ব্বতগণ ও নদী-মালা, যেমন সেই প্রথম মনুষ্য, আমরাও তেমনই প্রাচীন; আমাদের মৃত্যু নাই।" তাহারা হাসিতে লাগিল।

প্রথমা কহিল, "আমার বাহু দিয়া তোমায় জড়াইতে দাও। আমার বাহু কোমল ও উষ্ণ। তোমার হৃদয় শীতল ও স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়াছে; এস, আবার আমি স্পন্দিত করিয়া দিই। এস, আমার কাছে এস।

দ্বিতীয়া কহিল, "এস তোমাতে আমার তপ্তজীবন ঢালিয়া দিই। এখন তোমার মস্তিষ্ক অবশ, অবয়ব মৃতদেহের ন্যায়; কিন্তু তাহারা একটা ভীষণ স্বাধীন জীবনের সঙ্গে বাঁচিতে পারে। দাও, আমায় ঢালিতে দাও।"

উভয়ে কহিল, "আমাদের অনুসরণ কর, আমাদের সহিত বাস কর, তোমার অপেক্ষা অনেক উন্নত হৃদয় এইখানে এই অন্ধকারে বসিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছে, তাহারা আমাদের কাছে আসিয়াছে এবং আমরা তাহাদের কাছে গিয়াছি। তাহারা কখনও আমাদের পরিত্যাগ করে নাই—কখনও না। আর সব ভ্রান্তিময় দৃষ্টিবিভ্রম, কেবল আমরাই প্রকৃত,—কেবল আমরাই বাস্তব। সত্য ছায়া মাত্র; কুসংস্কারের উপত্যকা সকল কেবল প্রহসন; পৃথিবী ভস্ম-ময়ী; তরুগণ জীর্ণ; কিন্তু আমরা—অনুভব করিয়া দেখ—আমরা বাঁচিয়া আছি! তুমি আমাদিগকে সন্দেহ করিতে পার না। অনুভব কর, আমরা কত উষ্ণ। এস, আমাদের সঙ্গে এস; এস, আমাদের কাছে এস।"

তাহারা শিকারীর মস্তকের উপর চারি দিকে কাছে কাছে ঘুরিতে লাগিল, তাহার ললাটে শীতল বিন্দু সকল গলিতেছিল। উজ্জ্বল আলো তাহার চক্ষে আসিয়া বিঁধিতেছিল, তাহাতে তাহার ধাঁধা লাগিতেছিল, এবং জমাট রক্ত ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে বলিল, "হাঁ, কেন আমি এখানে,—এই অদ্ভুত অন্ধতমসে মরিব? উহারা কেমন উত্তপ্ত, আমার জমাট রক্ত উহা-

দেবই কল্যাণে বিগলিত হইয়াছে।" সে তাহাদের গ্রহণ করিবার জন্য পাণি-দ্বয় প্রসারিত করিল। তখন মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার সম্মুখে, তাহার চিরপ্রেমাস্পদ বস্তুর প্রতিমা আবির্ভূত হইল, তাহার দুটি হাত দুই পাশে ঝুলিয়া পড়িল।

তাহারা ডাকিল, "আমাদের কাছে এস।" কিন্তু সে তাহার মুখ ঢাকিল। কহিল, "তোমরা আমার চোখ ঝলসিয়া দিতেছ, তোমরা আমার হৃদয় প্রতপ্ত করিয়া তুলিতেছ; কিন্তু আমি যাহা চাহি, তোমরা তাহা দিতে পারিবে না। আমি এইখানে অপেক্ষা করিব—যতক্ষণ না মরি, এইখানে আমি অপেক্ষায় রহিব। যাও!"

শিকারী হাত দিয়া আপনার মুখ ঢাকিল, এবং আর কিছু শুনিতে চাহিল না। যখন সে আবার মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন আলো দুটি দূরে তিরোহিত হইয়া গিয়া দুটি নক্ষত্রের মত মিট্ মিট্ করিতেছিল।

দীর্ঘ—সুদীর্ঘ রজনী গড়াইয়া যাইতে লাগিল।

যাহারা কুসংস্কারের উপত্যকা পরিত্যাগ করিয়া আসে, তাহাদের সকল-কেই এই অন্ধকারের রাজ্য অতিক্রম করিতে হয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ কতিপয় দিবসের মধ্যে এ রাজ্যের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, কেহ কেহ সেখানে মাসের পর মাস, কেহ কেহ বৎসরের পর বৎসর বিলম্ব করে; কেহ কেহ সেইখানেই মরিয়া যায়। অবশেষে দিক্‌চক্রবালের ক্রোড়ে একটি মলিন আলোক দেখা দিল। শিকারী উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিল। শেষে শিকারী সেই আলোর নিকট পৌঁছিল, এবং উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণপ্রভাসিত প্রদেশে পদার্পণ করিল। তখন তাহার সম্মুখে প্রকৃত ও বাস্তবের শক্তিশালী পর্ব্বত-মালা আবির্ভূত হইল। তাহাদের উপর পরিষ্কার সূর্য্যরশ্মি খেলা করিতেছে, এবং শিখরগুলি মেঘমালার মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। গিরিপদমূলে অনেক পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। একটা মহানন্দপূর্ণ চীৎকারধ্বনি শিকারীর হৃদয় হইতে সবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে সর্ব্বাপেক্ষা সরলতম পথ বাছিয়া লইয়া পর্ব্বতারোহণে প্রবৃত্ত হইল। পর্ব্বতের সানু, কন্দর, শিলারাশি তাহার গানে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তাহারা বাড়াইয়া বলিয়াছিল;—ফলতঃ ইহা তত উচ্চ নয়, পথও তত দুর্গম ও ভীষণ নহে। কতিপয় দিন, কতিপয় সপ্তাহ, বড় জোর কতিপয় মাস,—তাহার পর ঐ পর্ব্বতের চূড়া! কেবল যে একটি মাত্র পক্ষ কুড়াইয়া পাইবে, এমন নহে; অন্য লোকে যত পক্ষ কুড়াইয়া পাই-য়াছিল, সে তৎসমুদয়ও সংগ্রহ করিবে—জাল বুনিবে—সত্যকে ধরিবে—

তাহাকে দৃঢ় করিয়া ধরিবে—নিজের হাত দিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে—তাহাকে জড়াইয়া ধরিবে!

সে আনন্দপূর্ণ সূর্য্যকিরণে হাসিতেছিল, উচ্চতানে গাহিতেছিল। বিজয় বড় নিকটে। তৎসত্ত্বেও কিছুক্ষণের পর পথ ঋজু হইয়া উঠিল, আরোহণ করিতে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, গান মরিয়া গেল। দক্ষিণে ও বামে তৃণলতাশৈবালশূন্য প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ড দেখা দিতেছিল। আগ্নেয়নিঃস্রবতুল্য ভূমি হাঁ করিয়া ছিল। সে এখানে সেখানে ধবল অস্থিরাশির আভা দেখিতেছিল। এখন পথ ক্রমে আরও চিহ্নবিহীন হইয়া আসিতে লাগিল; ক্রমে ইতস্ততঃ দুই একটি পদাঙ্কযুক্ত চিহ্নমাত্রে পরিণত হইল; তাহার পর একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। সে আর গান গাহিল না, নিজের পথ নিজে করিয়া লইতে লাগিল। ক্রমে সে এক মসৃণ, অনবচ্ছিন্ন প্রাচীরের নিকট উপনীত হইল—যত দূর চক্ষু যায়, কেবল সেই প্রাচীরের বিস্তৃতি। সে বীরের মত কহিল, "আমি এই প্রাচীরের ধারে সোপান গড়িব। একবার এই প্রাচীরে আরোহণ করিতে পারিলে আমি ইহার ভিতরে গিয়াছি আর কি।" এই বলিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সে তাহার কল্পনায় মাকু দিয়া পাষাণ খুঁড়িয়া তুলিতে লাগিল; কিন্তু অর্দ্ধেক পাষাণরাশি কার্য্যোপযোগী হইল না, এবং আধ মাসের পরিশ্রমের গঠন গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গেল; কারণ, বনিয়াদের পাথর ভাল করিয়া নির্ব্বাচন করা হয় নাই। কিন্তু শিকারী গড়িয়া চলিল, সে সর্ব্বদা মনে মনে বলিত,—"একবার এই প্রাচীরে আরোহণ করিলে আমি উহার ভিতরে গিয়াছি বলিলেই হয়। কেবল এই মহৎ কার্য্য শেষ!"

অবশেষে সে প্রাচীরের উপর উঠিল, এবং চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। বহু নিম্নে কুসংস্কারের উপত্যকার উপরে শ্বেত কুয়াসা দুলিতেছিল, এবং তাহার নিজের উপর পর্ব্বতের চূড়া সকল দুর্গশিখরবৎ বোধ হইতেছিল। পূর্ব্বে তাহাদের অনুন্নত বোধ হইয়াছিল, এখন দেখা গেল, তাহাদের উচ্চতার পরিমাণ করা যায় না। চূড়া হইতে মূল পর্য্যন্ত পাষাণ প্রাকারে বেষ্টিত স্তরের পর স্তর বৃত্তাকারে মহাপ্রভাবে উঠিয়াছে। তাহার পর অনন্ত সূর্য্যরশ্মির লীলা। সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; ভূমিতে মুখ লুটাইয়া পড়িয়া রহিল, যখন উঠিল, তখন তাহার মুখ শ্বেত হইয়া গিয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন নীরবে সে চলিতে লাগিল, সে এখন অত্যন্ত নীরব হইয়াছে। উপত্যকার যাহাদের জন্য, তাহাদের পক্ষে এই উচ্চ রাজ্যের তরল বায়ুতে নিশ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহ করা বড় কঠোর,

প্রত্যেক নিশ্বাস তাহাকে আহত করিতে লাগিল। তাহার নখের কোণ হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল। পরবর্ত্তী প্রাকারের সম্মুখে সে আবার কার্য্য আরম্ভ করিল। ইহার উচ্চতা অসীম বলিয়া বোধ হইল; সে একটিও কথা কহিল না। সে লৌহবৎ পাষাণ কাটিয়া সোপান গঠিতে লাগিল। দিনরাত্রি কেবল তাহার যন্ত্রের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। কত বৎসর চলিয়া গেল, তবুও সে সোপান গড়িতে লাগিল, কিন্তু পাষাণ প্রাকার তবুও গগন ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল! কখন কখন সে প্রার্থনা করিত, এই অনাবৃত পাষাণ প্রাকারের উপর একটি ক্ষুদ্র শৈবাল কি বনলতা উৎপন্ন হউক—সে তবু একটা সঙ্গী পাইবে; কিন্তু তাহা কখনও ঘটিল না।

বৎসর ঘুরিয়া যাইতে লাগিল, সে যে কয়টি সোপান কাটিয়াছিল, তাহা দিয়া বৎসর গণিত—এক বৎসরে গুটিকত মাত্র—কেবল গুটিকতক। সে আর গাহিত না,—সে আর কিছু বলিত না,—সে আর বলিত না যে,—"এটা করিব বা ওটা করিব"—কেবল কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিত। নিশীথে—যখন গোধূলির আলো নিবিয়া যাইত, তখন সেখানে পর্ব্বতের গুহামুখ ও ছিদ্র হইতে অসংখ্য অদ্ভুত ও ভীষণ মুখ আবির্ভূত হইত; তাহারা চীৎকার করিয়া বলিত, "ওহে সঙ্গীহীন মানব! তোমার কাজ বন্ধ কর, আমাদের সহিত কথা কও।" সে উত্তর করিত, "কার্য্যেই আমার মুক্তি; যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য আমি কর্ম্ম হইতে বিরত হই, তোমরা এখনই আমার উপর আসিয়া পড়িবে।" তাহারা লম্বা গলা আরও দূরে বাড়াইয়া দিয়া বলিত, "তোমার পদতলে ঐ পাষাণছিদ্রের ভিতর চাহিয়া দেখ,—দেখ, ওখানে কি পড়িয়া আছে—শ্বেত অস্থিরাশি! তুমি যেমন এই পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছ, সেও তেমনই সাহসী ও দৃঢ়কায় ছিল। সে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল, বুঝিয়াছিল, এখানে চেষ্টার কোনও ফল নাই; সে কখনও সত্যকে ধরিতে পারিবে না, কখনও তাহাকে দেখিতে পাইবে না, কখনও তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না। সে বড় ক্লান্ত হইয়াছিল বলিয়া এখানে শুইয়া পড়িয়াছিল। সে চিরজন্মের মত নিদ্রিত হইয়াছে, সে আপনাকে ঘুম পাড়াইয়াছে। নিদ্রায় বড় শান্তি। নিদ্রাবস্থায় তুমি আর সঙ্গীহীন নও, তখন তোমার হৃদয় কি হৃদয় আর ব্যথিত হইবে না।" শিকারী শুধু হাসিত।

"আমি যে প্রিয়তম সকল বস্তু হৃদয় হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি, একাকী চিররাত্রির দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, প্রলোভন অতিক্রম করিয়াছি, যেখানে

আমার স্বজাতীয় জীবের কণ্ঠধ্বনিও শুনা যায় না, সেখানে বাস করিয়াছি, একাকী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি, সে কি এইখানে শয়ন করিবার জন্য—তোমাদের আহার্য্য হইবার জন্য? তোমরা রক্তশোষী!"

সে বিকট হাস্য করিল, এবং নিরাশার প্রতিধ্বনি দূরে অপসৃত হইল; কেন না বীরের হাস্য,—সবল চিত্ত, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুতুল্য।

তবুও তাহারা আবার তাহার দিকে চাহিতে লাগিল, কহিল, "তুমি কি জান, তোমার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, তোমার হাত শিশুর হাতের মত কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে? তুমি কি দেখিতেছ, তোমার মাকুর মুখ ভোঁতা হইয়া গিয়াছে? যদি তুমি কখনও এই সোপান বাহিয়া উঠিতে পার, সেই তোমার শেষ; তুমি কখনই আর একটার উঠিতে পাইবে না।"

"আমি জানি" এই বলিয়া সে আবার কাজে মন দিত।

জরাজীর্ণ শীর্ণ হস্তে সে ভাল করিয়া পাথর কাটিতে পারিত না; কেন না, তাহার অঙ্গুলিগুলি অবশ ও বক্র হইয়া গিয়াছিল। তাহার সৌন্দর্য্য ও শক্তি আর কিছুই ছিল না।

অবশেষে একটি জরাজীর্ণ, শুষ্ক, শীর্ণ মুখ পর্ব্বতের উপরেও চাহিয়া দেখিল। দেখিল, অনন্ত গিরিশ্রেণী প্রাচীর সহিত শুভ্র মেঘলোক পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; কিন্তু তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছিল। বৃদ্ধ শিকারী যেখানে কাজ করিয়া নিজের জীবন নিঃশেষিত করিয়াছিল, সেইখানে গিরিশৃঙ্গের পার্শ্বে শুইয়া পড়িল। অবসন্ন হাত দুটি ভাঁজ করিয়া রাখিল। অবশেষে নিদ্রার সময় আসিল। তাহার নীচে উপত্যকার উপরে ঘন কুয়াসা ভাসিতেছিল। একবার কুয়াসা একটু সরিয়া গেল; এবং তাহার অবকাশ দিয়া মুমূর্ষুর চক্ষু নীচে শৈশবের তরুরাজি ও ক্ষেত্রসমূহের দিকে চাহিয়া দেখিল, বোধ হইল, বহুদূর হইতে শিকারীর আপনার বন্যবিহগগুলির চীৎকারধ্বনি বহিয়া আসিতেছে। জনতার নৃত্যগীতের শব্দ যেন শুনিতে পাইল। সে ভাবিল, যেন তাহার পুরাতন সহচরদের কণ্ঠধ্বনিও শুনিতে পাইতেছে। সে দেখিল, বহুদূরে তাহার পূর্ব্বতন বাসগৃহের উপর সূর্য্যরশ্মি প্রতিভাসিত হইতেছে। তাহার নয়নকোণে বড় বড় অশ্রুবিন্দু জমিয়া আসিল, সে কাঁদিয়া বলিল, "যাহারা ওখানে মরে, তাহারা একলা মরে না।"

তাহার পর আবার কুয়াসার রাশি একত্র সংহিত হইল। সে তাহার চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

সে বলিল, "আমি খুঁজিয়াছি, বহু বৎসর আমি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু তবু আমি তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি বিশ্রাম করি নাই, আমি অনুশোচনা করি নাই, কিন্তু তবু আমি তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। এখন আমার শক্তি গিয়াছে। যেখানে আমি অবসন্ন ও উচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছি, সেখানে আবার নবীন ও সজীব নূতন লোক আসিয়া দাড়াইবে। আমি যে সোপান কাটিয়াছি, সেই সোপান বাহিয়া তাহারা উঠিবে; আমি যে সিঁড়ি করিয়াছি, তাহারা তাহাতে আরোহণ করিবে; যে ইহাদের গড়িয়াছে, তাহারা তাহার নামও জানিবে না। বিশ্রী গঠন দেখিয়া তাহারা হাসিবে; যখন পাষাণ গড়াইয়া পড়িবে, তখন তাহারা আমাকে অভিশাপ দিবে; কিন্তু তাহারা আমার কার্য্য দিয়াই আরোহণ করিবে, তাহারা আমারই রচিত সোপানশ্রেণী দিয়া উঠিবে, আমাকে দিয়া তাহারা তাহাকে পাইবে। কেহ শুধু নিজের জন্য জীবন ধারণ করে না; মরণের সময় জীবনের কার্য্যসমূহ আমিত্বের সহিত চলিয়া যায় না।" তাহার কুঞ্চিত চক্ষুর পাতার নীচে দিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। যদি সত্য তাহার উপর, মেঘমালায় আবির্ভূত হইতেন, এখন সে তাহা দেখিতে পাইত না; মরণের কুহেলিকা আসিয়া তাহার চক্ষু ঢাকিতেছিল।

সে বলিল, "আমি তাহাদের সানন্দ পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি; তাহারা আসিতেছে;—তাহারা উঠিবে,—উঠিবে!" সে তাহার কুঞ্চিত হস্ত চক্ষুর উপর উত্তোলন করিল।

তাহার পর, উপরের শুভ্র আকাশ হইতে শান্ত বায়ু বহিয়া, ধীরে ধীরে কি একটা নিম্নে পতিত হইতেছিল। তাহা ধীরে ধীরে মুমূর্ষুর বুকে পড়িল। সে হাত দিয়া অনুভব করিল। উহা একটি পালক। সে পালকটি ধরিয়া মরণের কোলে সুপ্ত হইল। (১)

---

(১) Olive Schreinerএর Dreams হইতে অনুবাদিত।

সহযোগী সাহিত্য।

রমণীর সম্মানে, শিক্ষায় এবং স্বাধীনতায়, পাশ্চাত্যেরা, প্রাচ্যদিগের অপেক্ষা ইদানীং উন্নত, অগ্রসর এবং শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অদ্যাপি পৃথিবীর কুত্রাপি, নারীজাতির প্রকৃত অধিকার সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্ত এবং স্বীকৃত না হইলেও, পাশ্চাত্য দেশে, তাহা কতক অংশে নির্ণীত হইয়া গিয়াছে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। নারীজাতির শিক্ষায়, সম্মানে, স্বাধীনতায় ও সত্বাধিকারপ্রদানে, সহযোগী পাশ্চাত্যজাতি প্রাচ্যদিগের শীর্ষস্থানীয় হইলেও, পাশ্চাত্য দেশে, রমণীদিগের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের পথ যে খুব প্রশস্ত, পরিষ্কৃত, সহজ এবং সুগম, তাহা নহে। পুরুষেরা এতকাল যে সকল কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, সে সকল কার্য্যে, আজ কাল রমণীদিগকে কিছু কিছু অধিকার দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু সে অধিকারের অধিকারিণী হইতে, রমণীদিগকে পুরুষদিগের সহিত সমানে প্রতিযোগিতা করিতে হয়। প্রতিযোগিতা প্রাণপণসাধ্য, প্রবল। স্ত্রীপুরুষে, যখন সমান অধিকার, তখন প্রতিযোগিতাও সমান হইবে, ইহা ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, গণিতবিজ্ঞানের গণনা; অতএব গ্রাহ্য। রমণী যখন পুরুষের সহিত সম অধিকারের আকাঙ্ক্ষিণী, তখন তাঁহার অংশে অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রদত্ত হইবে না, আর প্রদত্ত হইলেই বা তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন কেন? প্রতিযোগিতা অন্যায় নহে। কিন্তু, রমণীদিগের পক্ষে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের পথ কণ্টকাকীর্ণ করাও ন্যায়সঙ্গত নহে। কিন্তু প্রায়ই তাহা করা হইয়া থাকে, অন্ততঃ অবস্থার গতিকে সেরূপ ঘটে। যে কার্য্যে প্রবেশ করা পুরুষের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, পুরুষানুরূপ শিক্ষা ও দক্ষতা সত্ত্বেও সে কার্য্যে প্রবেশ লাভ করা রমণীর পক্ষে বিলক্ষণ কঠিন হয়। ইহা অন্যায়। অনেকে মনে করেন, রমণী কেবল রমণী বলিয়াই সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে, শিক্ষা বা পরীক্ষা-গৃহে অধিকতর অনুগ্রহ আকর্ষণ করিয়া থাকেন। হইতে পারে, স্থলবিশেষে এ কথা আংশিক সত্য; কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়ম নহে। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে, রমণী কেবল রমণী বলিয়াই, পুরুষানুরূপ শিক্ষা ও কার্য্যক্ষমতা সত্ত্বেও, সংসারের অনেক সুবিধা,—কার্য্যক্ষেত্রের অনেক অধিকার হইতে বঞ্চিত হন। অন্ততঃ সে সুবিধা ও সে অধিকার প্রাপ্ত হইতে, পুরুষ অপেক্ষা তাঁহাদিগকে তীব্রতর শ্রম ও কঠিনতর চেষ্টাচরিত্র করিতে হয়। তাহা করিয়াও অনেক সময় কার্য্যসিদ্ধি হয় না। স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের সাধারণ রাজপথে উঠিয়া রমণীকে অনেক আঘাতই সহিতে হয়, বিস্তর বিঘ্ন বিড়ম্বনাই ভুগিতে হয়। ইহা পুরুষের রমণীসম্মানের খুব একটা সুনাম বলা যায় না।

নারীজাতির সত্বাধিকার। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য।

স্ত্রী-পুরুষে প্রতিযোগিতা।

রমণী,—কার্য্য-ক্ষেত্রে।

রমণীর স্বাধীন জীবিকার পথ সুগম নহে।

নানা কারণে নারীজাতির পক্ষে কার্য্যক্ষেত্র কণ্টকাকীর্ণ। প্রধান কারণ, পুরুষের পরুষ ব্যবহার, অথবা পাশব ভাব। সুতরাং নারীজাতির স্বত্বাধিকারের জন্য এ যুগে সর্ব্বত্র আন্দোলন আলোচনা ও আড়ম্বরের ত্রুটী না হইলেও, রমণী আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। রমণীর প্রতি পুরুষের প্রকৃত সম্মান উৎপন্ন ও অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, রমণী কেবল হৃদয়ের বস্তুই থাকিবেন, হৃদয়ের বস্তু এবং গৃহস্থালীর অত্যাবশ্যক আসবাব বলিয়া যথাক্রমে পূজিত ও ব্যবহৃত হইবেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত সর্ব্বদিকপ্রসারিণী উন্নতি হইবে না।

নারীজাতির উন্নতির অন্তরায়।

সাধারণ কর্ম্মভূমির ন্যায়, সাহিত্য-ক্ষেত্রও, নারীজাতির পক্ষে সুবাস কুসুম-উদ্যান নহে। বিশেষতঃ, যে স্থলে সাহিত্য জীবিকা-বৃত্তি,—দৈনিক অন্নমুষ্টিসংগ্রহের উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত, সে স্থলে সাধারণতঃ নারীজনের উপর সানুকূল বায়ু, অতি অল্পই প্রবাহিত হয়। অদ্যাপি পাশ্চাত্য দেশেই যখন এই অবস্থা, তখন এ দেশের অবস্থা সহৃদয় ব্যক্তির কেবল অনুমেয়।

রমণী,—সাহিত্য-ক্ষেত্রে।

এক সময়ে এ দেশীয় লোক রমণীর সম্মান জানিত বটে, কিন্তু সে অতি পূর্ব্বকালে। তাহার এক আধ অক্ষর পুরাতন পুঁথির অজ্ঞাত কক্ষে লুক্কায়িত থাকিতে পারে, কিন্তু লোকের সজীব স্মৃতিতে তাহা আর নাই। বহুকাল হইতেই ছিল না। শাস্ত্রের যুগ, সংস্কৃত সাহিত্যের যুগ, বেদ বেদান্ত উপনিষদের যুগ, মুনি ঋষি মহাশয়দিগের যুগ এক কথায় তথাকথিত সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ, ভারতে মুসলমানী আমলের বহু বহু পূর্ব্বেই, মহাপ্রলয়ের অতলস্পর্শ গর্ভে বিলীন হইয়াছিল। আর্য্যত্ব আমাদের মাথার মণি, (৩৭প্রা:) সম্মান প্রদর্শন করিতে কেহই এই "সাহিত্য" পত্রের পরিচালকদিগের অপেক্ষা অধিক পারিবেন না। কিন্তু অনন্ত কাল পূর্ব্বের আর্য্য-ভাণ্ড এখনকার আবশ্যকীয় যাহা কিছু সবই প্রাপ্তব্য, এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি। বিশেষতঃ, সেই ভগ্ন, বহুস্থানবিক্ষিপ্ত আর্য্য-ভাণ্ড মুছিয়া যদি বা এক আধ কৌটা অমৃত কেহ সংগ্রহ করেন, তৎপ্রতি এখনকার লোকের অনুরাগ ও আসক্তি কোথায়? তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া, তদ্দ্বারা উপকৃত কে হয়? আর্য্য-শিক্ষা, আর্য্য-উপদেশ অনেক কালের কথা। সত্য ও কলিযুগে বহু দূর ব্যবধান। যাউক সে কথা। সাধু এবং সয়তান, উভয়েই সত্যযুগের সুখ্যাতি করেন। কলিযুগের অখ্যাতিও উভয়ের মুখে অনবরত শুনিতে পাই। কিন্তু সুখ্যাতি আর অখ্যাতি, কেবল সুখ্যাতি আর অখ্যাতিই মাত্র। প্রকৃত উভয় যুগেরই আদেশ ও উপদেশে সমান। সত্যযুগওয়ালারা যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কলিযুগের লোকেও ত অন্ততঃ দুই চারিটা বিষয়ে সেই শিক্ষা পুনরুক্ত করিতেছে। কিন্তু কই? কেহই ত তাহাতে কর্ণপাত করে না। সত্যযুগের শিক্ষা কলিতে কলুষিত হইয়া অসত্য হইয়া গিয়াছে নাকি, তাই পোড়া দেশের দলে তাহা গ্রাহ্য হয় না? মেওয়াপাতি মহাশয়রাও ত দেখি তাহাতে নারাজ। কেবল ইতর অশিক্ষিত নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাবুরাও ত স্ত্রী শিক্ষার নামে জ্বলিয়া উঠেন। নারীজাতির নামমাত্রেই ত দেখি আজিও, সে-

আর্য্যত্ব ও আর্য্য-ভাণ্ড।

অবস্থা শোচনীয়।

প্রসিকতার ইতর উৎস উচ্ছৃঙ্খল বহে। এক শত বৎসরের সঞ্জীর য়ুরোপীয় শিক্ষার বল এই আর্য্য-শিক্ষা অনেক কালের কথা; তাহা না হয় নাই-ই ধরিলাম।

দুর্ব্বল মনুষ্য-প্রকৃতি স্বাস্থ্যকর শিক্ষায় সবল হইবার কথা। কিন্তু আশানুরূপ তাহা হয় না যে কেন, এ রহস্যের উদ্ঘাটন করা কঠিন। পতিত প্রাচ্য জাতির দৃষ্টান্ত বর্ত্তব্যের মধ্য নহে। স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে, পাশ্চাত্যদিগের মহা আড়ম্বর সত্ত্বেও যে পাশ্চাত্য দেশে রমণীকুল তাঁহাদের প্রযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারিতেছেন, তাহা নহে। শিক্ষা ও স্বাধীনতা কোনও স্থলে অত্যন্ত অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক মাত্রায় হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দাঁড়াইতেছে, কোথাও বা উহার একেবারে অবিকশিত অবস্থা। এ উভয়ই মন্দ।

য়ুরোপীয় উন্নতির মাত্রা।

আমরা বলিতেছিলাম, সাহিত্যের সচল কার্য্যক্ষেত্রে নারীজাতির জীবিকার পথ পাশ্চাত্য দেশেও সুগম নহে। অন্ততঃ, পুরুষের অপেক্ষা নারীর পক্ষে সে পথ দুর্গম। সুশিক্ষিত পুরুষ সাহিত্যের পথে যতটা সহজে অগ্রসর হইতে পারেন,—সুশিক্ষিতা রমণীর পক্ষে, সে পথ ততটা সহজ ও সুগম হয় না। সত্য বটে, ইংলণ্ডে আজ কাল অনেক রমণীর জীবিকা, সাহিত্যক্ষেত্রে লেখনী চালনা দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে, এবং তাঁহাদের কেহ কেহ যে অর্থরাশি উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহার কথা শুনিয়া এ দেশীয় লোক বিস্মিত হইতেও পারেন; কিন্তু সাহিত্যসংসারে প্রবেশলাভ করা, সাধারণতঃ রমণীদিগের পক্ষে সহজ নহে।

বিলাতে রমণী লেখিকা।

বিগত জুন সংখ্যা ব্ল্যাকউডে কোনও বিদুষী রমণী-লেখক তাঁহার সাহিত্য-বিপণীর অভিজ্ঞতা বর্ণিত করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম ইতিবৃত্ত ক্লেশকর, কিন্তু কৌতুকজনক। অনেক শিক্ষিত পুরুষ-সিংহ এই রমণীর অবিচলিত অধ্যবসায়, অধ্যয়ন ও অনুকরণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই লাভবান হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ দেওয়া যাইতেছে।

ব্ল্যাক্‌উডস্ ম্যাগাজিন্।

এই লেখিকা বিলাতের এখনকার এক জন বর্দ্ধিষ্ণু সংবাদপত্রের সম্পাদক। সম্পাদকীয় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিতে তাঁহাকে কিরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তিনি নিজে তাহা বিবৃত করিতেছেন,—

বর্দ্ধিষ্ণু রমণী সম্পাদক।

"আমি সংবাদপত্রসম্বন্ধীয় কোনও কাজের উমেদারিতে যখন প্রথম লণ্ডনে আসিলাম, তখন সংবাদপত্রের কাজে যে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলাম, তা নয়। আমার যতটা জানা শুনা ও করা কর্ম্ম ছিল, তা খুব বেশী না হইলেও, তা একেবারে কিছু নয় ছিল না। সংবাদপত্র লিখন ও পরিচালন ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতায় আমার অল্প বিস্তর দাবি দাওয়া ছিল। সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা অনিশ্চিত ও অনিয়মিত বুঝিয়াই আমি প্রথমতঃ সংবাদপত্রের কার্য্য অবলম্বন করি। আমি নবেল লিখিয়া অর্থার্জ্জনের চেষ্টায় অনর্থক সময় নষ্ট করি নাই। নবেল লিখিয়া অবিলম্বে যাহাতে করিয়া ফল লাভ করা যায়, আমাতে তাহার কোনও কোনও উপ-

রমণী সম্পাদকের আত্মকাহিনী।

কর্ম্মের অভাব ছিল। প্রথম সংবাদপত্রের কার্য্য অবলম্বন করিয়া, আমি পল্লীপ্রদেশে কয়েক মাসাবধি কোনও সান্ধ্যপত্রের সহ-সম্পাদকতা করি।—আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান, ফরাসী ও জর্ম্মন সংবাদপত্রের ফাইল হইতে, পুনর্মুদ্রণের জন্য আমি প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ও প্রবন্ধের অনুবাদ করিতাম, প্রুফ্ দেখিতাম, রিপোর্টারের কার্য্যও কতক কতক আমাকে করিতে হইত। এই সহসম্পাদকতার সঙ্গে সঙ্গে আমি এক খানি বড় দরের দৈনিক পত্রে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিতাম,—তাহার Ladies' Column চালাইতাম। এই উভয় সংবাদপত্রের কার্য্যেই আমি কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। এই দুই কার্য্য ছাড়িয়া যে সকল অবস্থা গতিকে আমি লণ্ডনের কঠিন কার্য্য-ক্ষেত্রে কার্য্যানুসন্ধানে আসিতে বাধ্য হই, তাহা বিস্তারিত বলিবার আবশ্যক নাই। ইহা বলিলেই প্রচুর হইবে যে, আমি রাজধানীর সংবাদপত্রপল্লী ফ্লিট ষ্ট্রীটে সমুপস্থিতা, বিচক্ষণশীলা, কিছু-না-কিছু করিবার জন্য সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞাকঢ়া। কিন্তু লণ্ডনে অজ্ঞাত, অপরিচিত, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার দ্বার কোথায়, কিছুই জানি না। বিশেষতঃ, আমার স্বভাব কোমল, বড় লজ্জাশীল। যে সকল মেয়েকে আপনার রুটি আপনি উপার্জ্জন করিয়া খাইতে হয়, তাহাদের সহিত আমি শিক্ষিত হই নাই। সুতরাং তাহাদের স্বভাবও প্রাপ্ত হই নাই। কাহারও অল্প মাত্রও অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতে আমি অপটু; আমার নিজের প্রাপ্য চাহিতেই আমি কুণ্ঠিত। নিজের সম্বন্ধে কাহাকেও কোনও কথা বলিতে আমার মাথা কাটা যায়। এই সকল প্রতিবন্ধক আমার পার্শ্বে, পশ্চাতে, সম্মুখে; অথচ নিজের জীবিকা আমায় নিজে অর্জ্জন করিতে হইবে। আমার আকাঙ্ক্ষা অতিরিক্ত নয়,—বাৎসরিক হাজার বা দেড় হাজার টাকা হইলেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা আমি তখন করি নাই। করা উচিতও ছিল না। কিন্তু ইহাই বা কোথা হইতে হয়?

সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতা।

কি কি কাজ করিতাম।

লণ্ডনে।

"কাজ কর্ম্মে নূতন ব্রতীরা সচরাচর যেরূপ করিয়া থাকেন, আমিও তাহা করিয়াছিলাম; লণ্ডনে আসিবার সময় অনুরোধপত্র আনিয়াছিলাম। অনুরোধপত্র আনিয়াছিলাম, বড়-লোকের—সম্পাদকীয় বড়লোকের নামে। কিন্তু তাঁর দেখা পাওয়া ভার। বড়লোকেরা প্রায়ই বাড়ীতে থাকেন না। বাড়ীতে থাকিয়াও থাকেন না। দুই তিন দিন দেখা করিতে গিয়া দেখা পাইলাম না। তার পর এক দিন দেখা হইল। যথাবিহিত শিষ্টাচারের সহিত গৃহীত হইলাম। বড়লোক আমার শক্তি, সামর্থ্য ও শিক্ষার বিষয় জিজ্ঞাসিলেন। আমার পুস্তকের সমালোচনায় বারেক চোখ বুলাইলেন। অবশেষে বলিলেন, তাঁর নিজের সেরেস্তায় আমার করণীয় কোনও কাজ কর্ম্ম নাই, তা তিনি আমায় অন্য সম্পাদকদের কাছে অনুরোধপত্র দিবেন। আমি তাহাতেই তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইলাম। অভাগ্য আমি ভাবিলাম, তাঁর পত্র আর চাকুরী পাওয়া, দুইই প্রায় সমান। আমি প্রীত মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

সুপারিশ চিঠি।

"কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে বুঝিলাম, এ প্রকার অনুরোধপত্রের এক কপর্দ্দকও মূল্য নাই। ইহার অর্থ,—অভাগা উমেদারকে দূরে নিক্ষেপ করা। কয়েক দিন মধ্যে অঙ্গীকৃত অনুরোধপত্র

আসিয়া পৌঁছিল। সম্পাদকীয় সেক্রেটারীর হস্তলিখিত পত্রে সম্পাদকের নামস্বাক্ষর। পত্র কয়ের খানি কয়ের জন সম্পাদকের নামে। এ দের অনেকেরই সহিত একেবারেই আমার সাক্ষাৎ হইল না। সাক্ষাৎকারসম্বন্ধে বাহ্য সম্পাদক উভয়ই সমান। রাজা ও সম্পাদকের মহামহিম শ্রীচরণেষু, অল্প স্বল্প পুণ্যের কার্য্য নয়। অনুরুদ্ধ সম্পাদকদের মধ্যে যে কয় জনের সঙ্গে আমার বহু কষ্টে সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন,—'আমার উপযোগী কোনও কর্ম্মই তাঁহাদের অধীনে তখন নাই, তবে চেষ্টা দেখিবেন, যদি কখনও সুবিধা হয়, পত্র লিখিবেন', ইত্যাদি।

বড়লোকের ব্যবহার।

"বলা বাহুল্য, আমি বড়ই বিষন্ন হইলাম। বিপন্নও কম নয়। সবিশেষ লজ্জাবোধও হইয়াছিল। অনুরোধদাতা সম্পাদকের নিকট আর আমি গেলাম না। যাইয়া কেবল বিরক্ত করা আর বিরক্ত হওয়া বই ত নয়। আমি যথাসাধ্য নিজের চেষ্টা নিজেই করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু কি চেষ্টাই বা করি,—কে কার খবর লয়, কে কার দুঃখে দুঃখিত হয়। যে সকল সম্পাদক না ভাবিয়া চিন্তিয়াই আমায় নিরাশ করিয়াছেন, আমার নিরাশ্রয় ভাব ও নিরাশার পরিমাণ জানিলে, তাঁহাদেরও উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত ছিল কারণ তাঁহারাও ত কন্যাকলত্রবিহীন নহেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও ত কন্যা আছে।

ভয়েদারী অবস্থা।

আমি এখন বড়ই নিরুপায়, ফ্লিট ষ্ট্রীট যেন আমায় গ্রাস করিতে আসিতেছে। কঠিন, নির্ম্মম হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর ফ্লিট ষ্ট্রীট। আমি পাড়াগেঁয়ে লোক—ফ্লিট ষ্ট্রীট দেখিয়া আমার প্রাণে মহা আতঙ্ক জন্মিতে লাগিল। উহার অলি গলি, ভবনসমূহ, সম্পাদকীয় কক্ষ যেন আমার চক্ষে খুনখারাবের জায়গা বলিয়া অনুভব হইল। যে ফ্লিট ষ্ট্রীটের সম্পাদকীয় পল্লী আমার এখন এত পরিচিত, যেখানে আমি নিজে এখন সুপরিচিত, সেখানে আমার এক সময়ে উপরি-উক্ত অবস্থা হইয়াছিল, সে সময়, সে অবস্থা, জীবনে কখনই ভুলিব না। জীবনের শত সৌভাগ্য, সহস্র সুখও তাহা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না।

আপিস-ঘরে।

"আমি তখন অনেক সম্পাদকেরই নাম জানিতাম না। এক একটা আপিসের ঘরে যাই আপিসের ছোকরা চাকর তখনি আমার অনভিজ্ঞতা বুঝিতে পারে, আমাকে চিনিয়া লয়ে, প্রশ্ন না করিতে করিতেই উত্তর দেয়,—'Not in Miss.' আমি অপ্রতিভ হইয়া জড়সড় হইয়া চলিয়া যাই। যে দুই চারি জন সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাঁহারা কেহই,—আমি কি করিতে পারি না পারি—জিজ্ঞাসা করেন নাই।

সম্পাদকীয় রীতি।

ইহা অবশ্য সত্য কথা যে, অনেক অযোগ্য ভবঘুরে লোক যাইয়া সম্পাদকদিগকে বিরক্ত করে, কাজেই তাঁহারা অপরিচিত আগন্তুকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বা তাহাদের প্রার্থনা কর্ণপাত করা, আবশ্যক মনে করেন না। তাহাতে তাঁহাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা না করাতে, অনেক উপযুক্ত অপরিচিতের প্রতি অন্যায় করা হয়, এবং মনুষ্যত্বধর্ম্মও পালন করা হয় না।

আমি এ সময়ে মনে মনে যে দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছিলাম, তাহা আমার আপনার প্রাণ ভিন্ন পরে জানিত না। নিরাশা আগুনে প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইতেছিল, কিন্তু বহির্মূর্ত্তি খানি ঠিক

আমার বেশ। আমি এখন অপেক্ষা তখন বরং স্থূলাঙ্গী ছিলাম। আমার মুখভাব স্বভাবতই স্বাভাবিক আনন্দব্যঞ্জক, আমার মনঃকষ্ট ও সাংসারিক দারিদ্র্য মুখ-ভাবে ব্যক্ত হইত না। আমার আভ্যন্তরিক ও সাংসারিক অবস্থা, আমার চেহারা দেখিয়া কেহই বলিতে পারিত না। হয় ত সে জন্যও আমি সম্পাদকশিরোমণিদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারি নাই।

চেহারার ফের।

"অসম্ভব নহে, যেখানে আমাকে আবশ্যক আছে, যে স্থলে আমি যে প্রকার কার্য্য করিতে পারি, তাহার অপ্রতুল আছে, হয় ত আমি সে স্থান অনুসন্ধান করিতে ও সেখানে যাইতে পারি নাই। সে স্থানে যাইতে পারিলে, হয় ত আমি কর্ম্মও পাই-তাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে ও আরও অনেকানেক বিষয়ে, স্ত্রীলোকের বড়ই মুস্কিল। পুরুষ, পুরুষ হওয়াতে, তাঁহার পক্ষে যাহা অতি সহজ; স্ত্রী-লোক কেবল স্ত্রীলোক বলিয়াই তাহার পক্ষে তাহা প্রচণ্ড কঠিন। আমার নারীত্ব, আমার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের এক গুরুতর প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। রমণীদের সকলেরই সাধারণতঃ এরূপ হয়। আমার মত উমেদারি অবস্থায় পতিত পুরুষ মানুষ, ক্লব-গৃহে অনেক পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নিজের কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে ও চেষ্টাচরিত্র করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকের তাহা করিবার যো নাই। পুরুষ মানুষ সকল সময়ে, দিবারাত্রির সকল ঘণ্টাতেই, কার্য্যানুরোধে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারেন, ও কার্য্যানুরোধে সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পারেন, কিন্তু নানা বিবেচনায়, মেয়ে মানুষে তাহা পারেন না। পুরুষ মানুষ, যে কোনও বিষয়েই হউক, জোর ও জিদ্ করিয়া দু'টো কথা বলিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার বিনয় নম্রতার ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু মেয়ে মানুষ একটার বেশী দুইটা কথা কহিলে, একটা একটু উঁচু কথা কহিতে গেলে, তাহার বিনয়-নম্রতা ও লজ্জাশীলতার হানি হয়, সে মুখরা ও চঞ্চল বলিয়া পরিগণিত হয়। পরন্তু পুরুষ মানুষের শিক্ষা ও শক্তি একই বিষয়ে আবদ্ধ নহে,—সর্ব্ববিষয়প্রসারিণী, বলিয়া লোকের বিশ্বাস;—স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও কার্য্য-শক্তি সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস, ঠিক ইহার বিপরীত। সুতরাং রমণীর নানা নিরাট।

পুরুষ ও নারী উমেদারি,—তুলনা।

"মিঃ টি. পি. ও'কনর, সম্পাদকীয় আসনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে, 'যেরূপে পার, যে কোনও কার্য্যে, কোনও সম্পাদকীয় আফিসে ভর্ত্তি হও। যদি আবশ্যক হয়, হরকরার কাজে, আপিস-ছোকরার কাজে ভর্ত্তি হইতেও কুণ্ঠিত হইও না। একবার আপিসে ভর্ত্তি হইতে পারিলে, বদি ধার থাকে, আপনা হইতেই কাটিয়া উঠিতে পারিবে। কিন্তু যেরূপে হয়, অগ্রে আপিসে ভর্ত্তি হও।' কিন্তু মহিলার পক্ষে আপিসে ভর্ত্তি হওয়ার চেষ্টা যে কি বস্তু, তা আমিই জানি।

সম্পাদকীয় উমেদারী,—আপিস প্রবেশ।

"আপিসে ভর্ত্তি হওয়া পুরুষ মানুষের পক্ষে যেরূপ কঠিন, স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শত গুণ কঠিন। পুরুষের যে স্থলে একটা প্রতিবন্ধক, স্ত্রীলোকের সে স্থলে এক সহস্র। আপিসে ভর্ত্তি হইতে পারিলে,—ভর্ত্তি হওয়ার পর,—স্ত্রীলোককে কিছু কিছু অনুগ্রহ অধিকার দেওয়া হয় বটে,—

স্ত্রীলোকের মুস্কিল।

তাহার কার্য্যের জন্য স্ত্রীজনোপযোগী সুসময় ও সুস্থানের ব্যবস্থা করা হয়,—কিন্তু আপিসে প্রবেশলাভ করিবার পূর্ব্বে, স্ত্রী-উদ্যোগের বড়ই দুর্গতি। তাহাকে সকলেই আপদ বালাই বলিয়া মনে করে, পদে পদে তাহার পথের কণ্টক হয়।

"বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সান্ত্বনা করেন, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রবোধ দেন যে, 'জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে প্রথমতঃ সকলকেই কষ্ট করিতে হয়। পৃথিবীতে যত বড় বড় লোক হইয়া গিয়াছেন, প্রায় সকলকেই প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, নিষ্ফল প্রয়াসে বহুকাল ক্ষেপণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা অবিচলিত অধ্যবসায়সহকারে সেই নিরাশা নিষ্ফলতা বহন করাতেই, অবশেষে স্ব স্ব উদ্দেশ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। 'কাদায় গুণ টানিয়া থাকিলে অবশ্যই আখেরে ভাল হয়।'

নিষ্ফলা চেষ্টা।

"হাঁ, তা বটে, ভাল হইতে পারে, অনেকের হইয়াও ছিল। যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাঁদের অপেক্ষা আরও অধিকসংখ্যক লোক, অবিচলিত অধ্যবসায়, অতুলনীয় সহিষ্ণুতা, শ্রম ও চেষ্টা সত্ত্বেও সম্ভবতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; নিষ্ফলা চেষ্টায় ও নিরাশায় প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, হায়! তাঁহাদের জীবনের—সুফলবিহীন জীবনের ইতিবৃত্ত অলিখিত। আমিও তাহাদেরই দলের এক জন নহি,—কেমন করিয়া জানিব? আত্মীয় বন্ধুর প্রবোধবাক্যে অকৃত-মনোরথ অনেকেরই মনে সম্ভবতঃ এইরূপ ভাবের উদয় হয়। কিন্তু যাউক এ কথা। আমি তাঁহার আত্মকাহিনীই কই।

"এক দিন একটি মেয়ে বোলে,—'দেখ, অমুক সম্পাদকের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিবি, তা হ'তে তোর কিছু উপকার হলেও হতে পারে।' সাত পাঁচ নানান খানা ভাবিলাম। সংসারে যে যত উপকার করিবার লোক, তা আমি তখন বেশই বুঝিয়াছিলাম। উপকার-করণেচ্ছুদের কাছে আমার যাইতে প্রবৃত্তিই হইত না। সে যাহাই হউক, মেয়েটির কথা আমি অমান্য করিলাম না। সম্পাদকের স্ত্রীর কাছে ছুটিলাম। এঁর স্বামী খুব এক জন পসারওয়ালা সম্পাদক। পসারওয়ালা সম্পাদকস্বামীর সহধর্ম্মিণী, বড় 'যে-সে' নন, পসারে পসারে ঘরে বাহিরেই প্রবল ধর্ম্মগত মিল হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পতির পসারে পত্নীরও প্রচণ্ড পসার। পসারের পা কেবল পয়সার উপরেই পড়ে, পৃথিবীর উপর পড়িবে কেন? পসারী সম্পাদকের পত্নীর দ্বারে যাইয়া সবিনয়ে সংবাদ পাঠাইলাম যে, 'আমি তাঁর সঙ্গে দু'চারি মিনিটের জন্য, দু'চারিটি কথা কহিবার কামনা করি।' আ, আমার মরণ। সম্পাদকের পত্নী সগর্ব্বে বলিয়া পাঠাইলেন,—'না না, তিনি কারও সঙ্গে কথা টথা কইতে পাবেন না,—তা হলে তিনি ট্রেণ ফেল হবেন।'

সম্পাদকের স্ত্রী।

তা, তখন কথা কহিতে পারিবেন না, কখন পারিবেন,—কি আর কিছু, বা দেখা করিতে পারিলেন না বলিয়া দু'টো সামলি আপ্যায়িতের কথা, কিছুই বলিলেন না। পসারবন্ত কাগজওয়ালাদের পত্নীদেরও বোধ হয় তা বলিতে নাই। আমি মনোদুঃখে,—ঘৃণা, অপমান, লজ্জা, মনে মনে গালিয়া, চোখের জল বহুকষ্টে চোখে রুধিয়া, চলিয়া আসিলাম।

বিজ্ঞাপনের তল্লাসে আমি এখন [illegible] কাগজ ইাটকাইতে লাগিলাম। আমার কবিতার উপযোগী বিজ্ঞাপন দেখিবামাত্রই তাহাতে দরখাস্ত করিতে লাগিলাম। বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে সর্ব্বত্রই আমার আবেদন যাইতে লাগিল। কিন্তু হায়, উত্তর ত কিছু আসে না। যে এক আধটা উত্তর আসে, তাহা অতি অদ্ভুত। কেহ বলে, টাকা দিয়া উমেদারী তালিকায় নাম রেজিষ্টারী করিতে, কেহ বা নূতন সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের 'প্রস্পেক্টাস' পাঠাইয়া দিয়া তাহার সেখার দিদিতে বলে। এ সকল কেবল প্রবঞ্চনারই পন্থা। হঠাৎ এক দিন এক স্থান হইতে আমার এক আবেদনের উত্তর পাইয়া বড়ই প্রীত হইলাম। কোনও 'সোসাইটী'—সংবাদপত্রের সম্পাদক আমায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। সহর্ষে গিয়া আমি সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সম্পাদকটি বেশ সভ্য ভব্য, ছোট-খাট। সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি প্রবন্ধ,—বেশ চটুল, রসাল, সজীব প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন কি? প্রবন্ধ যতই তীব্র, তেজাল ও বঙ্কিম করিতে পারিবেন, ততই ভাল।'

বিজ্ঞাপনে দরখাস্ত, দরখাস্তের উত্তর।

সম্পাদকীয় ডাক।

তার পর তিনি আমায় তেমনতর প্রবন্ধের নমুনা দেখাইলেন। কিন্তু কি করি, বলুন; আমার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ, আমি তেমনতর প্রবন্ধ লিখিতে পারিব না, লিখিবই না। আমি সম্পাদকমহাশয়কে তাহা বলিলাম। কাজেই এখানে আর কিছু হইয়া উঠিল না। ইহার পর আমি 'নারী উমেদারদিগে চাকরী-দেওয়ার আপিসে' আবেদন করিলাম, এ বড় সুবিধার জায়গা নয়, তা আমি জানিতাম। কিন্তু কি করি, কিছু ত করা চাই। এ আপিসেও [illegible] গেলাম। এখানকার অধ্যক্ষঠাকুরাণী প্রবীণা, অভিজ্ঞবয়সী মানুষটি, অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও কঠোর ভঙ্গিমা ইহার। তিনি বলিলেন,—আমি তোমায় বেশী আশা দিতে চাই না, [illegible]ইত্যের কাজ, সম্ভবতঃ তুমি আমার দ্বারা না পেয়েও পেতে পার, তবে কাজে ভদ্রে কখনও কিছু উপস্থিত হয়, এখন নাম রেজিষ্টারী ক'রে যাও।' অধ্যক্ষঠাকুরাণী আমার সার্টিফিকেট পরীক্ষা করিলেন, আমার জাতি, কুল, পিতা মাতা, গাঁই গোত্র, অবস্থা, অনেক কথাই জিজ্ঞাসিলেন।

নারী-উমেদারের আপিস।

অধ্যক্ষ ঠাকুরাণী।

অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি যে পুস্তক লিখিয়াছ, তাহার নাম কি?' আমি উত্তরে বলিলাম,—'Modern men by a Modern maid' ('এ কালের মানুষ' কোনও এ কালের মেয়ে কর্ত্তৃক প্রণীত)। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! আমি আমার পুস্তকের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র ঠাকুরাণীটি অবাক্, আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে কোনও কথাই বলিলেন না। তার পর গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—'এমন কুনামযুক্ত কুপুস্তক প্রণয়ন করার পরিবর্ত্তে, আমি আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিতাম।'

গ্রন্থগতগ্রহ;—নাম বিভ্রাট।

'আমি ভয়ে ভয়ে ভগ্ন স্বরে, অতি বিনীত ভাবে প্রতিবাদ করিলাম, বলিলাম, মহোদয়ে। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার যদি আমার পুস্তক খানি পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে ইহা

সোসাইটী সংবাদপত্র সাধারণতঃ সাময়িক গল্প গুজব ও নিন্দা কথা থাকে।

অবশ্যই প্রকাশ পাইবে যে, তাহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এমন একটিও অনুপযুক্ত উক্তি নাই, সুরুচিবিরুদ্ধ এমন একটিমাত্রও শব্দ নাই, যাহা নির্ব্বিঘ্নে পাঠ না করা যাইতে পারে। আমার পুস্তকখানি আমি ভাল বলিতেছি না. আমার বিবেচনায় তাহা কিছুই নয়, তাহাতে অনেক ভুলচুক, ভ্রমপ্রমাদ অবশ্য থাকিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মতঃ মহাশয়ার নিকট আবেদন করিতেছি,—তাহাতে দুর্নীতি ও সুরুচিবিরুদ্ধ এক বর্ণও নাই।'

"আমি অনুনয় বিনয় করিয়া অনেক বলিলাম বটে, কিন্তু আপিসওয়ালী তাহা আদৌ বিশ্বাস করিলেন না, অবিশ্বাস-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিতে লাগিলেন। 'পৃষ্টান ট্রাক্ট সোসাইটীর' কেতাব কিনিয়া পড়িবার জন্য আমায় উপদেশ দিলেন।

"আমি বিষণ্ণ ভাবে গৃহে ফিরিলাম। উপরি-উক্ত আপিসের দ্বারা কোনও কাজ কর্ম্ম পাইবার আশা, অবশ্য কিছুই আর রহিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কাণ্ড বা কর্ম্ম-ভোগ দেখুন। কয়েক মাস পরে, আমি এই আপিসের সেই অধ্যক্ষ ঠাকুরাণীর নিকট হইতে এক বড় জরুরি চিঠি পাইলাম; ঠাকুরাণীটি লিখিতেছেন,—'তুমি অবিলম্বে এখানে আসিবে, কর্ম্ম উপস্থিত আছে।'

ডিটেক্‌টিব হইতে ডাক।

"আমি উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরাণী বলিলেন,—'একজন মেয়ে "ডিটেক্‌টিব" দেখিয়া দিবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। তুমি নিশ্চয়ই সে কাজ করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই ডাকিয়াছি।'

"মরণ আর কি। মহিলাটি বলেন কি? আমি গোয়েন্দাগিরি কার্য্যে সুপারগ, এ অদ্ভুত সিদ্ধান্তে তিনি কি সূত্রে, কি প্রমাণে উপনীত হইলেন! আমি তাঁহার কাছে যে প্রকৃতির কর্ম্মের প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরির কি সম্বন্ধ? ঠাকুরাণী অবশ্যই মনে করিয়া থাকিবেন যে, খবরের কাগজ ওয়ালী মেয়ে পৃথিবীর সকল কাজই করিতে পারে। বিশেষতঃ, এখন-কার যে মেয়ে 'এখনকার মানুষ' নাম দিয়া বই লিখিতে পারে, তাহারও অসাধ্য কিছুই নাই। ফলতঃ, আমি যে কি কদর্য্য জীবনই বহন করি, ঠাকুরাণীটির কল্পনায় কল্পিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না।

অসাধ্য কিছুই নাই।

"তখনও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ওটকান আমার কামাই নাই। এক দিন (সেটা বড়ই সুখের দিন) দেখিলাম,—এক উচ্চ শ্রেণীর নূতন মাসিকপত্রের জন্য একজন কার্য্যদক্ষ চৌকোস সহকারী সম্পাদকের দরকার। আমি অমনি তখনই দরখাস্ত পাঠাইলাম। দরখাস্তের জবাব সত্য সত্যই আসিল। বিজ্ঞাপনদাতার নাম মিঃ ব্ল্যাঙ্ক। মিঃ ব্ল্যাঙ্ক বলিলেন, 'আমি আপনার আবেদন মঞ্জুর করিয়াছি, আপনাকে রাখিব, কিন্তু আপাততঃ কি বেতন দিতে হইবে।' আমি বলিলাম, সে বিষয় মহাশয়ই বিবেচনা করিবেন।

সহকারী সম্পাদকতা।

"আমি বেতনের কথা মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলাম না, ভয়,—পাছে খুব বেশী বলিয়া বসি, অথবা খুব কম বলি। ফলতঃ, যাহা পাই, তাহাতেই কর্ম্ম স্বীকার করিব, আমি মনে মনে তখন ঠিক্ করিয়াছিলাম।

"মাসিক পাঁচ পাউণ্ড বেতন ঠিক্ হইল, আমি সম্মত হইয়া, সব এডিটর নিযুক্ত হইলাম। আমায় যে সব কাজ করিতে হইবে, তাহাও ঠিক হইয়া গেল। সাধারণতঃ নিজের বাড়ীতে বসিয়াই আমার প্রবন্ধ লিখিতে হইবে, কেবল সময়ে সময়ে সম্পাদকের ইপ্সিত ধনী লোকদের বাড়ীতে "ইণ্টারভিউ" করিতে যাইতে হইবে,—ইহাও অবশ্য প্রবন্ধের উপকরণসংগ্রহের জন্য। কিন্তু যে সব লোকের সঙ্গে "ইণ্টারভিউ" অর্থাৎ দেখা সাক্ষাৎ করার কথা হইল, তাঁরা সাধারণ্যে অজ্ঞানিত, অপরিচিত লোক। আমি সে কথা আমার নব মনিব মহাশয়কে বলিলাম; বলিলাম যে, এ সকল লোকের কথা লিখিলে কে পড়িবে,—আর ইহাদের কৃত মহৎ কাজই বা কি এমন আছে, যাহা লেখাতে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে। সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী বলিলেন,—'লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা ততটা উদ্দেশ্য নয়, যতটা উদ্দেশ্য, যাদের কথা লেখা হইবে, তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা; তাহা হইলেই, অনেক কাজ হইবে। মনে কর, জন জেকব ব্রাউন, নূতন বড় মানুষ হইয়াছে,—তাহারা তাহাদের নাম স্বভাবতই ছাপায় দেখিতে ইচ্ছা করে, আমরা তাহাদের কথা লিখিলে, তাহাদের দ্বারা অনেক উপকার হইতে পারিবে।'

সব এডিটারীর শেষ ফল।

"আমি ইহাতে আর কোনও কথা কহিলাম না। আমার লিখিতব্য প্রবন্ধের কঙ্কালস্বরূপ, সম্পাদকের প্রদত্ত কতকগুলি নোট লইয়া চলিয়া আসিলাম। দু'মাস খেটে খুটে, বৃটিশ মিউসিয়ামে বার বার যেয়ে দেখে শুনে, প্রবন্ধ লিখিলাম। দু'মাসে প্রবন্ধও লেখা গেল অনেকগুলি। দুই সংখ্যা কাগজও বাহির হইল। কিন্তু আমার বেতন কই? দুই মাসে পাওনা হইয়াছে ১০ পাউণ্ড। বার বার তাকিদ পত্র লিখিলাম, ৩০ সিলিং পাইলাম। তাহার পর আর সিকি পয়সাও পাই নাই, কাগজও বাহির হয় নাই। আমার পাওনা টাকা দেওয়া ত পরের কথা, সম্পাদক একবার চিঠি লিখিয়া আমার কাছে দুই পাউণ্ড ধার চাহিয়াছিলেন। এ পর্ব্ব এইখানেই শেষ।

"আমি সম্পাদকমহলে ফের আর এক চক্র দিলাম। কিন্তু সেই একই কথা। শ্যালা, শ্যালাঁ, ভাইপো, ভাইঝি,—অন্য লোকের আবশ্যক নাই। মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, শরীরও আর বয় না; নিরাশা, দুর্ভাবনা, অভাব, নিজের অকর্ম্মণ্যতা, আমি আমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভাবিয়া অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। উমেদারী করিতে কোনও স্থানে এক বারের বেশী দুই বার যাই না, পেতে পা সরে না, মনে হয়, আমারমত এমন অনেক উমেদার আছে। আমার নিজের গরজের সঙ্গে অন্যের গরজও চিন্তা করা আমার স্বভাব। ইহাতে আমার অনিষ্টই হইত। পৃথিবীতে আমার মত ব্যক্তির আর কাহারও যে কোনও গরজ আছে, ইহা না ভাবিয়া আমি কেবল আমার নিজের গরজটি ভাবিয়া কাজ করিলেই বোধ হয়, ভাল হইত। কিন্তু তা আমি পারিতাম না, কাযেই পদে পদে আমার উৎসাহভঙ্গ হইত। আমি ভাবিতাম, আমি অসংখ্যের মধ্যে এক জন, অসংখ্যের উপায় হইলেই তবে না আমারও উপায় হইবে। হায়! তাহা অসম্ভব। ভগবান আমার এই অস্তিত্বের অতিরিক্ত সৃষ্টি কেন করিয়াছিলেন।

দারুণ দুরবস্থা,—স্বার্থ ও পরার্থ।

'এথিনিয়ম' ও "ভেলিনিউস" পত্রে কাহারও প্রাইভেট সেক্রেটারী হইবার জন্য বিজ্ঞাপন দিলাম। বিজ্ঞাপনের উত্তর আসে না। কিন্তু এই সময় একটা বিজ্ঞাপন দেখিলাম যে, কোনও সাহিত্য-ব্যবসায়ী ব্যক্তির একটি রমণী সহকারী দরকার। বলা বাহুল্য যে, আমি দরখাস্ত করিলাম। দরখাস্তের উত্তরে "মেসার্স ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটের" আপিসে, বিজ্ঞাপন-দাতার এজেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আদিষ্ট হইলাম। গেলাম সেখানে।

এজেণ্ট আপিসে। এজেণ্টটি ভদ্রপ্রকৃতির লোক। বলিলেন,—"আমি দুই শতেরও উপর আবেদন পাইয়াছি—তাহার মধ্যে আপনার আবেদনই অনুমোদিত হইয়াছে। কিন্তু আপনি "প্রাইবেট্ সেক্রেটারীর" কাজ পাইয়া উঠিবেন না; তাহাতে সবিশেষ ক্ষিপ্র লেখক হওয়া চাই, বিশেষতঃ "টাইপ রাইটিং" জানা চাই। তা বিজ্ঞাপনদাতার হস্তে সাহিত্যসম্বন্ধীয় অনেক কাজ কর্ম্ম আছে, তাহার কতক কতক আপনি বোধ হয় পাইতে পারেন। আপনার সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতা উপকারে আসিতে পারে, অতএব আপনি মিষ্টার ড্যাসের (বিজ্ঞাপনদাতার নাম মিঃ ড্যাস) নিকট গমন করুন।

"কিন্তু, এই মিঃ ড্যাস লোকটি কেমন? আমি মনে মনে ছবি আঁকিলাম, বেশ একটি ধর্ম্মভীরু, প্রবীণ ধরণের লোক,—শুভ্রকেশ, সোনার চস্‌মা, যিনি

মিঃ ড্যাস,— আমার দুঃখে দুঃখিত হইবেন, ইত্যাদি। আমি এজেণ্টের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'মহাশয়! মিঃ ড্যাসের বয়ঃক্রম কি? তিনি নিশ্চয়ই বৃদ্ধ হইয়া থাকিবেন।'

'এজেণ্ট।—না, মিস্, তিনি ঠিক বৃদ্ধ হন নি কিন্তু বয়স কত হবে, আমি ঠিক বলিতে পারিলাম না। তিনি এমন প্রকৃতির লোক, যাঁকে দেখে বয়স কত কিছুতেই আন্দাজ পাওয়া যায় না। এই সাতান্ন,—আটান্ন,—এই রকমই হ'ত হবে। তা আমি ঠিক বলিতে পারি না মিস্। আপনি নিজে গিয়াই সব দেখিতে পাবেন। যাহা ঘটে, আমায় বলিয়া যাইবেন।

আমি মিঃ ড্যাসের বাটীতে গেলাম। দিব্য সাজান গোজান, সুন্দর কার্পেটমণ্ডিত কামরা। কামরায় এক নবীন যুবক আসিয়া দাঁড়াইলেন। যুবকের বয়স উনত্রিশ,—ত্রিশ,—বিটবাট, ফুল বাবু। আমি মনে করিলাম, ইনি মিঃ ড্যাসের ভাই-পো, ভাগিনেয় বা প্রাইবেট সেক্রেটারী, এইরূপ কেহ হইবেন। বলিলাম,—'আমি মিঃ ড্যাসের সহিত সাক্ষাৎ করিব।' যুবক বলিলেন, 'মাই ডিয়ার লেডী, আমারই নাম মিঃ ড্যাস।'

শুভ্রকেশ ও সোনার চস্‌মার স্বপ্ন আমার ভাঙ্গিয়া গেল। আমি অপ্রস্তুত ছিলাম; আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। চিত্তচাঞ্চল্য সাবধানে সম্বরণ করিয়া কাজের কথা আরম্ভ করিলাম।

সাহিত্য-জগৎ। মিঃ ড্যাসের বিবেচনায় আমি প্রাইবেট সেক্রেটারীর কাজ পাইবার উপযুক্ত হইব না। তবে তিনি অন্য কাজ দিয়া আমার উপকার করিবেন। আমি মনে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইলাম। কিন্তু মিঃ ড্যাসের কথা অনেক। তিনি অকপটে আরম্ভ করিলেন,—'যাকে লোকে (Library Sweater) সাহিত্যশোষক বা সাহিত্যভাব চিনে জোঁক বলে, আমায় সবে তাই বলিয়া জানিবেন। আমি অনেকগুলি মফঃস্বল সংবাদপত্রের "লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা"। যুবতী স্ত্রীলোকেরাই আমার সব কাজ করিয়া দেন;

গুলিপুটে করুণাময় পরমেশ্বরের পূজা করিলাম। কাপি লেখা শেষ হইল,—পাঠাইয়া দিলাম। সেই সায়ংকালেই সর্ব্বনিকটবর্ত্তী হকারের কাছে হেরাল্ড পাঠাইতে আদেশ করিলাম।

"প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, টেবিলের উপর—হেরাল্ড। কিন্তু সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে,—মনে কতই তোলাপাড়া, শঙ্কা সন্দেহ হইতেছে। প্রবন্ধ হয় ত হেরাল্ডের উপযোগী হয় নাই, সম্পাদক পছন্দ করেন নাই,—কাগজের মধ্যে আমার নিরাশাই হয় ত লুকাইয়া রহিয়াছে,—প্রবন্ধ সম্ভবতঃ ছাপা হয় নাই।

আশা,—আশঙ্কা।

"কাঁপিতে কাঁপিতে কাগজ খুলিলাম। দেখি, ঐ দেখ,—আমার প্রবন্ধ! আমার প্রবন্ধ মধ্য পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। আহ্লাদে আমার অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। বার বার পুনর্ব্বার, বিশ বারেরও বেশী, হেরাল্ডে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধটি পড়িলাম। তার পর মিঃ ষ্ট্যানহোপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ছুটিলাম।

"হেরাল্ড আপিসে যাইবামাত্র, মিঃ ষ্ট্যানহোপ বলিলেন,—'বেশ হইয়াছিল, আমার যাহা দরকার, ঠিক তদনুরূপই হইয়াছিল।'

"অতএব আর কথা কি, তথায় এবং তখনি সম্পাদকীয় সেবেস্তায় আমি নিযুক্ত হইলাম। বেতন হইল সাপ্তাহিক তিন পৌহর। বড়ই সুখে সময় কাটিতে লাগিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মিঃ ষ্ট্যানহোপ, সে দিন আমার যাহা যাহা করণীয়, টেলিগ্রামে আদেশ পাঠাইতেন, আমি কাপি লিখিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিতাম। মিঃ ষ্ট্যানহোপ চমৎকার ভদ্রলোক, তাঁহার সহিত কাজ কর্ম্ম করিয়া যথেষ্ট আনন্দ হইত। কয়েক মাস পরে, লণ্ডনে আর হেরাল্ড আপিস রহিল না; কাযেই তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।

চাকুরী প্রাপ্তি।

কিন্তু কর্ম্মের জন্য আমায় আর ভাবিতে হইল না। অপর সংবাদপত্রের চাকুরী পাইলাম। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বিবৃত করার আবশ্যক এ স্থলে নাই।"

নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি উপলক্ষ করিয়া এবার আমরা প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। বিষয় বিস্তৃত এবং গুরুতর। স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা ও সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপর সমগ্র জগতের—সমাজ-শরীরের অর্দ্ধাঙ্গের এবং উত্তমাঙ্গের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। এক অঙ্গ অপূর্ণ থাকিয়া অপরাঙ্গের বিকাশ, কেবল বিরূপকর। তাহা সমগ্র শরীরের উন্নতি নহে,—উৎকট ব্যাধি। ভারতবর্ষ সকল বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও ব্যাধিগ্রস্ত। ব্যাধির বেগ দিন দিন বরং বাড়িয়াই উঠিতেছে। প্রায় এক শত বৎসর হইতে চলিল, মহাত্মা রামমোহন রায় রমণীকুলের অকূল পাথারে কাণ্ডারী হইয়াছিলেন, তাঁহার পর পুণ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন, ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও বোধ হইতেছিল যে, বাঙ্গালীর নারী-বধব্যাধি প্রশমিত হইতেছে। কিন্তু হা অদৃষ্ট। আজ কালকার অবস্থা কি? অবস্থা দেখিয়া মান। গোলাপি আমলের গলগণ্ড গলিত কুষ্ঠে পরিণত হইয়াছে। যাউক সে কথা। নারীজাতির সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে য়ুরোপই এ যুগে অগ্রণী। য়ুরোপ এ বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ও কোন্ পথে যাইতেছে, সময়ে সময়ে অবগত হওয়া ও আলোচনা করা উচিত। আমরা এবার কয়েকটি বিলাতী মাসিক পত্র হইতে এ বিষয়ের সার মর্ম্ম সঙ্কলন করার

পূর্ব্বাবৃত্তি।

প্রস্তাব করি। কিন্তু অগ্রেই বলা যাইতেছে যে, নারী জাতির শিক্ষা-নীতি য়ুরোপে যে পথে যাইতেছে, ভারতেও যে ঠিক সেই পথে যাইবে, আমরা এমন বিবেচনা করি না। এদেশীয়দিগের পথ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, স্বপ্রোদিত, ও সনাতন জাতীয় প্রথানুমোদিত হওয়াই উচিত। পাঠকদিগের অবগতির জন্যই কেবল য়ুরোপীয় অনুষ্ঠান ও আকাঙ্ক্ষার বিবরণ বিবৃত করিতেছি,—অবগতিরই জন্য, অনুকরণের জন্য নহে।

মডারণ রিবিউ।

ইথেল ষ্টোক্স নাম্নী এক লেখিকা, রমণীদিগের মধ্যে স্বয়মিচ্ছু সৈন্যদল গঠনের প্রস্তাব করিয়া "মডারণ রিবিউতে" এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখিকা স্বজাতীয়াদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—Women arise and play the man" স্ত্রীলোকের পুরুষোচিত কাজ করা উচিত কি না, সে স্বতন্ত্র কথা, আমাদের বিবেচনায় তাহা বরং করা উচিত নয়। কিন্তু কোন কার্য্য পুরুষোচিত, আর কিই বা রমণী-উচিত, অনেক বিষয়েই তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। এমনও দেখা গিয়া থাকে যে, কোনও কোনও পুরুষোচিত কার্য্য রমণী করেন, আর রমণীর করণীয় কার্য্য করেন পুরুষে। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিগত বিশেষ বিশেষ কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে জাতিগত একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম কিছুতেই খাটিতে পারে না, তা সে ব্যক্তিত্ব পুরুষের বা স্ত্রীলোকেরই হউক। মডারণ রিবিউর লেখিকার এ সব কথার আলোচনা করার আবশ্যক হয় নাই, প্রসঙ্গক্রমে আমরাই ইহার উল্লেখ মাত্র করিলাম।

স্ত্রীলোকের সৈনিক কার্য্য,—কথা কিছু নূতন নয়। সমগ্র পৃথিবীর পুরাতন ইতিহাসে ইহা অঙ্কিত আছে। তবে 'স্বয়মিচ্ছু' নাম ও পদ্ধতি কতক নূতন বটে। রাজপুত নারীগণ স্বয়মিচ্ছু হইয়াই সংগ্রাম করিতেন, ক্রান্সো প্রুসিয়ান যুদ্ধকালে স্বরাসী রমণীদিগের মধ্যে স্বয়মিচ্ছু সৈনিকসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। তবে স্থায়ী পুরুষ ভলন্টিয়ার দলের ন্যায় রমণী-ভলন্টিয়ার প্রথা—পাকাপাকি হওয়া উচিত কি না, তাহাই হইতেছে কথা। য়ুরোপীয়দের একথা য়ুরোপীয়েরাই ভাল বিবেচনা করিতে সমর্থ। তবে, অসভ্য আদিম কালে সর্ব্বদা ও মধ্যযুগে সময়ে সময়ে, আপন আপন জীবনরক্ষার্থেই স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই শস্ত্রযুদ্ধ করিতে হইত। কিন্তু মনুষ্য জাতি, এখন সে স্তর হইতে অনেক উপরে উঠিয়াছে। অতএব সে আবশ্যকতাও কদাচিৎ আছে। এখন সমর-প্রাঙ্গণ অপেক্ষা স্বগৃহে ও সমাজে রমণীদিগের প্রচুর কার্য্য বিদ্যমান বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

পেলমেল ম্যাগাজিন্।

পেলমেল ম্যাগাজিন্ লণ্ডনের নূতন মাসিক পত্র। জুন সংখ্যক পত্রে, লেডী ব্রুক তদীয় "সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে, ইংরেজ রমণীদিগের শিক্ষা, অধিকার ও উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। লেখিকার বিবেচনায়, ইংরেজ-রমণীদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিদ্যানুশীলন, ইংরেজ পুরুষদিগের অপেক্ষা যে কিছু কম হইতেছে, তাহা নহে, বরং স্থলবিশেষে, মানসিক উন্নতিতে পুরুষদিগের অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর হইতেছে। মফঃস্বল স্কুল কলেজে ইদানীং রমণী অধ্যাপকদিগেরই অপেক্ষাকৃত অধিক আদর। রমণীদিগের প্রবল সংগীতানুরাগও এ সময়ের শুভ লক্ষণ। ইংলণ্ডে বাস্তবিক মানসিক উন্নতি যে পরিমাণে হইতেছে, রাজনৈতিক অধিকার ঠিক সেই অনুপাতে

অগ্রসর হইলে আর কোনও কথাই ছিল না, কিন্তু লেডী ব্রুকের বিবেচনায় তাহা হইতেছে না, অতএব হওয়া উচিত।

কুমারী সারলট স্লিপ মেডিকেল ম্যাগাজিনে স্ত্রীজাতির শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। কুমারী বলেন,—ইংরেজ রমণীদিগের কেবল মানসিক শিক্ষাই হইতেছে,—তাঁহাদের শারীরিক শিক্ষা আশানুরূপ হইতেছে না। বিদুষীরা নিতান্তই দুর্ব্বল। বালিকা, স্কুল কলেজে কেবল পুস্তক পড়িতে,—নির্দ্দিষ্ট পাঠ কণ্ঠস্থ করিতেই বিব্রত থাকে, তাহাদের মস্তিষ্কেরই আলোড়ন বিলোড়ন হয়, উপযুক্ত ব্যায়ামাদি দ্বারা শারীরিক শিক্ষা ও শরীর-সঞ্চালনে শারীরিক বলবিধান পক্ষে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টিসাধন পক্ষে সবিশেষ দৃষ্টিপাত করা হয় না। সুতরাং বাল্যাবস্থা হইতেই বালিকাদিগের শরীর সম্যকরূপে বিকশিত ও সুগঠন প্রাপ্ত হয় না; ব্যায়াম ও উপযুক্ত সঞ্চালনের অভাবে বিকলাঙ্গ হইতে থাকে। রমণীদিগের স্বাভাবিক সুগঠন ও সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি হয় না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শীর্ণ, সংকীর্ণ, শিরা ধমনী মাংস পেশী সঙ্কুচিত ও মুখশ্রী মলিন হয়। বিবিধ বিদ্যায় বিদুষী হওয়ার পর বালিকার, যুবতীর কি মূর্ত্তি? কুৎসিতা, কুরূপা, শুষ্কা, শীর্ণা, চসমাধারিণী, ফ্লানেল-বিজড়িতা, ব্লু-ষ্টকিং-সজ্জিতা এক কিম্ভূতকিমাকার জীব। রমণী-সৌন্দর্য্য সকলেরই প্রিয়; কিন্তু সৌন্দর্য্য যে কিসে সৃষ্ট, বর্দ্ধিত ও সম্যক বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। অন্ততঃ, সৌন্দর্য্যের খাতিরেও রমণীদিগের মানসিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুনিয়মিত শারীরিক শিক্ষার বিশিষ্ট ব্যবস্থা হওয়া অত্যাবশ্যক। আজ-কাল ইংরেজ-রমণীসমাজে সৌন্দর্য্যের এতই অভাব হইয়াছে যে, চিত্র ও ভাস্কর্য্যের জন্য উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত আদর্শ পাওয়া যায় না। বিদ্যাবতীরা গ্রীক, ল্যাটিন ক্লাসিকে কথা কহিতে পারেন; গ্রীসীয় সাহিত্যে তাঁহারা সুপণ্ডিতা,—কিন্তু প্রাচীন গ্রীসীয় সৌন্দর্য্যের বিষয় তাঁহারা কখনও আলোচনা করেন কি? তাহা করিলে এমন দুরবস্থা হইত না। প্রাচীন কালের গ্রীসীয় নারী সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া, পার্টীন রমণী লাবণ্যে পরমরমণীয় প্রতিমা ছিলেন। কিন্তু কিসে, কোন উপায়ে, তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের এতাদৃশ স্ফূর্ত্তি হইত? ব্যায়াম, কুস্তি, জিমনাষ্টিক প্রভৃতি বিবিধ কসরৎ ও সর্ব্ববিধ-শারীরিক শিক্ষায় তাঁহারা শিক্ষিতা হইতেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেক অঙ্গ পারিপার্শ্বিক সম পরিমাণে প্রস্ফুট হইত;—স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য স্বাভাবিক শিক্ষায় সমুৎপন্ন হইত।

স্ত্রীজাতির শারীরিক শিক্ষা।

ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জর্ম্মণী ও অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশে এ বিষয়ে সাধারণের সম্যক মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা ব্যবস্থাপক সভায় রাজকীয় আইন কানুনের বিষয়ীভূত হইয়াছে। অতএব ইংলণ্ড যে অদ্যাপি এ বিষয়ে উদাসীন কেন, এজন্য লেখিকা আশ্চর্য্যান্বিতা।

রমণীদিগকে ব্যবহারিক উদ্ভিদ-বিদ্যা ও উদ্যানতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া, তাঁহাদিগের জন্য অপর একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন উপজীবিকা এবং স্বাস্থ্য ও সদাচারপ্রদ কার্য্য-ক্ষেত্র উদ্ঘাটনের জন্য য়ুরোপে আজ কাল সবিশেষ উদ্যোগ ও অনুষ্ঠান হইতেছে। অনেক গুলি সাময়িক পত্রে, বিগত কয়েক মাস ধরিয়া, এ বিষয়ের আলোচনা চলিয়াছে। এ বিষয়ে উদ্যানজীবী ও উদ্ভিদব্যবসায়ী মালিদিগের

রমণীর উদ্যানবৃত্তি ও উদ্যানব্রত।

সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পারিয়া উঠা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অসম্ভব, এজন্য সাধারণের যত্নে ও দানে, তাঁহাদের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইতেছে।

উদ্ভিদবিদ্যা ও হাতে হেতেরে উদ্যানে কাজ কর্ম্ম শিখাতে, শ্রমজীবী রমণীদিগের কেবল উপজীবিকা নয়,—সম্ভ্রান্ত নারীদিগের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইতে পারে। এ কার্য্য বস্তুতঃই স্ত্রী-জাতির স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীজনোচিত। ইহা আলস্যপরায়ণাদিগের উপযুক্ত কার্য্যে সময়ক্ষেপণের উৎকৃষ্ট উপায়। তাস পাশা খেলিয়া, বৃথা বাচালতা, পরনিন্দা ও পরকুৎসা করিয়া কাল কাটানর পরিবর্ত্তে, এ দেশীয় বড় মানুষের মেয়েরা যদি খিড়কীর বাগানের তত্ত্বাবধান ও পাট করেন, স্বহস্তে তথায় ফল ফুলের চারা রোপণ ও পালন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যেরও সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। এক কার্য্যে,—এক দিকে শরীরসঞ্চালনজনিত ব্যায়াম, অপর দিকে প্রকৃতির প্রিয় বস্তু পত্র পুষ্প ফলের সেবা শুশ্রূষায়, তাহা দানে ও বিতরণে চিত্তের স্ফূর্ত্তি,—উদ্যানসেবা,—বৃত্তি বা ব্রতরূপেই হউক, জীবিকা অর্জ্জন বা চিত্তবিনোদনের জন্যই হউক, উহা পরম রমণীয় ও সম্পূর্ণরূপে রমণীর উপযোগী। যুরোপে অতি উপযুক্ত চেষ্টাই হইতেছে; এ দেশে কি উহা সম্ভবে না? সত্য ত্রেতায় ঋষিপত্নী ও ঋষিকুমারীরা তপোবনের কত কার্য্যই না করিতেন। সন্তান-স্নেহে তাঁহারা লতা, বৃক্ষ ওষধির লালন পালন করিতেন। উদ্যানের প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক লতাতে তাঁহারা প্রিয় পুত্রকন্যার সজীব সুকুমার মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতেন! কিন্তু হায়। উদ্যানের কার্য্য এ দেশে, [illegible] ভদ্রের অশ্রদ্ধেয়, কেবল ইতর কুলী মজুর ও মালীর করণীয়!

বাগানের পাট, চাষার রোপণ, পালন ও কর্ষণ, স্ত্রীলোকদিগের মত পুরুষে কিছুতেই করিতে পারেন না। ফুলের আদর যত্ন স্ত্রীলোকদের মত কে করিতে পারে? উদ্যানকৃষি নারীজাতির অতিশয় উপযোগিনী; ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা যেরূপ বলিলাম, "অ্যাটল্যান্টিক মান্থলি"ও ঠিক সেইরূপ লিখিয়াছেন,—

অ্যাটল্যান্টিক মান্থলি।

"No one will deny that gardening is a very healthy form of exercise, nor will any girl who cares about her garden go out in the listless, uninterested manner of the girl who has no such inducement, who is in no hurry to go out because she has nothing to do when she gets there. This bed will want planting or weeding; these carnations should be tied up and staked; these seedlings must be thinned and those cullings are ready for repotting. The result of having these varied occupations in view will be that the girl will be eager to go out, and happy and busy during the whole time of her recreation. Then comes the pleasure which she will have in the flowers when grown. There is another kind of pleasure which she will also derive from gardening if she only sets her mind to it and that is the pleasure of giving.

সাহিত্যের দার্শনিক সমালোচনায় জর্ম্মণ সমালোচক সবিশেষ শ্রেষ্ঠ। সেক্সপীয়রের কাব্য

ও কবিত্বের মর্ম্মগ্রাহী সমালোচনা পৃথিবীতে অতুলনীয়। সংপ্রতি কোনও জর্ম্মণ সমালোচক (Hedwig Bendel) ইংরেজ নবেলিষ্ট জর্জ্জ ইলিয়ট সম্বন্ধে একটি সমালোচনা প্রকাশিত করিয়াছেন। সমালোচনা সম্পূর্ণ সহানুভূতি-মূলক;—কাব্য সাহিত্যের সমালোচনায় সহানুভূতি ও সদ্ভাবই অত্যাবশ্যক উপাদান,—জর্ম্মণ সমালোচনায়, সাধারণতঃ এ উপাদান প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্তব্য।

জর্জ্জ ইলিয়ট ও জর্ম্মণ সমালোচক।

বর্ত্তমান শতাব্দীর সাহিত্যক্ষেত্রে জর্জ্জ ইলিয়ট অসাধারণ রমণী। ইংরেজী সাহিত্যের সমীচীন ছাত্রমাত্রেই জর্জ্জ ইলিয়টকে জানেন, জর্জ্জ ইলিয়টের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। দেখা যাউক, জর্ম্মণ কি চক্ষে জর্জ্জ ইলিয়টকে দেখেন।

জর্জ্জ ইলিয়ট প্রাকৃত ও অর্থহীন প্রচলিত লৌকিকতার অতীত। লৌকিক পদ্ধতির পড়্ডলিকাপ্রবাহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, পরিচালিত করিতে পারে না; তিনি তাহার নিকট দিয়াই যান্ না, আদৌ অনুসরণ করেন না। কি প্রকৃত জীবনে, কি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে, জর্জ্জ ইলিয়টের অসাধারণ, অতিবৃহৎ ব্যক্তিত্ব,—অখণ্ড ও উচ্চতর প্রকৃতির বিশেষত্ব। এই সুবৃহৎ ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব, জর্জ্জ ইলিয়টের সর্ব্ব-প্রধান আকর্ষণী শক্তি, সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ পদার্থ। কেন না, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিশেষত্বগুলির প্রত্যেকই এক একটি ক্ষুদ্র পৃথিবীস্বরূপ। জর্জ্জ ইলিয়টের ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব রূপ সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডগুলি বড়ই জটিল, তাদৃশ জটিলতা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

"জর্জ্জ ইলিয়টের মস্তক অসাধারণ বৃহৎ—মুখশ্রী পুরুষভাবাপন্ন, নেত্রদ্বয় অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃপূর্ণ, বিশিষ্টরূপে মনোভাববিজ্ঞাপক, নয়নাভ্যন্তর দিয়া যেন সমগ্র হৃদয় মনের বহিঃস্ফুরণ হইতেছে,—নয়নজ্যোতিতে যেন মানস-কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে। জর্জ্জ ইলিয়টের মৃদু মন্দ হাস্য যাবপবনাই মনোহারিণী,—তাহার মধ্যে যেন কি-জানি-কেমন একটু অদৃষ্টপূর্ব্ব আনন্দদীপ্তি,—কেমন একটু সকরুণ, কমনীয়তার শান্ত সুশীতল ছায়া। জর্জ্জ ইলিয়ট যখন কোনও বিষয়ে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইতেন, তখন তাঁহার মুখভাবে এক মনোবিমোহিনী সৌন্দর্য্য-শক্তি প্রতিভাত, প্রতিবিম্বিত ও দৃশ্যকাব্যবৎ দেদীপ্যমান হইত, সে প্রদীপ্ত প্রতিভায় অতি-মূঢ়ের পাষাণ কঠিন মনও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। জর্জ্জ ইলিয়টের ব্যক্তিত্বে বীরত্ব ও অসাধারণত্ব সমপরিমাণে সংমিশ্রিত। তদীয় গ্রন্থে তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টি, তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত।

"জর্জ্জ ইলিয়টের প্রকৃতির ও প্রতিভার প্রধান বৈচিত্র্য,—অগ্নি। এ অগ্নি তাঁহার জীবনের অঙ্কুর হইতেই প্রজ্বলিত; বালিকার স্বল্প স্বভাবের আবেগময় অসংযমে, মানসিক তুফানে ও হৃদয়ের অপরিসীম অতলস্পর্শী কারুণ্যে এবং কোমলতায় এ অগ্নি প্রজ্বলিত। এ অগ্নি কিশোরীর,—যুবতীর অধ্যয়নতৃষ্ণায় ও জ্ঞানপিপাসায় প্রজ্বলিত। পরন্তু এ অগ্নি জর্জ্জ ইলিয়টের উৎসাহে, প্রণয়ে, বিশ্বাসে, মাহাত্ম্য-পূজায় প্রজ্বলিত। এই অসাধারণ অগ্নি দ্বারাই তাঁহার স্বভাবের সাধারণ শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য উজ্জ্বল আলোকময় ও অগ্নিময় হইত। জর্জ্জ ইলিয়টের শেষ বয়সে বরং এ অগ্নি অনেকটা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। তিনি কিয়ৎপরিমাণে ভীরু ও ভাব-অসহিষ্ণু হইয়াছিল। কেবলমাত্র সময়ে সময়ে তদীয় প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের

স্ফূর্ত্তি হইয়া তাঁহার অন্তরাত্মার পুনঃপ্রকাশ হইত, তখন তিনি ভীরুতা মৌনভাব ও শিথিলতা, দূরে,—অতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া,—বিদ্যুৎবৎ জাগিয়া উঠিতেন, অদম্য উৎসাহে সত্যের সমর্থন ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ করিতেন। তিনি তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তর উত্থিত 'আদেশের' উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও তদনুসারে কার্য্য করিতেন। গর্ব্বিতা, অসীমউৎসাহান্বিতা, অত্যানুভূতি-প্রবণা, জর্জ্জ ইলিয়ট, আত্ম-হৃদয়ের উত্তেজনাতেই চালিত হইতেন।

"জর্জ্জ ইলিয়ট উচ্চাভিলাষিণী ও পৃথিবীর প্রশংসাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। প্রজ্বলিত বাসনানলে উত্তেজিতা হইয়া তিনি নিজের নিকট ও পৃথিবীর নিকট অনেক প্রত্যাশা করিতেন। এ প্রকৃতির লোক কদাচিৎ প্রফুল্ল, প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। মনুষ্যজীবন প্রচুর পরিমাণে ইহাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করিতে পারে না, ইহাঁরা নিজেও নিজেদের জন্য প্রচুর পরিমাণে কিছু করিতে পারেন না। ইহাঁরা স্বভাবতই কিছু কোপনপ্রকৃতি,—আঘাতমাত্র, স্পর্শমাত্র, অসহিষ্ণু ও অভিমানী হন; অতি অল্পেই অত্যন্ত ব্যথা বোধ করেন। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর,—ক্ষুদ্রতম ক্ষতও, ইহাঁরা তীব্রাদপি তীব্র, তীক্ষ্ণাদপি তীক্ষ্ণরূপে অনুভব করেন। মনুষ্যভাগ্যে, তাহার জীবন-যুদ্ধে এবম্বিধ ক্ষতের ও আঘাতের অভাবও নাই,—সহস্র সহস্রের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়। সাধারণতঃ লোক যাহা গ্রাহ্যই করে না, ইহাঁরা তাহা অতিশয় গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করেন, ও তজ্জনিত মানসিক ক্লেশে নিপীড়িত হন।

"স্বার্থপ্রবণা ও নিঃস্বার্থপরায়ণা আসক্তির আলোড়ন বিলোড়ন ও আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বজনিত যাতনাতেও, জর্জ্জ ইলিয়ট কম ক্লেশ পান নাই। প্রশস্ত ও প্রেমপ্রবণ হৃদয়, সুতীক্ষ্ণ নীতি-জ্ঞান, স্বভাবসিদ্ধ সত্যপরায়ণতা, অত্যুগ্র কর্ত্তব্যবোধ, জর্জ্জ ইলিয়ট নিজ স্বভাবে পূর্ণতাপ্রার্থিনী ছিলেন। সেই প্রার্থনা বা প্রত্যাশা, উপরিলিখিত নৈতিক স্বরূপের সহিত সংমিলিত হইয়া, তাঁহাকে তাঁহার অতি তুচ্ছ দোষ দুর্ব্বলতার জন্য যাবপরনাই কষ্ট দিত। সে কষ্ট,—সে যাতনা, তাঁহার এক একটি হৃদয়স্পর্শী বর্ণনায় বিলক্ষণ প্রকাশ।

"জর্জ্জ ইলিয়টের প্রকৃতির আর এক অংশ এই যে, তিনি বিষয়বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের অধ্যয়নে ও বিশ্লেষণে সমগ্র হৃদয় মন নিয়োজিত করিতেন,—করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার নিজ শক্তির এবং স্বার্থের শতদিকব্যাপী কার্য্য ছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, তিনি সে সকল পশ্চাৎভাগে রাখিয়া, সর্ব্বাগ্রভাগে ও সম্মুখে সেই সংকল্পিত ও জীবন্ত আদর্শ মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া, তাহার অধ্যয়ন ও অঙ্কন করিতেন। জর্জ্জ ইলিয়টের স্বভাবের ইহা একটি সর্ব্বপ্রধান আসক্তি। এ আসক্তি সম্পূর্ণরূপে স্ত্রী-জনোচিত। ইহা মার্জ্জিতবুদ্ধি ও স্বাভাবিক সহজ-জ্ঞান হইতে উৎপন্ন, এবং পুরুষ অপেক্ষা নারীতে অধিক পরিমাণে প্রস্ফুট। জর্জ্জ ইলিয়টের এই শক্তি বা আসক্তি অসাধারণ রকম ছিল।"

জর্জ্জ ইলিয়টের চিন্তাশক্তি যেরূপে গভীরা ছিল, তাদৃশ ক্ষিপ্রা ছিল না। তিনি "ঝটপট" কোনও কিছু, গ্রহণ, ধারণ ও অঙ্কন করিতে পারিতেন না। ধীরে সুস্থে, আস্তে আস্তে এক একটু করিয়া পরখ পরীক্ষা করিয়া, চিন্তা করিয়া, তবে তিনি কোনও কিছু করিতেন। গুণাগুণ, সারত্ব, অসারতা, উপকারিতা বা অকর্ম্মণ্যতা অবধারণ না করিয়া, তিনি কিছুতেই হাত দিতেন না। তিনি সকল বিষয়ই সবিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত গ্রহণ করিতেন, সুতরাং তাঁহার

সকল কার্য্যই ধীর মন্থর গতিতে নির্ব্বাহিত হইত। এই জন্য তিনি কথোপকথনেও খুব মৃদু ছিলেন। এই মন্থরশীলতার জন্য তিনি নিজ শক্তিতে কিয়ৎপরিমাণে অনিশ্চিত ছিলেন। ইহা দ্বারা তাঁহার নিজের প্রতি নিজের প্রশান্ত বিশ্বাস নষ্ট করিয়াছিল। তিনি বহুলোকের মধ্যে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িতেন।

"জর্জ্জ ইলিয়টের তীক্ষ্ণানুভূতি-উত্তপ্ত স্বভাবে সহানুভূতি অতীব প্রবল ছিল। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত, পতিত ও পথভ্রান্তদিগের, দোষদুর্ব্বলতাপ্রবণদিগের দুঃখে যারপরনাই দুঃখিত হইতেন, কিন্তু তাহাদিগকে আন্তরিক দয়া করিতেন।—ও বুঝিতেন যে, অবস্থা গতিকে বা আসক্তির প্রকোপে পাপী পাপ করে। তিনি পাপীকে দয়া করিতেন, কিন্তু পাপের প্রতি তাঁহার দুরন্ত কঠোরতা ও অপরিসীম ঘৃণা ছিল। তাঁহার স্বাভাবিক সুনীতিপ্রবণ চিত্ত ও সুবিশুদ্ধ-চরিত্র সে আবশ্যকতা পরিহার করিবে কিরূপে? তবে মানব-হৃদয়ে অসাধারণ জ্ঞান, তাহার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ সূক্ষ্মদৃষ্টি,—তাঁহার স্বাভাবিক পর-দুঃখ-কাতরতার সহিত একত্রিত হইয়া, অন্যের প্রতি জর্জ্জ ইলিয়টের উগ্র সহানুভূতিকে অত্যুগ্র করিয়াছিল। পরন্তু তাঁহার দুরন্ত আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মদোষদর্শন, অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র ও ক্ষমাশীল করিতেছিল।"

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। শ্রাবণ। এবারকার "ভারতীর" শীর্ষস্থানীয় "প্রজাপতির মৃত্যুগান" একটি চলন-সই ছড়া মাত্র। ইহাতে কিছু বিশেষত্ব বা কবিত্ব দেখিলাম না। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'শিক্ষাসঙ্কট" সবেগে চলিয়াছে। "ভাষাবিভ্রাট" প্রবন্ধটি সময়োপযোগী ও আলোচনার সামগ্রী। লেখক বলেন, "ভাবের রাজ্যে কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের ভাষা ও ভাবের ছাঁচ ইংরাজী, অন্তঃপুরে ও বিশ্রামস্থানে আমাদের ভাষা ও ভাবের ছাঁচ বাঙ্গালী। * * * আমাদের সমস্ত কাজের কথা আসরা ইংরাজীতেই চালাইয়া থাকি। বাঙ্গালা ভাষাটা কেবল অকেজো কথার এবং কবিতার জন্য, অতএব অন্তঃপুরই তাহার উপযুক্ত স্থান। আমাদের সমস্ত Serious চিন্তা ইংরাজী ছাঁচে ঢালা এবং ইংরাজী ভাষাই তাহার উপযুক্ত অবলম্বন।" আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। লেখক "আমাদের" শব্দে যাঁহাদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাহাতে ইংরাজীশিক্ষিতদিগকেই বুঝিতেছি। সমগ্র বাঙ্গালার লোক সংখ্যার অনুপাতে ইংরাজীশিক্ষিতের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলিলেও অসঙ্গত হয় না। এই মুষ্টিমেয় ইংরাজীনবিশ ভিন্ন আর কেহ যে "সমস্ত কাজের কথা ইংরাজীতেই চালাইয়া থাকে", এমন নহে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারাও এই বাঙ্গালা ভাষাতেই কাজ চালাইতেছেন। লেখক বলিতেছেন, "কোন গূঢ়তত্ত্ব গভীর ও গম্ভীরভাবে আলোচনা করিতে বসিলেই বিপদ। বিজ্ঞান, ফিলজফি, পলিটিক্স্ ইত্যাদি আলোচনা করিবার ক্ষমতা বঙ্গভাষার নাই।' লেখকের এ কথাও স্বীকার করা যায় না। দেখা যাইতেছে, দর্শন বিজ্ঞানের অনেক গূঢ়তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় আলোচিত হইতেছে,—আবশ্যক মত বাঙ্গালা ভাষাও নবাগত অতিথিদের জন্য আসন রচনা করিয়া দিতেছে। আমাদের দেশে কূপমণ্ডূক লেখকদের বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গালা ভাষাটা

নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও দরিদ্র বলিয়াই তাঁহারা ইহাতে শুষ্কতর বিষয় লিখিতে পারেন না। কিন্তু মনে রাখা উচিত, সাধনা না করিলে সিদ্ধি হয় না। বর্ণপরিচয় শেষ করিয়া বাঙ্গালায় বিজ্ঞান লিখিতে গেলে, সত্যই শব্দের দুর্ভিক্ষ অনুভব করিতে হয়। আগে বাঙ্গালা না শিখিয়াই, বিস্তৃত অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা বাঙ্গালার শব্দসম্পত্তির অধিকারী না হইয়াই, বাঙ্গালা লিখিতে গেলে বিড়ম্বনা বই আর কি আশা করা যায়। এই লেখক ফিলজফি, পলিটিক্স্ প্রভৃতি দু একটি ইংরাজী কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি শব্দ নিবিষ্ট করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইত না। বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা, ইংরাজীর তুলনায় অল্প বলিয়াই ইংরাজী কথা আগে আসিয়া উপস্থিত হয়, লেখকও অমনি প্রথম-উপস্থিত ইংরাজী কথাটি প্রয়োগ করেন, বাঙ্গালায় সে শব্দ আছে কি না, ভাবিয়া দেখেন না। বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষা অপুষ্ট ও অসম্পূর্ণ, এ কথা স্বীকার করিয়াও বলা যায় যে, ইংরাজী কথা ব্যবহার না করিয়া বাঙ্গালা লেখা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিপুল ভাবরাজ্যের বিরাট প্রজ্ঞাদিগকে বাঙ্গালা ভাষার কুটীরে না হউক আটচালায় আশ্রয় দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। আমরা গথিক্ ধরণের অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে না পারি, বড় বড় চক্‌মিলান সেকেলে বাড়ীতেও অনেক অতিথির স্থান দিতে পারি। আসল কথা, সখে সাহিত্য হয় না, লেখক হইতে গেলে শিক্ষা-নবিশি না করিলে চলে না, এক এক জন পাশ্চাত্য লেখকের সাহিত্য-শ্রমের গল্প শুনিলে স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। আজীবন পরিশ্রম, অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন ও অবিরাম অনুশীলনের পর ভাষায় মনোভাব প্রতিভাসিত করিবার ক্ষমতা লাভ করা যায়। ভাষার শব্দভাণ্ডারে কি আছে না আছে, আগে তাহার তত্ত্ব না লইয়া, কলম চালাইতে বসিলেই শব্দের অনাটন প্রভৃতি বিবিধ বিড়ম্বনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। যদি সাহিত্যব্রত অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে পদার্পণ করিয়াই ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখিলে চলিবে না, তজ্জন্য অধ্যয়ন ও ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে। এ দেশে সেরূপ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের সম্পূর্ণ অভাব। সেই জন্যই বাঙ্গালা ভাষার এত দুর্দ্দশা। লেখক বলিতেছেন, "আমাদের দেশে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া নূতন আবিষ্কার করি, ওরিজিন্যাল্ কিছু একটা লিখিতে পারেন, এমন লেখক নাই বলিলেও চলে।" লেখকের এ কথা স্বীকার করিলে, বাঙ্গালা ভাষার দুর্গতি লইয়া তাঁহার সহিত আর তর্ক করিতে হয় না। কোন শব্দের দুর্ভিক্ষই এ দুর্গতির কারণ নয়, লেখকের অভাবই ইহার একমাত্র হেতু। "নূতন কথা সৃজন করিয়া লিখিতে হইলে ভাষা যে দুর্ব্বোধ্য হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু অনেক সময় কথা নূতন করিয়া সৃজন না করিয়া যদি সুপরিচিত ইংরাজী কথা ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে ভাষাটা ঢের বেশী বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা।" কিন্তু লেখকের মনে রাখা উচিত, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীর জন্য, এবং ইংরাজী-শিক্ষিতের সংখ্যা এত অল্প যে, নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজী কথা ইংরাজী-জানা পাঠকের "ঢের বেশী বোধগম্য" হইতে পারে, কিন্তু যাহারা ইংরাজী জানে না, তাহাদের পক্ষে বাঙ্গালার ভিতর ইংরাজীশব্দবিন্যাস নিতান্ত দুরূহ হেঁয়ালি হইয়া পড়িবে। ইংরাজী অনভিজ্ঞদিগকে ইংরাজী শব্দের অর্থ শিখাইয়া দেওয়াও যাহা, অপ্রচলিত দুরূহ, সংস্কৃত শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া, বরং তদপেক্ষা অনায়াসসাধ্য। পাশ্চাত্য ভাষার সঙ্গে প্রাচ্য ভাষার মোটে সাদৃশ্য নাই; কিন্তু পক্ষান্তরে সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালার শোণিতসম্বন্ধ আছে। ইংরাজী কথা লইয়া বাঙ্গালায় শব্দবৈভব সৃষ্টি করা অপেক্ষা, সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় সঞ্জীবনী-শক্তি সহজে সঞ্চারিত হইতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণের কল্যাণে সংস্কৃত ধাতুর ঐশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছামত অপর্য্যাপ্ত শব্দ সংগ্রহ, রচনা ও আমদানী করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে, অনেক দুরূহ সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। প্রথম পরিচয়ের সময়ে নিশ্চয়ই তাহারা শ্রুতিকটু ও অপরিচিতের মত উপেক্ষিত ছিল, কিন্তু কালক্রমে এখন তাহারা বাঙ্গালায় একরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এক ভাষায় নানা ভাষার শব্দ আসিয়া পড়ে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম—বিদ্রুতেই ইহার প্রতিরোধ করা যায় না। প্রতিরোধের আবশ্যকও হয় না। যে সব ইংরাজী কথা ধীরে ধীরে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতেছে, তাহা স্বাভাবিক নিয়মের বলে। তদপেক্ষা অতিরিক্ত

বাড়াবাড়ি দেখিতে যাওয়া সমীচীন হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালা অভিধানের ভিতর ইংরাজী অভিধানের সম্পূর্ণ অপরিচিত ও ভিন্নভাবাপন্ন কথাগুলি ছাড়িয়া দিলে, কোনও মতেই কাজ চলিতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ের নিষ্পত্তির ভার সময় ও স্বভাবের উপর দিয়া, আপাততঃ সংস্কৃত হইতেই শব্দসম্পত্তি আহরণ করা ভাল। শ্রীমতী বিনয়কুমারী বসুর 'লক্ষ্মী' নামক কবিতাটি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। কবি, "লক্ষ্মীর" পৌরাণিক সৌন্দর্য্যটুকু কবিত্বের সুষমা দিয়া বড় সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "দেব-প্রয়াগ" বেশ হইতেছে। "সন্ন্যাসী" নামক গল্পটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। "কুমন্ত্রণা" "সুমন্ত্রণার' উত্তর কাটাকাটি এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার বসুর, "সুমন্ত্রণায়" কবিত্ব আছে। আমরা আশা করি, তিনি কুমন্ত্রণার জবাবে সময়ক্ষেপ না করিয়া, স্বাধীনভাবে গীতি-কবিতার অনুশীলন করিবেন। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "তুকি বর বনে" কৌতূহলজনক, সুখপাঠ্য প্রবন্ধ।

নব্যভারত। শ্রাবণ। এবারকার নব্যভারতের প্রধান প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "পঞ্জিকাবিভ্রাট"। এরূপ জ্ঞানগর্ভ গবেষণাপূর্ণ আলোচনা বাঙ্গালায় বড় বিরল। আমরা পাঠকদিগকে সমগ্র প্রবন্ধটি পড়িতে বলি। সার্জ্জন মেজর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু "খাদ্য" সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছেন। সাহিত্যের হিসাবে যাহাই হউক, এরূপ প্রবন্ধ দৈনিক জীবনের বড়ই উপকারী। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামীর "বীরাঙ্গনা" কাব্য সমালোচনাটিও মন্দ নহে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তকৃত "প্রেমের পরীক্ষার সমালোচনা" একটি সুলিখিত প্রবন্ধ বটে, কিন্তু বড় সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। আমরা হীরেন্দ্র বাবুর মত সমালোচকের নিকট আরও বেশী আশা করি। "কৃষিকার্য্যের উন্নতি" বেশ চলিতেছে। "বঙ্গহারা ফরিদপুর,' সম্পাদকের রচনা। ফরিদপুরবাসী পাঠকদের প্রীতিকর হইলেও, ইহা সাধারণ পাঠকের উপযোগী হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় ফরিদপুরের যে কয়টি লুপ্ত রত্নের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করা সহৃদয়তার কার্য্য। কিন্তু তিনি যে ভাবে এই পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা বড় অল্প।

সাধনা। শ্রাবণ। সাধনার প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প—"শাস্তি"। লেখক গল্পটি লিখিয়া কাহাকে শাস্তি দিতে চাহেন, বুঝিতে পারিলাম না। যদি পাঠককে শাস্তি দেওয়াই তাঁহার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে। "উকিলের কাহিনী" একটি সামাজিক নক্সা; ইহাতে দোষ গুণ উভয়েরই সমান অভাব। "গ্রহমণ্ডলী" শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সুলিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'পিসের লোটি ও ইস্তাম্বুল" প্রবন্ধটির বিষয় ভাল, কিন্তু ভাষা অতি দরিদ্র, অসম্পূর্ণ, খাপ্‌ছাড়া। ভাষার জঞ্জালে পড়িয়া লোটি শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছেন। চলিত ভাষায় লেখা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ভাষায় বিলক্ষণ দক্ষতা না থাকিলে, চলিত ভাষা লইয়া লোফালুফি করা যায় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এক দিকে সুনির্ব্বাচিত সুন্দর সাধুভাষার সংগ্রহ ও অপর দিকে নিতান্ত চলিত অপশব্দের অপপ্রয়োগ, খিচুড়ীর মত হইয়াছে। স্থানে স্থানে রচনা দেখিয়া লেখিকার রচনাশক্তির ও শব্দনির্ব্বাচনপটুতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যদি খেয়াল ও যথেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া সংযত ভাবে বাঙ্গালা লেখেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উপকার করা হয়;—এরূপ প্রবন্ধকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীগীতচিন্তামণি" বৈষ্ণবসাহিত্যবিষয়ক একটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ। "সাংখ্য দর্শন" প্রবন্ধ বেশ হইতেছে। "সাংখ্য বৈদান্তিক ও লৌকিক আত্মা" এবারকার সাংখ্যদর্শনের বিষয়।

গীদে মোপাসাঁ।

কেবল মাত্র সমালোচনা দ্বারা এক জন অপরিচিত গ্রন্থকর্ত্তাকে পাঠক-বর্গের নিকট পরিচিত করা বড় কঠিন। গ্রন্থপাঠেই গ্রন্থকর্ত্তার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে যদি আবার সেই অপরিচিত গ্রন্থকার পাঠকের অপরিজ্ঞাত ভাষায় লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিচয় দেওয়া সমালোচকের পক্ষে কঠিন নয়—অসম্ভব। অনুবাদে আমাদের বিশ্বাস নাই। সত্য বটে, সাহিত্য-সংসারে দু একটি সুন্দর অনুবাদ আছে, কিন্তু সাধারণতঃ কাব্যসৌন্দর্য্য ভাষান্তরিত হইবার নহে—অনুবাদে তাহার কমনীয় কান্তি কোথায় চলিয়া যায়। পদ্যকাব্যের ত কথাই নাই—ভাবপ্রকাশে কবির প্রধান অবলম্বন ছন্দ, কিন্তু অনুবাদে ছন্দের মাধুরী একেবারে বিলুপ্ত হয়। Carey সাহেব দান্তের মহাকাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন—অতি উপাদেয় অনুবাদ, সাধারণ্যে তাহার বহুল প্রচার। কিন্তু গোষ্পদে যদি সাগরের মহিমা অনুভূত হয়, তাহা হইলে ইংরেজ অনুবাদকের অমিত্রাক্ষর পয়ারেও ইতালীয় কবিগুরুর অমর ছন্দের মহাসঙ্গীত শুনিতে পাইবে। পাঠক বলিতে পারেন, Carey সাহেব কবি নন—এক জন প্রকৃত কবি যদি Divina Comediaর অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে ছন্দঃসৌন্দর্য্য বজায় থাকিত। কিন্তু কোন দুটি ভাষায় একই ছন্দ প্রচলিত থাকিলেও এক ভাষায় সে ছন্দ যেরূপ শুনাইবে, অপর ভাষায় তাহা কখনই সেরূপ শুনাইতে পারে না। সাহিত্যানুরাগী পাঠক অবগত আছেন যে, Byron, Mrs. Browning, William Morris প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় শ্রেষ্ঠ কবি-গণ দান্তের ছন্দের অনুকরণে সফলমনোরথ হন নাই। এবং কতকগুলি ফরাসী ও ইংরাজী ছন্দের পরস্পর সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, Swinburneএর কবিতায় যে

ফরাসী অনুবাদ হইয়াছে, তাহা গদ্যে। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবির বিশ্ব-বিজয়ী সঙ্গীতের গদ্যানুবাদ! হায় অনুবাদ!! এ দিকে Swinburne এত বড় এক জন উচ্চদরের কবি হইলেও, গ্রীক্ ভাষায় তাঁহার অলোকসামান্য পারদর্শিতা থাকিলেও, এবং গ্রীক ভাবে পূর্ণপ্রাণ হইলেও, তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে, না অনুবাদে না অনুকরণে Saphoর গীতিকাব্যের ঔদার্য্য, মহত্ব এবং মাধুর্য্য ইংরেজী ছন্দে আনিতে পারিয়াছেন। এ বিষয়ে কিন্তু আমাদের বিশেষ গৌরব আছে—বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে, অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবির কয়েকটি কবিতার চমৎকার অনুবাদ করিয়াছেন। তাহাতে ছন্দের সুষমা, ভাবের মাধুর্য্য এবং পদের মহত্ব, সকলই রক্ষিত হইয়াছে। কোন্‌টি অনুবাদ, কোন্‌টি মূল, তুমি বলিতে পারিবে না। যেন দুই খানি সমুজ্জ্বল মুকুরে একই সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছে।

পদ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট গদ্যেরও রাগিণী আছে। "Prose has its Cadences." সে রাগিণীও লেখকের ভাষার সহিত আজন্ম মিশ্রিত। ভাব ও রস প্রকাশের জন্য তাহা ভাষারই সহিত, কেবল এক সঙ্গে নয়, একই অঙ্গে আবির্ভূত। তোমার অনুবাদ যদি ভাষান্তরমাত্র হয়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তুমি লেখকের রচনার অর্দ্ধাঙ্গমাত্র অনুবাদ করিলে। ইহা ছাড়া আর এক কথা এই, প্রত্যেক ভাষাতেই এমন অনেক কথা দেখিতে পাইবে, যাহাদের স্বতন্ত্র প্রতিকৃতি—নিজস্ব চেহারা আছে। অপর ভাষায় তাহাদের প্রতিবাক্য কখনও তাহাদের সমগ্র অর্থ, তাহাদের সমস্ত প্রাণ যথাযথ প্রতিবিম্বিত করিতে পারে না। হয় ত কোন ভাষায় একটি আদরের কথার অন্তরালে ঈষৎ ব্যঙ্গের বঙ্কিম হাসি প্রচ্ছন্ন আছে। অপর ভাষায় তাহার প্রতিবাক্যে তুমি আদরটুকু পাইবে, ব্যঙ্গটুকু পাইবে না। কিন্তু বোধ হয় সেই ব্যঙ্গের বঙ্গতেই আদরের বেশী আদর। রচনার অর্দ্ধেক শ্রী শব্দনির্ব্বাচনে—এক একটি কথার সহিত কত স্মৃতিই জড়িত। সেই জন্য প্রবীণ ফরাসী কবি Gautier এক জন নবীন লেখককে পরামর্শচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি অভিধান পড়িয়া থাক ত? কথার যদি মূল্য এত অধিক হইল, এবং ভাষা হইতে ভাষান্তরে যদি সকল কথার অর্থসর্ব্বস্ব অক্ষুণ্ণ রাখা এক প্রকার অসাধ্য হয়, তাহা হইলে অনুবাদে আমাদের শ্রদ্ধার অভাব সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

---

* প্রভাত সঙ্গীতে "ভাবা ও আঁখি" এবং "সূর্য্য ও ফুল" দেখ।

কিন্তু দেখিতেছি, আমরা প্রবন্ধের দ্বারদেশেই পাঠককে আবদ্ধ রাখিতেছি। আমরা আজি এক জন খ্যাতনামা ফরাসী উপন্যাসলেখকের সহিত পাঠকের পরিচয় করিয়া দিতে চাহি; কিন্তু সাধারণ বঙ্গীয় পাঠক ফরাসী ভাষায় অনভিজ্ঞ। আমরা অনুবাদে বিশ্বাসহীন। সুতরাং কি করিয়া আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইব, ঠিক করিতে পারিতেছি না। সম্প্রতি গ্রন্থকারের মৃত্যু হইয়াছে, এবং সমস্ত সভ্য-জগতে তাঁহার কাব্যনিচয়ের সমালোচনা হইতেছে। আমরাও সমালোচনাচ্ছলে পাঠকদিগের সমীপে এই লেখকের বিশেষত্ব নিরূপণ করিতে চেষ্টা পাইব। সকল প্রথম শ্রেণীর লেখকদিগের ন্যায়, তাঁহারও বেশ সুন্দর এবং সুস্পষ্ট বিশেষত্ব ছিল।

আধুনিক ফরাসী লেখকদিগের মধ্যে Guy de Maupassant একজন অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রতিভাশালী। ছোট গল্প রচনায় তাঁহার সমকক্ষ নাই। তিনি বড় উপন্যাসও চারি পাঁচ খানি লিখিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে দুই এক খানি সাহিত্যজগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভও করিয়াছে। কিন্তু Maupassantএর অসাধারণ গুণপণা—ক্ষুদ্র গল্পরচনায়। তাঁহার উপন্যাসসমূহের মধ্যে এমন এক এক অধ্যায় আছে, যাহা সৌন্দর্য্যে পৃথিবীর যে কোন উপন্যাসের সমান। তাহাদের ভিতর দুই একটি চরিত্রসৃজনও অতি চমৎকার। এবং [illegible] ও বর্ণনায় Maupassantর এমন একটু অসাধারণ বিশেষত্ব আছে, সৌন্দর্য্য উদ্ভাবনে তাঁহার এমন বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে যে, ফরাসী ভাষার প্রথম শ্রেণীর লেখকদিগকে তাঁহার কাছে মস্তক অবনত করিতে হয়। কিন্তু তবুও তাঁহার উপন্যাসগুলি তাঁহার গল্পসমূহের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়। তাহাদের কোথায় একটু খুঁৎ—একটু অভাব আছে। তাহারা বেশ সুগোল নয়। পরিণতির পূর্ণ সৌষ্ঠব তাহাদের নাই। প্রথম শ্রেণীর কাব্যের ভিতর কেমন একটি ক্রমবিকাশ আছে, নৈসর্গিক সৃষ্টির ন্যায় তাহারা কেমন ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। একটির পর একটি ঘটনা নিতান্ত স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য ভাবে সংযোজিত হইয়া কাব্যের অঙ্গসমূহকে পুষ্ট করিতে থাকে। Maupassantএর উপন্যাসসমূহে এই মৌলিক নিয়ম লক্ষিত হয় না। তাহাদের ভিতর একটি সমগ্র ভাব পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পায় নাই, একটি পরিপুষ্ট জীবন গঠিত হয় নাই, ঘটনাসমূহের মধ্যেও নৈসর্গিক সংলগ্নতা নাই। তাহারা একজাতীয় হইলেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। যেটি আগে আছে, সেটি পরে যাইতে পারে, এবং যাহা পরে আছে, তাহা আগে যাইতে পারে, ইহাতে গ্রন্থের কিছু আসিয়া যায় না। এমন কি,

অনেকগুলি ঘটনা একেবারে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। ইহাতে কি বুঝায়? ইহাতে বুঝায় যে, গ্রন্থের বন্ধন সকল অতি শিথিল। কোন পূর্ণাবয়ব পূর্ণপ্রাণ কাব্য হইতে যদি একটি সামান্য অংশ বিচ্ছিন্ন কর, দেখিবে, তাহাতে সমগ্রের সৌন্দর্য্য অপহৃত হইয়াছে।

Maupassantর দুই একখানি উপন্যাস লইয়া একথা আরও কিছু বিশদ করা যাক। ইহাঁর সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস Une vie "একটি জীবন"। ইহাতে একটি দুর্ভাগা স্ত্রীলোকের অসামান্য দুঃখের জীবন বর্ণিত হইয়াছে। কেবল মাত্র তাহার শৈশবকাল মাতা পিতার স্নেহময় অঙ্কে সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু যে দিন জনক জননী তাহাকে তাহার স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন, সেই দিন অবধি তাহার জীবন অন্ধকার হইয়া আসিল। বিবাহ উৎসবের কিছু দিন পরেই স্বামীর পিশাচ প্রকৃতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। সদ্যবিবাহিতা যুবতী স্বামী বর্ত্তমানে বিধবা হইল। কিছুদিন পরে স্নেহময়ী জননী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। স্বামী নিজ কর্ম্মফলে কাহার দ্বারা হত হইল। অনন্তর পিতা মরিলেন। রহিল কেবল একমাত্র স্নেহের অবলম্বন একটি পুত্র। সে আবার বিকলবুদ্ধি হৃদয়-হীন জড়বৎ। তবু তাহাকেই কাছে পাইয়া মায়ের হৃদয় শান্ত কিন্তু এ সুখটুকুও বিধাতার প্রাণে সহিল না। পুত্র অসৎসঙ্গে পড়িয়া ঋণ দায়ে দেশত্যাগী। অভাগিনী মরিলেই সকল যন্ত্রণার অবসান হয়। এমন সময়ে সংবাদ আসিল, বিদেশে নীচজাতীয়া একটি স্ত্রীরত্নের সহিত পুত্ররত্নের শুভ বিবাহ হইয়াছে, এবং বধূ একটি কন্যা প্রসবের পর মরিয়াছেন। পৌত্রীকে কোলে পাইয়া অভাগিনী আবার মৃত্যুর দিক হইতে জীবনের দিকে মুখ ফিরাইল। এই সময়ে তাহার স্বগত উক্তিটি বড় স্বাভাবিক—"যাই বল, তুমি আমি যতটা ভাবি, এ জীবনটা তত সুখও নয়, তত দুঃখেরও নয়"। এইখানে Maupassant সত্যের সুন্দর শ্রী আঁকিয়াছেন। এ জগতে মরিতে চায় কে? তুমি কি প্রতিদিন দেখিতেছ না, কত লোক শাখাপল্লবহীন বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় জীবনমরুভূমিতে একা দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু একদিন একটু বসন্তের হিল্লোলে বা নববর্ষার বৃষ্টিসম্পাতে, তাহার দগ্ধ অঙ্গে কোথায় দুটি শ্যাম পল্লব দেখা দিল—অন্ততঃ তাহার পাদদেশে স্নিগ্ধশ্যামল নধর শৈবালরাশি অঙ্কুরিত হইল? কিন্তু এই সকল ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কোন নৈতিক সম্বন্ধ নাই। তাহারা কেবল মাত্র পরের পর ঘটিয়া যাইতেছে। ইচ্ছা করিলে আরও দু দশটা দুঃখময় ঘটনা যোজনা করা যাইতে পারে। তাহাদের ভিতর কোন

সংঘর্ষের স্রোত, বেগ বা আবর্ত্ত নাই। ঘুরাইয়া পাকাইয়া তাহারা নায়িকার জীবনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে না, বা নায়িকার জীবন হইতে কোন অপূর্ব্ব অদম্য মানসিক শক্তি উদ্ভাবিত করিতেছে না। এক কথায়, ইহাতে বাহ্য এবং অন্তর্জ্জগতের সংগ্রাম নাই—ঘাতপ্রতিঘাত নাই। কবি ইহার নাটকত্ব কিছুই দেখাইতে পারেন নাই। এত দুঃখের চিত্রে পাঠকের হৃদয়ে করুণার তরঙ্গ উঠে না, চক্ষে এক বিন্দু অশ্রুর উদয় হয় না।

Maupassantর দ্বিতীয় উপন্যাস Bel-Ami—এমন নিষ্ঠুর ও লক্ষ্যহীন পুস্তক বোধ হয় জগতে আর একখানি নাই। ইহার নায়ক এক জন অতি অসার, অপ্রিয়, হৃদয়হীন নরাধম। গ্রন্থের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, সে নিরুপায় দরিদ্র। পরে একের পর এক করিয়া তাহার প্রভু এবং সুহৃৎবর্গের স্ত্রীসমূহের প্রেম অর্জ্জনে নিজের অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল; কিন্তু ইহাতে না আছে ঘটনার বৈচিত্র, না আছে ক্রমাভিব্যক্তি। ইহার অগ্রও যাহা, পশ্চাৎও তাহা। গ্রন্থের যে কোন স্থান আরম্ভ বা শেষ হইতে পারে। বাস্তবিক ইহাতে কিছুই আরম্ভ হয় নাই, কিছুই পরিণাম পায় নাই। আমরা নায়ককে প্রথম পরিচয়ে যেরূপ দেখি, বিদায়কালেও সেইরূপ দেখি। যদি পাপেরই জীবন দেখাইবার গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল—এবং কাব্যের এমন সুন্দর ও উপাদেয় বিষয় আর কি হইতে পারে?—তাহা হইলে তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। গ্রন্থের কোথাও পাপের প্রলোভন, তাহার আপাত-মিষ্টতা, তাহার মায়াময়ী মরীচিকা মূর্ত্তি—দেখিলাম না। অপর দিকে পাপের বিভীষিকা—তাহার বিষদংশনের সর্ব্বগ্রাসী পরিণাম—তাহার কঠোর প্রায়শ্চিত্তের করুণ চিত্রও দেখিলাম না। Romola নামক উপন্যাসে George Eliot কেমন অসামান্য ধৈর্য্য এবং নৈপুণ্য সহকারে দেখাইয়াছেন, তুমি কি করিয়া, ধীরে ধীরে, ভোগার অজ্ঞাতসারে একটি সামান্য ত্রুটী হইতে আরম্ভ করিয়া পরে গভীর এবং গভীরতর পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হও। অবনতির পিচ্ছিল এবং নিম্নাভিমুখ পথের কি সুন্দর চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু Maupassantর উপন্যাসে ইহার কিছুই নাই—সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠা গ্রন্থের ভিতর তোমাকে কাহারও দুঃখে দুঃখিত বা কাহারও সুখে উল্লসিত হইতে হয় না। এমন কেহ নাই, যাহার সুন্দর শ্রী দেখিয়া তুমি মুগ্ধ হও—যাহার গুণে তুমি তাহাকে ভালবাসিতে পার। গ্রন্থের কোথাও দয়া দাক্ষিণ্য বা প্রেম নাই—মানবসুলভ ভ্রমপ্রমাদ বা দুর্ব্বলতা নাই—কোথাও শিশুর প্রফুল্ল মুখের হাসির আশির্ব্বাদ নাই, এবং বৃদ্ধের স্নিগ্ধ দৃষ্টির

অমূল্য প্রীতি-উপহার নাই। এমন একটি চরিত্র নাই যে, মনোরাজ্যে তোমার চিরসহচর হইতে পারে—যাহাকে তুমি জীবনের আপদ বিপদে, সুখে দুঃখে স্মরণ করিতে পার। পাপেরও যে চিত্র আছে, তাহা বিশাল—আসুরিক বা অমিত দুষ্কর্ম্ম অর্জ্জনে দর্পিত নয়। সে চরিত্রের কোথাও উদ্দাম সাহস বা অবিচলিত নির্ভীকতা দেখিলাম না। তাহাতে Don Juan বা Cenci'র দানব প্রকৃতির কিছুই নাই। সকলই তুচ্ছ দীন ঘৃণ্য—ঘৃণ্য—ঘৃণ্য। গ্রন্থের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল ঘৃণার কুৎসিত নাসিকাকুঞ্চন। নায়ক ঘৃণ্য—অপর পাত্রপাত্রী ঘৃণ্য। এবং যে সকল স্ত্রৈবিণী তাহাদের অমূল্য শ্রী-সৌভাগ্য অবাধে বিসর্জ্জন করিতেছে, তাহারা ঘৃণ্য হইতেও ঘৃণ্য।

কিন্তু এই উপন্যাসের ভাষা মোহমন্ত্র বিশেষ। Maupassantর কোন গ্রন্থেরই ভাষা এত সুন্দর নয়। তাহাতে আবার ইহার স্থানে স্থানে অতি মনোরম বিষয় সকলের অবতারণা আছে, এবং বর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবি-দিগের ন্যায়। তাঁহার প্রথম উপন্যাসের এরূপ ভাষাসৌভাগ্য নাই। বোধ হয়, ইচ্ছা করিয়াই গ্রন্থকার সেই দুঃখের চিত্রকে একটু শান্ত, একটু অনুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। শুনিতে পাই, ফ্রান্সীরা Bel-Amiর বড় ভক্ত। ভাষার গুণে, সুন্দর বর্ণনার জন্য, জ্ঞানগর্ভ উক্তিসমূহের জন্য, এবং জীবনের অপরূপ চিত্র অঙ্কনের জন্য, এই পুস্তক যে ফরাসীদের চিরআদরণীয় হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নয়।

Maupassantর একখানি উপন্যাস সকল দেশেই বিশেষ আদৃত হইয়াছে, এবং ইউরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু এ খানি আকারে একটি বড় গল্পমাত্র, এবং বেশী বড়ও নহে। তাঁহার দুই একটি উৎ-কৃষ্ট গল্প L'heritage বা Boub de Suif আয়তনে ইহা অপেক্ষা সমধিক ক্ষুদ্র নহে। তাহা ছাড়া যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি গল্প রচনা করেন, সেই প্রণালীতেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ছোট গল্প লিখিতেই Maupassant সিদ্ধহস্ত। গল্পতেই তাঁহার বল। এখন আমরা তাঁহার গল্প লিখিবার প্রণালী আলোচনা করিব।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

বৈদিক প্রবন্ধ।

সুদাস।

বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ন্যায় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষ্যবাক্যে আমরা অবগত হই যে, সুদাস একজন অসমসাহসিক—অসাধারণ রণকুশল প্রবলপরাক্রম দিগ্বিজয়ী রাজাধিরাজ ছিলেন। বহুসংখ্যক বিপক্ষ রাজা দলবদ্ধ হইয়া, তাঁহার পৈতৃক রাজ্য মৎস্য নামক জনপদ আক্রমণ করিলে, তিনি স্বকীয় বাহুবল ও সমরনৈপুণ্যে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে আপন শত্রুকুল সংহার করিয়া, সিন্ধু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত সমুদায় প্রদেশের একেশ্বর হইয়াছিলেন। সুদাসের রচিত বেদসূক্তটি পাঠ করিলেও বুঝা যায় যে, যুদ্ধবিগ্রহেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় যাপিত হইয়াছিল। তদীয় বেদসূক্তটিকে উপাসনাসঙ্গীত বলিলেও চলে—সমরসঙ্গীত বলিলেও চলে। ফলতঃ, এই অপূর্ব্ব সংগীতটির কেবল ভাষায় অনুবাদমাত্র পাঠকগণকে উপহার দিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না; ইহার মূলগুলি অস্মদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেরই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। বৃক্ষপত্রের ন্যায় অসংখ্য মনুষ্যের জন্ম ও পতন হইতেছে। কিন্তু সুদাসের ন্যায় মনুষ্য ধরাতলে অল্পই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ন্যায় গভীর চিন্তাশীল, সিংহবিক্রান্ত নরনেতার হৃদয়ের ভাব কিরূপ ছিল, ইহা জানিতে কাহার না কৌতূহল জন্মে? সাধারণ মনুষ্য পৃথিবীতে আসে যায়, কিছুকাল পরে আর তাহাদের চিহ্নমাত্র থাকে না;—সুদাসেরও সাম্রাজ্য অনেক কাল হইল, বিলুপ্ত হইয়াছে। কোথায় তাঁহার মৎস্য রাজ্য ছিল, তাহা এক্ষণে সুনিশ্চয় করা কঠিন। তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহের কথাও মনুষ্য প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সুদাস কেবল বিজেতা নরপতি হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন নাই; তাঁহার আত্মা আজিও আমাদের সহিত কথা কহে। তিনি মনুষ্যের সনাতন শিক্ষকসম্প্রদায়ের মধ্যে এক জন। তাঁহার হৃদয়ের ভাবের সহিত আমাদের হৃদয়ের ভাব তুলনার যোগ্য। তিনি যেন কালার্ণবের অপর পার হইতে সমরভেরী বাজাইয়া আমাদিগকে সম্ভাষণ করিতেছেন। তদীয় সঙ্গীতের প্রত্যেক বর্ণ ভারতবর্ষীয় আর্য্যকুলের প্রত্যেক নরনারীর কণ্ঠস্থ থাকা

উচিত। দুঃখের বিষয়, এই সংগীতটি অতি ক্ষুদ্র। পাঠ করিবা, তাদৃশ রচনা আরও থাকিলে ভাল হইত, মনে হয়। ভরসা করি, অস্মদ্দেশীয় সংগীতশাস্ত্র-নিপুণ গায়কেরা ইহাকে উপযুক্ত সুরে গাঁথিয়া, জনসাধারণের কণ্ঠস্থ করিয়া দিবেন। সংগীতটি এই—

প্রোষু অস্মৈ পুরোরথমিন্দ্রায় শূষমর্চত।
অভীকে চিদু লোককৃৎসঙ্গে সমৎসু বৃত্রহা
অস্মাকং বোধি চোদিতা,—নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু॥
স্বং সিন্ধুঁবরাসৃজোঽধরাচো অহন্নহিম্।
অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে বিশ্বং পুষ্যসি বার্য্যং
তং ত্বা পরিষ্বজামহে,—নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু॥
বিষু বিশ্বা অবাতযোঽর্ষো নশং ত নো ধিয়ঃ।
অস্তাসি শত্রবে বধং যো ন ইন্দ্র জিঘাংসতি
বা তে রাতির্দদির্বসু;—নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু॥
যো ন ইন্দ্রাভিদাসতি সনাভির্যশ্চ নিষ্ট্যঃ।
অধস্পদং তমীং কৃধি যো অস্মাঁ অভিদাসতি
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু॥
যো ন ইন্দ্রাভিদাসতি সনাভির্যশ্চ নিষ্ট্যঃ।
অব তস্য বলং তির দ্যৌর্ধন্বনা
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু॥
বয়মিন্দ্র ত্বায়বঃ সখিত্বম্ আবৃণীমহে।
ঋতস্য নঃ পথা নয অতি বিশ্বানি দুরিতা,—
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু॥
অস্মভ্যং সু ত্বমিন্দ্র তাং শিক্ষ যা দোহতে প্রতি বরং জরিত্রে।
অচ্ছিদ্রোধ্নী পীপয়দ্ বৎসায় নঃ সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ॥

ঋগ্বেদ॥ ১০—১৩৩—১—৭।

"প্রকৃষ্টরূপে, সুন্দররূপে এই ইন্দ্রের রথাগ্রে বর্ত্তমান পরাক্রমকে পূজা কর। সংগ্রামে শত্রুবল আসন্ন হইলেও যিনি দৃঢ় থাকিবার শক্তি প্রদান করেন, যিনি আবরণকারীগণের হন্তা, তিনি আমাদের নেতা হইয়া, আমাদের আহ্বানে কর্ণপাত করুন। কুৎসিত শত্রুগণের কুৎসিত ধনুর্গুণ ছিন্ন হউক। (১)

(১) ইন্দ্রে সুদাসের জীবন বিশ্বাস। সংগ্রামে ইন্দ্র তাঁহার রথাগ্রে থাকিয়া যুদ্ধ করেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি শত্রুকুল কর্ত্তৃক স্বদেশকে আক্রান্ত দেখিয়া, ইন্দ্রের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া, যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েন। 'যাহারা স্বীয় দেশ রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ অস্ত্রী-

"তুমিই সিন্ধুগণকে প্রবণ প্রদেশাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছ—তুমিই অন্তরীক্ষ-চারী মেঘকে বিদীর্ণ করিয়াছ, হে ইন্দ্র! তুমি প্রতিপক্ষরহিত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। সমুদায় বরণীয় ধনকে তুমিই পোষণ কর। (ভয়াতুর শিশু যেমন পিতাকে আলিঙ্গন করে) তদ্রূপ আমাদের সমৃদ্ধির স্রষ্টা এবং পোষ্টা যে তুমি, আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। কুৎসিত শত্রুগণের কুৎসিত ধনুর্গুণ ছিন্ন হউক। (২)

"সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বপ্রকার শত্রুভূত তদীয় "অরাতি" বুদ্ধি সকল আমাদের সকাশ হইতে বিনষ্ট হউক, আর তোমার যে "রাতি" বুদ্ধি, তাহা আমাদিগকে ধনপ্রদান করুক। যে আমাদিগকে বধ করিতে চায়, সেই শত্রুর প্রতি তুমি হননসাধন আয়ুধকে ক্ষেপণ করিয়া থাক। কুৎসিত শত্রুগণের কুৎসিত ধনুর্গুণ ছিন্ন হউক। (৩)

"হে ইন্দ্র! যে ব্যক্তি বৃকের ন্যায় হত্যাকরণাভিপ্রায়ে চারি দিক হইতে আমাদের উপর অস্ত্রক্ষেপণ করে, তাহাকে আমাদের পদতলে ক্ষেপণ কর; কেন না, তুমি বিশেষরূপে শত্রুগণের পরাভবকর্ত্তা হইতেছ। কুৎসিত শত্রুগণের কুৎসিত ধনুর্গুণ ছিন্ন হউক। (৪)

"হে ইন্দ্র, যে সমানজন্মা শত্রু, অথবা যে সকল নিকৃষ্টজন্মা আমাদিগকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করে—আকাশের ন্যায় তাহার সেনা বিস্তৃত হইলেও,

---

কাব করে,—সংগ্রামে ঈশ্বরই তাহাদের নেতা হয়েন'—ইহাই সুদাসের ভবিষ্যদ্বংশীয় নর-নারীর প্রতি উপদেশ। ব্রাহ্মণেরা এই মহাবাক্যকে বেদবাক্য বলিয়া রক্ষা করিয়াছেন।

"আবরণকারীগণের হন্তা"=যাহারা সৈন্যব্যূহ রচনা করিয়া, চারি দিক হইতে আক্রমণ করে—তাহাদের বিনাশকর্ত্তা।

(২) সুদাস বলিতেছেন—'হে ইন্দ্র, এই নদীনদভূষিত, সুবর্ষাসিক্ত ভূমির ধন ধান্য তুমিই উৎপাদন করিয়াছ ও পোষণ করিতেছ,—এখন শত্রুকুল এই ধনসমৃদ্ধি উৎসন্ন করিতে অগ্রসর—এখন তুমি যাহার উৎপাদক, তুমিই তাহার রক্ষক হও—এখন আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম'—ইত্যাদি।

(৩) "অরাতি"=যাহা দান করে না। "রাতি"=যাহা দান করে। সুদাস বলিতেছেন—'হে ইন্দ্র। আমরা তোমার ক্রোধকেই প্রধান শত্রু বলিয়া জানি—অন্য শত্রু আমাদের নগণ্য। যেন তোমার চিত্তের অপ্রসন্নতা কোনও কালে আমাদের উপর পতিত না হয়।'

(৪) ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। যাঁহাদের উপর লোকরক্ষার ভার—তাঁহারা আততায়ীকে পদদলিত করিবেন—ইহাই বেদের উপদেশ।

তুমি আপনার সামর্থ্য দ্বারা তাহাকে বিনাশ কর। কুৎসিত শত্রুগণের কুৎসিত ধনুগুর্ণ ছিন্ন হউক। (৫)

"আমরা হে ইন্দ্র! তোমার প্রসাদ লাভের জন্য এই উপাসনা আরম্ভ করিয়াছি। "ঋতের" পথে আমাদিগকে সমুদায় পাপ অতিক্রম করিয়া লইয়া চল—কুৎসিত শত্রুগণের কুৎসিত ধনুগুর্ণ ছিন্ন হউক। (৬)

"আমাদিগকে সুন্দররূপে, হে ইন্দ্র! সেই বিদ্যা উপদেশ কর, যাহা নিরন্তর বরণীয় ধন স্তোতাকে দোহন করিয়া দেয়—বিপুল আপীনশালিনী ধরিত্রী-ধেনু যেন সহস্র ধারায় দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া আমাদিগকে বর্দ্ধিত করেন।" (৭)

অন্য লোকে সুদাসকে যেরূপ চক্ষে দেখিয়াছেন, এবং সুদাস আপনার ছবি আপনি যেরূপ টানিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তদুভয়ই পর্য্যালোচনা করিলাম। কিন্তু আমরা শিখিবার উপযুক্ত কি দেখিলাম? বেদকে যে লোকে

---

(৫) সমানজন্মা শত্রু=আর্য্যবংশসম্ভূত শত্রু নরপতি। নিকৃষ্টজন্মা শত্রু=অনার্য্য শত্রুদল। উভয়বিধ শত্রুর সহিতই সুদাসকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল—ইহাতে জানা যায়।

"আকাশের ন্যায় তাহাদের সেনা বিস্তৃত"—ইহাতে জানা যায়, সুদাসের প্রতিপক্ষগণের সৈন্যসংখ্যা প্রচুর ছিল।

(৬) ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেও কি প্রকারে পাপ হইতে রক্ষা পাইবেন, তৎপ্রতি সুদাসের স্থির লক্ষ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত অবিচল নিয়মের নাম বেদে "ঋত" বা "সত্য" বা "ব্রত"। সিন্ধুদ্বীপ ঋষি বলিতেছেন—

"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত॥ ১০—১৯০—১

বলা বাহুল্য, সন্ধ্যার্চ্চনার সময় আজিও ব্রাহ্মণেরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন। ইহার অর্থ এই যে, পরমেশ্বরের অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানালোক হইতে যে সকল অবিচলিত নিয়মকে ঋষিরা ঋত বা সত্য বলেন—(যাহার অপর নাম ধর্ম্ম) তাহা আবির্ভূত হইয়াছে। সুদাস রাজা বলিতেছেন, 'হে ঈশ্বর! যেন সকল অবস্থাতে আমরা তোমার প্রতিষ্ঠিত "ঋত" নামক ধর্ম্মমার্গ হইতে বিচলিত না হই,—তুমি সেই পথ দিয়া আমাদিগকে পাপের পারে লইয়া যাও।'

(৭) সুদাস যে কেবল যুদ্ধে শত্রু সংহার করিতেই ব্যস্ত ছিলেন—তাহা নহে, কিসে স্বীয় রাজ্যে কৃষির উন্নতি সাধন হইবে, "বিপুল আপীনশালিনী ধরিত্রী-ধেনু কিসে সহস্র ধারায় দুগ্ধ দান করিবেন," এই চিন্তাও অজস্র সুদাসের হৃদয়ে জাগরূক ছিল, দেখা যায়। শান্তিস্থাপনই যুদ্ধের উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। শত্রুগণের ধনুগুর্ণ ছিন্ন হউক, বারম্বার পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া—অবশেষে তিনি বলিতেছেন—'হে পরমেশ্বর! আমার শাসনাধীনা ধরিত্রী-ধেনু সহস্র ধারায় ক্ষীর প্রসব করিয়া আমার প্রজা বৃদ্ধি করুন!'

কি অদ্ভুত দৃশ্য—ধনুর্ব্বাণ হস্তে এক জন রাজচক্রবর্ত্তী ঋষি, স্বীয় প্রজাপুঞ্জের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বরচিত অপূর্ব্ব বেদমন্ত্রের দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন!

সত্যযুগের বচনা বলে,—এখানে আমবা সত্যযুগের কি পরিচয় পাইলায? যুদ্ধবিগ্রহ মারামারি কাটাকাটি, এখনকার কলিযুগে যেমন—তখনকাব সত্য যুগেও তেমনি ছিল, দেখা যায়; তাহাতে কিছু ইতরবিশেষ দেখি না। তবে প্রণিধান করিয়া দেখিলে দুই একটি বিষযে বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য দেখা যাইবে। আমাদের এই যুগে ঈশ্বরে বিশ্বাস বড় অল্প; ঈশ্বর আছেন কি না, তাহাতে আমাদের অনেকেরই বিশেষ সন্দেহ। আমরা সংসারে কেবল অন্ধ নিয়মেব কার্য্য দেখি—ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাই না। সংসারের কার্য্যকলাপ আমাদের চক্ষে মনুষ্যের বুদ্ধি বিবেচনা ও চেষ্টা প্রযত্নের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে; ঈশ্বর যে তাহাব নিয়ামক, ইহা আমরা বুঝি না ও বিশ্বাস কবি না। তাহাতে আমাদের জীবনের লক্ষ্য বড় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, ইন্দ্রিয়তুষ্টি ব্যতিরেকে জীবনের আর কিছু লক্ষ্য আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। ঈশ্বর আমাদের চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হওয়ায়, আমরা মনুষ্য অপেক্ষা উন্নত জীবেব কল্পনা করিতে অক্ষম। মনুষ্যকে আমরা সকল কার্য্যে অযথা প্রাধান্য দিয়া থাকি, সে যে জীবনমরণের মধ্যে চংক্রমণশীল সামান্য কীটের ন্যায় হীন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। সুদাসের সময় লোকের সংস্কার ভিন্ন প্রকাব ছিল। আমরা দেখিতে পাই—ঈশ্বরকে তখনকাব লোকে যেন প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিত। ঈশ্বর আছেন—ইহা সংশয়ের বিষয় হওয়া দূরে থাকুক, সুদাস নিশ্চয় ভাবিতেন, ঈশ্বর তাঁহার রথের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। তিনি যে স্বীয় পরাক্রমে শত্রুকুল পরাজয় কবিতেছেন—ইহা তিনি ভাবিতেও অক্ষম ছিলেন; তিনি আপনার সাহসকে আপনার মনের শক্তি বলিয়া পবিগ্রহ করিতে এক বারে অসমর্থ ছিলেন। যুদ্ধস্থলে দৃঢ় থাকিবার শক্তি, ঈশ্বরেব সকাশ হইতে তাঁহার হৃদয়ে পৌঁছিত; ঈশ্বর তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন; ইহা তিনি প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেন। এই জীবন্ত বিশ্বাসের বলেই তিনি রণক্ষেত্রে অজেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইংলণ্ডেব অলিভার ক্রমওএলেব সহিত এ বিষয়ে তাঁহার সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েই আপনাকে দৈবী শক্তিতে শক্তিমান বলিয়া জ্ঞান করিতেন; উভয়েই আপনাকে যেন ঈশ্বরের হস্তচালিত যন্ত্রস্বরূপ মনে করিতেন।

বামায়ণে বাল্মীকির সঙ্গীতে শুনা যায়,—

নাস্মনঃ কামকারো হি পুরুষোঽয়মনীশ্বরঃ।
ইতশ্চেতরতশ্চৈনং কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি॥

বিধাতার নাম "কৃতান্ত," কেন না, তিনি সকল কার্য্যের "অন্ত" বা শেষ

ফল গঠন করেন। মানবেচ্ছার স্বাধীনতা বড়ই সংকীর্ণ; সে স্বাধীনতা শেষ ফল বা অন্ত পর্য্যন্ত পৌঁছে না। মনুষ্য আপনাকে আপনার ক্ষুদ্র কার্য্যক্ষেত্রে নিজের কাম-কার বলিয়া মনে করে—কিন্তু শেষফল সম্বন্ধে সে ঈশ্বরের হস্তে সামান্য পুত্তলিকা মাত্র। বাল্মীকির এই ভাব; সুদাসেরও এই ভাব। সুদাস ঈশ্বরকেই সংসারের সমুদায় কার্য্যে শেষ ফলের নিয়ামক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সেই ভাবেই তিনি ঈশ্বরকে ডাকিতেন।

এই জন্যই, এ কালের মত ইতিহাস লেখার পদ্ধতি, সে কালে ছিল না। বসিষ্ঠের চক্ষে সুদাস দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী হইলেও, কেবল এক জন জন্ম মৃত্যুর অধীন মনুষ্য; বসিষ্ঠ স্বপ্নেও ভাবিতেন না যে, রণাঙ্গনে সুদাস শত্রুকুল পরাজয় করিয়াছেন। সে সব ইন্দ্রেরই কীর্ত্তি। 'হে ইন্দ্র!—শম্বরকে বধ করা, বৃত্রকে বধ করা প্রভৃতি তোমার প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ শুনিয়াছি,—এক্ষণে সুদাসের যুদ্ধে তোমার নূতন কীর্ত্তিকলাপ চক্ষে দেখিলাম!'—বসিষ্ঠের লিখিত সুদাসের ইতিহাস এই কথায় পরিণত। সুদাস আবার যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন?—অবজ্ঞার কথা! ইন্দ্রই সুদাসের দ্বারা মহৎকার্য্য করিলেন—ছাগ-শিশুকে দিয়া সিংহকে বধ করিলেন—সূচী দ্বারা কঠিন যূপের কোণ কাটিলেন; ছি ছি—সুদাসের কীর্ত্তি ঘোষণা করিও না—ইন্দ্রেরই কীর্ত্তি ঘোষণা কর। সুদাসের সমক্ষে—দিগ্বিজয়ী সুদাসের সমক্ষে বসিষ্ঠ যখন এই কথা বলেন, তখন সুদাস কি মনে করেন?—যেমন সুদাস, তেমনি বসিষ্ঠ; ইনি তোষামোদ চান না—উনি তোষামোদ করেন না। ধন্য সে কালের বীরপুরুষ, ধন্য সে কালের ইতিহাসলেখক। সুদাস যদি এ কালে জন্মিতেন, তাঁহার জীবনের ইতিহাসের সহিত ইন্দ্রের কোনও সংস্রবই থাকিত না। তাঁহার বীর্য্য-বত্তার প্রশংসা খ্যাপন করিয়া, কতই মোটা মোটা গ্রন্থ লেখা হইত—কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের কীর্ত্তি ঘোষিত হইত না।

এখন পাঠকবর্গ একবার জিজ্ঞাসা করুন, সুদাসের জীবনের লক্ষ্য কি ছিল? তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন; এবং তাদৃশ নরাধিপের ধর্ম্মপালন, তাঁহার জীবনের এক লক্ষ্য ছিল, দেখা যায়। কিসে শত্রুকুল পরাজয় করিবেন—কিসে বিপক্ষের মস্তক পদদলিত করিবেন—কিসে প্রজাবর্গকে লুটপাট হইতে রক্ষা করিয়া রাজ্যে শান্তিবিধান করিবেন—কিসে কৃষির সমুন্নতি সাধন করিয়া প্রজাকুলের ধনসম্পদ ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন, ইহা তাঁহার নিত্য অনুধ্যান ছিল, ইহা তাঁহার নরপতিজীবনের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার সাধা-

সংশয় দুঃখ চিন্তা মনে উদয় হয়। জীবন অসার বোধ হয়, মৃত্যুর পরাক্রম দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িতে হয়, জীবনের মিথ্যা প্রহেলিকায় আর বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করে না। মৃত্যুকে যখন এইরূপ সাক্ষাৎ দেখি, তখন মনের ভাব এই রকম হয়, কিন্তু এ রকম মনের ভাব অধিকক্ষণ থাকে না। থাকিবার যো নাই, থাকিলে মহা অনর্থ ঘটিত। আমরা মরিব, অতএব জীবনের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, এ ধুয়া তুলিলে সংসার অচল হইয়া উঠে। মৃত্যুকে দিবা নিশি ঘরে রাখিয়া জীবনের কাজ চলে না। জীবনের রঙ্গস্থলের যে স্থানে মৃত্যু পদার্পণ করে, সে স্থানে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া, জীবন নিজের জন্য অন্য স্থান দেখে। যাহা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয় নাই, তাহাই জীবন। যতক্ষণ দিন, ততক্ষণ জীবন, মৃত্যু আসিলেই রাত্রি আসিবে।

পুনর্জ্জন্মবাদ হইতে যে আত্মার অমরত্ব সিদ্ধ হয়, এমন বোধ হয় না। আত্মা নিত্য,—এই মৌলিক বিশ্বাস হইতেই বহুজন্মে বিশ্বাস জন্মিয়া থাকিবে। প্রাণী দেখিতেছি বহুবিধ, সকলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন রূপের, কিন্তু সকলের প্রাণ-প্রকৃতি একরূপ। মনুষ্য, গো, হস্তী, অশ্ব, ব্যাঘ্র, পক্ষী পতঙ্গ নানাবিধ প্রাণী রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট, কিন্তু সকলেই প্রাণী, অর্থাৎ প্রাণ নামক যে বস্তু, তাহা সর্ব্ব জীবের মধ্যেই বর্ত্তমান। জীবনাত্রেরই সাধারণ স্বভাব আছে, কতক এমন নিয়ম আছে, যাহা সকল প্রাণীই পালন করে, এবং সকলেই যাহার অধীন। জীবন ও মৃত্যু সর্ব্বত্র সমান, সিংহাসনাধিপতিও যেমন দেহত্যাগ করেন, তাঁহার রক্ষিত কুক্কুরও সেইরূপ দেহত্যাগ করে। আত্মা ত অমর—সম্রাটের আত্মা যেমন অমর, কুক্কুরের আত্মাও সেইরূপ অমর। এই দুই আত্মা কোথায় প্রয়াণ করিল? নিরাশ্রয় হইয়া আত্মা অধিষ্ঠান করিতে পারে না, পরম আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়াও আত্মা মাত্রের সাধ্য নহে। অতএব বহুতর জীবের আত্মা দেহমুক্ত হইলে অন্য দেহে প্রবেশ করে, অন্য আকার ধারণ করে। উন্নতি অবনতি সর্ব্বত্রই নিয়ম, সে নিয়ম আত্মার সম্বন্ধেও প্রতিপালিত হইতে পারে। যে আত্মা এ জন্মে গর্দ্দভ-দেহ ধারণ করিয়াছে, পরজন্মে যে সে আবার সেই শরীর ধারণ করিয়া বস্ত্রভার বহন করিবে, এরূপ সম্ভব নহে। এ জন্মে যদি সে প্রভুর কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ত গর্দ্দভজন্ম হইতে তাহার মুক্ত হইবারই সম্ভাবনা। আর যে পামর দুর্ল্লভ মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াও পশুর অধম আচরণ করিতেছে, সে কি পরজন্মে আবার মানবকুল কলঙ্কিত করিবে? পূর্ব্বজন্ম পুনর্জ্জন্ম এইরূপ পর্য্যায় ক্রমাগত চলিতেছে, চক্রের আব-

নের মত আত্মা ঘুরিতেছে, নিরবচ্ছিন্ন জন্ম মরণ ভোগ করিতেছে। নিকৃষ্ট প্রাণী হইতে উৎকৃষ্ট প্রাণী, উৎকৃষ্ট প্রাণী হইতে নিকৃষ্ট প্রাণী, পূর্ব্ব এবং ইহজন্ম-কর্ম্ম ফলস্বরূপ ক্রমান্বয়ে আত্মা পরিভ্রমণ করিতে থাকে। আধুনিক ...য় বিবর্ত্তবাদ এই জন্ম-পর্য্যায়ের নিয়ম, শারীর ধর্ম্মেও প্রমাণ করিতেছে। জীবের মধ্যে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, কেবল যে কোনও জন্তুর আত্মা আমার শরীরে বিরাজ করিতেছে এমত নহে, সেই জন্তুর শোণিতও আমার ধমনীতে বহিতেছে। আমি যে প্রাণীকে অত্যন্ত ঘৃণা করি, সেও আমা হইতে স্বতন্ত্র নহে, জীবমাত্রেই কুটুম্ব, সর্ব্ব প্রাণী একই বিশাল পরিবারভুক্ত।

জন্মজন্মান্তরীণ এই ফলভোগ, অসংখ্য দেহধারণ, বহু প্রাণীর গর্ভে বাস, বহু জন্ম, বহুবার মৃত্যু, অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। জীবনের পরে মৃত্যু, মৃত্যুর পরে জীবন, এক শরীরের পরে অন্য শরীর, এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? অনিশ্চিত হইতে অনিশ্চিতে ভ্রমণ করিতে, অনন্ত কাল এই পৃথিবীতে বিঘূর্ণিত হইতে কে সম্মত হয়? জীব মিথ্যা, মৃত্যু স...

—ইতেজি... ...নও জানি...

...ইচ্ছা...

...বন্ধুক্ত হইব, এই চিন্তা... পর্ব্বদা ...হয়। পুনর্জ্জন্ম সকলেই বুঝিতে ...। পুনর্জন্ম হইতে... ...সকলেরই ইচ্ছা হয়। বহু জন্মের পর হয় ত মানব দেহ ধার... ...ণ করিয়াছি, আবার মরিয়া পশুদেহ ধারণ করিব, একরূপ বিশ্বাস জন্মিলে মনে... অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। মরিয়া পুনর্ব্বার মানবদেহও ধারণ করিতে ই... ...চ্ছা করে না। আবার এই সকল দুঃখ কষ্ট, এইরূপ দুষ্পূরণীয় কৌতূহল লইয়া বে... জন্ম গ্রহণ করিতে চায়? আর যেন না জীবনের ভার বহন করিতে হয়, আর... যেন জীবনের অন্ধকারে না পদস্খলন হয়, কেবল সেই কামনাই করি। অনিত্যে... ...র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যেন নিত্যের ক্রোড়ে স্থান পাই, যেন কক্ষ... ...কক্ষান্তরে না নিক্ষিপ্ত হই, যেন কেন্দ্রস্থ হইয়া স্থির হইতে পারি। ... ...মোক্ষ, লয়, নির্ব্বাণ যাহাই হউক, তাহাই যেন প্রাপ্ত হই, অনিশ্চিতের... ...রাখিবা যেন নিশ্চিতের রাজ্যে উপনীত হই।

এই জন্য তীর্থের ম... ...রাণসী তীর্থশ্রেষ্ঠ। যে তীর্থে মৃত্যু হইলে দেহ-পঞ্জর হইতে আত্মা-পক্ষী... ...ক্ত হইবে, সে তীর্থের তুল্য আর তীর্থ কোথায়?

যে ভীত, সে অভয় প্রার্থনা করে। জন্মমৃত্যুভীত জীব কাশীবাস করিলে অভ
প্রাপ্ত হয়। জন্মমরণ পেষণযন্ত্রবিশেষ, জীব তাহাতে নিরন্তর পিষ্ট হইতেছে
উপরের চক্র মৃত্যু, নীচের চক্র জীবন; এই দুই প্রস্তরের মধ্যে জীব নিরন্তর
পিষ্ট হইতেছে। এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা লাভ করিবার জন্য
আগ্রহ হয় ? এই ভয়ের উৎপত্তি হইলে পর, ইহার উপর বিশ্বাসের ভিত্তি সহজে
স্থাপিত হইতে পারে। ধর্ম্মের বলে সেই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ভয় সংক্রামক। পূর্ব্ব
ও পুনর্জ্জন্মের ভয় কাহারও পক্ষে বিবেচনার ফল, যুক্তির ফল, সাধারণের পক্ষে
সহজ বিশ্বাস, লোকশ্রুতির ফল, ধর্ম্মের আচার্য্যদিগের শিক্ষার ফল। ভয় যেমন
সাধারণ, নির্ভর হইবার উপায়ও তেমনি সাধারণ। শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে
কোনও কোনও পশু ও পক্ষী পলাইবার পথ না পাইয়া, বালুকার অথবা ক্ষুদ্র
ঝোপে মাথা লুকাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করে। তাহাদের সমুদয় শরীর বাহির হইয়া
থাকে, এবং পশ্চাদ্ধাবিত শিকারী অথবা হিংস্র পশু তাহাদিগকে অনায়াসে বধ
মুদ্রিত করিলে অথবা মস্তক আবৃত করিলে
ইহাদিগকে ইবে না,
তাহা
রূপ ভাব মনে উদিত
যে যাহা করিতে বলে, যেখানে ল
শুনিতে ইচ্ছা করে। নিজে হত
কাল কীর্ত্তন করে। তীর্থযাত্রা আমাদের প্রকৃতিগত বিচিত্র ধর্ম্ম। তীর্থ বিশেষে
কলেবর পরিত্যাগ করিলে জীবন্মুক্ত হইতে পারা যা এ বিশ্বাস বিচিত্র কিসে ?

কথাটা 'জীবন্মুক্ত' কেন হইল ? জীবন হইতে লোকে মুক্ত হইতে চায়, না
জীবন ও মৃত্যু দুই হইতে মুক্ত হইতে চায় ? মানুষ জীবন হইতে মুক্ত হইতে
যত না চায়, মৃত্যু হইতে মুক্ত হইতে তত চায়। জী বন্মুক্ত বলিলেই জীবন এবং
মৃত্যু উভয় হইতে মুক্তি কিরূপে বুঝায় ? উত্তরে লা যাইতে পারে যে, মৃত্যু-
শূন্য জীবন হয় না, জীবনের স্রোত মৃত্যুর সাগরে ই। জীবন হইতে
মুক্ত না হইলে মৃত্যু হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় তএব জীবন হইতে
মুক্ত হইলে মৃত্যু হইতেও মুক্ত হওয়া যায়।

আকাশে যেমন নক্ষত্র, মৃত্যুতে সেইরূপ জীব আকাশের যেমন সীমা
নাই, মৃত্যুর সেইরূপ সীমা নাই. আকাশ যেরূপ র, মৃত্যু সেইরূপ অন্ধ

যার—অর্থাৎ অজ্ঞানিত, অদৃষ্ট। সর্ব্বব্যাপী আকাশ, মৃত্যু সর্ব্বব্যাপী। আকাশ যেমন নিজগর্ভে চন্দ্রসূর্য্য ধারণ করে, মৃত্যু সেইরূপ নিজগর্ভে জীব সকলকে ধারণ করে। নক্ষত্র যেমন জ্যোতির্ম্ময়, জীবন সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময়। মরিলে নক্ষত্র হয়, এ রকম বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক নহে। আলোকের সঙ্গে জীবন এবং মৃত্যুর সঙ্গে অন্ধকারের সাদৃশ্য আমাদের মনে সহজেই আসে। আলোকে আমরা দেখিতে পাই, অন্ধকারে দেখিতে পাই না, জীবনকে আমরা জানি, মৃত্যুকে আমরা জানি না। রাত্রিকালে আমরা যখন আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন নক্ষত্রই দেখি, যেখানে শূন্য আকাশ, সেদিকে বড় তাকাই না। সেইরূপ যখন আমরা মৃত্যুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন জীবনের দিকেই চাহিয়া দেখি, জীবনকেই মৃত্যুর প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করি। মৃত্যুর যে জীবন চিহ্নস্থান, সেখানে জীবনের চিহ্নমাত্র নাই, সেখানে আমরা দিক্‌ভ্রান্ত হই। বেদের পূর্ব্বে মানব জীবনের কোনও চিহ্ন নাই, আমরাও আর কিছু জানিতে পারি না, জানিবার কোনও উপায় নাই। পথের কোনও চিহ্ন নাই, কোনও সঙ্কেত নাই, পথ বলিয়া দিবার কেহ নাই। পৃথিবী যে পুরাতন, পাষাণ বহুকালপ্রোথিত অস্থিকঙ্কাল—জীবনের অবশিষ্ট। যে সমস্ত চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, সেই স্থলে মৃত্যুর একাধিপত্য। মৃত্যু অনন্ত, আকাশতুল্য, জীবন সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহ ধূমকেতুর মত।

একান্ত চিত্তে মৃত্যুর পরাক্রম কল্পনা করি, জীবনের বিবিধবর্ণরঞ্জিত পট হইতে যখন দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া মৃত্যুর অভিমুখে চাহিয়া দেখি, তখন মৃত্যুকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা করে; যুক্তকরে বলিতে ইচ্ছা করে, মহাবলবান তুমি, তোমার তুল্য বলবান কেহ নাই! তোমার মুখে তর্জ্জন গর্জ্জন নাই, নিস্তব্ধতাই তোমার বল। কেহ তোমাকে দেখিতে পায় না, কেহ তোমাকে চিনিতে পারে না, অথচ সকলে তোমারে জানে। তুমি যেখানে পদার্পণ কর, যেখানে তোমার ছায়া পতিত হয়, সে স্থান সকলেই চিনিতে পারে। সর্ব্বত্র তোমার অপ্রতিহত গতি, সর্ব্বত্রই তোমার জয়। সর্ব্বস্বই তোমার, যাহাকে তুমি গ্রহণ করিতে চাও, তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। সে শিশুকে কেহ মাতার ক্রোড়চ্যুত করিতে পারে না, তুমি সেই শিশুকে হরণ কর, মাতার ক্রোড় শূন্য কর। যে দম্পতীর মধ্যে কেহ কাহাকে ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, তুমি তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন কর। যে শোকে সন্তাপে জর্জ্জরিত হইয়া চিত্ত শীতল করিবার ঠাঁই খুঁজিয়া পায় না, সে তোমার আশ্রয়

কামনা করে। তোমার আগমন দেখিলে, তোমাকে স্মরণ করিলে, লোক ভীত হয়, আবার তোমার অপূর্ব্ব মোহনী শক্তি আছে, তাহাতে কেহ বে আকৃষ্ট হয়, জীবনকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, উন্মত্তের মত তোমাকে আলি করিতে ধাবমান হয়। সন্ধ্যার আকাশ যেমন জগৎকে অন্ধকারে আ তুমি সেইরূপ জীবনকে আবৃত কর। তোমাকে দেখিয়া শাক্যমুনি করিয়াছিলেন, তুমি মানুষকে বৈরাগ্যের শিক্ষা দাও। তোমার মুখ মানুষ ভাবিতে শিখে, তোমার ঘনান্ধকার ভেদ করিবার জন্যই ধ্যানের তুমি সকলকে দেখা দাও, অথচ কেহ তোমায় দেখিতে পায় না; যে তো দেখে, সে একেবারে তোমার রাজ্যের প্রজা হয়। যেখানে বায়ুরও গতি না সেখানে তুমি অবাধে যাইতে পার। আমরা তোমাকে জানিবার জন্য চেষ্টা করি। তুমি ভিন্ন তোমাকে জানিবার অন্য উপায় নাই। যখন তো জানিব, তখন আর জীবনের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। কে তুমি, তুমি? কত যুগ ধরিয়া তোমার আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি, তু অদ্যাবধি কোনও উত্তর দিলে না, কখনও কি কোনও উত্তর দিবে না?

মৃত্যু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হওয়া আমাদের ধর্ম্ম। সে কৌতূহল নিবৃত্তি কোনও উপায় নাই। চিন্তাকুল হইয়া কেন মৃত্যুর ভাবনা ত্যাগ করি, তল যখন স্পর্শ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসি, তখন সেই পরিক্লান্ত দৃষ্টি জীবনের তৃণধান্যশস্যপূরিত ক্ষেত্রে পতিত হয়। মনে তখন কি ভা হয়? এই যে শিশুর হাস্যপূর্ণ জনসমাকীর্ণ লোকালয়, ইহাও কি মৃত্যুর স্থান নয়? জীবন কি? মৃত্যু ত আমাদের জ্ঞানাতীত, জীবনের সম্বন্ধেই বা আমরা কি জানি? যাহা দেখিতেছি, তাহা কি সত্য? যাহা বুঝিতেছি, তাহা কি সত্য? আজ যেখানে প্রাসাদ দেখিতেছি, বিংশতি বৎসর পরে সেখানে কি প্রাসাদ দেখিতে পাইব? এ সব কি দেখিতেছি? কি আসিতেছে, কি যাইতেছে? জীবন কাহাকে বলি, মৃত্যু কাহাকে বলি, ইহলোক কি, পর লোক কি? এ সব কিছুই ত সত্য বোধ হয় না। সবই অনিত্য, সবই মায়াময়। এই বিশ্বাস যেই স্থির হইল, হৃদয়ে মূলীভূত হইল, অমনি প্রতিশব্দ হইল, সব মায়া, সব প্রবঞ্চনা! জীবন মৃত্যু, পৃথিবী আকাশ, সূর্য্য নক্ষত্র সমুদয় অনিত্য, সব মায়ার খেলা। অসি যেমন কোষে লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ নিত্য এই অনিত্যের কোষে গুপ্ত রহিয়াছে, সত্য মায়ায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। সমুদ্রের তলে সমুদ্র আছে, বিশ্বাসের তলে বিশ্বাস আছে। কোথায় মৃত্যু, কোথায়

—কেন ভাবিয়া আকুল হইতেছ। যেমন জীবন, তেমনি মৃত্যু—সব
। মায়া! মায়া! মায়া! মায়াজালে বদ্ধ তুমি, যে দিকে তুমি ফিরিতেছ,
দিকে তোমায় জড়াইতেছে, তোমায় ইন্দ্রজাল দেখাইতেছে। এই মায়া-
হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা কর—এই মুক্তিই যথার্থ মুক্তি,

ন কি জানিবার চেষ্টা করা উচিত। জীব
সকলেই জানে। প্রাণীমাত্রেই স্বধর্ম্মপরতন্ত্র
কিন্তু যে নিয়মে প্রাণী উৎপন্ন হইতেছে, সেই
আমাদের জীবন যেরূপ, বিশ্বজীবন কি সেই-
ক পাশব ধর্ম্মের ফল, না তাহাতে আর কিছু
আত্মা আছে, তাহাও কি কেবল এই ধর্ম্ম পরি-
ন একটা বিশেষ প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই সম্ভব
র্থতা আনন্দের কারণ—সে আনন্দ যেরূপই হউক,
প্রবৃত্তির উত্তেজনার আনন্দ হউক, অথবা অতি নীচ প্রকারের
, আনন্দ বটে। অতএব ভ্রূণোৎপত্তি আনন্দসম্ভূত, সে বিষয়ে
হ নাই। এই আনন্দ প্রাণীমাত্রেই সম্ভোগ করে। এই আনন্দ যে
া নিত্য নহে, এ কথা লক্ষ বার বুঝাইতে হয়। কিন্তু তাহাতেও
নক সময় বুঝে না; কারণ আমাদের স্বভাব এই যে, আমরা যে
ীন, সেই নিয়ম আমরা সর্ব্বত্র আরোপ করিতে চাই। সেই জন্য
যে, প্রজাপতি যে নিয়মে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিয়মে
ত্য উৎপাদন করি। ক্রমে এই বিশ্বাস বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত
া পড়ে। ভগবান পদবীধারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'আমি উৎপত্তিহেতু
র্প।' * অর্থাৎ যে প্রবৃত্তি ফলবতী, তাহা অপবিত্র নহে, নিন্দনীয় নহে,
ৎ পবিত্র এবং ঈশ্বরানুমোদিত। যদি তাহাই হইল, তবে জগৎ কেনই বা
ই নিয়মে সৃষ্ট না হইয়া থাকিবে? কিন্তু যাহারা এ মত কহে, তাহাদিগকে
কৃষ্ণ 'আসুরস্বভাব' বলিয়াছেন;—'তাহারা জগৎকে স্ত্রীপুরুষসম্ভূত ও কাম-
ত কহে।' † তাহারা এমন কথা কেন বলে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।
পার্সী নাকি স্ত্রীপুরুষসম্ভূত ও কামজনিত, সেই জন্য সে সহজেই মনে
ত পারে যে, জগৎ স্ত্রীপুরুষসম্ভূত ও কামজনিত। স্বর্গ নরকে বিশ্বাসের যে

* ভগবদ্গীতা, ১০ম অধ্যায়। † ভগবদ্গীতা, ১৬শ অধ্যায়।

কারণ, এরূপ বিশ্বাসেরও সেই কারণ। কোনও নিয়ম, কোনও বিধি যে তাহাকে বিস্তৃত করা, আমাদের স্বভাব।

এই কথাটা আর একটু বুঝিয়া দেখা উচিত। জীব শরীর ধারণ পূর্ব্ব প্রকার আনন্দ উপভোগ করে, তাহা আনন্দ অত্যন্ত তীব্র। আনন্দ অপবিত্র, এ শিক্ষা আমরা গোপনে উপভোগ্য, ইহাও এক প্রকার প্রধান কর্ত্তব্য, এই এক ইন্দ্রিয় জয় করা। আ করা যায়, কেবল এই এক ইন্দ্রিয় জয় করা অ তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য দেবরাজ আর কিছু না, বিলাসচতুরা ললামলাবণ্যময়ী বিদ্যাধরী প্রে জয় করিয়া সংসারের ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া প মনোনিবেশ করিত, যাহার কিছুতে মন টলিত কটাক্ষে তাহারও চিত্ত অস্থির হইত, বহু পরিশ্রমে আনন্দ মুহূর্ত্ত স্থায়ী মাত্র, অথচ এই আনন্দপ্রাপ্তির উপায় সম্মুখে তাহা হইতে বিরত হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। মনুষ্যলোকে এই অ গোপনীয়, পশুদিগের মধ্যে গোপনীয় কিছুই নাই। এই আনন্দ ফ সন্তানের তরেই স্ত্রীপুরুষসংসর্গ আবশ্যক। পশুদিগের মধ্যে সেই নি মনুষ্য সে নিয়ম লঙ্ঘন করে। এই জন্য মানুষ এই আনন্দ গো করিতে চায়। যে প্রবৃত্তি উৎপত্তি হেতু, তাহাতে দোষের লেশ কিন্তু যে প্রবৃত্তি সে নিয়ম অতিক্রম করে, তাহা পাপজনক, সুতরাং যাহা গোপনীয়, তাহাই দূষণীয়।

প্রাণী যত প্রকার ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে অপত্যোৎপাদন ক্ষমতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। একে ত সেই প্রবৃত্তি আনন্দবিধায়ক, আবার সেই প্রবৃ ফলবতী হইলে অত্যন্ত আনন্দ হয়। এই শক্তি প্রজাপতির তুল্য। সন্তান হই মনে হয়, এই জীব আমাদেরই সৃজিত, ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার বলে আমরা এ নূতন প্রাণী সৃজন করিলাম। ঈশ্বরের শক্তির অংশ যদি আমাদিগের থাকিবে ত আমরা কেমন করিয়া স্বতন্ত্র প্রাণী উৎপাদন করিলাম? আনন্দ আছে, এই জন্য খৃষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে কথিত আছে যে, ঈশ্বর সসা পশুপক্ষীসমাকুল পৃথিবী সৃজন করিয়া আনন্দিত হইলেন, নিজের দেখিয়া মনুষ্য যেমন পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ পরিতৃপ্ত হইলেন। জীবের

জগতের সৃষ্টিতে কি প্রভেদ? জীব যদি চেতন বলিয়া জড়জগতের অপেক্ষা হয়, তাহা হইলে জীবের উৎপত্তি জগতের উৎপত্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট কেন ? যদি জগৎকে কামজনিত না বল, তবে জীবকে কেন কামজনিত বল? জনিত হইলেই কি জীব জগতের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইল?

জগৎ যে কামজনিত নহে, অথবা স্ত্রীপুরুষসম্ভূত নহে, এই শিক্ষা দেওয়া ক সময়ে আবশ্যক হয়; কারণ 'আসুরস্বভাব' লোকের সংখ্যা জগতে ক। জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন রূপে বর্ণিত ছে। বাইবেলের অনুসারে জগৎ ঈশ্বরের আদেশে সৃষ্ট, আর কোনও ক্রিয়ার আবশ্যক হয় নাই। ঈশ্বরের মুখ হইতে আদেশবাক্য নির্গত হইল, গৎ সৃষ্ট হইল, দিন রাত্রি হইল, আকাশ হইল, জল স্থল হইল, স্থাবর সর্ব্বশেষে মনুষ্য সৃষ্ট হইল। কেন এরূপ হইল, এরূপ সৃষ্টি নৈসর্গিক র উত্তর নাই, উত্তরের আবশ্যকও নাই; কারণ, ঈশ্বরের বুদ্ধি বুঝিতে পারে না। এই অলৌকিক সৃষ্টিবর্ণনা আধুনিক নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেন যে, জগৎ য় নাই, প্রকৃতির নিয়মানুসারেই ধীরে সৃষ্ট হইয়াছে, কোনও যে শূন্য হইতে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ পৃ দিত হয় নাই। ইহাতে যে য়ানদিগের বিশ্বাস টলিয়াছে, করিবার কোনও কারণ র ভিত্তি বিশ্বাস, বিজ্ঞান নহে।

কথা আমরা মানি যে, জগৎ কামজনিত ন.., কিন্তু জীব কামজনিত, ও জগতের উৎপত্তিতে এবং জীবের উৎপত্তিতে প্রভেদ আছে, এ জ স্বীকার করিতে হইবে। বাস্তবিক কেহই মনে করে না যে, নর-রী মিলিয়া যেমন সন্তানোৎপাদন করে, সেইরূপে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। থাটা এই যে, স্ত্রীপুরুষসম্ভূত মনুষ্যের জন্ম পবিত্র কি না; যদি পবিত্র, তাহা ইলে, সম্পূর্ণ পবিত্র কি না। জীবমাত্রেই যে কামজনিত, সে বিষয়ে কোনও ংশয় নাই। কিন্তু কামজনিত জন্ম কি অপবিত্র? তাহা হইলে জীবন অপবিত্র, কারণ জন্মের সহিত জীবনের আমরণ সম্বন্ধ থাকে। জীবের উৎপত্তি কামজনিত লিয়া কি আত্মা আবিল হয়, না অন্যান্য নিয়ম যেরূপ, পবিত্র সন্তানোৎ-াদনের নিয়মও সেইরূপ পবিত্র অথবা অন্য নিয়ম অপেক্ষা অধিক পবিত্র? কিম্বা নিয়মের সহিত পবিত্রতা ও অপবিত্রতার কোন সম্বন্ধ নাই, বিশ্ব যেমন নিয়মবলে সৃষ্ট হইয়াছে, জীবও তেমনি নিয়মবলে উৎপন্ন হইয়াছে?

জীবের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, এ কথা মানিয়া লইতে কেহ ইতস্ততঃ করে না। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যের সমকক্ষ কেহ নাই। সৃষ্টির মধ্যে যে মনুষ্যের সমকক্ষ আর কেহ নাই, এ কথা তত সহজে বলা যায় না। যত কিছু সৃষ্ট পদার্থ আছে, তাহার মধ্যে কি মনুষ্য শ্রেষ্ঠ? এ কথার প্রামাণ্য হউক, বা না হউক, এ কথাও আমরা মানিয়া লইয়াছি, কোন মনুষ্যদেহ অপেক্ষা আর পবিত্র মন্দির নাই, এ বিশ্বাস একরূপ মূলীভূত হইয়াছে। আত্মা অমর এবং ঈশ্বরাংশ, এই কথা বলিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকি না। মনুষ্য-শরীরে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন, এ কথা জগতের সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। যে মন্দিরে, যে শরীরে ঈশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠান করিতে পারেন, তদপেক্ষা পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ শরীর আর কোথায়? যে মনুষ্য দেহ ধারণ করে, সেই শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করে। মানব-জীবন শ্রেষ্ঠ জীবন।

জীবনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াও আমরা জীবনের [illegible] করিতে পারি না। মানুষ সুকৃত করে, আবার দুষ্কৃতও করে। দুষ্কৃতই অধিক করে। আমাদের যে সকল প্রবৃত্তি আছে, অধিকাংশই অধোমুখী। মনে [illegible] অথবা মুখে যাহাকে দুষ্ক্রিয়া বলি, সময় তাহাই কাজে করি। [illegible] অপেক্ষা পাপের আচরণ সহজ, অধোগামিনী, তাহার [illegible] সহজে আমাদিগকে বশীভূত করে। পুণ্যবান, তাহাকেও [illegible] পের আশঙ্কা করিতে হয়, যে ব্রতী, ব্রতভঙ্গের আশঙ্কা করিতে হয়, যে তপস্বী, তাহাকে তপস্যাভঙ্গের করিতে হয়। পশুভাব আমাদের স্বভাবে যেমন প্রবল, দেবভাব তেমন প্রবল নয়। ভাবিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের স্বভাব নহে; কিন্তু উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। উৎকর্ষের সম্ভাবিতাই মানব-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতা।

এইরূপ বিপরীত প্রবৃত্তি ও বিপরীত শক্তি চারি দিকে দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর বিশ্বাসীরা বলেন যে, পাপ এবং পুণ্য, উভয় ঈশ্বরের অভীপ্সিত অথবা নিয়োজিত নহে; পুণ্যময় নিয়ম লঙ্ঘনের নামই পাপ। পাপের কারণ ঈশ্বর নহেন, পুণ্যের ব্যতিক্রম হইলেই পাপ হইল। এ কথা সত্য হউক অথবা মিথ্যা হউক, জগতে যে বিপরীত ব্যাপার, বিপরীত নিয়ম লক্ষিত হয় না, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। জগৎ সর্ব্বত্র দ্বন্দ্বপ্রবৃত্তি, সেই দুই প্রকৃতি পরস্পরের বিরোধী—একে অপরকে নাশ করে। মৃত্যু জীবনের বিরোধী,

অন্ধকার আলোকের বিরোধী। জগৎ এই দ্বন্দ্বনিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে। সুখ যেমন আছে, দুঃখ তেমনি আছে। ঐশ্বর্য্য যেমন আছে, দারিদ্র্য তেমনি আছে। গ্রহগণের গতি, পৃথিবীর ভ্রমণ, দুই বিপরীত শক্তিতে সাধিত হইতেছে; দুই শক্তি ঠিক পরস্পরের বিরোধী; একটি আকর্ষণ করিতেছে, আর একটি নিক্ষেপ করিতেছে—একটি শক্তি কেন্দ্রানুগ, দ্বিতীয়টি কেন্দ্রাতিগ। উভয়ে উভয়কে বিনাশ করে না, বরং দুই মিলিয়া গ্রহগণের গতির আনুকূল্য করে। বিরোধই জগতের নিয়ম, বিরোধে বিনাশ হয় না, বৃদ্ধি হয়।

মনুষ্যের প্রকৃতিতে এই যে অনৈক্য, এ কিরূপ বিরোধ? এই বিরোধে মনুষ্যজাতি চালিত হইতেছে সত্য, কিন্তু এই বিরোধকে আমরা অমঙ্গলকর মনে করি? যখন দেখিতেছি যে, বিরোধই জগতের নিয়ম, বিরোধেই [illegible] এই বিরোধ হইতে অমঙ্গলের আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে। বাস্তবিক কেহ অমঙ্গলের কারণ বিবেচনা করে না। সুপ্রবৃত্তি এবং [illegible] নিত্যই চলিতেছে। দুঃখ এই যে, মানুষ দুর্ব্বলস্বভাব, সে হিত অধিক যুদ্ধ করিতে হয়, তাহারই বশ্যতা স্বীকার করে।

এব জীবনের সম্বন্ধে এ টুকু জানিতে পারিতেছি। জীবনের মূল—[illegible]—সকল জীবেরই এক প্রকার। জীবের উৎপত্তি সর্ব্বত্রই একরূপ—[illegible]ভূত। এই আনন্দ স্থূল আনন্দ—ইন্দ্রিয়বৃত্তিচরিতার্থতাজনিত আনন্দ—[illegible] প্রাণীই ইহা তুল্যরূপে উপভোগ করে। জীবন দ্বন্দ্বনিয়মের অধীন সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, স্বাস্থ্য জরা প্রভৃতি ভোগ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। [illegible] পথ আবার দুইরূপ, এক পথ উন্নতির, আর এক পথ অবনতির। [illegible]র পথে বাধা বিঘ্ন বিস্তর, অবনতির পথ মুক্ত। কিন্তু এ টুকু জানিয়া আমাদের কিছুমাত্র তৃপ্তি হয় না। জীবন সম্বন্ধে যাহা জানি না, তাহাই জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হই। যাহা দেখিতেছি, যাহা জানিতে পারিতেছি, তাহা ত কিছুই নহে। আমাদের জীবন ত নিতান্ত ক্ষুদ্র, এই ক্ষুদ্র জীবনে আমাদের মনে এত মহৎ ভাবের কেন উদয় হয়? অনন্তের জ্ঞান, অনন্তের আকাঙ্ক্ষা, অনন্তের উপাসনা আমাদের চিত্তমধ্যে এত প্রবল কেন? ঈশ্বরজ্ঞান, ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটা স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট জ্ঞান, সমুদ্রের জলপ্রবাহের ন্যায় আমাদিগকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করে কেন? শরীরে ও আত্মায় প্রভেদ অতি সহজে অনুভব করা যায়। সর্ব্বদা মনে হয় যে, আমি অবিনাশী, কেবল আমার এই শরীর অনিত্য। বাহ্যজগতে যে এক অব্যয় সত্য দেখিতে

বিষান তরঙ্গ ভিন্ন করিয়া চলিয়াছে, কোথায় প্রচণ্ড ঝটিকায় কোন জাহাজ র্ণ হইয়া গিয়াছে, কোথায় কোন হতভাগ্য আবর্ত্তে ডুবিতেছে, কোথায় কোন বলবান পুরুষ ভয়-কাতরা রমণীকে তরঙ্গের মুখ হইতে রক্ষা করি-তেছে—এই সব যেমন কল্পনা করে, কল্পনা করিতে করিতে যেমন আর সব ভুলিয়া যায়, সমুদ্র-তীরের নিশ্চিন্ত আসন বিস্মৃত হইয়া নিজেকে বিপদগ্রস্ত পোতযাত্রী কল্পনা করে, সেইরূপ জীবনের তীরে বসিয়া আমরা কত কি কল্পনা করি। এই যে বিশ্বব্যাপিনী চিন্তা, জীবন হইতেই তাহার আরম্ভ, জীবনের পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াই আমরা চারি দিকে চাহিয়া দেখি, যত উচ্চে আরোহণ করি, যত শিখর-শৃঙ্গের নিকটবর্ত্তী হই, ততই অধিক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। সকল সিদ্ধান্তের মূল জীবন। যদি জীবনে অবিশ্বাস হইল ত মৃত্যুতেও অবিশ্বাস। যদি ইহলোক সত্য হয়, তবেই পরলোক সত্য। যদি জীবন তঞ্চক মাত্র—মায়া—তাহা হইলে সমস্ত জগৎ মায়াময়। এই জন্য জীবন ও মৃত্যুকে কদাচ সমতুল্য বলিতে পারি না। জীবন যে প্রত্যক্ষ, সে

ন সন্দেহ নাই, জীবন বিশ্বাসের বিশ্বাস, সংশয়ের সংশয়, মায়ার
নিত্যের অনিত্য, নিত্যের নিত্য। যে পরলোকে সুখের কামনা করে,
াকেই তাহার উদ্যোগ করে, যে মুক্তি চায়, সে এইখান হইতেই মুক্ত
াবস্ত করে, যে শান্তিপিপাসু, সে ইহজীবনেই শান্তিনির্ঝরের অন্বেষণ
জ্ঞানের ভাণ্ডার, অজ্ঞানের কূপ, মৃত্যুর দ্বার, মুক্তির পথ এই জীবন।
জীবনে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া আবশ্যক। জীবনের সম্বন্ধে আমরা অধিক
পারি না বটে, কিন্তু জীবনের সম্বন্ধে অধিক জানিবার সম্ভাবনাও
রণ জীবন মৃত্যুর সহিত, অনন্তের সহিত, অগন্যের সহিত বিজড়িত
রহিয়াছে।

চরাচরের নিয়মনিচয় এমনি সরল অথচ এমনি জটিল, এত বৈষম্যপূর্ণ যে, জগতের সম্বন্ধে অথবা মানুষের সম্বন্ধে একটা কথা কহিলেই, একটা কোন নিয়ম দেখাইলেই আবার তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিতে হয়। দেখিতেছি যে আমাদের সমস্ত চিন্তা জীবনে কেন্দ্রীভূত হইতেছে, অথচ জীবনের সেবায় আমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসমূহ ব্যয়িত হইলেই বিপদ। জীবনধারণ করা, এবং জীবনধারণের উপায় সংগ্রহ করা পাশব ধর্ম্ম, প্রাণীমাত্রেই তাহা করিয়া থাকে। জীবনের সেবা করিবার জন্য যে যাহা করে, তাহাতে কোন উপকার হয় না, কোন কীর্ত্তি হয় না। এক জন সম্রাট অথবা এক জন পরাক্রান্ত

সেনাপতি যে সকল ক্রিয়া করেন, তাহা শুদ্ধ জীবনের জন্য নহে। যে আকাঙ্ক্ষা, দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা কেবল প্রাণধারণের জন্য নহে। পশু স্বভাবে জীবনধারণ ব্যতীত অন্য চেষ্টা নাই। মনুষ্যের স্বভাবে অন্য প্রকার উত্তেজনা আছে। শারীরিক বৃত্তি সকল জয় করিবার চেষ্টা কেবল মনুষ্যের মধ্যেই আছে। শরীরের প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইলেই তাহারা রিপু নামে অভিহিত হয়। এই শরীরকে দমন করাই যথার্থ জেতার কাজ। ইন্দ্রিয় জেতাই যথার্থ বলবান। যে তপস্যা করে, ক্ষুধাকে দমন করে, চঞ্চল চিত্তকে স্থির করে, সেই মানবকুলে ধন্য। যে ভিক্ষুক, সেই যথার্থ ধনী, যে জীবনের সেবা করে না, সেই জীবনের যথার্থ উপকার করে। জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারের নানা কষ্টভোগ করিয়া, সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অপূর্ব্ব গ্রন্থ সকল রচনা করেন। অনাহারে অথবা কারাগারে বৈজ্ঞানিকগণ নিগূঢ় বিজ্ঞানতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। নির্ব্বাসিত হইয়া দান্তে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত কাব্য রচনা করিলেন, দীর্ঘকারাবাসকালে তাসো তাঁহার সুবিখ্যাত কাব্য লিখিলেন অল্পকষ্টে পড়িয়া কেপ্‌লর জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি করিলেন, বনে করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ বিরচিত করিলেন। শাক্যমুনি যদি পিতৃগৃহ—না পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে কি কখন বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে হইত? যীশু খৃষ্ট যদি আজীবন সূত্রধরের কাজ করিতেন, যদি তাঁহা বাখিবার ঠাঁই থাকিত, তাহা হইলে কি ভারতবর্ষে ইংরাজ কখন মহম্মদ যদি আরব্যদেশে ধর্ম্মানল না প্রজ্জলিত করিতেন, তাহা মোগল কখন দিল্লীশ্বর হইত?

আকাশ যেমন এই বিশ্ব চরাচরকে বেষ্টিয়া আছে, জীবন সেইরূপ দিগকে বেষ্টিয়া আছে। সকলের আদি জীবন, সকলের অন্ত জীবন। জীবনের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ, আমাদের যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইবে, সমুদয় জীবনজনিত জীবনপরিমিত। জীবনকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। জীবনের বাহির হইতে কখন কিছু সংবাদ আসে নাই, কখন কিছু আসিবে না। স্বর্গ নরকের কল্পনা জীবনে, ভিন্ন লোকে বিশ্বাসের কারণ জীবন। সালোক্য সাযুজ্য নির্ব্বাণ প্রভৃতি জীবনের বহির্ভূত নহে, জীবনেই এ সকলে বিশ্বাস আবদ্ধ হয়। জীবন আমাদের সর্ব্বস্ব। কিন্তু জীবন অর্থে জীবনধারণ করা বুঝিলে হইবে না। জীবনধারণের চেষ্টায় জীবন পর্য্যবসিত হইলে সে জীবন বৃথা হয়। জীবন সান্ত, কিন্তু অনন্তের সহিত ইহার সম্বন্ধ

রা যায় না। সকল রহস্যের অপেক্ষা এই রহস্য বড় গভীর। জীবনের
কি, অথবা পরে কি, আমরা কোন কালে জানিতে পারিব না, কিন্তু
লই জানিবার চেষ্টা করিব। বিশ্বাস নহিলে জীবনের তরু মূলবদ্ধ হয় না,
সের মূল জীবনের কোমল ভূমি ভেদ না করিলে বর্দ্ধিত হয় না। আমরা
জ্ঞানলাভ করিয়াছি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত কিছু নূতন অথবা পুরাতন
ত পারিয়াছি, সকলই জীবন-বৃক্ষের কুসুমসদৃশ।

যদি জগৎ সুদ্ধ লোক স্বীকার করে যে, জীবনের বহির্ভাগ হইতে কখন
আসে না, তাহা হইলে মানবজাতির উন্নতির পথ ঘুচিয়া যায়। জীবনের
সীমার আমাদের চিন্তা অথবা বিশ্বাস আবদ্ধ হইলেই আমাদের দ্রুত
নতি হইবে। আমাদের বল অলক্ষিতে আসে, বিশ্বাস যেন অন্য লোক
হইতে আসে, তিতিক্ষা, ক্ষমা, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণ অন্য কোন জীবন হইতে
াসে। জীবনরূপী সমুদ্র জীবনের ভেলায় চড়িয়া পার হওয়া যায় না, এই
য ধর্ম্ম, বিশ্বাস, ভাবুকতা প্রভৃতি অন্য উপায়ের প্রয়োজন হয়।

এই জন্য-জীবনকে জীবনের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। এই জন্য সর্ব্বদাই
তারিত হই। মনে হয় যে, জীবনের বহির্দেশ হইতেও জীবনের
কিছু আসে। এক গ্রামেই জীবনের ইতিহাস সমাপ্ত হয় নাই, নগর
নগরান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে সে ইতিহাস চলিয়া গিয়াছে।
ই জীবনের উপর দিয়া জীবনাতীতের ছায়া চলিয়া যাইতেছে। সেই
আমরা বিবিধ মূর্ত্তি দেখিতেছি, বিবিধ শিক্ষা লাভ করিতেছি।

যে বিশ্বাস করে যে, জীবনের পূর্ব্বে অথবা জীবনের পরে কিছু নাই, জীবন অনন্ত নহে, জীবাত্মা অমর নহে, সকলই ধ্বংসশীল, তাহার উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া যায়। মনে অনেক বল থাকিলে ইহজীবনের জন্যই জীবনের সদ্ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তেমন অমানুষী শক্তি লাভ করা যায় না। বিশ্বাসে বল, সংশয়ে বল নাই। সংশয়ের অপর নাম দুর্ব্বলতা।

'মৃত্যু ব্যাঘ্রের ন্যায় জন্তুগণকে ভক্ষণ করে না, এবং মৃত্যুর স্বরূপ নিরূপণ করা কঠিন।' * ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি সনৎসুজাত এই কথা কহিয়াছিলেন। মৃত্যুতে এবং ব্যাঘ্রে যে প্রভেদ, তাহা সহজ বুদ্ধিতেই উপলব্ধ হয়। ব্যাঘ্রের স্বরূপ আমরা জানি, মৃত্যুর স্বরূপ নিরূপণ করা কঠিন বলিয়াই মৃত্যু

* উদ্যোগপর্ব্ব, সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায়।

ভীষণ। ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে তবে জন্তুগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, মৃত্যুর কারণ বলিয়াই ব্যাঘ্রকে দেখিয়া সকলে ভীত হয়। মৃত্যুর যতই চিন্তা করি, ততই বিশ্বাস হয় যে, মৃত্যুর সম্বন্ধে অজ্ঞতাই আমাদের ভয়ের কারণ।

সনৎসুজাত পুনরায় বলিতেছেন, 'যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিষয়ানুরাগে হয় নাই, তাঁহার পক্ষে মৃত্যু তৃণময় ব্যাঘ্রের ন্যায় নিতান্ত অকি বিষয়ানুরাগ হইতে নিবৃত্ত হওয়া সহজসাধ্য নয়, এবং যিনি তাহা পারি করিতে পারেন, তাঁহাকে মৃত্যুভয়ও পরিত্যাগ করে। মৃত্যুভীতি পরিত করা তেমন কঠিন নয়। যাহার ধর্ম্মবল নাই, সেও অনেক সময়ে নির্ভীক মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করে। মৃত্যুকে তৃণতুল্য জ্ঞান করা অভ্যাসের ফ যাহার পরলোকে বিশ্বাস নাই, সেও নির্ভয়ে মরিতে পারে, যে অদৃষ্টবাদী, সে নিশ্চিন্ত হইয়া মৃত্যুর মুখ অবলোকন করে। কিন্তু চিন্তা ত্যাগ করা যায় ন এই যে গভীর রহস্য, ইহা ভেদ করিবার অভিলাষ ত্যাগ করা যায় না। মৃত্যু কি ?—এই প্রশ্ন সর্ব্বক্ষণ মনোমধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকে।

আলোকের সহিত অন্ধকারের যেরূপ সম্বন্ধ, জীবনের সহিত মৃ রূপ সম্বন্ধ। মৃত্যুর ধ্যান করিতে করিতে জীবনের উপকূলে উপ জীবনের চিন্তা করিতে করিতে মৃ গ্রাসে পতিত হই। চিন্তার অবি কল্পনার সীমা নাই। আমরা জীবনের জালে বদ্ধ, জীবনের বর্ণে আমাদে রঞ্জিত। জীবনকেই আমরা সর্ব্বত্র বিস্তৃত করি, জীবনকে সঙ্কীর্ণ করিলেই ঘটে। জগৎকে পরিচালিত করিবার, মানবজীবনকে পবিত্র করিবার প্রধান উপায় বিশ্বাস—ধর্ম্মে বিশ্বাস, অনন্তে বিশ্বাস, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস। বিশ্বাস জীবনের উপর স্থাপিত হয় না। জীবন এত ক্ষুদ্র, এমন নশ্বর, এত দুর্ব্বল যে, কেবল জীবনের উপর ভরসা করিলে আমাদের বুকে বল হয় না, উৎসাহ হয় না।

জীবন ও মৃত্যুর এই অনন্ত রহস্য অনন্ত কাল ধরিয়া মনুষ্যকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। যাহারা মনে করে, এই রহস্য ভেদ করিয়াছি, তাহারাই বল-বান, যাহারা নিত্যসংশয়ে আকুল হইয়া ইতস্ততঃ করে, তাহারাই মনুষ্যকুলে দুর্ব্বল। বিশ্বাস স্থল, সংশয় জল। যে বিশ্বাসের উপর দাঁড়ায়, সে নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়ায়, যে সংশয়ের উপর দাঁড়ায়, তাহার অনুক্ষণ অন্ধকার অতলে ডুবিবার ভয় থাকে। সংশয়ের সমুদ্র সন্তরণ করিয়া, অবিশ্বাসের তরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া

আত্মবিশ্বাসের সৈকতে উঠিতে হয়। এই জন্য আত্মজয়ের তুল্য জয় নাই। জগতে যাঁহারা মহাপুরুষ নামে খ্যাত হইয়াছেন, যাঁহারা অতিশয় বলবান, সকলেই এইরূপ আত্মজয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে আপনার চিত্ত বশীভূত করিতে পারে না, যে আপনাকে জয় করিতে পারে না, সে দিগ্বিজয়ী হইবে কিরূপে? কিছুতে দাঁড়াইবার স্থান পায় নাই, সে পরকে আশ্রয় দিবে কোথা হইতে? বৃক্ষতলে শাক্যমুনির ধ্যান—আত্মজয়। আপনার হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক ধারণ করিয়া, প্রখরপ্রভাশালী বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে ডাকিলেন। তাহারা সেই আলোক দেখিল। ক্রমে সেই সঞ্চিত আলোক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, দেশ হইতে দেশান্তরে, জাতি হইতে জাত্যন্তরে সেই আলোক প্রবাহিত হইল, কোটি কোটি জীব সেই আলোকমার্গ অনুসরণ করিল। খৃষ্টদেবের পদানুসরণ করিয়া ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়াছে। এই সকল মানবকুলকেশরী জীবিতাবস্থায় জীবনকে অতিক্রম করিতেন, বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন। জীবনের উন্নতিসাধন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য, অথচ ইহারা সকলেই জীবনকে [illegible] ন করিতেন। জীবনে লোকে যাহা [illegible] তাহা হারা পরিত্যাগ করিতেন, কিন্তু ই[illegible] বাঞ্ছনীয় ক্রমে [illegible]রত্যাগ পারি না। ইঁহারাই আমাদিগে[illegible]হাদিগকে [illegible]গেরই পদচিহ্ন লক্ষ্য আমরা সাধ্যমত জীবনপথে অ[illegible]সর হইতেছি। মানুষ অনবরত [illegible] ক্ষুদ্র করে, সঙ্কীর্ণ করে, ইহারা আবার জীবনকে প্রশস্ত করেন। কিছুদিনে কূপসদৃশ হইয়া পড়ে, ইহারা আবার প্রসন্নসলিলা নদী আসেন। ভগীরথের শঙ্খনাদ লক্ষ্য করিয়া ললিত তরল গমনে লকিত কণ্ঠে যেমন জাহ্নবী প্রবাহিতা হইয়াছিলেন, জীবন-জাহ্নবী সেইরূপ বর্দ্ধিতকলেবরা হইয়া এই সকল মহাত্মার কণ্ঠধ্বনির অনুসরণ করে।

শিক্ষার বিষম ফের।

(বিজ্ঞানশিক্ষার যথেষ্ট আলোচনা হয় না বলিয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সম্প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে শিক্ষকেরা বিজ্ঞানানুমোদিত নিয়ম মতে শিক্ষা দিবেন।)

(বিদ্যালয়।—শিক্ষক ও ছাত্র।)

শিক্ষক। পড়, বাবা, বিজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পড়।

ছাত্র। (পড়িতেছে) সূর্য্য উদয় হইয়াছে।

শিক্ষক। অ্যাঁ।

ছাত্র। কেতাবে যাহা আছে, তাহা পড়িতেছি।

শিক্ষক। কি কখন উদয় হয়? তোমার মাথা। সূর্য্য

ছাত্র। এই যে কেতাবে রহিয়াছে।

শিক্ষক। যেমন পাঠক, তেমনি কেতাব। সূর্য্য কি উদয় হয় না, অস্ত যায়? সূর্য্য ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর গতির তুলনায় অচল রহিয়াছে। সূর্য্য ওঠেও না, নামেও না; পৃথিবীই কেবল পাঁ পাঁ করিয়া ঘুরিতেছে। ঘুরিবার সময় পৃথিবীর এক দিক সূর্য্যের দিকে থাকে, আর এক দিক বিপরীত দিকে থাকে। যে দিক সূর্য্যের দিকে থাকে, সেই দিকে আলোক, অর্থাৎ দিন। আর এক দিকে অন্ধকার, অর্থাৎ রাত্রি। রাত্রি গিয়া যখন প্রভাতের আলোক আসে, তখন বুঝিতে হইবে যে, পৃথিবীর যে দিক সূর্য্য হইতে দূরে ছিল, সেই দিক ঘুরিয়া সূর্য্যের দিকে আসিতেছে। অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইয়াছে না বলিয়া বলিতে হইবে যে, পৃথিবীর অন্ধকার দিক ঘুরিয়া সূর্য্যের সম্মুখে আসিতেছে। এজন্য সে দিকে আলোক হইয়াছে।

ছাত্র। যে আজ্ঞা। আমি কেতাবে কাটিয়া আপনি যাহা বলিলেন, লিখিয়া রাখিতেছি।

শিক্ষক। পড়িয়া যাও।

ছাত্র। আকাশ গম্ভীর নীল।

শিক্ষক। কি বলিলে?

ছাত্র। কেতাবে যাহা আছে, তাহা পড়িতেছি।

শিক্ষক। আকাশের বর্ণ নীল, কে বলিল?

ছাত্র। আমরা ত সকলেই দেখিতেছি। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে দেখায়।

শিক্ষক। তোমরা ত সকলে দেখিতেছ যে, সূর্য্য পৃথিবীর চারি দিকে ঘোরে। চক্ষে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আর বিজ্ঞানের প্রয়োজন কি? আকাশ নীলও নয়, লালও নয়, পীতও নয়। আকাশ সর্ব্বদা অন্ধকার। পৃথিবীর চারি দিকে যে বায়ুর আবরণ আছে, সেই জন্য আকাশ নীল দেখায়। নহিলে আকাশের কোন বর্ণ নাই।

ছাত্র। এই অশুদ্ধিও শোধন করিয়া লইতেছি।

শিক্ষক। তার পর?

ছাত্র। পশ্চিম দিকে এক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উঠিয়াছে।

শিক্ষক। দেখিতেছি এ কেতাবে না, ইহাতে সকল কথাই ভুল। কৃষ্ণবর্ণ আবার কি? বর্ণের শূন্যতাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কি না অন্ধকার, শ্বেত, পীত, লোহিত প্রভৃতি বর্ণ বলা যায়, কোন বর্ণ না থাকিলেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণবর্ণ মেঘ না বলিয়া বর্ণশূন্য বলিতে হইবে। আর মেঘ উঠিয়াছে, এ কথাও ভুল। বায়ু-তাড়নে মেঘ পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু উঠেও না, পড়েও না।

ছাত্র। লিখিয়া লইয়াছি। (কেতাব দেখিয়া) রাত্রি অন্ধকার, কেবল নক্ষত্রকুল ক্ষীণ রশ্মি বিতরণ করিতেছে।

। (মাথা হেলাইয়া) উঁহু, ভুল হইল। নক্ষত্রকুল আলোক রশ্মি বিতরণ করিতেছে—আমরা কেমন করিয়া জানিব? এক একটা নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে আসিয়া পঁহুছিতে বিশ বৎসর লাগে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যদি একটা নক্ষত্র ধ্বংস হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সেই নক্ষত্রের আলোক অদ্যাবধি পৃথিবীতে দৃষ্ট হইবে। নক্ষত্রগুলা আছে কি না, তাহার স্থিরতা নাই, আলোক আছে, এই পর্য্যন্ত স্থির। অতএব বলিতে হইবে, নক্ষত্রকুল আলোক রশ্মি বিতরণ করিয়াছিল।

ছাত্র। তাহাই বলিব। (পুনর্ব্বার পাঠারম্ভ) এই গৃহ অতি পরিষ্কার, কোথাও ধূলির কণামাত্র নাই।

শিক্ষক। মিথ্যা কথা! ধূলি নাই, এমন স্থানই নাই। ধূলি সর্ব্বত্রই অল্প অথবা অধিক পরিমাণে, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম আকারে থাকে। চক্ষে দেখিতে না পাইলেই যে কোন খানে ধূলি নাই, এমন বিবেচনা করিতে পারা যায় না। বল, এই গৃহ সহজে পরিষ্কার দেখাইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই ধূলি আছে, কিন্তু সূক্ষ্ম পরীক্ষা না করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ছাত্র। যে আজ্ঞা।

শিক্ষক। আজ এই পর্য্যন্ত রহিল। আমি যেমন বলিয়া দিতেছি, এইরূপে পড়িবে। বিশেষ সাবধান থাকিবে যে, পড়িবার সময় অথবা কথাবার্ত্তা কহিবার সময়, কোন অবৈজ্ঞানিক কথা মুখ দিয়া না বাহির হইয়া পড়ে। আর কেহ যদি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা কয়, তাহারও ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবে।

ছাত্র। আমি আজ হইতে খুব সাবধান থাকিব, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।

[ছাত্র (ডাকনাম কানাই) গৃহে শয়ান। পিসীমার প্রবেশ।]

পিসীমা। ওরে কানাই! তোর কি ঘুম ভাঙ্‌বে না। রোদ উঠেছে যে অনেকক্ষণ।

কানাই। (উঠিয়া চোক মুছিতে মুছিতে) কি বল্‌লে, রোদ উঠেছে?

পিসীমা। কেন, তুই কি শুন্‌তে পাস্ নে?

কানাই। ওই যে কথাটা বল্‌লে, ওটা ভুল। রোদ ওঠেও না, পড়েও না। পৃথিবী ঘুরে যে দিকে সূর্য্যের সম্মুখ হয়, সেই দিক আলো হয়, যে দিকে সূর্য্যের আলো দেখা যায় না, সেই দিক অন্ধকার। রোদ উঠেছে আর বোলো না। বলো—পৃথিবীর এ দিকটা ঘুরে সূর্য্যের সাম্‌নে এসেছে, তাই আলো হয়েছে।

পিসীমা। আ গেল যা। ঐ এক রত্তি ছেলে,

গলা টিপ্‌লে এখনও দুধ বেরে
আবার কথা শোন! আমার সঙ্গে
তোর তামাসার সম্পর্ক না কি যে, তুই
তামাসা কর্‌চিস্?

কানাই। তামাসা বই কি! মাষ্টার আমায়
বলে দিয়েছে যে, বিজ্ঞানের মতে সমস্ত
কথা বল্‌বে, আর যারা জানে না, তাদের
শেখাবে। তোমরা বিজ্ঞান কিছু জান?

দিদীমা। না, আমাদের আর জেনে কাজ
নেই। তোর মাষ্টার বেগুণ পোড়া খায়,
তুইও খাস্, তা বলে কি আমি পাগলের
মত বক্‌ব না কি?

(কানাই ও তস্য ভগিনী সরলা।)

সরলা। দাদা, দেখ! তোমার ঘর ঝাঁট দিয়ে
কেমন পরিষ্কার কোরেছি। কোথাও
একটুও ধুলা নেই।

কানাই। তুই ত ভারি জানিস্। ধুলা নেই—
এমন কি আবার জায়গা আছে? ঝাঁট
দিলেই বুঝি ধুলা যায়?

সরলা। কোথায় ধুলা আছে—এসে দেখে যাও
ত। ধুলা যদি কোনওখানে একটুও
দেখ্‌তে পাও, তা হলে আমায় বলো।

কানাই। চোকে না দেখ্‌তে পেলেই বুঝি
ধুলা থাকে না। তুই একটা microscope
সেই যে, কি বলে—আঃ—সেই অণুবীক্ষণ
যন্ত্র নিয়ে আয় দেখি, আমি এখনি তোকে
দেখিয়ে দিচ্চি—ধুলা আছে কি না।

সরলা। সে আবার কি? আমি ত তার
নামও শুনি নি।

কানাই। তাই ত বলি, তোরা কি কিছু
জানিস্! বিজ্ঞান না শিখ্‌লে পদে পদে
ভুল হয়।

সরলা। অমন লেখা আমি শিখ্‌তে চাই নে।
আমি এতক্ষণ ধরে এত কোরে ঘর ঝাঁট
দিলুম, কোন খানে একটি কুটো কি
একটুও ধুলা নেই, তা তুমি কিছুতে
বিশ্বাস কোর্‌বে না। আর আমি কখন
তোমার ঘর ঝাঁট দেব না।

(কানাই এবং কানাইয়ের মা।)

কানাই। মা, বড় তৃষ্ণা পেয়েছে, একটু খাবার
জল দাও ত।

মা। এই নাও বাবা, কলসী থেকে বেশ ঠাণ্ডা
জল এনেছি, খাও।

কানাই। ঠাণ্ডা জল আবার কি?

মা। জল হাতে কোরে দেখ না, ঠাণ্ডা কি
না। তোমার জন্য আমি কি যেখান
সেখান থেকে জল আন্‌ব?

কানাই। না না, সে কথা বল্‌চি
যে, ঠাণ্ডা জল কথাটাই ভুল।
ঠাণ্ডাই হয় না। হয় খুব গ
অল্প গরম। বলতে হয় যে, ব
গরম জল এনেছি।

মা। অবাক্! এ তোর কোন্ দে
জল যদি ঠাণ্ডা হয় না ত শীত
দেখে আঁৎকে উঠিস্ কেন,
নাইতে চাস্ না কেন?

কানাই। সে শুধু খুব কম গরম বলে। এই
যে বরফ দেখ, বোধ হয় যেন বড় ঠাণ্ডা,
হাতে করা যায় না, তাতেও গরম আছে।
একেবারে গরম নেই, এমন কোন জিনিস
নেই।

মা। এ সব কথা তোকে কে শেখালে? তুই
কি বল্‌চিস্?

কানাই। তোমরা বিজ্ঞান কিছুই জান না,
তা আর বুঝবে কি? মাষ্টার মশায়
আমায় এত কোরে বলে দিলেন, আমি

তোমাদের এত বোঝাবার চেষ্টা কচ্চি, তা তোমরা কিছুই বুঝবে না।

(কানাইয়ের মা, পিসীমা ইত্যাদি কানাইয়ের প্রস্থান।)

পিসীমা। চক্রবর্ত্তীদের এবার কেমন নষ্টটি হয়েছে, দেখেছ? যেন প্রতিমাখানি। যেমন রং, তেমনি মুখ চোক। চুলের রং বিশ কালো, যেমন লম্বা, তেমনি গড়ে।

কানাই। তুমি স্বচ্ছন্দে একটা কথা ভুল বল্‌লে।

পিসীমা। আবার কি হল? মেয়েদের কথায় তুই আবার কেন?

কানাই। চুলের রং যে কালো বল্‌লে, কালো কি কোন্ রং আছে? সাদা লাল হল্‌দে [illegible] রং, কালো কোন রং নয়। কিন্তু থাক্‌লেই কালো। চুলের রং না বলে বল্‌তে হয়, চুলের রং নেই। লেই ঠিক বলা হল।

(ইন্দুর পিতা ও কানাইয়ের মাতা।)

(অত্যন্ত বিষণ্ণ ও চিন্তিত ভাবে) [illegible]র কানাইয়ের কি হল—আমি ত [illegible] বুঝতে পারি নে।

পিতা। হল আবার কি। দিব্য হেসে খেলে বেড়াচ্চে, কখন আবার কি হল।

মাতা। না, তা বলচি নে। এই কদিন থেকে ছেলে যেন কেমন ধারা হয়ে গিয়েছে, কি রকম এলোমেলো কথা কয়, কিছুই বুঝতে পারি নে।

পিতা। কি রকম?

মাতা। কে জানে বাপু, ওদের ইস্কুলে কে এক জন মাষ্টার এসেছে—মিন্‌সে হয় ত পাগল—সে কি জ্ঞান না ও গণ জ্ঞানে, ছেলের মুখে দিন রাত কেবল ঐ এক কথা, ঠাণ্ডা কন্‌কনে জল দেখ্‌লে বলে একটু গরম, ঘরে ধুলা না থাক্‌লেও বলে ধুলা আছে, বোদ উঠলে বলে, পৃথিবী ঘুরচে। শুনে শুনে আমার হাত পা পেটের ভিতর সেঁধিয়েছে। তা' তুমি না হয় ডাক্তার ডেকে একবার দেখাও, না হয় কবিরাজের বাড়ি থেকে একটু তেল টেল চেয়ে পাঠাও।

পিতা। এই কথা। তবু ভাল। আমি ভাবি না জানি কি হয়েছে! এখন সব স্কুলে বিজ্ঞান শিখাচ্চে কি না, সে একটা নতুন জ্ঞান। তা সাহেবদের হুকুম, তার উপর ত আর কথা নেই।

মাতা। বলা কব, বাজ নেইক অমন জ্ঞানে! মুখ্খু সুখ্খু হয়ে ছেলে আমার বেঁচে বর্ত্তে থাক্, অমন ইস্কুলে গিয়ে আর বাজ নেই। শেষে কি পাগল হয়ে যাবে?

নব্য বঙ্গ। *

নব্য বঙ্গ উপন্যাস গ্রন্থ। কিন্তু উপন্যাস হইলেও ইহা কেবল কাল্পনিক ঘটনায় সম্বন্ধ নহে। ইহাতে যে সকল বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই অলীক ভাবের বিকাশ নহে। নব্য বঙ্গসমাজের অনেক বিষয় ইহাতে যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। নব্যবঙ্গ কল্পনার লীলাকানন হইলেও, অধুনাতন বঙ্গসমাজের একখানি সুসম্বদ্ধ ও প্রকৃত ঘটনামূলক চিত্র।

নব্য বঙ্গে অনুকরণের ছায়াপাত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ "স্বর্ণলতা" উপন্যাস যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, নব্য বঙ্গ কিয়দংশে সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। কুচরিত্রা স্ত্রীলোকের পরামর্শে কিরূপে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হয়, পরস্পর প্রণয়বদ্ধ ভ্রাতৃযুগল বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপে শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়া উঠে, কিরূপে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মতিভ্রংশ ঘটে, কিরূপেই বা উপার্জ্জনাক্ষম অপিচ অবলম্বনশূন্য হইয়া দুস্তর সংসারসাগরে ভাসিতে ভাসিতে কষ্টের একশেষ করে, "স্বর্ণলতায়" তাহার যেরূপ উজ্জ্বল চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে, নব্য বঙ্গে তদনুরূপ উজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অনুকরণ হইলেই গ্রন্থ নিকৃষ্ট হয় না। সীতার বনবাসের প্রথম অংশ ভবভূতির উত্তরচরিতের অনুলিখিত হইলেও, সীতার বনবাস বঙ্গ সাহিত্যভাণ্ডারে একটি উজ্জ্বল ভাবরত্ন কিরাতার্জ্জুনীয়ের সহিত মাঘের শিশুপালবধের অনেক সাদৃশ্য হয়। এরূপ হইলেও শিশুপালবধ সংস্কৃত সাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের অনুকরণে ইউরোপের অনেক আধুনিক ব নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এই আধুনিক গ্রন্থগুলি কোনও অংশে নিকৃষ্ট বা কোনও অংশে অপাঠ্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। বরং অনুকরণচ্ছটায় ঐ গুলির ঔজ্জ্বল্য অনেকাংশে বর্দ্ধিত হইয়াছে। স্বর্ণলতার অনুকরণে নব্যবঙ্গের কোনও অংশ লিখিত হইলেও, লেখকের লিপিনৈপুণ্যে ও বর্ণনার বৈচিত্রে, অনুকরণজনিত হীনতা ঘটে নাই। বরং নব্যবঙ্গ পাঠকের সমধিক হৃদয়াকর্ষক হইয়াছে।

নব্য বঙ্গে অপবিত্রতার যেরূপ তীব্র হলাহলময় উৎকট দৃশ্য প্রদর্শিত হই

* নব্য বঙ্গ, সামাজিক উপন্যাস।

যাছে, সেইরূপ পবিত্রতার অপার্থিব সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে। কুচরিত্রা কুলটা নারীর পাপময় মায়াজাল ও শোচনীয় পরিণাম যেরূপ কৌশলসহকারে চিত্রিত হইয়াছে, সতী সাধ্বী পতিব্রতার অতুল্য পবিত্রতার ভাব, বিশ্বজনীন অপূর্ব্ব স্নেহ, নিঃস্বার্থ পরোপকার ও স্বর্গাদপি গরীয়সী পতিভক্তির দৃশ্য, সেইরূপ কৌশলের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে, নব্যবঙ্গের যাঁহারা বিমলা ও বগলার চিত্র দেখিবেন, এবং চিরদুঃখিনী শিবানী ও ভবানীর চিরপবিত্রতাময়ী প্রকৃতির দিকে যাঁহারা দৃষ্টিপাত করিবেন, এ বিষয় তাঁহাদের স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গ্রন্থে নব্যবঙ্গের—অস্মদ্দেশের দূষিত কৌলীন্য প্রথার চিত্র সমধিক উজ্জ্বল হইয়াছে। এই চিত্রে পতিগতপ্রাণা পতিবিচ্ছেদবিধুরা পতিভক্তিপরায়ণা শিবানীর পবিত্রতা অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লেখকের লিপিনৈপুণ্য প্রশংসনীয়। গ্রন্থের অনেক স্থলে তাঁহার বর্ণনাচাতুরীর পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণনা যেরূপ মনোহারিণী, সেইরূপ শিক্ষাবিধায়িনী।

ত হিন্দুগৃহস্থ কিরূপ পরোপকারী, কিরূপ দয়াশীল ও কিরূপ ধর্ম্মানুরক্ত া শিবকৃষ্ণ ও তদীয় পত্নী প্রসন্নময়ীর চিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। নব্য- দেখাইয়াছেন যে, ইঙ্গরাজি বিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইলেও নিষ্ঠাবান হিন্দু প্রতিষ্ঠাবান হইতে পারেন, আ ি বিলক্ষণ উপার্জ্জনক্ষম হইয়া ধনী পরিগণিত হইতে পারেন। শিবকৃষ্ণ ইঙ্গরেজিতে অশিক্ষিত, কিন্তু মোচনে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত, পরোপকারসাধনে সর্ব্বদা সমুদ্যত, এবং রাজনে সর্ব্বদা অর্থব্যয়ে অকুণ্ঠিত। তদীয় সহধর্ম্মিণীও সেইরূপ দান- রায়ণা, সেইরূপ দয়াশীলা এবং সেইরূপ পরোপকারতৎপরা। চির- ভবানী পুত্রের সহিত ইঁহাদের সংসারে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শান্তিলাভ করে। শেষে ইঁহাদেরই দয়ায় কঠোর দারিদ্র্যদুঃখ হইতে মুক্ত হয়।

পক্ষান্তরে ইঙ্গরেজি বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইলেও যদি পরিশুদ্ধ জাতীয় প্রথায় ও প্রকৃত হিন্দুত্বে ঔদাস্য জন্মে, তাহা হইলে মানুষ কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয়, স্নেহ দয়ায় বিসর্জ্জন দিয়া নীচতার দিকে কিরূপ অবনত হইতে থাকে, এবং কপট-ভাবময় হইয়া কিরূপ বিগর্হিত কার্য্য সাধনে উদ্যত হয়, তাহা নগেন্দ্রনাথের চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ ইঙ্গরেজিতে সুশিক্ষিত, রাজধানীতে দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচিত, অধুনাতন সভ্য সমাজে সম্ভ্রান্ত বদান্য ও শিক্ষানু- রাগী বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু তিনি মাতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, সহোদরার প্রতি

স্নেহশূন্য, আত্মীয় স্বজনের প্রতি মমতাবিহিত। পত্নীসর্ব্বস্ব নগেন্দ্রনাথের চিত্র পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে প্লাবিত নব্যবঙ্গে বেশ ফুটিয়াছে।

সংক্ষেপে, নব্যবঙ্গ পাঠে আমোদের সহিত যথোচিত শিক্ষালাভ করা যায়। গ্রন্থে লেখকের গুণপণা প্রকাশিত হইয়াছে। নব্যবঙ্গকার সমাজতত্ত্বাভিজ্ঞ। তাঁহার লিখিত গ্রন্থে ইদানীন্তন বঙ্গসমাজের অনেক বিষয় সবিশেষ কৌশল-সহকারে চিত্রিত হইয়াছে। চিত্রকর নিপুণ ও উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন। প্রদর্শিত চিত্রগুলি তাঁহার নৈপুণ্যের পরিচয়স্থল। তিনি বর্ণনাকুশল ও লিপিচাতুর্য্যে প্রশংসনীয়।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

শব্দ ও অর্থ।

বাঙ্গালা অভিধানগুলি সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ; যে সহস্র দেশীয় কথা বাঙ্গালা ভাষায় স্থানলাভ করিয়াছে, কি যাহারা সংস্কৃত শব্দ হইতে এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, কোন ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, নির্ণয় করা দুষ্কর, সে সব শব্দ বাঙ্গালা অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সম্মাননীয় আনন্দরাম বড়ুয়া, বাঙ্গালা ভাষার একখানি প্রকৃত অভিধান সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি সহস্র দেশীয় শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যক্রমে অকালে তাঁহার মৃত্যু হইল—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান আর সংগৃহীত হইল না।

এখানে কয়েকটি বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগ দেখান যাইতেছে—শব্দ এখন অপ্রচলিত হইয়াছে।

ভোখিল—

কমলিনী কমল কলেবর
তুহু সে ভোখিল মধুকর।

উনমতি—

গাইতে মোতিম হারা
ছলে পরশই কুচভারা।
না মুখয়ে রতি রস রঙ্গ
খেলে উনমতি খেলে ভঙ্গ।

হট—

হট নাহি করহ মহত রাখ মোর।
হটে নট কৈলি সব কাজ।
হট করি নাহ কয়ল যত কাজ,
সো কি কহব ইহ সখিনী সমাজ।

আওলি, আগোর—

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আওলি
বিহি নিরমল তুয়া শিরীতি পুতলি।

শুন শুন নাগর সব গুণ আগোর
এক তুঁহু নাগরী নবগুণ আগোরী
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর
ভাঙ্গ ভুজঙ্গীম-রহ আগোর।

বিভান—

জীবন যৌবন বাসগৃহে পুন
যো কিছু আপন বিতান।

অনরত—

যামিনী অতি অধিক বহি গেল
যতহঁ মনোরথ অনরত ভেল

অহেরা—

মাধব মনোরথ ফিরত অহেরা
একলি নিকুঞ্জ ধনী, ফুল শরে জর জর
পন্থ নেহারত তেরা।

না মিলল শ্যামর বাতি
নন্দ দাস কহ দীঘল ভরাতি।

স্থান ও শিথান শব্দ এখনও গ্রাম্য লোকে ব্যবহার করে। কিন্তু গ্রন্থ-ব্যবহার দেখা যায় না।

হইতে মাথাটি বাহুতে
রাধিয়া সুতল কাছে।
পীরিতে জাগি যুগায়নু নাগানি
বিহান নিশি।

নির্গুন—

শরীরে না রহে প্রাণ কর মোর দয়া
ত্রিতাপে তাপিত মোরে দেহ পদছায়া
নির্গুন জাও পদ অভয় তোমার
অবশেষে কৃপা কর কে আছে সংসার
মিত্র বৃন্দা লয় জিতা সুশীলা সুবালা
প্রভু নির্গুন করে আনন্দ বিহ্বোলা।
নির্গুন নহা আর ঘৃত বাতি জ্বলে
ঘরের আইলা প্রভু হেরে শুভ বেলে॥

পার—

থির নয়নে ধনি তুয়া পথ হেরইতে
কুসুম পরাণ ওহি লাগি,
নয়নক আর বাঢল অভিশয় তাহে
পুন যামিনী জাগি।

পাল—

বঁধুলী অরুণ, অধরে ভেল কাজর
পালোপরি যলতক দাগ।

কবল—

কবলে কবলে জীউ জরি যব যাওব
তবহি দেখব ইহ রঙ্গ।

যোকারী—

রাধামোহন পঁহু গোপত যোকারী
সো সুখ কোজন কহইতে পারি।

গরাধ—

রাসহাট উপরে পতাকা শশধরে
কোকিল বোটাল ছুবে আগায় কামেন
ভ্রমরা হাটের বাদ্য পরা দেবে
গরাধ রসিকবর মদনমোহন।

বিশ্বম্ভর নির্গুন করে আর্য্যগণ
জয় হলাহুলি শুনি এ গীত নাচে॥

ব্যতীত—

সাধনের যত অঙ্গ রহিল তাহারে
স্মরণ পদ্ধতি পড়ে তাহে অন্ত র
সাধ্য সাধন করে আনন্দ আবেশ
ব্যতীত করিল আজ্ঞা দিল অবশেষে

খুঁথল—

কুল চির মোর খুলল কবরী

নিরুকল্প—

পরশে অবশ তনু বেশ নিরুকল্পি

বিতথা—

সে হেন অঙ্গের এমন বিতথা
লোকে না বলিবে কি

অবজ্ঞান—

যা লাগি কান্দিবে আমি, সে কথা জানহ তুমি
আর যত যত অবজ্ঞান।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি অপ্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে :—

মোরি—ফিরাইয়া

কাননকুঞ্জ কুসুম শরে জর জর বয়ন
হেরি পুন ভেবি
ভাগ্যে মিলন পুন তোহে কমলমুখী
রোখে চললি মুখ মোরি

উদাস—

অনুরাগশূন্য, বিষণ্ণ, মুদিত, অনাবৃত—

তুহু লাগি তেজল গুরুজন আশ
কাহে লাগি তুহু ভাবে ভেলি উদাস ?
তাবক ভ্রমর আধ, আচ্ছাদিল তাব সাধ
আধ উদাস আধ দেখি
আধ লুকায়লি আধ উদাস
কুচকুম্ভে কহি গেল হৃদয়ক আশ।

বেভার—ব্যাপার

জ্ঞানদাস ভাবিয়া গায়
রসের বেভাব লুকানা যায়।

শান্তি—শান্তি

কানুক বচন অমিয়া রস সেচনে বেচনু
তনু মন জাতি

আরম্ভটী—

কথা কহে পুরিপাটী নারদের আরম্ভটী
স্ফুরিত অধরে দোলে অঙ্গ।

নিজ কুল দূষণ ভূষণ করি মানলু তেঞি
ভেল ঐছন শান্তি।

প্রসাদ—ভাব, Inspiration.

কহয়ে রসিক ভকতগণ
রাধার ভাবে বিভাবিত মন
পরসাদে কহে আমার গোরা
কাহারে কি কহে প্রলাপ পারা

লাগ—সঙ্গ

বুকমাঝে দেখি তোমার কৃষ্ণের দাগ
কোন কলাবতী আজ পেয়েছিল লাগ ?

হারা—ক্লান্ত

ভাবের ভরেতে চলিতে
চরণ
কানুর সনে নিকুঞ্জ বনে
রঙ্গেতে

ব্যস্ত—স্থানভ্রষ্ট

বিতথ চেতন গোপী কৃষ্ণ
উপেখিল কুলশীল লাজ
ব্যস্ত বস্ত্র আভরণ হৈল
কৃষ্ণগত চিত্তবৃত্তি মদন

সন্ধান শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সন্ধান—উপায়

মনের আকুতি বেকত করিতে
কত না সন্ধান জানে।
আমার প্রাণ কাঁদে গৌরাঙ্গ বলে
ধৈরয না মানে
আমি কি জন্যে জল ভর্ত্তে গেলাম
ভুলে রলাম ভরী পানে,
আমি আর যাব না মনে করি,
তবু কি জানি সন্ধানে টানে।

সংযত—আয়োজন

বিলম্ব করহ কিছু আমারে চাহিয়া
বিলম্বে সে দিতে পারি সংযতে করিয়া

বাসি—ভালবাসি, মনে করি—

প্রতি অঙ্গে অমিয়া উগারে রাশি রাশি
নিরখিতে নয়ন হৃদয় কেন বাসি।
শূন্য ঘরে কত সৈন্য সামন্ত ভাবিল
ঐছন বাসয়ে শচী তবাসিত হৈল

পরিচ্ছেদ—শেষ, পূর্ণ

লুবধ মধোভব নহ পরিচ্ছেদ

ভোর—ভোলা
সো বহুবল্লভ সহজই ভোর
কৈছনে বেদনে জানব মোর ?
প্রতিভাতি—বুদ্ধি
অখিল লোচন ভম তাপ বিমোচন
উদয়তি আনন্দ কন্দে
এক নলিন মলিন কবয়ে জনি
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে
সুন্দরি বুঝিল তুয়া প্রতিভাতি
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি অন্তে
আহিরিণী জাতি।

ভারতচন্দ্র ঘোষণা অর্থে ভাষণা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন :—
যাঁসনা কেবল বৈল, বাসনা পুরণ নৈল
লাভে হতে লাভ হইল, লোকে মিথ্যা ভাষণা
মঙ্গল—প্রস্তাবনা, প্রবন্ধ।
পূর্ণ কব নূতন মঙ্গল

ভারতচন্দ্র যত যাবনিক ও দেশজ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার আর কোনও কবি সেরূপ করেন নাই। ভারত সংস্কৃতেব ন্যায় পারসী ভাষা উত্তম শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং সে সময়ে বাঙ্গালা দেশে পারসীর খুব কদর ছিল। এজন্য যাবনিক শব্দের প্রতি ভারতের অনুরাগ বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে দেশজ শব্দের প্রাবাল্য দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, সে সময়ে দেশজ শব্দেব প্রাদুর্ভাব এখন অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। সভ্য সমাজে এখন বাঙ্গালার নানা ভাগের লোক একত্র হয়। একখানি পুস্তক লিখিলে এখন সমগ্র বাঙ্গালার দিকে চাহিয়া লিখিতে হয়। এজন্য আমাদের কথায় ও লিখায় দেশজ শব্দের সংখ্যা খুব কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবিকঙ্কণ ও ভারতের নিম্নলিখিত কথাগুলি এখন সকল লোকে বুঝিবেন কি না সন্দেহ। খাঁটি বাঙ্গালা এখন আর শিক্ষিত সমাজে শুনা যায় না। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "খাঁটি বাঙ্গালা কথায় বাঙ্গালির মনের ভাব খুঁজিয়া পাই না। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালি কবি জন্মে না, জন্মিবার যো নাই, জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালি কবি আর জন্মিতে পারে না।" ভাষা ভাব প্রকাশ করে। বাঙ্গালির ভাব বাঙ্গালি নাই,—বিকৃত। তাই ভাষা বাঙ্গালি নাই। ভাবের মত ভাষায় বর্ণসঙ্করতা জন্মিতেছে। এটা উন্নতি কি অবনতি ? বঙ্কিম বাবু বলেন, ইহা উন্নতি।

লোৎ পেবে বাঁধে সদাগবে।
নেগে খায় নাযের নফবে।
সাধু কন্যা হইলা ফাঁফব।
ভেদ পেয়ে দ্বিজ স্থানে।
গাযে কাঁথা শিরে টোপ,গলে হেঁসি মুখে গোপ
ঝুলিছে দুলিছে ধোপ, হাতে আশাবাড়ীবে
এবে বাবু সাপে খেকো, ভুবন কবিল ভেকো

কেবল কামের ভেকো, সঙ্গে লয়ে সামন্ত।
বড় হৈল কর্ষণ, বুঝিনু নিষ্কর্ষা।
ঘব ভাঙ্গে উড়ে খড় নাহি যায় চাওয়া
হলস্থুল পাবাবাব, প্রলয়ের দাওয়া।
ভেড়ের ভাড়ামি মুখে, ধেড়েব বিক্রম বুকে
ভেড়ে ধেড়ে ফেবে সুখে স্থল জল নেড়ে।

অতিতর একটি সুন্দর শব্দ। এখন আর ইহার ব্যবহার দেখা যায় না।

তাহার কামিনী, চন্দ্রিনী পদ্মিনী দোঁহে প্রেম অতিতর।

বৈষ্ণব কবিগণ ভাবের উচ্ছ্বাসে অনেক গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাঁদিবার সময়ে কেহ সাধু ভাষায় কাঁদে না। ভাষার বাঁধ ভাবের স্রোতে ভাসিয়া যায়। বৈষ্ণব কবিরা অনেকে রাঢ়দেশীয়। পূর্ব্ব বা উত্তর বাঙ্গালায় বিখ্যাত কবি কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। এ জন্য রাঢ় দেশে প্রচলিত অনেক দেশীয় শব্দ বৈষ্ণব কাব্যে পাওয়া যায়।

শ্রীনিবাস তা সবার পানে নিরখিয়া
করে করাঘাত শিরে উমড়য়ে হিয়া।
দেহে পৈঠে দ্বিভুজ এ কৌতুক অপার
এই হেতু পৈঠ নাম লোকেতে প্রচার
ওই যে পিয়াসো গ্রামে বৃক্ষে প্যাস হৈল
বলদেব আসি জল কৃষ্ণে পিয়াইল।
গোরাগুণ গাইয়া গোঁয়ায় দিবা রাতি
দেখিয়া সে দশা বিদরিয়া যায় ছাতি
আমায় অসংখ্য লোক সঙ্কীর্ত্তন স্থানে
অল্প স্থান বিস্তার তা কেহ নাহি জানে।
ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই
ঈশান বিহনে না যায়েন কুন ঠাঁই
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়
যে আখুটি করে তা ঈশান সমাধয়
আকটী করিতে একটি বোল যেন
অমিয়া অধিক লাগে
হাট ভাঙ্গা গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া
শ্রীনিবাস প্রতি কহে হাত সান দিয়া
বাঁধুলি জিনিয়া রাঙ্গা ওটখানি হাস
ওরূপ হেরিয়া কাঁদে বলরাম দাস।
এথা সঙ্কীর্ত্তনে করে হুঙ্কার গর্জ্জন
বকিয়া মরয়ে শুনি পাষণ্ডীর গণ।
শ্রীবাসের শাশুড়ি মাথায় জল দিয়া
এ ঘরের কোণে তেঁহ ছিল লুকাইয়া
দৈবকীনন্দনে বোলে শুনলো আজালি
তুমি কি না জান গোরা নাগর বনমালি।
কংসারী বল্লভ আর, ধনঞ্জয় এ সবার,
হই যেন নাচের কুকুর।
নয়নে গলয়ে নীর, নিরখিয়া অস্থির
নিহিয়া নিহিয়া দেয় প্রাণ।
বঁধুর পিরীতে, আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতি কুল।
গোবর্দ্ধনের শোভা দেখি যায় বুধুতীরে
দুই কুণ্ডে খেতি দেখি কাশে উচ্চৈস্বরে
যব গেহ লাগিয়াছে দেখিল নয়নে
যেই লীলা যেই স্থানে চিনিলেন মনে।
পথে চলি যান মাথে দিয়া নিজ হাত
সেকালে যে দুঃখ হইল নিবেদিল কাথ।
ঠাকুর কহয়ে বাপু শুন মোর কথা
সিঝা পোড়া ব্যঞ্জন আমি করিয়ে সর্ব্বথা।
নবাব আছিল ক্রোধে বসিয়া যে স্থানে
বেরিয়া সকল লোকে নিল হেন মনে
সেলাম করিল যাই দেখিয়া হাসিল
তুমি কোন হাকিম এত রাজ্য যুটিল
ইহা বলি কোড়া মারিল বহুতর
না বুঝিল কিছু ইহা আনন্দ অন্তর
হাসিয়া কহয়ে এই উচিত শাস্তি হয়
যে উচিত গুণাকর করুন মহাশয়।
না মারিল হুকুম হইল বামতল ঘরা
বিচারিল আছে এই জীবনেই মরা।
কিবা গান কিবা বাদ্য সুর সুমধুর
দ্রবিল সবার চিত্ত নাহি মনে উর

সাত পাঁচ নাহি মোর তুই আঁমি তারা
আঁধলার নড়ি যেন এই ধন মোরা।
শুনিলেন শচী গঙ্গাতীরে গৌরহরি
ধরিতে চলিলা শচী হাঁতে সাট করি।
ধরিবারে চাহে শচী ধরিতে না পারে
ধাঞা সম্ভাইল গিয়া ঘরের ভিতরে।
হেনকালে গৌরচন্দ্র চতুর সুজন
মা মা বলিয়া কাঁদে জনক আজান
আঁচলে ধরিয়া কাঁদে নানা খটি করে
চরণ আঘাত করে নয়ন কচালে।
নবদ্বীপে হাট আইল শুনহ বচন
না কাঁন্দহ আরে বাপ আমার জীবন।

ভক্তিরত্নাকর, কর্ণানন্দ চৈতন্যমঙ্গল, প্রেমবিলাস প্রভৃতি বিখ্যাত বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে উপরিলিখিত পদগুলি উদ্ধৃত হইল। এমন সহস্র পদ আরো উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই সকল দেশজ শব্দগুলির এক একটি যথাস্থানে প্রয়োগ করিতে পারিলে মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়ন করিতে পারে। এ সকল শব্দ নষ্ট হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, গ্রন্থকার বিবেচনা করিবেন।

এই সকল শব্দ রক্ষা করিবার আর একটি আবশ্যকতা আছে। ভাষার ইতিহাসে ইহারা এক একটি স্তম্ভ। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস অদ্যাপি লিখিত হয় নাই—সে ইতিহাস লিখিবার সময় ইহাদিগের নিতান্ত প্রয়োজন হইবে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, সেন বংশের রাজত্বকালে যখন মিথিলা বাঙ্গালার অধীন ছিল, তখন মৈথিলী ও দেশজ শব্দ মিলিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা পূর্ণ করে। মিথিলার ভাষার সহিত রাঢ়, পূর্ব্ববঙ্গ ও উড়িয়া ভাষার অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গপ্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা দেশে এক সময়ে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সংস্কৃতমূলক শব্দ বাঙ্গালার আর কোনও স্থানে এত শুনা যায় না। মৈথিলী শব্দ রাঢ় অপেক্ষা পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অধিক শুনা যায়। পূর্ব্ব বাঙ্গালার (বিক্রমপুরের) লোকে কথা বলিবার সময় এক রকম স্বর করিয়া বাক্য উচ্চারণ করে। এই স্বর নবদ্বীপ ও রাঢ়ে অল্প পরিমাণে এবং শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামে অধিক পরিমাণে শুনা যায়। পূর্ব্ব বাঙ্গালার লিখিত ভাষা বর্দ্ধমান ও বীরভূমের লোক যত বুঝিতে পারে, হুগলী নদীয়া চব্বিশপরগণার লোকে তত বুঝে না। পূর্ব্বে এক একটি শব্দ প্রয়োগ করিয়া কাল, পুরুষ ও কারকের পরিবর্ত্তন প্রদর্শিত হইত। এই শব্দগুলি এখন এক একটি ক্ষুদ্র প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে। এই প্রত্যয়গুলি দেখিয়া ভাষার ইতিহাসের দিক নির্ণয় করিতে হয়। মৈথিলী, রাঢ় ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার কথোপকথনে, এই প্রত্যয়গুলি অনেক একই-রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মিথিলার সানুনাসিক উচ্চারণ, বীরভূম ও বিক্রম-পুরে যথেষ্ট। আর্য্য জাতি মিথিলা হইতে উত্তর বঙ্গ দিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে যাইয়া বাস করিয়াছিল; তখন নদীয়া ও চব্বিশপরগণা জঙ্গলে ও জলাশয়ে পূর্ণ। রঘু

এই পথে বঙ্গদেশ বিজয় করেন,—কালিদাস লিখিয়াছেন। ফাহিয়ান ও হুয়েন-সাং সমতটে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছিলেন। সমতট পূর্ব্ব বঙ্গে। পূর্ব্ব বঙ্গ বাঙ্গালার প্রাচীনতম অংশ। নদীয়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণার ভদ্রলোক-দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা রাঢ় ও পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে আসিয়া এই সকল জেলায় বাস করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার হিন্দুরাজার শেষ রাজধানী পূর্ব্ব বঙ্গে। শ্রীহট্ট, চট্ট-গ্রাম ও বিক্রমপুরের লোক বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্থাপয়িতা। বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, যখন যে ধর্ম্ম বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়াছে, পূর্ব্ব বঙ্গের লোকেরা অধিক সংখ্যায় সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং সকলের শেষ পর্য্যন্ত সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে। ভাবপ্রবণতা দেশজ শব্দের রক্ষাকারণ, পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এজন্য বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত রূপ দেখিতে হইলে, বিক্রম-পুর ও বীরভূমে অন্বেষণ করিতে হইবে। যাহারা রেঢ়ো ও বাঙ্গাল বলিয়া খ্যাত, তাহারাই বাঙ্গালার গৌরব।

সকল পদ উদ্ধৃত করিতে হইলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে। এই জন্য প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত এবং অদ্যাপি রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত কতক-গুলি শব্দ এখানে উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

দাপুনি,	ভোক,	গোঙায়,	বাঘাই,	হাব্যাস,	বাই,	বলাইল,
ছাওয়াল,	বেলি,	বিষাব,	হোঁউলা,	পাখাজিল,	মাইল,	দিঠ,
পিড়া,	সোযাপ,	নিবড়িল,	উর্দ্ধমিতে,	নেউটিয়া,	জাই,	ছায়,
এড়ি,	সিযান্ত,	মুয়াষ,	ছাউনি,	আউয়াদ,	নেতধটি,	সোদর,
কখু,	বালাই,	নেউ.ট,	নিবড়িল,	বিকুলি,	ছুটক,	গাঁঠ,
বজনু,	জেঁ,	নাটুযা,	বহুরি,	ঘোচন,	চেন,	আলাইলা,
কতি,	মোঁ,	গায়ন,	কাহা,	আপতি,	পরশয়,	অবেভার,
দিঠিজ,	মু,	তেউড়,	দচাইল,	আউটিয়া,	উঘাবে,	আলোল,
চামাল,	বেড়াসি,	দোহরি,	বৈ,	মালসাট,	সম্বিত,	পুটা,
ধামাল,	দিহোঁ,	মোহবি,	পরতেক	লাগ,	হালে,	পাঁচনি,
বেবি,	ধড়ামুহ,	হেট,	পাঁতি,	নাগ,	সবসন,	দোসব,
আঁটিয়া,	আপে,	ঝটি,	আঁধ,	পাশ,	পুছিতে,	ফুটকি,
তোকানি,	ছোঁযড়,	কাঁহাল,	নৈঁচ,	লটপটি,	আউদব,	হেঁচরিয়া,
মোকামি,	কোঙব,	পায়ড়া,	কাবড়,	বড়ভারি,	কাশলি,	গোডাইয়া।

বাঙ্গালা অভিধানে ইহার কয়টি শব্দ পাওয়া যায়, এবং প্রচলিত বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার কয়টি ব্যবহৃত হয়—পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"ক্ষেমা—ও ক্ষেমা।"

"যাই, মা।"

বেলা তখন আটটা বাজিয়াছিল। ঘরের বাহিরে এক বারাণ্ডা রোদ ছড়াইয়া সূর্য্যদেব আকাশের গায় আপনার আসনখানি বেশ জমকাইয়া লইয়াছিলেন। তারাসুন্দরী একটা জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিলেন। ক্ষেমা ওরফে ক্ষেমঙ্করী অথবা ক্ষেমাঙ্গিনী—দাসী মহলের সেরা দাসী—তাড়াতাড়ি ছুটিয়া উপরে আসিল।

ক্ষেমা আসিলে, তারাসুন্দরী বলিলেন,—"একবার যা দেখি বাহির বাড়ী।"

ক্ষেমা, বড় চতুরা। সে "বাহির বাড়ী" কথাটার অর্থ বুঝিল। তৎক্ষণাৎ নীচে নামিল। যেখানে আর আর চাকর চাকরাণীরা ঈর্ষাপরতন্ত্রনয়নে ক্ষেমার দিকে হা করিয়া চাহিয়াছিল, তাহাদিগকে দেখাইয়া দেখাইয়া গর্ব্বে মট্ মট্ করিতে করিতে বাহির বাড়ী চলিয়া গেল।

ক্ষেমা ঝি, ঝি-মহলে গৃহিণীর কিছু সোহাগিনী। সে চতুরা, রসিকা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী। লোক বুঝিতে, মন যোগাইতে, মানুষ বশ করিতে বড় মজবুত। তায়, তার বয়সটা কাঁচা, চেহারারও একটু চটক ছিল, ঠসক ঠমকও যে না জানিত, তাহা নহে। আবার তার গুণও অনেক। চুল বাঁধিতে, বিছানা গুছাইতে, পানের মসলা তৈয়ার করিতে একরূপ সিদ্ধহস্ত ছিল। আর যখন একা থাকিত, তখন আপন মনে কি গুন্ গুন্ করিত। নানা কারণে তারাসুন্দরী তাহাকে বড় পছন্দ করিতেন। ক্ষেমাও গৃহিণীর সোহাগ পাইয়া আর আর চাকর দাসীদের উপর প্রভুত্ব করিতে ছাড়িত না। সকলে তাহাকে ভয় করিত। সাক্ষাতে পারিত না, অসাক্ষাতে আঙ্গুল মট্‌কাইয়া তাহার অকাল নিপাতের জন্য যমরাজকে সত্বর একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রার্থনা করিত। তা, তাহাদের সে প্রার্থনা সফল হইবার আপাততঃ কোন সম্ভাবনা ছিল না। ক্ষেমা বিলক্ষণ সুস্থ শরীরে, খোস মেজাজে ও হাল তবিয়তে দিন কাটাইতে-

ার বিঙ বাধা আঁচলটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে

র দিয়া হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঝটিকা চলিয়া গেলে তাহার বহন করিয়া শ্রীভ্রষ্টভাবে গাছ যেমন নীরব নিথরে দাঁড়াইয়া থাকে,—রাত্রির সেই ভীষণ গোলযোগের পর হরিহর বাবু ঠিক্ সেইরূপে, নীরব নিথরে শুইয়া আছেন। মুখমণ্ডল চিন্তারেখাঙ্কিত, মূর্ত্তি ভাবনাক্লিষ্ট ও বিষাদ-গম্ভীর। প্রত্যহই ভোর না হইতে অনেকে আসিয়া জুটিতেন, বলা বাহুল্য, আজও তেমনি অনেকে আসিয়া জুটিয়াছিলেন, কিন্তু শরীর বড়ই অসুস্থ বলিয়া হরিহর সকলকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। অন্যের কথা কি, দুর্য্যোধন খুড়াও আজ আমল পান নাই। হরিহর বাবু একেলা আল্‌বোলার নল হাতে করিয়া, তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া, কাত হইয়া পড়িয়া কড়ির দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছেন।

চতুরা ক্ষেমা দূর হইতে ইহা দেখিল। ব্যাপার খানা সব ঠিক্ বুঝিতে না পারুক, কিন্তু অনেকটা বুঝিতে আর বাকি রহিল না। একটু হাসি আসিল। তাহা সামলাইয়া ধীরে ধীরে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া বলিল,—"মা আমায় পাঠাইয়া দিলেন।"

হরিহর একমনে আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন, প্রথমে শুনিতে পাইলেন না। ক্ষেমা এবার একটু বেশী রকম প্রকাশ হইয়া বেশী রকম আওয়াজে সেই কথা বলিল।

হরিহর বলিলেন,—"অ্যাঁ—কেন?"

"কেন?"—এ কথার কি কিছু উত্তর দেওয়া যায় গা? ক্ষেমা চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে বলিল,—"অপ্পেয়ে মিন্‌ষের নেকাম দেখ।"

হরিহর ক্ষেমাকে নীরব দেখিয়া অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন,—"বলি, কোন অসুখ হয় নাই তো?"

ক্ষেমা কি করে, তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল,—"বোধ হয়, তাই কিছু হবে।"

"অ্যাঁ—সে কি রে!"—হরিহরের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আপনার সকল চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। উঠিতে কাছাটা খুলিয়া গেল। পোড়ারমুখী ক্ষেমা মুখে কাপড় দিয়া হুড় হুড় করিয়া বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গেল।

শশব্যস্ত হইয়া শীঘ্রই হরিহর আপনার শয়নগৃহ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তারাসুন্দরী শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিলেন।

আগ্রহসহকারে হরিহর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অসুখ হইয়াছে?"

তারাসুন্দরী বুঝিলেন, পোড়ারমুখী ক্ষেমা এই অসুখের কথা রটাইয়াছে। ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"না, কিছু নয়।"

"কিছু নয়!—তোমার চোখ রাঙা, মুখ কালিপানা, কথা ভাব ভাব—মিথ্যা বলিও না। ডাক্তার ডাকাইব?"

"না না। একটু মাথাটা টীপ্ টীপ্ করিতেছিল, তা সারিয়া গেছে। বসো না।"

তারাসুন্দরী আবার ঈষৎ হাস্য করিলেন। সে হাসি কি মধুর লাগিল! হরিহর বসিলেন।

তারাসুন্দরী তখন স্বামীর দুটি হাত ধরিয়া বলিলেন, "বল, আমায় মাপ করিবে। আমি না-বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ একটা কথা বলিয়া তোমার মনে বড় ব্যথা দিয়াছি, সে কথা ভুলিয়া যাইবে, বল।"

হরিহর বস্তুতঃ হক্‌চকিয়া গেলেন। তারাসুন্দরী এবার নারী জাতির যে বরুণাস্ত্র চোখের জল তাহা প্রয়োগ করিয়া, স্বরটা আরও করুণ হইতে করুণতর করিয়া বলিলেন, "আমার সদাই যেমন ভয়, পাছে কোন্ দিন্ কোন্ খায় তোমার এত সাধের ভালবাসা হারাই, তেমনি পোড়ার মুখে—"

হরিহর তারাসুন্দরীর মুখে হাত চাপা দিতে গেলেন। তারাসুন্দরী মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন—"ছি ছি, ভুবন কি আমার পর? আমার বড় নাকি দুর্ম্মতি হইয়াছিল, তাই মুখ দিয়া ওরূপ কথাগুলা বাহির হইয়া গিয়াছিল। নহিলে, ভুবনের কাছে অমূল্য?"

হরিহর হতবুদ্ধি। ভাবিতে লাগিলেন, এ কি সেই তারাসুন্দরী!

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তুমি এখনই ভুবনকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দাও। বাছাকে দেখিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। আর যদি রাগ না কর, তবে একটি কথা বলি। আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, একবার রাজবাড়ী গিয়া মেয়েটিকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসি।"

হরিহর বলিলেন—"তাও কি হয়?"

তারা। তোমার যে মত হইবে না, তা আমি জানি। কিন্তু তারা আমাকে চিনিবে কেমন করিয়া? আমি কিছু পাল্কি চড়িয়া একেবারে বরের মা হইয়া

সেখানে যাইতেছি না। মনে করিয়াছি, চণ্ডীতলায় এক বার কালী দর্শন করিতে যাইব। সেখান হইতে রাজবাড়ী অতি অল্প দূর। কাহাকেও না বলিয়া ক্ষেমাকে লইয়া একবার চুপি চুপি সামান্য বেশে গিয়া দেখিয়া আসিব। চিনিবে কেমন করিয়া?

হরি। কি জান, তবু কাজটা ভাল নয়।

তারা। তা দেখ, ভাল মন্দ বিচারের ভার তোমাদের উপর। আমার বড় ইচ্ছাটা হইয়াছে, তাই বলিলাম।

হরিহর চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি যে ভিতরে আসিয়া পত্নীর এই আশ্চর্য্য ভাব-পরিবর্ত্তন দেখিবেন, ইহা স্বপ্নেও কখন ভাবেন নাই। পাছে বাধা দিলে আবার কি হইতে কি ঘটিয়া উঠে, তাহাও ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, ছদ্মবেশে গিয়া প্রতিবেশী বলিয়া পরিচয় দিলে চিনিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অনেকক্ষণ পরে, হরিহর বলিলেন, "তবে কবে যাবে?"

আনন্দে তারাসুন্দরী বলিলেন, "কেন, আজ।"

"আজই—এত বেলায়?"

"গাড়ীতে যাব, কতক্ষণ লাগিবে?"

হরিহর ধীরে ধীরে বলিলেন—"তবে, উদ্যোগ কর।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"আর তুমিও বিলম্ব করিও না, কাহাকেও শীঘ্রই ভুবনকে আনিবার জন্য পাঠাইয়া দাও।"

হরিহর দুটা কাজেরই আয়োজন করিতে বাহিরে উঠিয়া গেলেন।

তারাসুন্দরী ডাকিলেন, "ক্ষেমা—ও ক্ষেমা!"

ক্ষেমা নিকটেই ছিল; কিন্তু সহসা সাড়া দিল না, পাছে তারাসুন্দরী জানিতে পারেন যে, সে তাঁহাদের সব কথা শুনিয়াছে।

তারাসুন্দরী আবার ডাকিলেন, "ক্ষেমা, আ মরণ, কোথায় গেলি?"

ক্ষেমা দুপ্ দুপ্ করিয়া সিঁড়ির উপর পা ফেলিতে ফেলিতে আসিয়া বলিল, "এই যে মা।"

ক্ষেমা আসিলে, তারাসুন্দরী বলিলেন—"নে, শীঘ্র সব জিনিষপত্র গুছাইয়া নে, আমরা চণ্ডীতলায় ঠাকুর দেখিতে যাব।"

ক্ষেমা যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, "ওমা, সে কি গো, এত বেলায়?"

তারাসুন্দরী তাহার কোন উত্তর দিলেন না। ক্ষেমা দেখিল, তিনি নিজেই

চোপড় চোপড় লইতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষেমা আর কিছু না বলিয়া দ্রব্যাদি গুছাইতে প্রবৃত্ত হইল।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী প্রস্তুত। তখন আগে তারাসুন্দরী, তার পর ক্ষেমা তাড়াতাড়ি দুই জনে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ঘর্ঘরচক্রে গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে সেই মুদিতদ্বার গাড়ী মধ্যে অস্পষ্টালোকে ক্ষেমা একবার তারাসুন্দরীকে কি বলিবে বলিয়া তাঁহার পানে ভাল করিয়া চাহিল। এ কি এ! সে দেখিল, তারাসুন্দরীর সেই বিশাল আয়ত চক্ষুর্দ্বয় বিশাল দুই অগ্নি-খণ্ডের ন্যায় ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে। অমন যে সুগঠিত খগচঞ্চুবৎ নাসা, তাহা স্ফীত হইয়া ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস উদ্গীরণ করিতেছে। মাথার উপর এলায়িত কুন্তল ঊর্দ্ধফণ সর্পের ন্যায় যেন গোছায় গোছায় ফুলিয়া উঠিয়াছে। একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞায় অধরপ্রান্ত ইহার মধ্যে না জানি কতবারই দন্তে দন্তে নির্দ্দয়রূপে নিপীড়িত হইয়াছে, তাহা হইতে যেন রক্তধারা ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে। ক্ষেমা কতকটা সাহসিনী, কিন্তু সাহসিনী হইলেও তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে পটে তারা মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, ভাবিল, এ কি সেই প্রচণ্ড তারা মূর্ত্তি! সভয়ে চক্ষু নত করিয়া গাড়ীর এক কোণে চুপ করিয়া জড়সড় হইয়া বসিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কালো পড়িয়া আসিয়াছে। পড়ন্ত রোদগুলা বড় বড় লাফ দিয়া এ গাছ হইতে ও গাছে গিয়া পড়িতেছে। পড়িবার সময় লোকের এমনই বাড়াবাড়ি রকমের লাফালাফিটা ঘটে বটে। বেলডাঙ্গার রাজবাড়ীর পথে অসংখ্য লোক—কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কেহ বা অতিথিশালার অন্নব্যঞ্জনে উদরটা এতই স্ফীত করিয়া ফেলিয়াছে যে, আর নড়িতে পারিতেছে না—পথের পার্শ্বে গাছ-তলায় শুইয়া বিশ্রাম করিতেছে। বিদেশী ভিখারী, যে আপনার দেশে দিনান্তে দুই-গুণ্ডা পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিত না, সে আজ দুই টাকা পাইয়া মহা আনন্দে গৃহাভিমুখে ছুটিতেছে। চারি দিকে জনতা, চারি দিকে লোকারণ্য। সবারই মুখে একই কথা—ধন্য রাজা দেবীরায়, ধন্য রাজকুমারী মাধুরী। সেই জনতার ভিতর দিয়া এক খানি গাড়ী ধীরে ধীরে রাজবাড়ী অভিমুখে যাই-তেছে। আরোহীগণ খড়খড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়া সমস্ত দেখিতে দেখিতে ও শুনিতে শুনিতে যাইতেছেন।

সুপ্রশস্ত দূরবিস্তৃত রাজপথ। সে রাজপথ যতই প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই জনতা ও লোক-কোলাহল আরও বেশি বোধ হইতে লাগিল। অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া দুই ধারে সারি সারি দেবমন্দির। পূজা ও ভোগ হইয়া গিয়াছে—কাহারও চাতালে পুরোহিত ঠাকুর কম্বলাসনে বসিয়া পঞ্জিকা হস্তে জিজ্ঞাসুকে দিন গণনা করিয়া শুনাইতেছেন। কোথাও কোন ভট্টাচার্য্য থামে ঠেস দিয়া তুলটে পুথি লিখিতেছেন। বোয়াকে বসিয়া কোথাও বা জনৈক সন্ন্যাসী বিভূতিভূষিত অঙ্গের সার্দ্ধপঞ্চদশ ভাগ অনাবৃত করিয়া প্রকাণ্ড লৌহ-চিমটার উপর ভর দিয়া পাকলনেত্রে গঞ্জিকাসেবনোপযোগী অগ্নির অনুসন্ধান করিতেছেন। দেবালয়ের মাঝে মাঝে উচ্চ মঞ্চ, সেই সকল মঞ্চে নহবৎ বাজনা হইয়া থাকে। এখন লোকজন নাই, কেবল দুই একটা কাড়া বা নাগরা কাৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কোথাও বা একটা দুষ্ট ছেলে সুযোগ বুঝিয়া, সিঁড়ি বহিয়া উঠিয়া পোঁ করিয়া সানাইটায় ফুঁ দিতেছে। দূরে প্রকাণ্ড সিংহদ্বার—তাহার দুই পার্শ্বে বিশালদন্তশালী দুইটি হস্তী দাঁড়াইয়া কর্ণসঞ্চালন করিতেছে। সেই সিংহদ্বারের পশ্চাতে সুধাধবলিত রাজপ্রাসাদ তুঙ্গ শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া, রাজার সুবিমল যশঃস্তম্ভের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

গাড়ী খানি সিধা না গিয়া গতি ফিরাইয়া, অন্য পথ ধরিয়া, ঘুরিয়া গিয়া এক ফটকে লাগিল। সেই ফটকের দুই ধারে দুই ভোজপুরী যমদূতের ন্যায় বসিয়াছিল। বিস্মিত হইয়া তাহারা দুই জনে উঠিয়া দাঁড়াইল। এ দ্বারে অপর গাড়ী প্রায় কখন আসিত না। কেবল রাজকুমারী এই পথ দিয়া অতিথিশালা ও রুগ্নাশ্রমে যাতায়াত করিতেন। রাজবাড়ীর এই অংশ রাজা সম্প্রতি বহুব্যয়ে কন্যার জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অপর লোকজন আসিত না বটে, কিন্তু আসিলে—বিশেষ যদি স্ত্রীলোক হইত—প্রবেশ নিষেধও ছিল না। জেনানা সোয়ারি দেখিয়া প্রহরীদ্বয় বিনা বাক্যব্যয়ে ফটক খুলিয়া দিল। গাড়ী এক প্রকাণ্ড উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে চারি জন স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। আরোহীদ্বয় অবতরণ করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা অপর কেহ নহেন—তারাসুন্দরী ও রেমা।

সেই চারি জন অন্তঃপুররক্ষিকা অতি যত্নে ও বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে লইয়া চলিল। তারাসুন্দরী দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। কি চমৎকার উদ্যানশোভা! ফটক পার হইয়া দুই ধারে সরল রেখাবৎ অনন্ত ঝাউ বৃক্ষের শ্রেণী। তাহার পদপ্রান্তে সমশীর্ষ শ্যামদূর্ব্বাদল-পরিবৃত সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র চিত্রিত-

বৎ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার মাঝে মাঝে নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ—জাতি, যুথী, মল্লিকা, গোলাপ, করবী—প্রস্ফুট কুসুমদল বিকসিত করিয়া সৌন্দর্য্যের পূর্ণ-ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে। কোথাও নবকুসুমিত অশোকশাখা স্তবকভারে অবনমিত হইয়া পাতার আবরণে সৌন্দর্য্য ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে; আর একটা দুষ্ট কোকিল তাহাকে লজ্জা দিবার জন্য থাকিয়া থাকিয়া কেবল হাঁকিয়া লোক জড় করিবার চেষ্টা করিতেছে। ক্বচিৎ একটা চাঁপা গাছের উঁচু ডাল হইতে গন্ধে বিভোর হইয়া, পাপিয়া আপনার স্বরলহরী ছড়াইয়া উদ্যান মাতাইয়া তুলিতেছে। কোথাও ঝুমকা লতার তলায় দলবদ্ধ হইয়া, কতকগুলা ভ্রমর গুণ গুণ করিয়া তাহার চারি ধারে উড়িয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে লতাকুঞ্জ—ব্রততীর উপর ব্রততী জড়িত হইয়া কি সুন্দর গৃহ রচিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বিচিত্র ফোয়ারা—পরীমুখ হইতে অবিরল জলধারা উৎসারিত হইয়া তলস্থ ভূমিখণ্ড অভিষিঞ্চিত করিতেছে। মুগ্ধনেত্রে তারাসুন্দরী দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, উদ্যানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক বিশাল দীর্ঘিকা সেই শ্যামদূর্ব্বাক্ষেত্র শ্যামসলিলে সিক্ত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে: সেই জলে কত কুমুদ কহ্লার ও পঙ্কজ প্রস্ফুটিত হইয়া অতি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। সেই সকল জলজ পুষ্পের শোভা তীরভূমির স্থলজ পুষ্পের প্রতিবিম্বে আরও সমধিক সমৃদ্ধিত হইয়াছে। কোথাও মরাল মরালী গ্রীবা ভাসাইয়া সাঁতার দিয়া চলিয়াছে; কোথাও বা যত্নপালিত মৎস্যের দল ঝাঁক বাঁধিয়া খেলা করিতেছে। কি সুন্দর! আর কি সুন্দর সেই অপরাহ্ণ রবি-রশ্মির জলের উপর পড়িয়া ঝিকিমিকি! তারাসুন্দরী সে শোভা দেখিয়া যত না হউক, যে এক বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সেতুর উপর দিয়া সেই দীর্ঘিকা পার হইলেন, তাহা দেখিয়া যার পর নাই মুগ্ধ হইলেন। আরও অধিক মুগ্ধ হইলেন এই ভাবিয়া যে, যাহার উদ্যানের একটা সামান্য সেতু এত মনোহর, না জানি তাহার গৃহশোভা আরও কত মনোহর হইবে।

অল্পক্ষণ মধ্যেই তারাসুন্দরীর সে কৌতূহল নিবৃত্ত হইল। এ কি এ! রামায়ণে মহাভারতে যে ইন্দ্রালয়ের কথা বর্ণিত আছে, তাহা কি এইরূপ? তারাসুন্দরী যে ঘরে প্রবেশ করেন, দেখেন সেই ঘরেরই মেঝে মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত, দেয়ালে দেয়ালে বিচিত্র চিত্র, কার্ণিসে কার্ণিসে ঝক্ ঝক্ করিতেছে সোণার হল করা, থাম গুলি এত মসৃণ যেন মাছি পিছলাইয়া পড়িতেছে; তাহাতে আবার বিচিত্র লতা পাতা আঁকা, প্রতি শিলানের উপর শিল্প-

নৈপুণ্যের আদর্শস্বরূপ নানাবিধ দেব দেবীর মূর্ত্তি চিত্রিতবৎ খোদিত রহিয়াছে। আর সেই সকল গৃহের সাজসজ্জার কথা কি বলিব? তারাসুন্দরী বড় মানুষের স্ত্রী বলিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইতেন, সে সব সামগ্রীর অধিকাংশ চক্ষে দেখা দূরে থাক, নামও পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। একটা ঘরে ঢুকিয়া ক্ষেমা তো ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। সে দেখে, তাহার চারিদিকেই সেইরূপ অনন্ত গৃহের সারি, আর এক ক্ষেমা অনন্ত হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একি মায়াগৃহ! সে কেমন করিয়া কোথা দিয়া বাহির হইবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে গৃহের চতুর্দ্দিক স্ফাটিকে আবৃত। সে সব গৃহ অতিক্রম করিয়া গেলে প্রকাণ্ড দ্রবদালান। তাহার এক ধার দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি। সে সিঁড়িতে উঠিতে ক্ষেমার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সে পা টিপিয়া টিপিয়া উঠিতে লাগিল—পাছে পিছলাইয়া একেবারে নীচে পড়িয়া যায়। বিস্মিতনয়নে এই সকল দেখিতে দেখিতে তারাসুন্দরী উপরে উঠিলেন।

রাণী পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন, আসিয়া আগ্রহে অভ্যর্থনা করিলেন। তারাসুন্দরী ভাবিলেন, "ইহারা কি আমাকে ভুবনের মা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে, নহিলে এত করিয়া খাতির করে কেন? আমি তো সামান্য বেশেই আসিয়াছি।" তারাসুন্দরী জানিত না যে, অপর সকলকে যেমন আদর যত্ন করা হয়, তাহাকে তেমনই করা হইয়াছে। জানিত না যে, এখানে ধনী নির্ধনের ইতরবিশেষ নাই, সকলের জন্য একইরূপ অভ্যর্থনা। পাছে কোনরূপে কেহ কখন ত্রুটী করে, এ কারণ রাণী পরিচারিকাদিগকে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন। তারাসুন্দরীর সঙ্কীর্ণ হৃদয়; সে সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে এতটা কথা তলাইতে পারিল না। তবে তাহার একটা সন্দেহ হইল, তাহা হইলে অবশ্যই রাণী এতক্ষণে দেখা করিতেন। এখন রাণী দেখিবার জন্য তাহার বাসনা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিল। বলিল, "তা, এক রকম সব তো দেখিলাম, এখন একবার রাণী ঠাকুরাণীকে একটু দেখিতে পাইব না?"

হৈমবতী ঈষৎ হাস্য করিলেন। বলিলেন, "সে পোড়ারমুখী কি আবার একটা দেখিবার জিনিষ?"

চতুরা ক্ষেমা কথাটার ভঙ্গী শুনিয়া বুঝিল, এই রাণী না হইয়া আর যায় না। তারাসুন্দরীর গা টিপিয়া একবার চোখে চোখে ইঙ্গিত করিল। তারাসুন্দরী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। এই রাণী! এত ঐশ্বর্য্য, এত ধনদৌলত যার

সেই রাজ-রাজ্যেশ্বরী এই! তারাসুন্দরী ভাবিয়াছিল, সে আসিয়া নানালঙ্কার-বিভূষিতা রত্নসিংহাসনসন্নিবিষ্টা সখীমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী কিঙ্করীকুলপরিসেব্যমানা মণিময়মুকুটধারিণী এক অভিনব মূর্ত্তি দর্শন করিবে—তাহা না হইয়া সামান্য শাড়ীপরা রাণী! সহসা মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

হাসিয়া হৈমবতী তাহাদিগকে বসিবার গৃহে লইয়া গেলেন। শিরীষকুসুম-মাস্তরণসদৃশ কোমল গালিচার উপর তারাসুন্দরী গিয়া বসিলেন। তখন, দুই চারি কথার পর জলযোগের আয়োজন হইল। আয়োজনটা অবশ্য পরিপাটী রকমেরই হইয়াছিল। তারাসুন্দরী প্রথমে দুই একটা ভাঙ্গিয়া একটু চাকিয়া উঠিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সব দুর্লভ সামগ্রীর আস্বাদ পাইয়া রসনাটা এমনই অবাধ্যতা আরম্ভ করিল যে, পাত্রখানি সমস্ত সাঙ্গ না করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এই সময়ে কি করিতে মাধুরী মায়ের নিকট আসিল। তারাসুন্দরী চাহিয়া দেখিলেন। কি অপরূপ রূপ! ভাস্করের গঠন হইলেও তাহাতে কিছু না কিছু খুঁত থাকে, কিন্তু এ নিখুঁত প্রতিমা কে গড়িল? এত রূপ, এত লাবণ্য, এত সৌকুমার্য্য কি মানুষের হয়? অবাক্‌নেত্রে তারাসুন্দরী চাহিয়া রহিলেন। চাহিতে চাহিতে তাহার চোখের ভাবটা কেমন বিকৃত আকার ধারণ করিল। দেখিয়া রাণী শিহরিয়া উঠিলেন। কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "যাও মা, গা ধুইয়া এস।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "এমন সোণার প্রতিমার ওরূপ সম্বন্ধ কেন করিলেন?"

সম্বন্ধ! রাণী আগ্রহান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিহর চক্রবর্ত্তীকে আপনি জানেন নাকি?"

"খুব ভাল রকমই জানি। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সম্পর্কে আমার ভগিনী হইতেন।"

"তবে আপনি সুবাদে ভুবনের মাসী হন?"

"তা, যা বলেন। আহা ভুবন বড় সুছেলে গো। তবে—"

"তবে কি?"

"না। তবে—"

রাণীর আগ্রহ আরও বর্দ্ধিত হইল। বলিলেন, "বলুন, সঙ্কোচ করিতেছেন কেন?"

"না, এমন কিছু নয়। রূপে গুণে ভুবনের জোড়া নাই—তবে কি না—"

রাণী চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, "ভুবনের কি কোন ব্যামো আছে?"

"ব্যামো—ভুবনের ব্যামো—তার মা যক্ষা হইয়া মারা যায় বটে; তবে তার—তা, মিথ্যা কথাই বা বলি কেমন করিয়া? একবার না, হাঁ ক্ষেমা, একবার না ভার্কি বক্ত উঠেছিল?"

ক্ষেমা বলিল—"তা আর জানিনে, সে তো সেদিনকার কথা গা। কত ডাক্তার বৈদ্য দেখিয়ে তবে ছেলে ভাল হয়ে উঠল।"

হৈমবতী যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই শুনিলেন। সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। কপালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তারাসুন্দরী, ক্ষেমাকে ডাকিয়া, নিভৃতে আপনার গৃহে লইয়া গিয়া, বলিতেছিলেন—"দেখিস্ ক্ষেমা, খুব সাবধান, যেন ঘুণাক্ষরেও এ কথা প্রকাশ না হয়।"

ক্ষেমা। সে কি মা, আমি কি ছেলে মানুষ?

তারা। তবু জানি কি, চামড়ার মুখ—বাহির হইয়া যাইতে কতক্ষণ?

ক্ষেমা। তেমন কাঁচা মেয়ে আমি নই মা।

তারা। তা জানি, তবু কি জানিস, সাবধানের মার নাই।

ক্ষেমা বলিল—কয় দিন ধরিয়া সে কথাটা না বলিতে পারায় তাহার আহার নিদ্রা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু কয় দিন ধরিয়া সে বলিবার জন্য কতই অগ্রপশ্চাৎ করিয়াছে, তারাসুন্দরীর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বলিতে সাহস হয় নাই। তারাসুন্দরী প্রায় একেলাই থাকে, মাঝে মাঝে মুখ নাড়ে, হাত নাড়ে, ভ্রূকুটী করে, থাকিয়া থাকিয়া সেই ভ্রূকুটী-বদ্ধ মুখমণ্ডল তুলিয়া কটমট করিয়া একদৃষ্টে শূন্যপানে চাহিয়া থাকে। কি এক ভীষণ প্রতিজ্ঞায় থাকিয়া থাকিয়া চোখের বড় বড় দুটা তারা জ্বলিয়া উঠে, কখন বা দাঁতে দাঁতে পিষিয়া শব্দ করে। অনেক সময়ে চুপ করিয়া বসিয়া একা একা মনে মনে কি বিজ্ বিজ্ করিয়া বকে, ক্ষেমা লুকাইয়া লুকাইয়া তাহা বুঝিবার জন্য এতই চেষ্টা করিত, কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। সেই যেদিন গাড়ীতে উঠিয়া তাহার যে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, ক্ষেমা অধিক সময় এ কয় দিন ধরিয়া সেই মূর্ত্তিই দেখিতে পাইত। দেখিয়া দেখিয়া

ক্ষেমা অন্তরে অন্তরে শিহরিত। ভাবিত, ইনি কি উন্মাদ হইলেন? কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার বেশ প্রকৃতিস্থ দেখিতে পাইত, তখন আর সে আশঙ্কার কোন কারণই বুঝিতে পারিত না। যাহা হউক, বড় সোহাগিনী হইলেও দিনাং সে তারাসুন্দরীর নিকটে সর্ব্বদা আসিতে ভয় করিত। তবে আজ কি তারাসুন্দরী তাহাকে ডাকিয়া এই কথা পাড়িলেন, তাই সে সাহসে ভর করিয়া বলিল—"তা, হাঁ মা, রাজার মেয়ে বৌ হইবে, এর চেয়ে আহ্লাদের বা আর কি আছে—তাতে তবে—"

তারাসুন্দরী ভ্রূকুটী করিলেন। ক্ষেমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তবু জোর করিয়া বলিল—"তাতে অমন করিয়া বাধা দিয়া লাভ কি?"

"লাভ!" তারাসুন্দরী গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"লাভ! তুই তার কি বুঝিবি? আমার অমূল্যকে ছাঁটিয়া ভুবন? সে দিন রাজবাড়ীতে গিয়া যতই সে ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছি, ততই ঈর্ষায় জ্বলিয়া মরিয়াছি। ভুবন কে? সে তো না থাকিলে আমার অমূল্যের সঙ্গেই সম্বন্ধ হইতে পারিত।"

ভয়ে ভয়ে ক্ষেমা বলিল—"তাই কেন তবে করিলে না?"

"করিলাম না! সে কি আমার দোষ?" তারাসুন্দরী আবার গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি তো অনেক সাধিয়াছিলাম। হতভাগা মিন্‌সের যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে আর এ আগুন জ্বালাইতাম?"

স্বভাবতঃ বুদ্ধিমতী ক্ষেমা আগা গোড়া বুঝিল। তার অধিক কিছু বলিতে সাহস করিল না। এই সময়ে হরিহর বাবুকে গৃহে আসিতে দেখিয়া, কাপড়ে অঙ্গ ঢাকিয়া পাশ কাটাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

হরিহর গৃহে প্রবেশ করিলেন। মুখ শুষ্ক, ললাট চিন্তারেখাঙ্কিত, সর্ব্ব-শরীর হতাশ্বাসে অবসন্ন। হাতে একখানি পত্র। তারাসুন্দরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া, বলিলেন,—"রাজবাড়ীর পত্র আসিয়াছে?"

হরিহর অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিলেন, "হুঁ।"

আহ্লাদ সহকারে তারাসুন্দরী বলিলেন—"তারা কবে দেখিতে আসিবে? কি লিখিয়াছে, পড় না।"

হরিহর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "লিখিয়াছে আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

তারাসুন্দরী একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন—"ওমা, ওকি কথার শ্রী! ভেঙ্গে বলই না, কি লিখেছে।"

হবি। বিবাহ হইল না।

"বিবাহ হইল না! সে কি? কেন?" মহাব্যগ্রতাব সহিত তাবাসুন্দবী ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বস্তুতঃ তখন তাহার বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ কবিতেছিল। কি জানি, যদি পত্রে তাহারই কথা কিছু লিখিয়া থাকে? বলিলেন "কি লিখিয়াছে, পড় না, শুনি।"

হবিহর পত্র পাঠ করিলেন। দেওয়ান মুকুন্দরাম লিখিতেছেন—"মহাশয় ক্ষমা কবিবেন। রাজাজ্ঞায় লিখিতেছি, কোন্ বিশেষ কারণ বশতঃ আপনার পুত্রের সহিত রাজকুমারীব বিবাহ ঘটিয়া উঠিল না। সে জন্য অবশ্য আমাদের বিশেষ চিন্তাব কারণ; কেন না, আমাদের কন্যা। আপনার রূপবান্ ও গুণবান্ পুত্র, আপনার ভাবিবাব কোন কারণ নাই। কাবণটা নিতান্ত গুরুতর না হইলে ইহা লিখিতাম না।"

হরিহব যতক্ষণ পত্র পাঠ করিতেছিলেন, তারাসুন্দরী উৎকর্ণ হইয়া এক মনে তাহা শুনিতেছিলেন। পত্র পাঠ শেষ হইলে তাঁহার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। মনে মনে বুড়া মুকুন্দরামের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া, একবারে কপাল হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

খানিক চুপ করিয়া গম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে তারাসুন্দরী বলিলেন—"ওগো বল কি গো! আমি সে সোণাব প্রতিমা ঘরে তুলিতে পারিলাম না! সে রূপ দেখে অবধি যে প্রাণ একবার তাকে কোলে লইবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। আ মরি মরি, সে কি মেয়ে? যেন নবদুর্গা। পোড়াকপালী আমি, আরও ভাবিতেছিলাম, শীঘ্র শীঘ্র এই শুভ কর্ম্মটা হ'য়ে গেলে বাঁচি। এই মাত্র ক্ষেনা হাসিতে হাসিতে বলিতেছিল—'হাঁ মা, আমাদের কি বখশিস্ দিবে?' আমি আবও তাব সঙ্গে বসিয়া বসিয়া কাকে কি দেওয়া যাব, তার পরামর্শ করিতেছিলাম। হা কপাল! কে আমার এমন বাড়া ভাতে ছাই দিলে বে?"

তারাসুন্দবী সত্যসত্যই টস্ টস্ করিয়া চোখেব জল ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া হরিহর আরও ব্যথিত হইলেন। তাঁব নিজেরও কান্না পাইবার উপক্রম হইল। হবিহর বলিলেন, "আমি তো কিছুই বুঝিযা উঠিতে পাবিতেছি না। এ পত্রের অর্থ কি?"

একটু চোখ রগ্ড়াইয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়, তাবাসুন্দরী বলিলেন, "অর্থ আর কি, এ নিশ্চয় কোন শত্রুব কাজ।"

হরি। আমিও তাই ভাবি। কিন্তু কার সঙ্গে আমার এমন শত্রুতা যে মিছামিছি এই বাদ সাধিবে?

তারা। হাঁ-গা, যে মন্দ—যে হিংস্রক, তার আবার সত্য মিথ্যা কি গা?

হরি। সে কথা ঠিক্। কিন্তু আমরা তো কোন কথাই গোপন করি নাই। যে কে কি মন্দ লাগাইবে? আমি বলি কি, একবার দুর্য্যোধন খুড়োকে ঠাইয়া দিই। কি বল?

সর্ব্বনাশ! তাহা হইলেই তো সব প্রকাশ হইবা পড়িবার সম্ভাবনা।

তারাসুন্দরী বলিলেন, "ছিঃ তাহা হইলে তারা বড় নীচ ঠাহরাইবে।"

হরি। তবে, বল দেখি কি করা যায়?

তারা। করিবে আর কি? ভুবন কি আমার হেঁজি পেঁজি ছেলে? হউক না ডাকের সুন্দরী; কিন্তু আনুক দেখি হাজারের ভিতর অমন একটি পাত্র?

হরিহর ঈষৎ হাস্য করিলেন। বলিলেন, "রাজকন্যা, তায় দেশ যুড়িয়া রূপ গুণের খ্যাতি ধরে না—তার সুপাত্রের ভাবনা কি?"

তারাসুন্দরী ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—"রূপে গুণে ভুবনের আমার জোড়া নাই। ভুবনের বিবাহের জন্য তাই বলিয়া কারও দ্বারস্থ হইবার আবশ্যক নাই। অনেকে সাধিয়া আসিয়া মেয়ে দিবে।"

হরিহর চুপ্ করিয়া রহিলেন।

তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন—"আমার ইচ্ছা হইতেছে, এই পত্রের বেশ উচিতমত উত্তর লিখিয়া পাঠাই। তিনি না হয় রাজা, আমরা না হয় গরিব, তা বলিয়া শুধু শুধু এমন অপমান করিবার তিনি কে?"

কথাটা কিন্তু মুখ দিয়া বাহির হইবামাত্র তারাসুন্দরী বুঝিলেন, তাহা বলা ভাল হয় নাই। কি জানি, যদি শেষ বিপরীত ঘটিয়া বসে। যদি গোলমালে তাঁহার কথাটাই বাহির হইয়া পড়ে! তাই চাপা দিবার জন্য আবার বলিলেন—"তবে কি জান, অত বড় লোকের সঙ্গে বাদানুবাদ করা আমাদের মত লোকের সাজেও না, ভালও দেখায় না। যদি রাজকন্যা পুত্রবধূ হওয়া আমাদের কপালে থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই হইত। যখন এতটা করিয়াও তাহা ঘটিল না, তখন আপনাদের অদৃষ্ট ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত।"

হরিহর বলিলেন, "তা ত সত্য; কিন্তু তাঁদের একবার চর্চ্চিয়া দেখাটা উচিত ছিল।"

তারা। বড় লোকের বড় কথা।

হরিহর বড় ভ্রিয়মাণ হইয়া—বুঝি চোখ দুটাও ছল্ ছল্ করিয়া আসিয়াছিল—একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে ভুবন আর মিছামিছি পড়া বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে কেন? কলিকাতায় যাক।"

তারাসুন্দরীও দুঃখার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "কি বলি বল? অনর্থক এই দেখ না কটা দিন ক্ষতি হইল। আহা, বাছাই বা কি মনে করিবে?"

হরি। এই জন্যই আমি আগে তাহাকে আনাইতে চাহি নাই।

তারা। তা, আমি অভাগী কি এমন হবে তা জানি? আমার ভয় হইতেছে, পাছে লোকে শেষে আমাকেই দুবে।"

কথাটা হরিহরের কানে কেমন খট্ করিয়া আঘাত করিল। বিস্মিত হইয়া একবার পত্নীর দিকে চাহিলেন। তখন ঘোর হইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার স্তরে স্তরে নামিতেছিল। সেই অন্ধকারে ধীরে ধীরে আকাশ পৃথিবী নীলিমা সমস্ত ছাইয়া আসিতেছিল। অন্ধকারের একটা চাপ শিশুর ন্যায় মাথা গলাইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। অবাক হইয়া হরিহর আকাশের এক কোণে যে একটা নক্ষত্র আলোক-আঁধারে জড়িত হইয়া অস্পষ্টভাবে জ্বলিতেছিল, তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

তারাসুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "কি জান, সম্পর্কটা যে বড় খারাপ।"

হরিহর চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু খট্‌কাটা সহসা মন হইতে দূরীভূত হইল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

তখনও ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই, বেশ ঘোর ঘোর রহিয়াছে, দুর্য্যোধন খুড়ো বিছানায় পড়িয়া নিদ্রা দিতেছেন।

খুড়া মহাশয় এক আধটু অহিফেন সেবন করিতেন, সমস্ত রাত্রির পর, ভোর বেলায়ই একটু ভাল রকম তন্দ্রা আসিত—তাঁহার বোধ হইল যেন তিনি বিস্তর কষ্ট করিয়া, কাঁটা ফুটাইয়া, হাত পা ছড়িয়া, গাছে উঠিয়া যেমন একটি সুন্দর সুপক্ক ফল পাড়িবার জন্য এডাল ওডাল করিয়া শেষ তাহার বোঁটায় হাত দিয়াছেন, অমনি কোথা হইতে একটা বিকটাকার রাক্ষসী আসিয়া ডাল নাড়া দিয়া উঠিল, তিনি সামলাইতে না পারিয়া ধুপ্ করিয়া তলায় পড়িয়া গেলেন। খুড়ো ঘুমের ঘোরেই চমকিয়া উঠিলেন। তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চোক

বগড়াইয়া চাহিয়া দেখেন, ঘরের ভিতর অস্পষ্ট আলোক আসিতেছে। দুর্য্যোধন বিপত্নীক, বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে বড় বড় পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া শয়ন করিতেন। সেই অস্পষ্ট আলোকে বোধ হইল, যেন তাহার একটা পর্দ্দা সরাইয়া মুখ বাড়াইয়া কে একটা স্ত্রীলোক উঁকি মারিতেছে।

একি সেই রাক্ষসী! খুড়ো ভাবিলেন, তবে কি সত্য সত্যই আমি গাছ হইতে পড়িয়া গিয়াছি, আর এ আমায় এখানে পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া আসিয়াছে। বুঝিতে পারিতেছেন, রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, দূরে দুই এক জনের আওয়াজও মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে, কিন্তু তবু কেমন ভয় করিতে লাগিল। সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, মাগীটা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। জোরে খুড়ো একবার সর্ব্বভয়বিনাশন রামনাম উচ্চারণ করিলেন। যে আসিয়াছিল, সে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "ও ঠাকুরদাদা, ওকি?"

তবু সহসা চক্ষু খুলিতে দুর্য্যোধনের সাহস হইল না। ধীরে ধীরে বারম্বার রাম নাম করিতে লাগিলেন। সে স্ত্রীলোক পুনরায় খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—"ও নামে আমায় তাড়াইতে পারিবে না। আমি পেত্নিনী নই, নাত্নিনী।"

গলার আওয়াজটা যেন পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। তখন দুর্য্যোধন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। বুঝি, সত্য সত্যই প্রেত্নিনী হইলেও দুর্য্যোধন এত চমকিত হইতেন না। দেখিলেন—ক্ষেমা। তারাসুন্দরীর সোহাগের ঝি—ক্ষেমা। আশ্চর্য্য হইয়া খানিক কথা কহিতে পারিলেন না। ক্ষেমা—যে গ্যাদায় মট্ মট্ করে, লোকের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে না, অংখারে আটখানা হইয়া বেড়ায়—সেই ক্ষেমা এখানে কেন? আর আসিবেই যদি, এতই কি কাজ যে এমন সময়ে আসিল? বস্তুতঃ খুড়ো কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষেমা আবার হাসিয়া বলিল—"কি ঠাকুরদাদা, এখনও কি আতঙ্ক গেল না? চিনিতে পারিতেছ না?"

আর কথা না কহা ভাল দেখায় না। দুর্য্যোধন বলিলেন—"তা বড় মিছে নয়—বুঝ্‌লে কিনা—তোমাদের চিন্তে পারা ভার।"

ক্ষেমা বলিল—"কেন, ঠাকুরদাদা, ঠান্‌দিদির তো আঁচলে গাঁচলে লুটাইয়া বেড়াইতে।"

হাসিয়া দুর্য্যোধন বলিলেন, "আরে বুঝ্‌লে কি না—সে হ'লো বুড় বুড়ীর

কথা—আর এই যে সব উচ্চকা-বয়স-ওয়ালা নাতিনীর দল—এদের চেনা বড় শক্ত।

ক্ষেমা। পুরুষ এমন জাতই বটে। আমরাই কেবল ছট্‌ফট্ করে মরি বৈ তো নয়। এই দেখ না, তা না হলে আর রাত না পোহাইতেই এখানে আসি।

দুর্য্যো। বটে—বটে—আজ আমার সুপ্রভাত।

"তা",—ক্ষেমা মুখ-খানা একটু গম্ভীর করিয়া বলিল—"তা, সুপ্রভাতও বটে, কুপ্রভাতও বটে।"

দুর্য্যো। সে কি?

ক্ষেমা। কুপ্রভাত কেন না, প্রথম খবর তোমার পক্ষে সু নয়, কু। রাজারা পত্র লিখিয়াছে, রাজকুমারীর সঙ্গে দাদা বাবুর বিবাহ হইবে না।

সেই মুহূর্ত্তে যদি সহসা আকাশ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া তাঁহার মাথার উপর পড়িত, তা হইলেও বোধ হয় দুর্য্যোধন এত-দূর স্তম্ভিত হইতেন না। সে কি? ক্ষেমা বলে কি? এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত হাঁটাহাঁটি—সব ঠিক্-ঠাক্—শেষে কি না বিবাহ হইবে না! খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন—"কেন হইবে না, তাহা কিছু লিখিয়াছে?"

ক্ষেমা। না, অন্য কিছুই বলে নাই। তবে হবে না যে ইহা স্থির।

তাই বা কি কথা? দুর্য্যোধন ভাবিতে লাগিলেন। ছাঁৎ করিয়া সেই অচিরদৃষ্ট স্বপ্নটা মনে পড়িয়া গেল। তবে কি সেই রাক্ষসী এই ক্ষেমা! বড়ই রাগ হইল। কিন্তু তাহা চাপিয়া বলিলেন, "তুই হয় তো কি শুনিতে কি বুঝেছিস্। ও কথা তোকে কে বল্লে?"

ক্ষেমা। আমি ঠিক্ শুনিছি, ঠিক্ বুঝেছি—আর তাই বল্‌বার জন্যও এত সকালে তাড়াতাড়ি এসেছি। সে বিয়ে হবে না। কেমন, এখন কুপ্রভাত কেন বলিতেছিলাম, তাহা বুঝিলে?

দুর্য্যোধন নীরব হইয়া রহিলেন।

ক্ষেমা আবার বলিল—"আর সুপ্রভাতও যে কেন বলিতেছিলাম, তাহা শুন। আমি সত্য সত্য নিজে আসি নাই। মা আমায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, বড় দাদাবাবুর সঙ্গে বিবাহ দিতে যদি তাহাদের অমতই হয়, তবে ছোট দাদাবাবুর জন্য তুমি কেন একবার চেষ্টা কর না।"

দুর্য্যোধন চটিয়া গেলেন। বলিলেন, "বলিস্ কি, অমন হীরের ধার-ছেলেকে তারা দিতে রাজি হইল না, আর ঐ বানরটাকে সেই মেয়ে দিবে?"

ক্ষেমা বলিল—"চুপ চুপ। আমার কাছে যা বলিলে, আর যেন কারও কাছে ও কথা বলিও না। মা যেন শুনিতে না পান। তা, আমি বলি কি, হানি কি, চেষ্টা দেখ না। এমনও তো হয়।"

দুর্য্যো। এ একেবারেই হবার নয়।

ক্ষেমা। কেন? বলে, "জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।" না হবার কারণ তো দেখি না।

দুর্য্যো। যদি বিধাতা পারেন, করুন। আমি ইহা পারিব না।

ক্ষেমা। পারিবে না?

দুর্য্যো। না।

ক্ষেমা। তবে আমি যাই।

দুর্য্যো। যাও।

ক্ষেমা। দেখ, হাজার টাকা। মা বলিয়াছেন, যদি তুমি এ সম্বন্ধ ঘটাইতে পার, রোক হাজার টাকা গণিয়া দিবেন।

দুর্য্যো। যে পারে, তাহাকে টাকা দিতে বলিও। আমি ইহা পারিব না।

ক্ষেমা। দেখ, দু হাজার টাকা পর্য্যন্ত তিনি দিতে প্রস্তুত। বুঝিয়া বল।

দুর্য্যোধন চুপ করিয়া রহিলেন। অনেক টাকা—একবার ভাবিয়া দেখিলেন। তিনি আপনাকে খুব সেয়ানা বলিয়া জানিতেন বটে, কিন্তু বুড়া মুকুন্দরাম যে তাঁহার অপেক্ষাও সেয়ানা, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। অমন পাকা সোণা যেখানে চলে না, সেখানে কষ্টির মুখে মেকি চালাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এতটা টাকার লোভই বা সামলান যায় কি করিয়া? দুর্য্যোধন আবার ভাবিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দেখ, ক্ষেমা, বৌ মা যখন বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি চেষ্টা করিব। কিন্তু যদি সফল না হই, আমার কোন দোষ নাই। বুঝলে কি না।"

ক্ষেমা হাজার চতুর হউক, মেয়ে মানুষ—পাকা কূটবুদ্ধি বুড়ার কথা সব তলাইয়া বুঝিতে পারিল না। বলিল, "তা ত বটেই, তাতে আর তোমার দোষ কি?"

দুর্য্যো। বেশ কথা; তবে ইহাতে হাত দিতে পারি। কিন্তু, দেখ, ক্ষেমা, রাগই কর আর যাই কর—বুঝলে কি না—উচিত কথা বল্‌ব। রূপার জাবগায় বাং চালান বড় কঠিন। ইহাতে কিছু ব্যয় আছে। মুকুন্দরামকে রোক ৫০০৲ টাকা না দিলে যে কিছু হবে, এমন আশাই করা বৃথা। তার কি?

ক্ষেমা হাসিয়া বলিল—"তা, মাকে বলিব। আপাততঃ তিনি আমার হাত দিয়া ১০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, এই লও।"

ক্ষেমা যাহাতে অপরে শব্দ শুনিতে না পায়, এমনি করিয়া, টীপি টীপি আঁচল হইতে টাকা খুলিয়া দিল। দুর্য্যোধন বেশ দেখিতে পাইলেন, ক্ষেমার কাপড়ের আর এক মুড়োয় কি বাঁধা আছে, বুঝিলেন, আজ সুপ্রভাত কেবল তাহার একার নয়। সুপ্রভাত তাঁরও যেমন, ক্ষেমারও তেমনি। কিছু না বলিয়া একটু মুচকিয়া হাসিলেন।

ক্ষেমা বলিল—"তবে এখন যাই।"

দুর্য্যো। এস।

ক্ষেমা যেমন চুপি চুপি আসিয়াছিল, তেমনি চুপি চুপি চলিয়া গেল। খানিক দূর গেলে; দুর্য্যোধন আবার তাহাকে ডাকিলেন। ক্ষেমা ফিরিয়া আসিল।

দুর্য্যোধন বলিলেন, "বলি, তুমি যে এসেছ, কর্ত্তা জানেন?"

ক্ষেমা। না। ভাল কথা! মা বলিয়া দিয়াছেন, এসব কর্ত্তাকে লুকাইয়া তোমায় করিতে হইবে।

দুর্য্যো। দেখিলে, ভাগ্যে জিজ্ঞাসা কর্লেম, নহিলে তো মজাইতে।

ক্ষেমা অপ্রতিভ হইল। আর দুই একটা কথার পর সে চলিয়া গেল।—

তখন, দুর্য্যোধন একা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এ কি ঘটনা! রাজ্ঞীরা এত ঠিক্ ঠাকের পর অমন পাত্রই বা কেন ত্যাগ করিল?—আর এই মাগী টারই বা কি মতলব? আস্পর্দ্ধা কম নয়, যে মেয়ে ভুবনকে দিতে চায় না, সেই মেয়ে দেবে কি না একটা জাদুনান কে! ভাল, হরিহরকেই বা লুকান কেন? বেওরা খানা কি? আমি এখনই একবার হরিহরের সঙ্গে দেখা করিয়া রাজবাড়ী যাব। এর একটা বিশেষ তদন্ত করা আবশ্যক। আর অমূল্যর জন্য চেষ্টা! আমি কি পাগল? বুড়ো হয়েছি বলে কি প্রাণের ভয় রাখি না? সে কাজ হবে না। তবে টাকা গুলো যদি বাড়ী বসে পাওয়া যায়, ক্ষতি কি? শেষ এক কথা—হলো না, কি করিব? নাচার। কিন্তু—দুর্য্যোধন অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া ভাবিলেন—কিন্তু বোধ হয় সম্বন্ধ ভাঙ্গাইবার মূলই ঐ মাগী দুটা। দুর্য্যোধন—একবার নয়, বার বার মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া—স্থির করিলেন, তাঁর সেই স্বপ্নটা নিতান্ত নিরর্থক নয়। মনে মনে বলিলেন, "যদি আমার অনুমান ঠিক্ না হয়, তবে বৃথায় এ চুল পাকাইয়াছি।"

* * *

নিকট বিদায় হইয়া, একমনে হন্ হন্ করিয়া যাই-
[illegible] হইতে অমূল্য আসিয়া দুই হাত বিস্তার করিয়া, পথ
আগুলিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষেমা বলিল—"ও কি দাদাবাবু, পথ ছাড়, লোকে দেখিলে কি বলিবে?"

অমূল্য। আর এই যে কোথায় রাত কাটাইয়া এলে, তাতে লোকে কিছু বলিবে না?

ক্ষেমা। ছি ছি! অমন কথা বলিও না। সর, আমি যাই।

অমূল্য। কোথায় গিয়াছিলি, না বলিলে আমি ছাড়িব না।

ক্ষেমা। আমি বলিব না।

অমূল্য। আমিও নড়িব না।

ক্ষেমা। অমন কর তো মাকে বলিয়া দিব।

অমূল্য। আমিও সকলকে বলিব, ক্ষেমা কোথা হইতে রাত কাটাইয়া আসিতেছিল, তাই ধরিয়াছি।

ক্ষেমা বড় দায়ে ঠেকিল। কথাটা আর কাহাকেও বলিতে তারাসুন্দরী নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কি করে, তাই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু অমূল্যও ছাড়ে না। বেলা হইয়াছে, লোক জন চলা ফেরা করিতেছে, দেখিলে কি বলিবে? কাজেই ক্ষেমা নিরুপায় হইয়া বলিল, "তোমার সম্বন্ধ করিতে গিয়াছিলাম।"

অমূল্য বলিল, "বড় সেয়ানা, এই বলিয়া আমাকে ভুলাইবি। তা হবে না, কোথায় গিয়াছিলি, সত্য করিয়া বল্।

ক্ষেমা। সত্য বলিতেছি, সেই জন্যই দুর্য্যোধন ঠাকুরের কাছে গিয়াছিলাম। রাজকন্যার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করিবার জন্য।

অমূল্য। কেন, দাদা—ভুবন-মোহন!

ক্ষেমা। সে ফস্কে গেছে। তারা লিখেছে, দেবে না।

"সত্যি"—অমূল্য লাফাইয়া উঠিল। বলিল—"আরে তাই এতক্ষণ বলিতে হয়। বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে। বলে, 'কেন রে তোর কাট্না কামাই—না, আমি যে রাজার জামাই।' আরে বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াইলে ফল কি? বাবা এখন কি বলেন?"

ক্ষেমা বলিল, "তিনি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন।"

অমূল্য। বেশ—বেশ! বল দেখি, ক্ষেমা, তোকে

ক্ষেমা একটু চোখটা টানিয়া বলিল—"আর কি,

অমূল্য একটু হাসিয়া ক্ষেমার দাড়িতে একটি টো—

"তুই এখন যা, আমি দেখিগে, ভুবন কোথায়।"

অমূল্য মহা হর্ষে লম্ফ দিয়া ছুটিয়া চলিল।

ক্ষেমা রাগরক্তমুখে রোমাঞ্চিতদেহে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন, প্রাতে হরিহর বাবু বৈঠকখানায় একাকী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। নিত্য যেমন ঘোষজা বোসজা চাটুর্য্যে মুখুয্যের দল আসিয়া থাকেন, আজিও তেমনি সকলে আসিয়াছিলেন, তবে অধিকক্ষণ কেহই থাকেন নাই। আজ দুই দিন হইল বাবুর বড় অসুখ, অধিক কথা কহিতে, বা কথা কহিলে বড় কষ্ট বোধ হয়। সহসা কি এমন অসুখ হইল, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, তবে দেখিল বটে, বাবু বড়ই বিমর্ষ, সদাই ভাবনাযুক্ত, কি একটা মানসিক গ্লানিবশতঃ যার পর নাই মনঃক্ষুণ্ণ। কারণটা জানিবার জন্য সকলেরই যে বিশেষ একটা মাথাব্যথা ছিল, তাহা অবশ্য নহে, তবে সমক্ষে কেহই তাহার জন্য সাধ্যমত সহানুভূতি ও যত্ন জানাইতে ত্রুটী করেন নাই। কেহ বলিল, ডাক্তার দেখাও। কেহ বলিল, এ হৃদ্রোগ, ইহার পক্ষে কবিরাজের চিকিৎসাই ভাল। কেহ কোথায় তাহার কন্যার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে কাহার এইরূপ অসুখ দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহার তুলনা তুলিল। কেহ বা একেবারে আর কিছু না করিয়া রসাসিন্ধু ও পটোলের স্বত্ব ব্যবস্থা করিল। হরিহর ইহা শুনিতেন, একটু ম্লান হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। ফলতঃ কোনরূপ চিকিৎসাও চলিল না, অথচ কথাটাও কেহ জানিল না। জানিল কেবল এক জন। সে দুর্য্যোধন খুড়ো। দুর্য্যোধন খুড়ো সে দিন ক্ষেমাকে বিদায় দিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া, হরিহরের কাছে আসিয়াছিলেন। উভয়ে অনেক কথা হইয়াছিল। কেন হঠাৎ বাজাবা এমন পত্র লিখিল, অমন নিখুঁত ছেলের তাহারা কি দোষ পাইল? ভাল, চর্চ্চিয়াই বা একবার দেখিল না কেন? দুই জনে এ সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। দুর্য্যোধন নিজেই বলিলেন, "আমি এখনই গিয়া ইহার বিশেষ তদন্ত করিয়া আসিব।"

দুর্য্যোধন উঠিতে যান, হরিহর তাঁহাকে বসাইলেন। তাঁর তারাসুন্দরীর কথা মনে পড়িয়া গেল। চুপ করিয়া খানিক ভাবিলেন। ভাবিলেন, সে দিন সেই তো সেখানে গিয়া কিছু বলিয়া আসে নাই? আশ্চর্য্য নয়, তিনি পত্নীর স্বভাব ভাল রকমই অবগত ছিলেন। আজ দুই দিন ধরিয়া ঐ কথাটাই অনবরতঃ তোলাপাড়া করিতেছিলেন। এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল, ক্ষেমাকে গোপনে ডাকিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু ভয়, পাছে ক্ষেমা গিয়া আবার তারাসুন্দরীকে সে কথা বলিয়া দেয়। তাহা হইলেও বিষম হুলস্থুল ঘটিবার সম্ভাবনা। ভাবিয়া চিন্তিয়া ক্ষেমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। এখন দুর্য্যোধন রাজবাড়ী যাইতে উদ্যত। অবশ্যই সে ইহার তদন্ত করিতে ছাড়িবে না। সে যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সুচতুর, কারণটা বুঝিতে যে তাহার বাকি থাকিবে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু—কিন্তু—যদি তারাসুন্দরীরই এই কাজ হয়—সে কথা ভাবিতেও হরিহর যার পর নাই ব্যথা পাইলেন—তাহা হইলে অনর্থক কেন আর এ কলঙ্ক দশ জনের কাছে প্রচার করি? অনেকক্ষণের পর হরিহর বলিলেন,—"না খুড়ো, তোমার সেখানে গিয়া কাজ নাই। তাহারা দিবে না, ইহাই তাহাদের অভি[illegible] তেমন কোন বিশেষ কারণ থাকিলে ছাপাইবে কেন?"

দুর্য্যোধন অবশ্যই যুক্তি দেখাইতে ক্র[illegible] হরিহর নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভাবে তাহা কা[illegible]য়া দিলেন। দুর্য্যে[illegible]রাগ হইল। তিনি চটিয়া চলিয়া আসিলেন। তার পর, সে দিন দুর্য্যো[illegible]র হরিহরের কাছে যান নাই। হরিহরও দুর্য্যোধন কি করিলেন না করিলেন, তাহার কোন সন্ধান লন নাই।

সকালে হরিহর একেলা বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ভুবন সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। কি দীন নম্র মূর্ত্তি! হরিহর জানালার দিকে চাহিয়াছিলেন, দেখিতে পাইলেন না। ভুবন তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইংরাজি লেখা পড়ার আমাদের দেশ যুড়িয়া একটা খুব অখ্যাতি রাষ্ট্র আছে। সে আমাদের ছেলে পুলের স্বভাব একেবারে বিগড়াইয়া দেয়। অনেকে ইংরাজি শিক্ষা আর ডাইনীকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ডাইনীর হাতে ছেলে সমর্পণ করিলে তাহা যেমন আর ফিরিয়া পাইবার আশা থাকে না, তেমনি ছেলেকে ইংরাজি লেখা পড়া শিক্ষা দিলে সে ছেলের উপর আর তার পর বাপ মার কোন হাতই থাকে না। সে নাকি সকল বিষয়েই হুট্ হাট্ করে, কথায় কথায়

আস্তিন গুটায়, যিনি যত বড়ই গুরুজন হউন, বড় একটা 'কেয়ার' করে না। এ নিন্দাবাদ যার তার মুখেই শুনা যায় বটে, কিন্তু হরিহর ইহা শুনিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার দুই পুত্রকে দেখাইয়া দিতেন। ইংরাজি লেখা পড়া ভুবন যথেষ্ট শিখিয়াছে—কিন্তু কি শান্ত ধীর ও বিনয়ী। আর, অমূল্য? সে কি জানে—কিন্তু গোঁয়ারের একশেষ। ভুবনের গুণের কথা বলিতে হরিহরের হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিত। যে আসিয়া ভুবনের প্রশংসা করিত—তারাসুন্দরী ছাড়া কে না করিত?—অমনি তাঁহার চোখের কোণে এক বিন্দু জল দেখা দিত। তিনি তাহাকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। চক্ষু ফিরাইতে দেখিলেন, ভুবন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উপযুক্ত পুত্র, কিন্তু তবু পিতা অনুমতি না করিলে বসিতে পারিতেছে না। দেখিয়া, হরিহর বলিলেন—"এস, বাবা, এস।"

তখন, ভুবন ধীরে ধীরে বিছানায় গিয়া বসিলেন। ভুবনকে দেখিয়া হরিহরের কান্না আসিল। হায় হায়, এতটা করিয়াও এই বিবাহটা দেওয়াইতে পারিলাম না! হরিহর পুত্রকে কি বলিবেন, তাহার কথা না পাইয়া চুপ করিয়া খানিক গম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ধীরে ধীরে ভুবন [illegible] ক্ষতি হইতেছে, যদি আজ্ঞা হয়, আজ বৈকালে আসি।

হরিহর বুঝিলেন, [illegible] জানিয়াছে। বলিলেন,—"আজ থাক, কাল তখন ভোরে যাত্রা।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া ভুবন উঠিতে যায়, এমন সময় হরিহর একটু কাসিয়া বলিলেন,—"বাড়ীর ভিতর সব বোধ হয় শুনিয়াছ?"

বস্তুতঃ কথাটা যখন বাড়ীর সকলেই শুনিয়াছিল, তখন ভুবন না শুনিবে কেন? বিশেষ, অমূল্য "রাজার জামাই—রাজার জামাই" করিয়া তাঁহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় ভুবন বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে অমূল্যের ইয়ারের দল তাঁহাকে দেখিয়া "যুবরাজ—যুবরাজ" করিয়া উঠিল। অমূল্য হাসিয়া বলিল, "যুবরাজ বাহাদুরের আসন সঙ্গে আছে তো?" ভুবন সেই সকল অপদার্থ গুলাকে কিছু না বলিয়া ক্রোধভরে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। সেখানে তারাসুন্দরী ক্ষেমাকে ডাকিয়া ভুবনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন—"দেখ, যে যেমন তার তেমনি চলিলে তবে শোভা পায়। বামন হয়ে হাত বাড়াইলেই কি চাঁদ ধরা যায়?" ভুবন সে শেষ ও টীটকারির

অর্থ বুঝিলেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া আপনার গৃহে গিয়া খিল দিলেন। রাঁধুনি আহারের জন্য ডাকিতে আসিলে, আহারে ইচ্ছা নাই বলিয়া দিলেন। অন্য দিন হইলে তারাসুন্দরী আসিতেন না—তারাসুন্দরী নিজে কখনও ডাকিতে আসেনও নাই—আজ কিন্তু আসিয়া ডাকিলেন। বলিলেন, "তা, চোরের উপর রাগ করিয়া ভুঁয়ে ভাত খেলে কি হবে বল?" ভুবন তাঁহার ডাকিবার অর্থ বুঝিলেন। কিছু না বলিয়া শুইয়া রহিলেন। প্রভাতেই পিতার অনুমতি লইয়া চলিয়া যাইবেন, স্থির করিলেন। তাই বলিতেছিলাম, ভুবন কথাটা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু ভুবন সে ছেলে নয় যে, পিতাকে কিছু বলিবেন। গত দিবসের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। হরিহর বুঝিলেন, লজ্জাবশতঃই পুত্রের এই ভাব হইয়াছে।

হরিহর বলিলেন, "তা কুলোকের কুপরামর্শে তাহারা যাহাই লিখুক, আমি বলিতেছি, এ বিবাহ হইবেই হইবে।"

ঠিক্ এই কথার জবাবে কোথা হইতে কে বলিয়া উঠিল—"আমি বলিতেছি, এ বিবাহ হইবে না—হইবে না—হইবে না।"

আশ্চর্য্য হইয়া হরিহর দ্বারের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, গুণধর পুত্র অমূল্য। হরিহর তাহাকে দেখিয়াই জ্বলিয়া গেলেন। বলিলেন, "তুই গুণ্ডটার সন্তান আবার এখানে জ্বালাতে এসিছিস্?"

অমূল্য বলিল—"তা বাবা, গালাগালিটা আমাকে দেবে দাও, আপনাকে আপনাকে আর আপনি দাও কেন? দাদা মহাশয় স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহাকে কি আর সকাল বেলা ও কথাটা বলা ভাল?"

রাগে হরিহরের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিলেন, মুখে কথা আটকাইয়া গেল। ভুবন অমূল্যকে বলিলেন—"ছি, অমূল্য, পিতার প্রতি উক্তি কি শিখিতেছ?"

অমূল্য বলিল, "আরে ছি, যুবরাজ, সিংহাসনটা গুটাইয়া ব'সো।"

হরিহর বলিলেন, "পাজি—নচ্ছার—বেরো বেটা, তুই আমার ত্যজ্য পুত্র।"

অমূল্য। ত্যজ্য পুত্র তো রোজ দুবেলা করিতেছ, তা জানি। কিন্তু এখন ত্যজ্য পুত্র করিলে তোমারই লোকসান। রাজার বেহাই হইবার ইচ্ছা থাকে তো আর ও কথা মুখে আনিও না। দুর্য্যোধন ঠাকুরদা ঠিক্ করিয়া আসিয়াছে, রাজকন্যা আমাকে দিবে বলিয়াছে।"

হরিহর কটমট করিয়া অমূল্যের প্রতি চাহিলেন। অমূল্য বলিল, "আমার

দিকে অমন করিয়া চাহিলে কি হইবে, ঐ ঠাকুরদা আসিতেছে—হয় না হয় জিজ্ঞাসা কর।"

এই সময়ে দুর্য্যোধন খুড়ো সেইখানে আসিলেন। হরিহর অমূল্যকে বলিলেন, "বেরো পাজি, আমার সুমুখ থেকে দূর হ—নহিলে জুতিয়ে—" রাগে সব কথাগুলা বাহির হইল না।

ভুবনও অমূল্যের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। ভুবনকে হস্তভঙ্গী করিয়া অমূল্য সেখান হইতে চলিয়া গেল।

হরিহর ভুবনকে বলিলেন, "আচ্ছা, এস বাবা এখন।" ভুবন কি ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক ভাবে আপনার গৃহে গিয়া পুস্তক দেখিতে লাগিলেন।

তখন দুর্য্যোধন খুড়ো আসিলে, হরিহর জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুড়ো তারা নাকি ভুবনকে ছাড়িয়া অমূল্যকে মেয়ে দিবে বলিয়াছে। আর এই ঘটকালি নাকি তুমিই করিয়াছ?"

দুর্য্যোধন বলিলেন—"হাঁ, তুমি তো সেখানে আর যাইতে নিষেধ করিলে, এ দিকে বৌমাও বড় ধরিয়া বসিলেন, কাজেই একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম। তা—তা তোমার পক্ষে তো একই কথা—বুঝলে কি না—কেমন?"

হরিহর চুপ করিয়া রহিলেন। দুর্য্যোধন বলিলেন—"এই কথা বল্‌তেই এত ত্বরান্বিত হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি। তা মন্দ কি?"

কথাটা বাস্তবিক সর্ব্বৈব মিথ্যা। দুর্য্যোধন বৎসরৈক হইল এক কন্যার বিবাহে খরচের টানাটানি বশতঃ আপনার একখানি সাধের বাগান বন্ধক দিয়াছিলেন। ভাবিলেন, এই দাওয়ে যদি সেখানা উদ্ধার করা যায়, তাহা হইলে বড় সুখের কথা। তিনি সেই জন্য ক্ষেমাকে বলিয়াছিলেন, মুকুন্দরামকে রাজি করিয়াছেন, আপাততঃ ২০০৲ টাকার আবশ্যক। ক্ষেমা গিয়া সে কথা তারাসুন্দরীকে বলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ক্ষেমা আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়াইয়া বলিয়াছিল। তারাসুন্দরী আনন্দে উৎসাহের সহিত সেই টাকা গুলি গণিয়া দিলেন। ক্ষেমার হিসাবমত অবশ্যই তাহার মধ্যে ৫০৲ টাকা ক্ষেমার বাক্সে আগে উঠিলে, তার পর ২০০৲ টাকা দুর্য্যোধনের হাতে গিয়া পৌঁছিল। তারাসুন্দরী কথাটা নিজেই অমূল্যকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "বাবা, এখন হইতে একটু ভাল হইয়া চলিও, কেউ যেন কোন দোষ দিতে না পারে। রাজার মেয়ের তোমার সঙ্গে পাকা দেখা হইবার কথা স্থির হইয়াছে।" সেই কথা শুনিয়াই অমূল্য সেই রাত্রে ইয়ারদের খুব ঘোর বটা করিয়া চড়িভাতি

দিয়াছিল। ভুবনকেও নূতন রকমে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিবার জন্য মতলব আঁটিয়াছিল। তা সে যাহাই হউক, দুর্য্যোধন যখন দেখিলেন, হরিহর ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তখন ফাঁজেই সুর বদলাইয়া ধরিলেন।

হরিহর চুপ করিয়া শুনিলেন। না রাম না গঙ্গা—কিছুই বলিলেন না। বেশ বুঝিলেন, তাঁহার সন্দেহ অমূলক নহে। মনে মনে বলিলেন, "কুক্ষণে তারাসুন্দরীকে রাজবাড়ী যাইতে দিয়াছিলাম!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আজ বড়ই দুর্দ্দিন। শেষ রাত্রি হইতে আকাশে মেঘ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, আর অবিশ্রান্ত টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। থাকিয়া থাকিয়া একটা পুবে জ'লো হাওয়া আসিয়া দরজা জানালার উপর জোরে ধাক্কা দিতেছে। প্রভাত দেখিয়া যে কেহ উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আকাশের ভাব গতিক দেখিয়া আবার মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, সেই দমকা হাওয়া ও বৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পথ ঘাট তখন কাদায় ভরিয়া গিয়াছে। নারিকেল গাছের বাল্‌দোর উপর চুপ করিয়া গোটা হইয়া বসিয়া দুটা কাক বাত্যাবিতাড়িত আপনার বাসা পানে চাহিয়া ভিজিয়া ভিজিয়া ফুলিতেছে। পূর্ব্ব রাত্রির পলায়িত একটা গোরু কোথাও বা মুখ উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। কচিৎ বা দোদুল্যমান জীর্ণ গোয়ালের আগড় ঠেলিয়া একটা বাছুর হাম্বা রব ছাড়িতেছে। বৃষ্টি কখনও একটু কমিলেও বাঁশতলার পথে হাওয়ার জোরে পাতার জল ছড় ছড় করিয়া পড়িতেছে। সেই বৃষ্টিকে তুচ্ছ করিয়া, মাত্র পুকুরপাড়ে বাবলা গাছের উপর বসিয়া একা মাছরাঙা, আকাশের জল পাইয়া যে দুই একটা মাছ ভাসিয়া উঠিতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। আর তদধিক মৎস্যলোলুপ দুই জন লোক মোহানার মুখে ঘুনি পাতিয়া চুপ করিয়া গুন্ মাথায় দিয়া একটা নোনা-তলায় বসিয়া ভিজিতেছে। বৃষ্টি ধরিয়া আকাশ হঠাৎ যে বেশ ফরসা হয়, তাহা বোধ হয় না, এখনও থানার ধারে বড় বড় কচু গাছের তলায় ভিজিয়া ভিজিয়া ব্যাংগুলা বিষম কলরব করিতেছে।

আজ বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা জমে নাই, পাঠশালায় ছেলে আসে নাই, নাঠে সে রাখালের চির পরিচিত মেঠো অথচ মিঠে গলা শুনা যায় না। পথে লোক জন বড়ই কম। যাহারা বাহির হইয়াছে, তাহাদেরও গন্তব্য স্থান অতি

সামান্য দূর। কেহ স্নানার্থ বাহির হইয়াছে, কেহ নারিকেল কুড়াইতে ছুটিয়াছে, যাহার বিচালির সংস্থান নাই, সে মাঠ হইতে তাড়াতাড়ি এক বোঝা ঘাস মাথায় করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে, কেহ গৃহিণীর গঞ্জনা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তেল আনিবার জন্য টোকা মাথায় দিয়া দোকানে চলিয়াছে, কেহ বা বিশেষ কোনও দায়ে ঠেকিয়া এক বার প্রতিবেশীর বাড়ী চলিয়াছেন। তা ছাড়া দূরযাত্রী অতি সামান্য। যাহারা রাত্রি থাকিতে ঝড় বৃষ্টির আগে বাহির হইয়াছিল, তাহারাও কোনও ভাগ্যবানের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে।

বেলা যখন আন্দাজ এগারটা, তখন একমাত্র পথিক বেলডাঙ্গার রাজপথ দিয়া দ্রুতপদে চলিয়াছে। হাওয়ার জোরে ছাতির শিক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পায়ের কাদা মাথার পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে, ভিজিতে ভিজিতে বরাবর রাজবাড়ী অভিমুখে চলিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয়, লোকটি অনেক দূর হইতে আসিতেছে। পথে কোথাও এক দণ্ড বিশ্রাম করে নাই। পথ চলাও যে সচরাচর অভ্যাস আছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। বয়স বেশী নহে—এই কেবল তরুণ যৌবন। কিন্তু তাহার কার্য্য দেখিলে বোধ হয় যেন এই বয়সেই সংসারবিবাগী ও প্রাণে মমতাবিহীন। তাহার আত্মীয় স্বজন কি কেহই নাই যে, এই ঘোর দুর্দ্দিনে গৃহে ধরিয়া রাখে? তখন যদি নিকটে কেহ থাকিত, সে বেশ লক্ষ্য করিত যে, তাহার মুখ আঁটা পিটিয়া ঠোঁটে ঠোঁটে জোড়া লাগিতেছে, চোখের তারা ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, ঘন ঘন নিশ্বাসে বুকখানা কামারের জাঁতার ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, জানু দুটা প্রায় অবশ হইয়া আসিয়াছে, একটা উছট লাগিলেই দশ হাত তফাতে ছিট্‌কাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু তবু সে হতভাগ্য ঝঞ্ঝা বৃষ্টি সমস্ত তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণে ছুটিয়াছে।

সেই যুবক যখন রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন একবার অতি বেগে বৃষ্টি আসিল। সঙ্গে সঙ্গে দুনা তেজে ঝড়ও গোঁ গোঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। মড় মড় করিয়া দেখিতে দেখিতে বড় বড় গাছ সকল পড়িতে আরম্ভ হইল। ঝড় বৃষ্টির সেই প্রবল-বেগ, সেই অবসন্ন ও পরিশ্রিন্ন দেহে অসহনীয় হইয়া উঠিল। বারবার আছাড় খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। উঠিয়া কর্দ্দমাক্ত কলেবরে দন্তে দন্তে অধর দংশন করিয়া পথিক রাজপথ ত্যাগ করিয়া—তখন যে পথে গাছপালা বড় একটা ছিল না,—সেই প্রাসাদের উপকণ্ঠপথ বাহিয়া

চলিতে লাগিল। তখন ইতস্ততঃ দেখিবার অবকাশ ছিল না; পথে নিবারণ করিবারও কেহ নাই, যে দুই এক জন প্রহরী ঘরের ভিতর আপনার খাটিয়ায় বসিয়া দুই একটা হাঁক দিয়াছিল, তাহাও বৃষ্টির শব্দে শুনা গেল না। অনেক পথ আসিয়া সেই যুবক যখন একবার মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তখন ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এ কি, কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি? এ যে রাজবাটীর খিড়কীর পথ! কিন্তু দাঁড়াইয়া ভাবিবার বা পশ্চাৎ ফিরিবার সময় তখন ছিল না। দেখিলেন, সম্মুখে এক অনতিবৃহৎ অট্টালিকা—অট্টালিকা পুরাতন ও জীর্ণ—তাহা প্রবল ঝড়ে দুলিতেছে। সে যে অচিরাৎ ভূমিসাৎ হইবে, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ, ইহার ভিতরে যে বহু লোক কথা কহিতেছে। ঝড়ের বেগে খিল খুলিয়া গিয়া কয়েকটা জানালার কপাট বার বার আছড়াইয়া পড়িতেছে। চাহিয়া দেখিলেন, একটি জানালায় একজন স্ত্রীলোক মুখ বাড়াইয়া কি দেখিতেছে। সে একটা পাশের ঘর। বাড়ীর সকল ঘর অপেক্ষা সেই ঘরটাই বেশি দুলিতেছিল। যুবক চীৎকার ছাড়িয়া উঠিলেন। সে শব্দ ঝটিকার প্রবল শব্দে মিশাইয়া গেল। সে চীৎকার শুনিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু সেই স্ত্রীলোক জানালা হইতে পথিককে দেখিতে পাইলেন। কোথায় কোন্ অসহায় হতভাগ্য আশ্রয়বিহীন হইয়া কষ্ট পাইতেছে, তাহা দেখিবার জন্যই বুঝি তিনি তখন জানালার ধারে আসিয়াছিলেন। যুবক সেই দিকে চাহিয়া বারবার হস্ত সঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। রমণী কিন্তু বুঝিলেন, দ্বার খুলিয়া তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্যই সে ইঙ্গিত করিতেছে। তিনি নিজের বিপদ্ জানিলে এতটা ব্যস্ত হইতেন কি না সন্দেহ, তৎক্ষণাৎ ব্যাকুল ভাবে নীচে নামিয়া আসিলেন। সেখানে অনেক লোক বসিয়া জটলা করিতেছিল; পথিককে লইয়া আসিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করিলেন। দুই জন লোক দৌড়াইয়া যাইবে, এমন সময়ে অকস্মাৎ ভীষণ শব্দে মড় মড় করিয়া উপরের সেই গৃহ চারিদিকে ইট কাঠ ছড়াইয়া চুরমার হইয়া পড়িয়া গেল। দেখিয়া, সভয়ে অবিলম্বে সেই বাড়ী পরিত্যাগ করিবার জন্য সকলে প্রস্তুত হইল। কিন্তু সেই রমণী—সে অপর কেহ নহে, রাজকুমারী মাধুরী—অগ্রে সেই পথিককে লইয়া আসিবার জন্য আদেশ দিলেন। চারি জন লোক দৌড়াইয়া গিয়া, পাঁজা বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া আসিল। পথিক সংজ্ঞাশূন্য। অনেকক্ষণ হইল মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে বাহকেরা সেই পথিককে আনয়ন করিল। পথিক তখনও সংজ্ঞারহিত। ধরাধরি করিয়া সকলে বাড়ীর ভিতর লইয়া আসিল। দৌড়িয়া সকলে দেখিতে আসিল। যে দেখিল, সেই অবাক হইয়া গেল। এ কি রূপ! বিধাতা কি নির্জ্জনে মানস-সরোবরে বসিয়া, সহস্র পদ্ম-কোরক ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহার অন্তর্দল দিয়া এই লোকললামভূত কামনীর দেহ গড়িয়াছেন? সম্প্রতি বৃষ্টিবারিবিধৌত হইয়া তাহার শোভা আরও কতই না বর্দ্ধিত হইয়াছে! কি মুখ, কি চোখ, কি কপাল, কি ভুরু—কোন খানে কি কিছুমাত্র খুঁত নাই! কি সুভুজবিশিষ্ট সর্ব্বাবয়বপরিপুষ্ট সমুন্নত দেহ! পা দুখানি কাদায় মাখামাখি হইয়া গিয়াছে, তবু বোধ হয়, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সেই কর্দ্দম ভেদ করিয়া অমলিন কান্তি ফাটিয়া বাহির হইতেছে। মরি, মরি, কোন্ হতভাগিনীর সন্তান? সংসারে কি কেহ নাই যে, এই দারুণ দুর্দ্দিনেও গৃহের বাহির হইতে না দেয়? রাণীর হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। সংবাদ পাইয়া রাজাও তৎক্ষণাৎ সেখানে আসিলেন। সেই অনিন্দিত শ্রী দেখিয়া তিনিও বিমোহিত হইলেন। তখন, রাজাজ্ঞায় ভিষক্ আসিয়া চেতনা উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেক শেষ তাপ ও ঔষধাদি [illegible] পর, পথিক একবার ঠোঁট নাড়িল। কি বলিতেছে, শুনিবার জন্য রা[illegible] নিজে মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন। শুনিলেন, বলিতেছে—"পলাও পলাও—বাড়ী এখনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।" রাজা ইতিপূর্ব্বে সেই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াছিলেন; বুঝিলেন, ইহারই জন্য তিনি আজ কন্যাকে ফিরাইয়া পাইয়াছেন। এ ব্যক্তি যেই হউক, এ তাঁহার কন্যার প্রাণদাতা। শুনিয়া রাজার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। রাণীকে সে কথা বুঝাইয়া বলিলেন। শুনিবামাত্র রাণী হৈমবতীও চমকিয়া উঠিলেন। সকলের অপেক্ষা অধিক শিহরিলেন—মাধুরী।

তখন, দয়ার উপর কৃতজ্ঞতা আসিল। রাজা, রাণী ও মাধুরী, তিন জনে নিজহস্তে তাহার সুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। যে মাধুরী এক জন সামান্য রোগীর জন্য প্রাণপণ করিয়া সুশ্রূষা করে, না জানি তাহার জীবনদাতার জন্য কতই না আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। বেলা যখন শেষ হইয়া আসিল তখন ঈষন্মাত্রায় চৈতন্য হইল। একবার চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখিল। ভাল করিয়া লক্ষ্য হইল না—সব যেন আবছায়া আবছায়া বোধ হইতে লাগিল। দেখিল, যেন এক বিচিত্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে সুকোমল শয্যার উপর সে শায়িত,

পার্শ্বে বসিয়া চারি পাঁচ জন সেবায় নিরত রহিয়াছে। সম্মুখে স্নেহের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপিণী রাণী হৈমবতী বসিয়াছিলেন,—বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ জগজ্জননী সেই পবিত্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। বড় ঘোর—ভাল করিয়া কিছুই লক্ষ্য হয় না। একটা কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে না পারিয়া, রাণীর প্রতি সকরুণ ভাবে চাহিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"মা!"

মা! রাণীর করুণা আরও উছলিয়া উঠিল। সাগ্রহে, সস্নেহে বলিলেন—"কেন, বাবা?"

"মা—মা—মা—আমার মা—আমার মা" অস্পষ্ট স্বরে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া আবার সে চুপ করিল। দেখিতে দেখিতে ঈষদ্মুক্ত সেই চোখের পাতা বুজিয়া আসিল। আবার সংজ্ঞা লোপ হইল।

রাজা চিন্তাকুল হইলেন। অন্য চিকিৎসক আনাইবার জন্য মুকুন্দরামকে ডাকাইলেন। মুকুন্দরাম আসিল। শয্যার নিকটে গিয়া দেখিবামাত্র বুড়া চমকিয়া উঠিল। বলিল—"এ কি, এ যে ভুবন!"

ভুবন! বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেবীবর মুকুন্দরামের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে ভুবন?"

বুড়া বলিল—"আমি যে কি আসিয়াছিলাম, এ সেই মনোহরপুরের হরিহর চক্রবর্ত্তীর পুত্র—ভুবন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হাঁ, ভুবনই বটে। বুড়া মুকুন্দরাম ঠিক চিনিয়াছিল।

রাজা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"দেখ, ভুল হয় নাই তো?"

মুকুন্দরাম বলিল—"না মহারাজ, এ রূপ যে একবার দেখিয়াছে, তার কি আর কখন ভুল হইবার সম্ভাবনা?"

রাজা বুঝিলেন, কথাটা ঠিক বটে। কন্দর্পলাঞ্ছন এমন অনিন্দিত রূপ কখন তো আর দেখেন নাই। দেশের সর্ব্বপ্রধান বিখ্যাত কারিগর আসিয়া শরৎকালে তাঁহার বাড়ী প্রতিমা গঠন করে, তাহাদের গঠন ও চিত্রনৈপুণ্য দেখিয়া লোকে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সেই প্রতিমাহিত দেব-সেনানী কার্ত্তিকের মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি নিজে কতবার তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু এমন নিখুঁত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন যে তাহারা গড়িতে পারে না। চিত্রের জন্য পটো যে এত বাহাদুরি লইয়া থাকে, কিন্তু এমন সর্ব্বজনমোহন রঙ্গ তো

কখন ফলাইতে দেখেন নাই। রাজা যতই দেখেন, ততই তাঁহার বিস্ময় ও মোহ আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একবার রাণীর দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, রাণী নিথর নিস্পন্দ হইয়া কি ভাবিতেছেন, আর নয়নের পক্ষ্মাগ্রে দুই বিন্দু অশ্রু ঝুলিতেছে। তখন, মাধুরীকে দেখিবার জন্য একবার চক্ষু ফিরাইলেন। মাধুরী নাই। নিঃশব্দে কতক্ষণ হইল, সে সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

তখন শীঘ্র ডাক্তার আনিবার জন্য এক লোক পাঠাইয়া দিয়া, রাজা মুকুন্দরামকে লইয়া কি পরামর্শ করিবার জন্য গৃহান্তরে উঠিয়া গেলেন। মুকুন্দরাম নিভৃতে পাইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসিলেন—"মহারাজ, যাহা শুনিয়াছেন, তাহা কি ঠিক?"

রাজা বলিলেন—"তাহাই ভাবিতেছি।"

মুকুন্দ। শ্রী তো দেখিলেন। আবার গুণ বোধ হয় রূপের চেয়ে শত গুণে বেশি।

রাজা। বুঝিলাম, মাধুরীর নিতান্তই দুরদৃষ্ট, নহিলে এমন সর্ব্বগুণাকর দুর্লভ পাত্র পাইয়া কেন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে?

মুকুন্দ। যাহাই বলুন, আমার কিন্তু বড় সন্দেহ হয়। কোনও শত্রু আসিয়া তো এরূপ মিথ্যা কথা রটায় নাই?

রাজা। তখনও তুমি এই সন্দেহ করিয়াছিলে, কিন্তু আমরা শুনি নাই। এখন আমারও মনে তাহাই লাগিতেছে বটে।

মুকুন্দ। আপনার মুখে শুনিয়াছিলাম, যে সে কথা বলিয়াছিল, সে ভুবনের মাসি। আমার বোধ হয়, ঐ বলিয়া সে মিথ্যা পরিচয় দিয়াছিল।

রাজা। কিন্তু, কথাটা সে তো বলিতে চাহে নাই। রাণী বিস্তর পীড়াপীড়ি করিলে তবে থতমত খাইয়া বলিয়াছিল।

মুকুন্দ। সেও তাহার নষ্টামি। অমন না করিলে প্রত্যয়টা এত সহজে আমাদের জন্মিবে কেন?

রাজা। তা যাহাই হউক, সত্য মিথ্যা কি না, একবার ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করাইলেই সন্দেহ ঘুচিবে।

কথাটা শুনিয়া মুকুন্দরামের বড় আনন্দ হইল। তখন, ডাক্তার আসিলে মুকুন্দরাম অগ্রে সেই পরীক্ষার কথা পাড়িলেন। ডাক্তার যতদূর তাঁহার বিজ্ঞানশাস্ত্রে লেখে, ততদূর করিয়া মনোনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর, অসুখের লেশমাত্র নাই। কেবল সম্প্রতি দারুণ

কষ্ট ও মূর্চ্ছা বশতঃ যা কিছু অসুস্থতা। শুনিয়া রাজা ও মুকুন্দরাম বিস্মিত হইলেন। ডাক্তার যতক্ষণ পরীক্ষা করিতেছিলেন, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রাণী হৈমবতী ততক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে তাহা দেখিতেছিলেন। ডাক্তারের কথা শুনিয়া, তবে ভাল করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। বুকের উপর যে এক-খানা প্রকাণ্ড পাঁথর চাপান ছিল, বোধ হইল তাহা যেন খসিয়া গেল। আনন্দে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল।

তখন ঝড় থামিয়া আসিয়াছিল, বৃষ্টির বেগও অনেকটা মন্দীভূত হইয়া-ছিল। কেবল রহিয়া রহিয়া এক একবার একটা দম্‌কা বাতাস বহিতেছিল। কেবল রহিয়া রহিয়া টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টিপতন শব্দ শ্রুত হইতেছিল। রাণী উঠিয়া একবার জানালা খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন। অপরাহ্ণ সূর্য্যের পশ্চিম কিরণ সেই বৃষ্টিজলে স্নাত হইয়া রহিয়া রহিয়া বাতাসে কাঁপিতেছিল। সূর্য্য-মুখীদাম ঝাঁকে ঝাঁকে উপাড়িয়া গিয়াছে, ফুল ছিঁড়িয়া তলায় পড়িয়া গাদা হইয়াছে, তবু তখনও ক্বচিৎ যে দুই একটা ফুল রহিয়াছে, তাহা তখনও একাগ্রনয়নে আকাশের পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। রাজনীগন্ধার লম্বা লম্বা ঝাড় মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, আর তাহার অগ্রভাগ হইতে মুক্তাফলের ন্যায় বারিবিন্দু ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িতেছে। দোপাটীর গাছগুলা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কাদায় মাখামাখি হইতেছে। ঝটিকোৎপাটিতমূল বড় বড় কৃষ্ণচূড়ের গাছ হইতে তখনও ফুল সকল ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া উড়িয়া যাইতেছে। বড় বড় নারিকেল বৃক্ষের পত্র জলে ধৌত হইয়া অপরাহ্ণ রবির স্বর্ণকিরণ মিশ্রণে বোধ হইতেছিল যেন এইমাত্র কে তাহা সোণার জলে ডুবাইয়া আনিয়াছে। উপরে আকাশপথ বাহিয়া দুইটা ভিজা চিল নীড়াভিমুখে উড্ডীন হইতেছিল। হৈম-বতী এ সকলই দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন তখন বিশেষরূপে নিবিষ্ট ছিল না। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে জানালা হইতে ফিরিয়া একবার গৃহে সেই শয্যার প্রতি চাহিলেন। মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া সেই সোণার কিরণ লাফাইয়া আসিয়া সেই শয্যার উপরে পড়িল। রাণী কি সুন্দর দেখিলেন! সেই সোণার বরণের উপর সেই সোণার কিরণ পড়িয়া কি উজ্জ্বল মধুরে মিলিল! রাণী ভাবিলেন, ধন্য সেই স্বর্ণগর্ভা, যে এমন অমূল্য নিধি প্রসব করিয়াছিল। যাহাকে অপর সকলে রত্নপ্রসবিনী বলিয়া প্রশংসা করে, সেই আজ অন্যকে সেই কথা বলিতেছে, না জানি তাঁহার রত্ন অপেক্ষা এ রত্ন তিনি কতই অধিক উৎকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন।

তখন, চিকিৎসার গুণে বা ততোধিক সুশ্রূষার গুণে ভুবন অনেক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন—"আমি কোথায়?"

রাণী অমনি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "কেন, বাবা, আমি যে তোমার মা; তুমি তোমার মার কাছে আছ।"

মা! আবার সেই কথা—মা! ভুবন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। এবার সে ঘোর ঘোর নাই, সে মস্তিষ্কের অবসন্নতা নাই, চোখের ঝাপসা কাটিয়া গিয়াছে—ভুবন দেখিলেন, মমতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি—হাঁ, মা বলিতে ইচ্ছা করে বটে। তাঁর মাকে ভাল মনে পড়ে না; ভাবিলেন, আমার মা যিনি ছিলেন, তিনি অবশ্য ইহাঁর মতই ছিলেন। এই জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি এক পটে সম্ভব, আর তাঁহার মারই সম্ভব। বলিলেন, "মা, আমি বড় পাপে শৈশবে মা হারাইয়াছি, তুমি যেন আর আমাকে ত্যাগ করিও না।"

সেই কাতর কণ্ঠের কথায় কাতর হৃদয় আরও কাতর হইয়া পড়িল। রাণী বলিলেন, "না বাবা, আমি তোমায় চক্ষের আড় করিব না।" তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পাবরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

মার কথা স্মরণ হওয়ায়, ভুবনের চোখে জল আসিযাছিল। চিকিৎসক তাহা লক্ষ্য করিলেন। রাণীকে উঠিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে রাণী উঠিয়া গেলেন।

গৃহে আসিয়া কন্যার কথা মনে পড়িয়া গেল। অন্য দিন হইলে সে নিজেই এতক্ষণ কত সেবা সুশ্রূষা করিত, কত কথা কহিত। সেই তোতা পাখী আজ একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছে। রাণী কন্যার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার গৃহে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সহচরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা সকলে ভুবনের সুশ্রূষা লইয়া ব্যস্ত ছিল, কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এদিক্ ওদিক্ করিয়া, খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, ছাদের কাছে একটা দরজা ধরিয়া মাধুরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দূর হইতে দেখিয়া রাণী একটু মৃদু হাস্য করিলেন। নিকটে আসিযা বলিলেন, "ওমা, তুমি এখানে? আমি আরও সাত দেশ খুঁজিয়া মরিতেছি।"

মাধুরী মাতার প্রতি চাহিলেন। বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। কত যেন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, মুখে কথা আসিল না।

রাণী আসিয়া গায়ে হাত দিলেন। তখনও টীপি টীপি বৃষ্টি পড়িতেছিল,

বায়ুভরে বৃষ্টির জল ছিটাইয়া আসিয়া গায়ে লাগিতেছিল। রাণী গায়ে হাত দিয়া বলিলেন "আ কপাল! করেছ কি? সন্ধ্যাবেলা গা মাথা সব ভিজা ফেলিয়াছ!"

লজ্জায় মাধুরী এতটুকু হইয়া গেল। মেয়ের সে ভাব দেখিয়া মার হাসি আসিল।

সে হাসি কি সুখের।

অপরাধ-তত্ত্ব।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে—শ্রাবণের 'সাহিত্যে'—দেখান গিয়াছে যে, অপরাধের অল্পাধিক্য, দেশের শৈত্যাতপের উপর অনেকটা নির্ভর করে। ইহা হইতে স্বতঃই অনুমেয় যে, ঋতুভেদেও অপরাধের ন্যূনাধিক্য ঘটিবে। ঘটিয়াও থাকে। ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সের কারাসমূহে প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবারের যত অপরাধী থাকে, তাহার একটি হিসাব, কারা-কমিশনরদিগের বার্ষিক বিবরণীতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। বহু-বৎসর-ব্যাপী এইরূপ হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, গ্রীষ্মাকালে কয়েদীর সংখ্যা প্রতি মাসে ক্রমে কমিতে থাকে, এবং শীতাগমে তদ্রূপ ক্রমে বাড়ীতে থাকে—অক্‌টোবর হইতে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ক্রমে কমিয়া যায়; ফেব্রুয়ারি হইতে অক্‌টোবর পর্য্যন্ত ক্রমে বাড়িয়া যায়। এই হ্রাসবৃদ্ধি এরূপ নিয়মিত রূপে ঘটিয়া থাকে যে, তাহা অবশ্যই কোন স্থায়ী ও ধারাবাহিক কারণ-সম্ভূত। এই কারণ,—আর্থিক, সামাজিক, না প্রাকৃতিক? কারণটা যে প্রাকৃতিক (এ স্থলে 'আর্ত্তব' বলিলেই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত হয়), এরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূলে একটি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়।

কয়েদীরা কোন্ ঋতুতে কি পরিমাণে কারা-নিয়ম ভঙ্গ করিয়া থাকে, লণ্ডন নগরের কারাগার সম্বন্ধে তাহার একটি হিসাব করা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, কয়েদীরা গ্রীষ্মকালে কারা-নিয়মভঙ্গ অপরাধ যত করে, শীতকালে তত করে না। এই রূপ অপরাধে অপরাধী শীত ঋতুতে যত হয়,

গ্রীষ্মকালে হাজার করা সাপ্তাহিক (রবিবার বাদে) তাহার বার জন অধিক হইয়া থাকে! এই হ্রাসবৃদ্ধির কারণ, আর্থিক বা সামাজিক হইতে পারে না; কেন না, কারাবাসীদিগের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা সকলেরই একরূপ—একই স্থানে অবস্থান, একই প্রকার আহার, একই কার্য্য, একই নিয়মাধীন, নিয়মভঙ্গে একই প্রণালীর দণ্ড—এমন কি, বিশ্রাম ও নিদ্রার সময় পর্য্যন্ত অবিকল এক। ঋতু-ভেদে এই সকল বিষয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ ঘটে না—কেবল ঋতুরই পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। অথচ ইহারা শীত অপেক্ষা গ্রীষ্ম কালে অধিক অপরাধ করে। সুতরাং বলিতে হয় যে, অপরাধের এই হ্রাসবৃদ্ধির কারণ—আর্ত্তব। এক্ষণে কথা এই যে, কারাগারের ভিতরে যাহা ঘটে, কারাগারের বাহিরেও তাহা ঘটে কি না।

ঘটিবারই কথা। মনুষ্যপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই মনুষ্যপ্রকৃতি—মানুষ আপনার প্রকৃতি বাহিরে রাখিয়া কারাগারে প্রবেশ করে না।

আত্মহত্যা সম্বন্ধে এই তারতম্য বিশেষ রূপে পরিস্ফুট। লণ্ডন সহরে প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে কত লোকে আত্মহত্যা করে, তাহার একটি বিংশতি-বৎসর-ব্যাপী (১৮৬৫—১৮৮৪) মাসিক হিসাব সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, মাসভেদে আত্মহত্যার হ্রাসবৃদ্ধির অনুপাত এই রূপ ঘটিয়াছে—

জানুয়ারি—৭৩২.	জুলাই——৯০৫.
ফেব্রুয়ারি—৭১৪.	আগষ্ট——৮৯১.
মার্চ———৮৪০.	সেপ্টেম্বর—৭৬৫.
এপ্রিল——৯৩৩.	অক্টোবর—৭৭২.
মে———১০০৩.	নভেম্বর—৭২৬.
জুন———১০২২.	ডিসেম্বর—৬৯৭.

ঋতুভেদে যে আত্মহত্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, তাহা এই হিসাব দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। কেবল যে লণ্ডন সহরে এইরূপ ঘটে, তাহা নহে। ডাক্তার মর্সেলি তাঁহার "আত্মহত্যা" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "সমস্ত ইউরোপীয় দেশেই যে তাপপ্রধান ঋতুদ্বয়ে আত্মহত্যার আধিক্য হয়, ইহা অস্বীকার করিবার পথ নাই।" অধ্যাপক ভন্ ওয়েটিণ্ডেনও ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

অপরাধের আর একটা কারণ—দারিদ্র্য। চৌর্য্যাদি সম্পত্তিসম্বন্ধীয় অপরাধ প্রধানতঃ যে দারিদ্র্যবশতঃই কৃত হয়, ইহাই আমাদের সকলের ধারণা।

ধারণাটা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু চৌর্য্যাদি অপরাধ সম্বন্ধে দারিদ্র্যকে আমরা যতটা দায়ী করি, প্রকৃতপ্রস্তাবে দারিদ্র্য ততটা দায়ী নহে। ইউরোপখণ্ডস্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রতি এক লক্ষ লোকের মধ্যে কত জন চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহার পঞ্চবর্ষব্যাপী তালিকা সংগ্রহ করিয়া হিসাব করা হইয়াছে। তাহার ফলানুপাত এরূপ——

ইতালি——২২১·	জর্ম্মাণি——২৬২·	আয়রলণ্ড—১০২·
ফ্রান্স——১২১·	ইংলণ্ড——২২৮·	হঙ্গারি——৮২·
বেলজিয়ম——১৪৩·	স্কটলণ্ড——২৮৯·	স্পেন——৭৪·

এই তালিকা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, দরিদ্র দেশ অপেক্ষা ধনশালী দেশের লোকই চৌর্য্যাপরাধে অধিক লিপ্ত। ইউরোপখণ্ডে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী দেশ, কিন্তু তাই বলিয়া এই দুই দেশে চুরির সংখ্যা জনসংখ্যানুপাতে অপেক্ষাকৃত অল্প নহে। স্কটলণ্ড অতি বড় ধনশালী দেশ; স্পেন অতি বড় দরিদ্র দেশ; অথচ স্পেনের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা স্কটলণ্ডের অধিবাসীরা চৌর্য্যাপরাধে চতুর্গুণ অধিক লিপ্ত। ইউরোপ খণ্ডে এক ইতালি ছাড়া আর সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, দরিদ্র দেশের লোকেরই সাধুতা অপেক্ষাকৃত অধিক। দরিদ্র ইতালি অসাধু বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ধনশালী ইংলণ্ডের মত অসাধু নহে—অন্ততঃ চৌর্য্যপরায়ণ নহে। ইংলণ্ডের সহিত আয়রলণ্ডের তুলনা করিলে কথাটা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। এই দুই দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা প্রায় একরূপ। সদসৎ কার্য্য সম্বন্ধে জনসাধারণের সংস্কার, এই দুই দেশ প্রায় সমরূপ। দুই দেশেই এক শাসনপ্রণালীর অধীন—ভূমিসম্বন্ধীয় অপরাধ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ সম্বন্ধে এই দুই দেশের দণ্ডবিধি এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি সমবিধ। অপরাধের তালিকা এই দুই দেশে একই পদ্ধতিতে গৃহীত হইয়া থাকে। অথচ, দরিদ্র আয়রলণ্ড চৌর্য্যাপরাধে যতটা লিপ্ত, ঐশ্বর্য্যশালিনী ইংলণ্ড তাহার দ্বিগুণেরও অধিক লিপ্ত। দারিদ্র্যকে চৌর্য্যাদি অপরাধের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত নির্দ্দেশ করা হয়। পেটের দায়ে লোকে চুরি করে বটে, কিন্তু কুপ্রবৃত্তিবশে তদপেক্ষা অনেক অধিক করে।

সকল সমাজেই এমন অনেক প্রকারের চুরি আছে, যাহা রাজবিধির এবং প্রচলিত ভাষায় চৌর্য্য বলিয়া অভিহিত নহে। জাল দলিল তৈয়ার করিয়া এক জন অপরের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেছে; রাতারাতি সীমানা-চিহ্ন বদলা-

ভারতবর্ষের পুলিস্ অন্য প্রকৃতির। ইহারা এমনই অতি-দক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ যে, প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান করিতে না পারিলেও পশ্চাৎপদ হয় না—সাক্ষী তৈয়ার করিয়া, প্রমাণ রচনা করিয়া, কোনও নিরপরাধ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিয়া বিচারাধীন করে। সুতরাং একটা অপরাধ কৃত হইলে, তজ্জন্য কাহাকেও না কাহাকেও অপরাধী রূপে বিচারালয়ে আসিতেই হয়। একটা অপরাধ কৃত হইল, অথচ তজ্জন্য কাহাকেও অভিযুক্ত হইতে হইল না, এরূপ ঘটনা ইংরেজ-শাসনাধীন ভারতবর্ষে কদাচিৎ ঘটে, সুতরাং ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের অভিযুক্তের সংখ্যানুসারে অপরাধের অনুপাত নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত নির্দ্দেশ করা হয়। তাই বলিতেছিলাম যে, ভারত অপেক্ষা ইংলণ্ডে পাপস্রোত যে পাঁচ গুণ অপেক্ষাও অনেক অধিক, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

একটা অতি-গুরু, অতি-ঘৃণিত, অতি-কদর্য্য পাপের দায়িত্ব সচরাচর দারিদ্র্যের স্কন্ধে অর্পিত হইয়া থাকে। অনেক পণ্ডিত লোকেরও ধারণা এই যে, অনেক স্ত্রীলোক দারিদ্র্য-নিবন্ধন সতীত্ব বিসর্জ্জন করিয়া আত্ম-বিক্রীত হইয়া থাকে—পেটের দায়ে রূপ যৌবনের ব্যবসায় করিতে বাধ্য হয়। এরূপ ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ অমূলক। দারিদ্র্য এবং নিত্য-প্রয়োজনীয়ের অভাব যদি এই সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান বা গুরুতর কারণ হইত, তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় ইহার ধিরলতা বা অল্পতা দেখা যাইত। এই দুই দেশে স্ত্রীলোকে কাজকর্ম্ম অতি সহজেই পায়—সৎপথে থাকিয়া আপন জীবিকা-অর্জ্জনের ইচ্ছা থাকিলে এক দিনের জন্যও কাহাকেও বেকার বসিয়া থাকিতে হয় না। স্ত্রীলোককে কাজ খুঁজিতে হয় না, কাজই স্ত্রীলোককে খুঁজে। অথচ এই দুই দেশে এই পাপস্রোত অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। বাস্তবিক পক্ষে, দারিদ্র্য নিবন্ধন কুপথ অবলম্বন করিতে কেহই বাধ্য হয় না; তবে কুপথবর্ত্তিনী হইলে, তার পর দারিদ্র্যবশতঃ সেই পথে থাকিতে বাধ্য হইতে পারে বটে—হইয়াও থাকে। কিন্তু ইহার জন্য ব্যভিচারের কলঙ্কভার দারিদ্র্যের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিলে অন্যায় ও অসঙ্গত হয়। প্রকৃত কথা এই যে, স্ত্রীলোক কুপথ অবলম্বন করে, প্রায়শঃই আলস্য, বিলাসপ্রিয়তা, কুসংসর্গ বা কুপ্রবৃত্তির বশে। পাবেন্ত দুশাতালেৎ, ক্রশেল্ এবং আরও কেহ কেহ—যাঁহারা এই শ্রেণীর পাপ-তত্ত্ব নিগূঢ় ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন—এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। ক্রশেলের মত এই যে, স্ত্রীলোক কুপথবর্ত্তিনী হয় প্রধানতঃ গৃহ-শিক্ষার অভাবে, গৃহ-শিক্ষার দোষে। তিনি লিখিয়াছেন—"স্ত্রীলোকের